মুহতারাম ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের

রচনা সমগ্র-১ম খন্ড

১.অঙ্গবিকৃতি (المثلة) কখন অবৈধ?

হাদিসে অঙ্গ বিকৃতি করতে নিষেধ এসেছে। আরবীতে যাকে المثلة বলা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য- কাউকে হত্যা করতে গিয়ে তার হাত-পা, নাক-কান-চোখ ইত্যাদি কর্তন করা বা নষ্ট করা। যেমন বুখারী শরীফে এসেছে-

"نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النهبى والمثلة"

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুণ্টন ও অঙ্গবিকৃতি থেকে বারণ করেছেন।” [সহীহ বুখারী: ২৩৪২]

তবে এ নিষেধাজ্ঞা বন্দী কাফেরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাফের বন্দী হওয়ার পর তাকে স্বাভাবিক হত্যা করতে বলা হয়েছে। তখন ইচ্ছাকৃত তার অঙ্গ বিকৃত করা নিষেধ। নাক-কান কাটা, চোখ নষ্ট করা, হাত-পা কাটা বা নষ্ট করা: এসব করা যাবে না। অবশ্য এখানেও আইম্মায়ে কেরামের মতভেদ আছে।

পক্ষান্তরে যুদ্ধরত কাফের, যাদের সাথে এ মূহুর্তে মারামারি চলছে বা যেসব কাফেরকে আমরা বন্দী করতে পারিনি- তাদেরকে হত্যা, বন্দী বা কাবু করার জন্য প্রয়োজনীয়

অঙ্গবিকৃতি বৈধ। যেমন- প্রথমে সুযোগ বুঝে আঘাত করে চোখ নষ্ট করে ফেলা তারপর হত্যা বা বন্দী করা।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

ثم لا يخفى أن هذا بعد الظفر والنصر، أما قبل ذلك فلا بأس به إذا وقع قتالا كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقأ عينه فلم ينته فضرب فقطع أنفه ويده ونحو ذلك. اهـ

“অস্পষ্ট নয় যে, নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র হলো- কাবু করতে সক্ষম হওয়া ও জয় লাভের পর। পক্ষান্তরে এর আগে মারামারি অবস্থায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন, প্রতিদ্বন্দী (মুসলিম) যোদ্ধা এক আঘাতে প্রতিপক্ষ যোদ্ধার কান কেটে ফেলল। অপর আঘাতে চোখ নষ্ট করে ফেলল। এরপরও যখন সে বিরত হল না, তখন আরেক আঘাতে তার নাক ও হাত কেটে দিল। এছাড়াও এ ধরণের যেকোন অঙ্গবিকৃতি(তে কোন সমস্যা নেই)।” [ফাতহুল কাদীর: ৫/৪৫২]

মোটকথা: যাকে আমরা বন্দী করেছি, এখন স্বাভাবিকভাবে তাকে হত্যা করতে পারি- তাকে স্বাভাবিক হত্যা করবো। আর যাকে বন্দী করতে পারিনি- চাই তার সাথে মারামারি চলুক বা না চলুক- তাকে হত্যা, বন্দী বা কাবু করার জন্য যেকোন স্থানে

আঘাত করে যেকোন অঙ্গ কর্তন বা নষ্ট করা জায়েয।

অতএব, তাগুত বাহিনির কোন সদস্যের সাথে যদি কোন মুজাহিদ ভাইয়ের মারামারি বেঁধে যায়, তাহলে তিনি তাকে হত্যা বা কাবু করার জন্য বা তার থেকে নিরাপদে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যেকোন জিনিস দ্বারা যেকোন স্থানে আঘাত করে যেকোন অঙ্গ কর্তন বা নষ্ট করতে পারবেন। তদ্রূপ, রাস্তা-ঘাটে চলন্ত বা সেনাঘাটিতে বা বাড়িতে প্রহরারত বা বিশ্রামরত যেকোন তাগুতী সদস্যকে হত্যা, বন্দী বা কাবু করার জন্য যেকোন জিনিস দিয়ে যেকোন স্থানে আঘাত করে নষ্ট ও বিকৃতি ঘটানো যাবে।

২.অজ্ঞাত আমীরের হাতে বাইয়াত: ইমামের পরিচয় কতটুকু জরুরী?

এক ভাই জানতে চেয়েছিলেন,

‘আমরা অজ্ঞাত আমীরের হাতে বাইয়াত দিয়ে জিহাদের কাজ করি, এটা কতটুকু শরীয়তসম্মত’?

প্রশ্নটা শুধু ভাইয়েরই নয়, আরো অনেকেরই হয়তো। বিশেষত যারা জিহাদের সাথে জড়িত না, তাদের অনেকের এ প্রশ্ন। আবার যারা মুজাহিদদের বাঁকা চোখে দেখেন, তারা প্রশ্নটা করে থাকেন মুজাহিদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে।

প্রথমত এখানে মনে রাখা চাই যে, আমীর অজ্ঞাত- এই বাহানায় জিহাদ তরক করার কোন সুযোগ নেই। যেমন, ইমাম কে তা না জানার কারণে নামায মাফ হয়ে যায় না।

দ্বিতীয়ত: জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য কোন একটা হক জিহাদি জামাতে যোগ দেয়া আবশ্যক। সকল মুসলমানেরই এটা দায়িত্ব। জিহাদি জামাত খুঁজে বের করা সবার দায়িত্ব। আমীর অজ্ঞাত- এই বাহানায় জামাতে যোগ দেয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই ।
তৃতীয়ত: আমীর অজ্ঞাত- কথাটাও মুশকিল। একেবারে যারা জিহাদ থেকে গাফেল ও বেখবর হয়ে বসে আছেন, তাদের কাছেই মূলত আমীর অজ্ঞাত। নতুবা যারা দুনিয়ার কিছুটা খবরাখবর রাখেন, মুসলিম উম্মাহর অবস্থা নিয়ে ফিকির করেন, জিহাদের সত্য তামান্না রাখেন, এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন- তাদের নিকট আমীর অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। জিজ্ঞেস করি- মোল্লা উমরকে কে না চেনে? শায়খ উসামার ব্যাপারে কার জানা শুনা নেই? আলকায়েদার আমীর যে

আইমান আযযাওয়াহিরি তা কার না জানা? আসেম উমার হাফিযাহুল্লাহ যে উপমহাদেশে আলকায়েদার আমীর কথাটা কে জানে না? একজন সচেতন মুসলমান তো পরের কথা; দ্বীনের দুশমনরাও তো তাদেরকে ভাল করে চেনে। এমনকি তাদের বয়ান-বক্তৃতা, লেখা-লেখি ও নির্দেশনাগুলোও তারা জানে। কিন্তু হায়! আমি এমনই দ্বীনসচেতন (!!) মুসলমান, আমি এদের কাউকেই চিনি না। জিহাদের ফরয দায়িত্ব থেকে একেবারেই যারা বেখবর, কিংবা জিহাদ থেকে একেবারেই বিমুখ- তারাই কেবল চেনে না। নতুবা বর্তমান দুনিয়ার অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদেরকে না চেনার কথা না।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আমীর – বর্তমান আমীরুল মু'মিনীন হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা হাফিযাহুল্লাহ - যাকে আমরা চিনি না বলে বাহানা খোঁজছি, মূলত তিনি অপরিচিত কেউ নন। অতি গোপনে কোন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অজ্ঞাত ক'জন লোক কোন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আমীর নির্ধারণ করেনি। আফগানের আহলুল হল ওয়াল আকদ এর বাইয়াতের মাধ্যমে সকলের নিকট সুপরিচিত একজন বিশিষ্ট মুজাহিদ আলেমে দ্বীনকে আমীর নির্ধারণ করা হয়েছে। তাকে না চেনা মূলত তিনি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে নয়, আমার নিজের বেখবরি আর গাফলতির কারণে।

তদ্রূপ, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অধীনস্ত

আন্তর্জাতিক জিহাদি সংগঠন আলকায়েদার আমীর শায়খ আইমান আযযাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহও অপরিচিত কেউ নন। তিনি মিশরের সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের উচ্চশিক্ষিত প্রসিদ্ধ একজন ব্যক্তি। তার রাজনৈতিক ও জিহাদি জীবন আরব বিশ্বে অতি পরিচিত। তিনি প্রসিদ্ধ জিহাদি সংগঠন জামাআতুল জিহাদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। প্রকাশ্যে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ করেছেন। জেল খেটেছেন। নির্যাতন সহ্য করেছেন।

আলকায়েদা উপমহাদেশের আমীর আসেম উমর হাফিযাহুল্লাহও অপরিচিত কেউ নন। তিনি কোথায় কোথায়ে লেখাপড়া করেছেন, কোথায় কোথায় জিহাদ করেছেন সবই জানা। ইমারতে ইসলামিয়ার সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবেই তাকে আলকায়েদা উপমহাদেশের আমীর নির্ধারণ করা হয়েছে।

এমনিভাবে যে দেশে যাকে আমীর নির্ধারণ করা হয়েছে, তারা প্রকৃতপক্ষে সবাই প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ঘোষণার মাধ্যমেই তাদের আমীর বানানো হয়েছে। এভাবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গকে আমীর নির্ধারণ করে জামাত গঠন করে তাদের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন যাবৎ জিহাদের কাজও চলছে। এর চেয়ে বেশি আর কতটুকু জানার দরকার আছে?

এ গেল বাহিরের লোকদের কথা। আর তানজীমে জড়িতরা

তো তাদেরকে ভাল করেই চেনেন। তাদের বয়ান বক্তৃতা নিয়মিত শুনেন। নির্দেশনার দিলে সেগুলো সবার কাছে পৌঁছে যায়। মেনে চলার চেষ্টা করেন। প্রচারেও সচেষ্ট হন যথেষ্ট। প্রশ্ন করি- এর চেয়েও অতিরিক্ত চেনার আবশ্যকতা আছে কি?

এখানে আরেকটি কথা বলে রাখি। সেটা হল, তানজীমের অধস্তন আমীর উমারাদের ব্যাপারে। আমরা সাধারণত যাদের নির্দেশনায় কাজ করে থাকি। যাদের ভায়া হয়ে কেন্দ্রীয় উমারাদের নির্দেশনা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছায়। নিরাপত্তার স্বার্থে কাটআফ সিস্টেমের কাজ হওয়ায় তাদের সকলকে আমরা চিনি না। তবে এটা মূলত জিহাদের একটা কৌশল। জিহাদের স্বার্থে এ ধরণের কৌশল গ্রহণ করার অধিকার আছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে জরুরী। কৌশল ও গোপনীয়তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধনীতি দেখলে তাতে আর সংশয় থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

তবে এতটুকু কথা অবশ্যই সত্য যে, আমার উর্ধ্বতন প্রথম আমীর, তথা আমার যিনি সরাসরি আমীর, তাকে আমি ভাল করেই চিনি। কারণ, তার সাথে দীর্ঘ দিনের পরিচয়, জানা শুনা আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক না থাকলে তিনি আমাকে তানজীমে জড়িত করতেন না। দীর্ঘ পরিচয় ও যাচাই বাছাইয়ের পর যখন আমি যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছি, তখনই আমাকে তানজীমে নেয়া হয়েছে। তদ্রূপ, আমার আমীরের

ব্যাপারেও আমার পূর্ণ আস্থা আছে বলেই আমি তার কথায় তানজীমে যোগ দিয়েছি। এরপর যখন তিনি আমাকে নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং সেগুলো উর্ধ্বতন উমারাদের নির্দেশনা বলে জানাচ্ছেন এবং সেগুলো শরীয়ত বিরোধীও মনে হচ্ছে না- তখন তার কথামত চলতে আমার আর কোন বাধা নেই। তদ্রূপ, তিনি যদি আমাকে অন্য কোন আমীরের হাতে সোপর্দ করেন, তাহলেও আমি আশ্বস্ত যে, তিনি উপযুক্ত কারো হাতেই আমাকে সোপর্দ করেছেন। এরপর শরীয়তসম্মত সকল বিষয়ে তাকে মেনে চলতে আমার কোন সমস্যা নেই। জিজ্ঞেস করি, এর চেয়ে অতিরিক্ত আর কতটুকু জানার আবশ্যকীয়তা শরীয়তে আছে?

মুহতারাম ভাইয়েরা, আমীর অজ্ঞাত- এটা মুলত তেমন কোন ফেক্টর-ই নয়। আমরা যতটুকু জানি, ততটুকু আমাদের কাজের জন্য যথেষ্ট। এর অতিরিক্ত না আমাদের কাজের জন্য প্রয়োজন আছে, আর না শরীয়তের পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতা আছে।

মুহতারাম ভাইয়েরা, সাহাবায়ে কেরামের সীরতের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি- এর বেশি দরকার নেই। আপনি তাকিয়ে দেখুন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন

মদীনায় খলিফা নির্ধারণ হলেন, তখন বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের কত জন তাকে চিনতো? আজ আমরা মোল্লা উমরকে, শায়খ উসামাকে, আইমান আযযাওয়াহিরিকে, আসেম উমরকে যতটুকু চিনি, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এর চেয়ে বেশি কিংবা এই পরিমাণও হয়তো অনেকে জানতো না। শুধু নামটুকুই হয়তো জানতো। কিংবা কিছু গুণ-সিফাত হয়তো জানতো। কিন্তু হযরত উমরকে দেখেছে কত জন? সুদূর মদীনা থেকে সেই রোম, সেই পারস্যের, সেই ইরাকের সকল মুসলিম কি তাকে চিনতো? সবাই কি তাকে দেখেছে? কিন্তু বাইয়াত তো সকলেই দিয়েছে। তদ্রূপ, হযরত উমর ইসলামী বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে যে উমারাদের নিযুক্ত করেছিলেন, তাদের সকলকেই কি সকলে চিনতো? সকলেই কি তাদেরকে দেখেছে? কিন্তু আদেশ তো সকলেই পালন করেছে। পরবর্তী সকল খলিফার বেলায়ও একই ঘটনা। বরং ইসলামী সাম্রাজ্য যত বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছে, খলিফা ও উমারাদের ব্যাপারে জানা শুনা ততই কঠিন হয়ে এসেছে।

অধিকন্তু বর্তমান যামানায় তো মিডিয়ার আদলে আমরা আমীর উমারাদের দেখতে পাচ্ছি, তাদের কথা বার্তা শুনতে পারছি। কিন্তু সে যামানায় তো এটার চিন্তাও করা যেত না। এতদসত্ত্বেও বাইয়াত তো ঠিকই হয়েছে। আদেশও পালন করে চলেছে। এতএব, এর চেয়ে বেশি জানা শুনার প্রয়োজন নেই। সাধারণ মুজাহিদ ও মুসলমানদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

হ্যাঁ, এখানে আরেকটা কথা আছে। যারা আহলুল হল ওয়াল আকদ; তথা যারা খলিফা নিয়োগ দেবেন, তাদের জন্য আবশ্যক খলিফার ব্যাপারে ভাল করে জানা শুনা। কেননা, একজন যোগ্য ইমাম নিয়োগ দিতে হলে যেসব সিফাত লক্ষ রাখতে হয়, সেগুলো ঠিকঠিক মতো আছে কি’না জানার জন্য ইমামকে চেনা জরুরী। তাদের ব্যাপারটা ভিন্ন। বাকি সকল মুসলমানের জন্য এর প্রয়োজন নেই।

কাযি আবু ইয়ালা রহ. (৪৫৮ হি.) বলেন,

ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه، إلا من هو من أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم الخلافة. ويجوز أن يسمي خليفة لمن عقد له الأمر. اهـ

“সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তাকে চেনা বা তার নাম জানা সকলের জন্য আবশ্যক নয়। তবে যারা আহলুল হল ওয়াল আকদ, যারা দলীলরূপে গণ্য হবেন এবং যাদের (বাইয়াতের) মাধ্যমে খেলাফত সংগঠিত হবে- তাদের কথা ভিন্ন।” – আলআহকামুস সুলতানিয়্যাহ্: ১/২৭

ইমাম মাওয়ারদি রহ. (৪৫০ হি.) বলেন,

فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم كافة الأمة أن يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه إلا أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وببيعتهم تنعقد الخلافة .

وقال سليمان بن جرير : واجب على الناس كلهم معرفة الإمام بعينه واسمه كما عليهم معرفة الله ومعرفة رسوله .

والذي عليه جمهور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل ، وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه واسمه إلا عند النوازل التي تحوج إليه ، كما أن معرفة القضاة الذين تنعقد بهم الأحكام والفقهاء الذين يفتون في الحلال والحرام تلزم العامة على الجملة دون التفصيل إلا عند النوازل المحوجة إليهم ، ولو لزم كل واحد من الأمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه للزمت الهجرة إليه ولما جاز تخلف الأباعد ولأفضى ذلك إلى خلو الأوطان ولصار من العرف خارجا وبالفساد عائدا ، وإذا لزمت معرفته على التفصيل الذي ذكرناه فعلى كافة الأمة تفويض الأمور العامة إليه من غير افتيات عليه ولا معارضة له ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير الأعمال. اهـ

“পূর্ববর্তী খলিফার অসিয়তের মাধ্যমে কিংবা আহলুল হল ওয়াল আকদের নির্বাচনের মাধ্যমে যখন দায়িত্বগ্রহণকারী ইমামের জন্য খেলাফত সংগঠিত হবে, তখন **উম্মাহর সকলের জন্য এতটুকু জানা আবশ্যক যে, উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে খেলাফতের দায়িত্ব সমর্পিত হয়েছে। সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তাকে চেনা বা তার নাম জানা তাদের জন্য**

আবশ্যক নয়। তবে যারা আহলুল হল ওয়াল আকদ, যারা দলীলরূপে গণ্য হবেন এবং যাদের (বাইয়াতের) মাধ্যমে খেলাফত সংগঠিত হবে- তাদের কথা ভিন্ন।

তবে সুলায়মান ইবনে জারির বলেন, আল্লাহকে এবং তার রাসূলকে চেনা যেমন আবশ্যক, সকলের জন্য সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তাকে চেনা এবং তার নাম জানাও তেমনই আবশ্যক।

তবে জুমহুর আইম্মার মতামত হল, ইমামের পরিচয় বিস্তারিত জানা জরুরী নয়, এক রকম জানাই যথেষ্ট। সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তা বা তার নাম জানা প্রত্যেকের জন্য জরুরী নয়। তবে যদি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যার ফলে চেনার দরকার পড়ে, তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন- কাযি, যাদের মাধ্যমে বিচার আচারের ফায়সালা হয় এবং ফুকাহায়ে কেরাম, যারা হালাল হারামের ব্যাপারে ফতোয়া দিয়ে থাকেন: জনসাধারণের জন্য তাদের ব্যাপারে এক রকম জানা শুনা আবশ্যক, বিস্তারিত নয়। তবে যদি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যার ফলে চেনার দরকার পড়ে, তাহলে ভিন্ন কথা।

যদি উম্মাহর সকলের জন্য সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তাকে

চেনা এবং তার নাম জানা জরুরী হতো, তাহলে (তাকে চেনার জন্য) হিজরত করার দরকার পড়তো। দূরবর্তীদের জন্য না যাওয়ার সুযোগ থাকতো না। ফলত সকল এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়তো। আর তখন এটা একতো স্বাভাবিক প্রচলনের পরিপন্থী হতো, অপর দিকে এর ফলে ফাসাদ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হতো।

উপরোক্ত যে বিবরণ আমি দিয়েছি, সে অনুযায়ী ইমামের পরিচিতি লাভের পর, কোন ধরণের বিরোধিতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা না দেখিয়ে প্রজাসাধারণের পরিচালনার সকল দায় দায়িত্ব তার হাতে সমর্পণ করা উম্মাহর সকলের অবশ্য কর্তব্য। যাতে তার প্রতি সমর্পিত মাসআলাহাত ও পরিচালনায় দায় দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিতে পারেন।" – আলআহকামুস সুলতানিয়্যাহ: ১/২৪

লক্ষ করুন-

"উম্মাহর সকলের জন্য এতটুকু জানা আবশ্যক যে, উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে খেলাফতের দায়িত্ব সমর্পিত হয়েছে। সরাসরি ইমামের ব্যক্তি সত্তাকে চেনা বা তার নাম জানা তাদের জন্য আবশ্যক নয়।"

ব্যস, এতটুকুই সাধারণ জনগণ ও সাধারণ মুজাহিদদের দায়িত্ব। এর বেশি নয়। না শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজন আছে, না কাজের জন্য প্রয়োজন আছে।

এখানে আরেকটি বিষয় মনে করিয়ে দেয়া মুনাসিব মনে করছি। সেটি হল, এ যে বাইয়াতের কথা গেল, সেটা হল খেলাফতের বাইয়াত। যে বাইয়াত ফরয। যে বাইয়াত না দিয়ে মারা গেলে জাহিলি মরা মরবে বলে হাদিসে ধমকি এসেছে। পক্ষান্তরে আমাদের বর্তমান যে বাইয়াত সেটা খেলাফতের বাইয়াত না। সেটা মূলত জিহাদের বাইয়াত। খেলাফতের বাইয়াতের বেলায়ই যখন এতটুকু যথেষ্ট, তখন জিহাদের বাইয়াতের জন্য এর চেয়ে বেশির কি আবশ্যকতা আছে?

মোটকথা-

আহলুল হল ওয়াল আকদের বাইয়াতের মাধ্যমে আফগানের সুপ্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীনকে ইমারতে ইসলামিয়ার আমীর নির্ধারণ করা হয়েছে। ইমারতে ইসলামিয়ার অধীনে

আলকায়েদার কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক আমীর নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন যাবৎ জিহাদ চলে আসছে। আমি একজন সাধারণ মুসলমান বা প্রাথমিক মুজাহিদ হিসেবে আমার দায়িত্ব তানজীমে জড়িত হয়ে জিহাদের ফরয আঞ্জাম দেয়া। জামাত নেই, আমীর নেই, আমীর চিনি না- এগুলো সব নিতান্তই বাহানা।

বি.দ্র

এখানে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করে দেয়া জরুরী মনে হচ্ছে। সেটা হল, আমরা যখন বলছি, 'আমীরের পরিচয় এর চেয়ে বেশি জরুরী নয়'- তখন এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ আলকায়েদার কথা বললে বা কোন জিহাদি তানজীমের কথা বললেই তাতে কোন তাহকীক ছাড়া যোগ দিয়ে দিতে হবে। বরং আমার উদ্দেশ্য, যখন আমি যথাযথ তাহকিকের পর তানজীমে যোগ দিতে চাচ্ছি বা যোগ দিয়েছি, তখন আর এর চেয়ে বেশি জানা জরুরী নয়। অতএব, তানজীমে যোগ দেয়ার

আগে ভালভাবে তাহকিক করে নিতে হবে। তাহকিকের পর তানজীমে যোগ দেয়া হলে এরপর আর উমারাদের ব্যক্তিপরিচয়ের তেমন জরুরত নেই।

কথাটা আরেকটু খুলে বলি: আলকায়েদা কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত সদস্য বানায় না, যতক্ষণ না তার ব্যাপারে যাচাই বাছাইয়ের পর নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তিনি জিহাদের এবং তানজীমের সাথী হওয়ার উপযুক্ত। হ্যাঁ, কখনোও যদি বাছাইয়ে ভুল হয়ে যায় সেটা ভিন্ন কথা। অতএব, যে কেউ জিহাদের যোগ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তানজীম তাকে সদসদ্য বানিয়ে নেবে না। তার ব্যাপারে যাচাই বাছাই করবে যথেষ্ট। এ গেল এক দিক।
অপর দিকে যিনি তানজীমে যোগ দিতে চাচ্ছেন, তারও উচিৎ, যিনি তাকে জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছেন, তার ব্যাপারে ভালভাবে তাহকিক করে নেয়া যে, তিনি আসলেই সত্য বলছেন কি'না? আসলেই তিনি হক জামাতের এবং তিনি যে তানজীমের কথা বলছেন, সেটার সদস্য কি'না? না'কি কোন গোয়েন্দা মুজাহিদের বেশ ধরে এসেছে? এসব বিষয় ভালভাবে যাচাইয়ের পরই কেবল তিনি তানজীমে যোগ দেবেন।

উভয় পক্ষ থেকে এভাবে যাচাইয়ের পর যখন কোন ব্যক্তি তানজীমে যোগ দেয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হবেন এবং তিনিও তানজীমে যোগ দিতে মনস্থির করবেন, তখন তার জন্য

তানজীমের উমারাদের ব্যাপারে অতিরিক্ত জানার প্রয়োজন নেই। তানজীমের উমারাদের সুনির্দিষ্টভাবে চেনেন না- এটা যেন তার তানজীমে যোগ দেয়ার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। বরং মোটামুটি পরিচয়ই যথেষ্ট। আইমান আযযাওয়াহিরি, আসেম উমর, মোল্লা উমর, শায়খ উসামা সহ আরো যারা প্রসিদ্ধ, তাদের ব্যাপারে মোটামুটি জানা শুনা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। না থাকলে যতটুকু প্রয়োজন তাদের ব্যাপারে জেনে নিতে পারে। এই মূহুর্তে তারা কোথায় আছেন- ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নে যাওয়া উচিৎ নয়। এটার না শরয়ী দিক থেকে দরকার আছে, না কাজের জন্য দরকার আছে। এরপরও এসব বিষয় মোটামুটি সবারই জানা থাকে। যেমন, ইমারাতে ইসলামী আফগানিস্তানের প্রধান আমীরুল মু'মিনীন যিনি হন, তিনি সাধারণত আফগানেই থাকেন। এটা মোটামুটি সকলেরই জানা। এ ধরণের বিষয়াদি এর চেয়ে অতিরিক্ত জানার তেমন কোন দরকার নেই। কাজের জন্য দরকার না পড়লে এসব বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটির দরকার নেই এবং এগুলো না জানার অজুহাতে তানজীমে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকারও কোন হেতু নেই।

যাহোক, এই আমার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ- উভয় পক্ষ থেকে যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে গেলে, উমারাদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বা বিস্তারিত জানা না থাকার কারণে তানজীমে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকার কোন হেতু নেই। তদ্রূপ, যোগ

দেয়ার পর কাজের জন্য বিশেষ দরকার না পড়লে সেগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটিরও প্রয়োজন নেই। আমার উদ্দেশ্য এমনটাই। নতুবা, যে কেউ তানজীমে যোগ দিতে বললেই অন্ধভাবে তাহকিক ছাড়া তার কথা মেনে নিতে হবে- এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সত্য সঠিক বুঝ দান করুন।

ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আ'লাম

৩.আপনার সন্তানের খবর নিন; সে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী না তো?

বিবর্তনবাদ একটা মৌলিক বিষয় হিসেবে স্কুল-কলেজগুলোতে পড়ানো হয়। এ মতবাদের মূলকথা হচ্ছে: (মানুষ আদিতে বানর ছিল। আস্তে আস্তে বিবর্তন হতে হতে মানুষে পরিণত হয়েছে।)

এ মতবাদে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয় নিহিত, যা ইসলামের গোড়ার সাথেই সাংঘর্ষিক:

১. আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

২. দাবি করা হচ্ছে, সৃষ্টিজগৎ কোন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি ব্যতীত আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে।

৩. সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস সালাম যে আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এবং তিনি যে জান্নাত থেকে একজন মানবরূপে দুনিয়াতে আগমন করেছেন এবং পরবর্তী মানবপ্রজন্ম তার ও তার স্ত্রী হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম থেকে বিস্তার লাভ করেছে- তা অস্বীকার করা হচ্ছে।

সন্দেহ নেই, এ তিনটার প্রত্যেকটাই সুস্পষ্ট কুফর এবং এ আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি সর্বসম্মতিতে দ্বীনে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের।

অতীব পরিতাপের বিষয়, মুরতাদ সরকার তাদের পাঠ্যপুস্তকে এই কুফরী মতবাদকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভূক্ত রেখেছে। যদ্দরুণ নবপ্রজন্ম এই সকল কুফরী আকীদা পোষণ করেই বড় হচ্ছে। ১নং কুফরটাতে লিপ্ত না হলেও, দ্বিতীয় কি অন্তত তৃতীয়টাতে অনেকেই লিপ্ত হচ্ছে। এভাবে শুধু এ

বিবর্তনবাদের কারণেই মুসলিম নামধারী একপ্রকার মুরতাদ প্রজন্ম সৃষ্টি হচ্ছে।

হে মুসলিম ভাই-বোনেরা, আপনারা আপনাদের সন্তানদের খবর নিন; তারা কি এখনোও ইসলামের উপর আছে? না ইতোমধ্যেই মুরতাদে পরিণত হয়েছে? অন্যথায়, এর দায়ভার কিয়ামতের দিন আপনাদের উপরই বর্তাবে। হে আল্লাহ, তুমি হিফাজত কর।

৪.আপনি কি গুনাহগার? হতাশ হবেন না- আপনিও কিতাবের উত্তরাধিকারী সৈনিক

শায়খ **আবু উমার আসসাইফ রহ.** এর **'আসসিয়াসাতুশ শরঈয়্যাহ্'** কিতাবে কথাটা দেখেছিলাম। তখনই মনে করেছিলাম, একটা পোস্ট দিয়ে দিই। অনেকের উপকারে আসবে। কিন্তু কিভাবে জানি ভুলে গেলাম। আজ অনেক দিন পর আবার মনে পড়লো। মনে করলাম, আজ আর না লিখে থামছি না। নয়তো আবার ভুলে যাব।

শায়খ রহ. ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা আলোচনা করছিলেন।

তখন কথাটা বলেছিলেন। শায়খের কথাটার ভিত্তি সূরা ফাতিরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ বাণীর উপর-

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

“অতঃপর আমি (এই) কিতাবের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) বানিয়েছি তাদের, যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী। কেউ কেউ মধ্যপন্থী। আর কেউ কেউ আল্লাহর হুকুম (ও তাওফিকে) নেক কাজে অগ্রগামী। এটি-ই হচ্ছে বিরাট মর্যাদা।”- ফাতির ৩১

আগে পরের আরো দু’টি আয়াতসহ হলে বুঝতে সহজ হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33)

“(৩১). আমি আপনার নিকট অহি মারফত যে কিতাব পাঠিয়েছি, তা-ই সত্য। যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, (তাদের সব কিছুর) দ্রষ্টা।

(৩২). অতঃপর আমি (এই) কিতাবের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) বানিয়েছি তাদের, যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী। কেউ কেউ মধ্যপন্থী। আর কেউ কেউ আল্লাহর হুকুম (ও তাওফিকে) নেক কাজে অগ্রগ্রামী। এটি-ই হচ্ছে বিরাট মর্যাদা।

(৩৩). তাদের জন্য আছে অনন্তকাল বসবাসের জান্নাতসমূহ। যাতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের পরানো হবে

সোনার বালা ও মুক্তা। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।"- ফাতির ৩১-৩৩

৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, তিনি তার আখিরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন, তা হক ও সত্য।

৩২ নং আয়াতে জানিয়েছেন, তিনি তার নির্বাচিত নবীর উপর যে নির্বাচিত কিতাব নাযিল করেছেন, সে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন নির্বাচিত এই আখিরী উম্মাহকে।

৩৩ নং আয়াতে জানিয়েছেন, আখিরী নবীর উপর অবতীর্ণ আখিরী কিতাব যে আখিরী উম্মাহকে দেয়া হয়েছে, তারা জান্নাতবাসী হবে।

এ আয়াতগুলো এ উম্মাহর জন্য বড়ই খুশির সুসংবাদ বহন করছে। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, এ আখেরী উম্মাহ আল্লাহ তাআলার স্বয়ং নিজের পছন্দকৃত ও বাছাইকৃত উম্মাহ। তিনি তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ট কিতাবের উত্তরাধিকারীরূপে নির্বাচন করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত তাদের জীবনবিধানরূপে পছন্দ করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হিসেবে তাদের বাছাই করেছেন। শেষে সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন, এ নির্বাচিত উম্মাহ হবে জান্নাতী । তারা আগেকার উম্মতসমূহের মতো নয়। তারা ইয়াহুদ নাসারার মতো নয়, যারা আল্লাহর কিতাব বিকৃত করেছে। আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করেছে। নিজেদের বানানো কথাকে আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছে। এ উম্মাহ আল্লাহর কিতাবের যথাযথ হেফাজত করবে। আগেকার উম্মতগুলোর মতো আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করবে না। পরিবর্তন করবে না। পরিবর্ধন করবে না। নিজেদের মনগড়া কথাকে আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দেবে না। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এ উম্মাহকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই! আয়াতগুলোর দিকে আবার তাকান। দেখুন আপনার রব কি বলছেন, **‘আমি (এই) কিতাবের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) বানিয়েছি তাদের, যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি।’**

দেখুন আপনার রব কি বলছেন-

ক. সকল জাতি-গোষ্ঠীর মধ্য হতে, সকল উম্মতের মধ্য হতে আপনার রব আপনাকে নির্বাচন করেছেন। পছন্দ করেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি আপনাকে অন্য কোন উম্মতের মধ্যে পাঠাতে পারতেন। আপনাকে দ্বীন বিকৃতকারী ইয়াহুদ নাসারা বানাতে পারতেন। কিন্তু না! তিনি আপনাকে নির্বাচন করেছেন।

খ. দ্বিতীয়ত আপনাকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। এ কিতাব দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করেছেন। এ কিতাব সংরক্ষণ ও প্রচার প্রসারের, এক হাতে তরবারি আরেক হাতে কিতাব নিয়ে এ কুরআনের দাওয়াত পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে আপনাকে নির্বাচন করেছেন।

আপনি ভাবছেন, আমি তো জালেম। আমি তো গুনাহগার। আমি কি এর উপযুক্ত? আমি কি পারবো এ মহাসম্মানিত কিতাবের কোন খিদমাত করতে? এমনই কি ভাবছেন? তাহলে দেখুন আপনার রব কি বলছেন,

‘তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী। কেউ কেউ মধ্যপন্থী। আর কেউ কেউ আল্লাহর হুকুম (ও তাওফিকে) নেক কাজে অগ্রগ্রামী।’

যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তার এ কিতাবের সংরক্ষণের জন্য, এ কিতাবের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারের জন্য নির্বাচন করেছেন, তাদেরকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন-

১. নিজের প্রতি জুলুমকারী। গুনাহগার। মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, উদ্দেশ্য- যাদের নেক কাজের তুলনায় গুনাহের পরিমাণ

বেশি।

২. যারা মধ্যপন্থী। যাদের গুনাহ আর নেক কাজের পরিমাণ সমান। কিংবা যারা গুনাহ করেছে আবার তাওবা করে নিয়েছে।

৩. যারা আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট বান্দা। যারা আল্লাহ তাআলার সকল নিষেধ বর্জন করে চলে। সকল আদেশ পালন করে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সব ধরণের নেক কাজে অগ্রগামী থাকে।

প্রিয় ভাই! দেখুন- এরা সবাই আল্লাহর কিতাবের সংরক্ষক। এ মহা দায়িত্ব তাদের সকলের। এ মহা সম্মান তাদের সবার। হতে পারে সে ব্যক্তিগতভাবে গুনাহগার। নিজের উপর জুলুমকারী। কিন্তু সেও আল্লাহর কিতাবের সংরক্ষক। হতে পারে সে মদখোর। কিন্তু তার হাতেও তরবারি। যে তরবারি দিয়ে আল্লাহ তাআলা তার নবীকে পাঠিয়েছেন। দ্বীনের নুসরতের জন্য। কিতাবের সংরক্ষণের জন্য। সে তরবারি তার

হাতে। সে তরবারি দিয়ে সে কিতাবের দুশমনদের গর্দানে আঘাত করে। দ্বিখণ্ডিত করে। দ্বীন মানতে অস্বীকারকারীদের জাহান্নামে পাঠায়।

এ জন্য মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত আকীদা- জালেম হোক, ফাসেক হোক; কাফের মুরতাদের বিরুদ্ধে সকলে এক। এক দেহের ন্যায়। সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। কেউ বাদ যাবে না। সকলের হাতে থাকবে তরবারি। সকলকে নিয়েই হবে লড়াই। কাফেরদের বিরুদ্ধে। দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে। কিতাব অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে। কিতাব অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে। হতে পারে সে জালেম। হতে পারে গনিমত লোভী। হতে পারে পদলোভী। কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর প্রেম। কিতাবের ভালবাসা। দ্বীনের মহব্বত। চোখে স্বপ্ন। দ্বীনের পতাকা উড্ডীনের স্বপ্ন। বিশ্বময়। সারা বিশ্বময়।

প্রিয় ভাই! আপনি গুনাহগার? হতাশ হবেন না। আপনি আল্লাহর মনোনীত বান্দা। এ দ্বীনের জন্য। এ কিতাবের জন্য। আপনার জন্য রয়েছে জান্নাতের ওয়াদা। আপনার রবের পক্ষ

থেকে। দেখুন আপনার রবের বাণী-

‘তাদের জন্য আছে অনন্তকাল বসবাসের জান্নাতসমূহ। যাতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের পরানো হবে সোনার বালা ও মুক্তা। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।’

আপনার রবের এ ওয়াদা এ উম্মাহর সকলের জন্য। শুধু বিশিষ্টদের জন্য নয়। শুধু নেককারদের জন্য নয়। জালেমদের জন্যও। গুনাহগারদের জন্যও। কিতাবের সংরক্ষক সকলের জন্য।

ইমাম বাকের রহ. বলেন,

وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفاء. اهـ

“(নিজের উপর) জুলুম (তথা গুনাহ) আল্লাহর পছন্দনীয় ও নির্বাচিত হওয়ার পরিপন্থী নয়।”- তাফসীরে বাগাবী ৩/৬৯৬

প্রিয় ভাই! *আপনি গুনাহ করেছেন- তথাপি আপনি আল্লাহর*

নির্বাচিত। কিতাবের জন্য। দ্বীনের জন্য। শরীয়তের জন্য। আপনি নিজেকে দমাতে পারেন না, নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বাঁচতে পারেন না- তথাপি আপনি আল্লাহর নির্বাচিত। কিতাবের জন্য। দ্বীনের জন্য। শরীয়তের জন্য। আপনি কাফেরের আতঙ্ক। নাস্তিকের যম। দ্বীনদ্রোহিদের ঘুম হারামকারী। শান্তি বিনষ্টকারী। আপনার রব আপনাকে এ কাজের জন্যই নির্বাচন করেছেন।

প্রিয় ভাই! মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা গুনাহগারদের কথা আগে বলেছেন- **'তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী। কেউ কেউ ...।'** কেন? তাদের কথাটা আগে বললেন কেন? মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা গুনাহগারদের আগে উল্লেখ করেছেন- যেন তারা হতাশ না হয়। নিরাশ না হয়। যেন মনে না করে যে, এ মহান কিতাবের সুমহান দায়িত্বের আমি উপযুক্ত নই। এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের আগে উল্লেখ করেছেন। নেককার ও বিশিষ্টজনদের পরে উল্লেখ করেছেন। তাদের মর্যাদা বেশি হতে পারে; কিন্তু আল্লাহর কিতাবের নুসরতে সকলেই সমান

অংশীদার। দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে সকলেই সমান। সকলে এক। এক দেহের ন্যায়। যেন সীসাঢালা প্রাচীর।

প্রিয় ভাই! হতাশ হবেন না। ফিরে আসুন। আপনার মর্যাদার আসনে ফিরে আসুন। আপনি আপনার রবের প্রিয় পাত্র। পছন্দীয়। নির্বাচিত। হতাশ হবেন না।

আপনার রবের দুশমনরা আপনাকে বুঝিয়েছে, এ কিতাবের সাথে আপনার সম্পর্ক নেই। আপনাকে দুনিয়া নিয়ে পড়ে থাকতে শিখিয়েছে। ভোগ-বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিতে শিখিয়েছে। এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াটাকেই আপনার জিন্দেগীর সর্বস্ব দেখিয়েছে। তারা আপনাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আপনারও একজন রব আছেন। তিনি আপনাকে ভালবাসেন। আপনার জন্য তিনি অফুরন্ত নেয়ামত রেখেছেন। যা কোন চক্ষু কোন দিন দেখেনি। কোন কান কোন দিন শোনেনি। কোন অন্তর কোন দিন কল্পনাও করতে পারেনি। ভুলিয়ে দিয়েছে, আপনি আপনার রবের পছন্দের পাত্র। নির্বাচিত সৈনিক। তার

অবাধ্যদের বুকে বিদ্ধ তীর আর ধারালো খঞ্জর। ঝাঁঝরাকারী বুলেট। গলার কাঁটা। পথের কণ্টক। ঘুম হারামকারী। প্রাণসংহারি।

ওহে ভাই! ফিরে আসুন। সব হতাশা ঝেড়ে ফেলুন। আপনার রবের দরবারে হাত তুলুন- ওহে পরওয়ারদেগার! আমি বুঝতে পারিনি। তুমি যে আমাকে ভালবাস। এত ভালবাস। আমি জানতে পারিনি। আমি যে তোমার দ্বীনের সৈনিক, তোমার কিতাবের রক্ষক, তোমার নির্বাচিত, তোমার মনোনীত- আমি জানতে পারিনি। ওহে আমার রব! আমাকে মাফ কর। আমাকে কবূল কর। তোমার দ্বীনের জন্য। তোমার কালামের জন্য। তোমার মহান কিতাবের জন্য। তোমার শরীয়তের জন্য।

ꙮꙮꙮ

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن

رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}

"(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।"- যুমার ৫৩

৫.আমরা অন্ধ অনুসরণের কোন পর্যায়ে পৌঁছেছি!!

প্রসিদ্ধ এক দারুল ইফতায় মনসুর হাল্লাজের ব্যাপারে একটা ইস্তিফতা আসলো। দ্বিতীয় বর্ষের এক তালিবুল ইলমের দায়িত্বে পড়লো ফতোয়াটা লিখার। সে ইতিহাসের বিভিন্ন

কিতাব খুলে দেখলো: **সবাই লিখেছেন, 'সে মুরতাদ ছিল, এ কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে।'**

তালিবুল ইলম উস্তাদকে জানালো, ইতিহাসের কিতাবাদিতে তাকে মুরতাদ লেখা হয়েছে। উস্তাদ বড়ই আজীব জওয়াব দিলেন। উস্তাদ জওয়াব দিলেন, **ইতিহাসে যা-ই লিখুক, আমাদের আকাবিরগণ তাকে কাফের বলেন না। আমরা আমাদের আকাবিরদের কথার বাইরে যাবো না। তুমি আকাবিরদের রায় মতোই ফতোয়া লেখ।**

শাগরেদ তাই করলো। তামরীনের সংখ্যা বাড়ানো আর উস্তাদের নেক নজর লাভের জন্য, ঐতিহাসিক মুলহিদ-যিন্দিক ও মুরতাদকে বিশ্ব-বিখ্যাত সূফী-দরবেশ ফতোয়া দিল।

আল্লাহ তাআলা কত সুন্দরই না বলেছেন,

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ

'তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের আগুনে। তারা তাদের বাপ-দাদাদের পথভ্রষ্ট পেয়েছিল। অত:পর তারা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে ছুটে চলেছে।'

[আস-সাফফাত: ৬৮-৭০]

ইমাম নাসাফী রহ. (মৃত্যু: ৭১০) যথার্থই ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

علل استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد بتقليد الآباء في الدين واتباعهم إياهم في الضلال وترك اتباع الدليل. اهـ

“আল্লাহ তাআলা এরা ঐসব মহা মুসিবতে আপতিত হওয়ার উপযুক্ত কেন হলো, তার কারণ বাতলিয়েছেন- এরা দ্বীনের বিষয়ে তাদের বাপ-দাদাদের তাকলীদ করতো। দলীলের অনুসরণ ছেড়ে তাদের বাপ-দাদাদের গোমরাহির অনুসরণ করতো।”

[তাফসীরে নাসাফী: ৩/১২৬]

৬.আমার পিতার সাথে কীরূপ আচরণ করবো যে তাওহীদ এবং শাসকদের কুফরের প্রসঙ্গে আমার কথার কোন গুরুত্বই দেয় না?

প্রশ্ন:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ! আমার পিতা নামায রোযা করে। যাকাত দেয়। আর মনে করে এতটুকুই ইসলাম। আমি যদি তাওহীদের আলোচনা করি তো আমার কথার দিকে ভ্রুক্ষেপই করে না। মনে করে এগুলো কিছু কিছু সংগঠনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা। আমি তার সাথে কথা জুড়লেই তিনি বলেন, এ দেশ আফগান নয় যে, এখানে

ঘোষণা দিয়ে ইসলাম পালন করা যাবে। শরীয়তের হুদুদ বাস্তবায়ন করা যাবে। অনেক সময় জোর আওয়াজে চিল্লাচিল্লিও শুরু করে দেন। রাগান্বিত হয়ে যান। বিশেষত যখন শাসকদের কুফরের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাই। এখন আমি কি করবো? আমার এমন আর্থিক সামর্থ্যও নেই যে, পিতা মাতাকে ছেড়ে আলাদা বাসা নিয়ে থাকতে পারি। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমি কি করবো? আমি দিশেহারা হয়ে আছি। অনুগ্রহ করে আমাকে সমাধান দিন।

উত্তর:

ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ! শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা! আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের অবস্থা এমনই। শাসকদের আনুগত্য করতে করতেই তাদের আজীবন কেটেছে। বেতন ভাতার ভয়ে কিংবা শাসকদের জুলুম অত্যাচারের ভয়ে তারা তাদের আনুগত্য করে চলে। তবে আল্লাহ তাআলা নব প্রজন্মের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাওহীদের দাওয়াত এবং জিহাদকে তাদের নিকট প্রিয় করে দিয়েছেন। তুমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমাকে তাদেরই একজন বানিয়েছেন। আর তুমি তোমার পূর্বের অবস্থা স্মরণ কর। তোমার পিতার সাথে

সদাচারণ কর। নরমভাবে স্নেহ ভালবাসার সাথে তাকে দাওয়াত দিতে থাক। আর স্মরণ কর আল্লাহ তাআলার এ বাণীর কথা, (كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم) (ইতিপূর্বে তোমরাও এমনই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন।) আর তুমি তোমার পরিবার ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেও না। বরং অবিরাম তোমার পিতাকে দাওয়াত দিতে থাক। হকের কথা শুনাতে থাক। হেকমতের সাথে। সুন্দর নসীহতের সাথে। তোমার পিতা চিল্লাচিল্লি শুরু করলেও তুমি চিল্লাচিল্লি করো না। তোমার পিতার আওয়াজের চেয়ে জোর আওয়াজে কথা বলো না। তার জন্য দোয়া করতে থাক ইখলাছের সাথে, যেন আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিক পথ দেখান। আল্লাহ তাআলা তোমাকে তাওফীক দান করুন। তোমার দ্বারা তোমার পিতাকে সঠিক পথের সন্ধান দিন।

উত্তর প্রদানে: আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী হাফিযাহুল্লাহ! মিম্বারুত তাওহীদি ওয়াল জিহাদ।

৭.আমার বিধবা মাকে দেখার মতো আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার উপর কি জিহাদ ফরয?

প্রশ্ন:
আমি একজন মুসলিম যুবক। আমি জিহাদ করতে চাই। আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। আমার মাকে দেখার মত আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমর উপর কি জিহাদ ফরয ? নাকি এই ওজরের কারণে আমার উপর থেকে জিহাদের ফরজিয়্যাত রহিত হয়ে যাবে?

নিবেদক
আবু আসেম আল-মিসরী

উত্তর:
বর্তমান যামানায় জিহাদ ফরযে আইন। তোমার মাকে দেখার মতো কেউ নেই বলে তোমার থেকে জিহাদের ফরজিয়্যাত রহিত হয়ে যাবে না। তবে তুমি যে দেশে বসবাস করছো সেখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী হুকুমের মাঝে কিছুটা তারতম্য হবে। যদি শত্রুদের সাথে যুদ্ধ বেঁধে গিয়ে থাকে এবং তোমাদের মত যুবকদের তাতে শরীক হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে তোমার মাকে দেখার মত কেউ না থাকলেও তোমার জন্য জিহাদে বের হয়ে যাওয়া ফরয। কেননা, দ্বীনের মাসলাহাত সকল মাসলাহাতের চেয়ে অগ্রগণ্য।

আর যদি অবস্থা এমন না হয়, তাহলে আশাকরি তোমার জন্য জিহাদে না বের হয়ে তোমার মায়ের দেখাশুনা করা বৈধ হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা কোন ব্যবস্থা করে দেন। তবে তোমাকে জিহাদের নিয়ত রাখতে হবে। তার জন্য ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকতে হবে। সবরের সাথে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকতে হবে। সম্ভাব্য সকল পন্থায় মুজাহিদদেরকে সহায়তা করে যেতে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে তাওফীক দান করুন!

উত্তর প্রদানে: আবু উসামা আশ-শামী, শরয়ী বিভাগ, মিম্বারুত তাওহীদি ওয়াল জিহাদ।

প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের দেশে এখনো সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয়নি। কাজেই পরিবার পরিজনের দেখাশুনার পাশাপাশি জিহাদের কাজে শরীক হওয়া আমাদের দেশে তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। বিভিন্নভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী মুজাহিদদেরকে সহায়তা করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। একটু ইচ্ছা থাকলেই ফরয জিহাদের দায়িত্ব আদায় করে গাজওয়াতুল হিন্দের সওয়াবের ভাগ পাওয়া যায়। আর যারা সম্পূর্ণই জিহাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের তো সৌভাগ্যের

কোন সীমাই নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের দেশের জনগণকে বুঝার এবং গাজওয়াতুল হিন্দে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আপনারা যদি একটু হিম্মত করে জনগণকে বুঝান তাহলে আশাকরি অতিশীঘ্রই জনগণ বুঝে যাবে। দূরে না পারলেও অন্তত নিজের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবকে যথাসম্ভব নিরাপত্তা বজায় রেখে বুঝাতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন!

৮.আমীরের আনুগত্য, যার ব্যাপারে আমরা প্রায়ই উদাসীন

জিহাদ কবুল হওয়ার জন্য আমীরের আনুগত্য শর্ত। রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله و أطاع الإمام و أنفق الكريمة و ياسر الشريك و اجتنب الفساد فإن نومه و نبهه أجر كله و أما من غزا فخرا و رياء و سمعة و عصى الإمام و أفسد في الأرض فإنه لن يرجع بكفاف

"যুদ্ধ দুই রকম: যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করবে, ইমামের আনুগত্য করবে, নিজের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে খরচ করবে, সাথীদের সাথে নরম আচরণ করবে, ফাসাদ-বিশৃংখলা থেকে দূরে থাকবে: তার ঘুম, তার জাগরণ সবকিছুই সওয়াবের কাজে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করবে গৌরব ও যশ খ্যাতির উদ্দেশ্যে, মানুষকে দেখানোর

উদ্দেশ্যে, ইমামের নাফরমানী করবে, যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে: সে তার মূল পুঁজি নিয়েও ফিরতে পারবে না।"
[মুসতাদরাকে হাকেম: ২/৩৫৩]

এ তো হল জিহাদ কবুল হওয়া এবং সওয়াব পাওয়া না পাওয়া নিয়ে কথা। আর বাস্তবেও জিহাদে সফলতা লাভের জন্য, শত্রুকে পরাজিত করে খেলাফত কায়েমের জন্য আমীরের আনুগত্য অপরিহার্য। আনুগত্য ছাড়া প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী কাজ করতে থাকে- তাহলে একদিকে যেমন সওয়াব থেকে মাহরুম হবে, অন্যদিকে দুনিয়াতেও সফলতা হতে বঞ্চিত হবে। এজন্য হযরত উমারে ফারুক রায়িল্লাহু আনহুর চিরন্তন বাণীটি সর্বদা স্মরণযোগ্য,

لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة

"জামাআত ব্যতীত ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ব্যতীত জামাআত নেই। আর আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্বের কোন ফায়েদা নেই।"
[জামিউ বয়ানিল ইলম: ১/২৬৩]

অতএব, আনুগত্য না হলে জামাআত টিকবে না, আর জামাআত না হলে ইসলাম কায়েমও সম্ভব না। এ কারণে শরীয়ত জামআতবদ্ধ হওয়া এবং আমীরের আনুগত্য করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আমীরের আদেশ যদি

নিজের মনের চাহিদার বিপরীতও হয়, এ কারণে যদি নিজের অধিকারে কিছু ছাড়ও দিতে হয়, তবুও ইসলাম আমীরের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছে।

হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
(دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ. فكان فيما أخذ علينا أَنْ بَايَعَنَا على السمع والطاعة فِي مَنشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسرنا ويُسرنا، وَأَثَرَة علينا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَه. قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ).

“রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা তাঁর হাতে বাইআত হলাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন তা হলো, আমরা আমাদের পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় বিষয়ে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপিও (আমীরের কথা) শুনবো ও আনুগত্য করবো এবং আমরা দায়িত্বশীলের সাথে দায়িত্ব নিয়ে বিবাদে জড়াবো না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে (তাহলে কথা ভিন্ন)।”

[সহীহ্ মুসলিম: ১৭০৯]

তাই ভাইদের কর্তব্য: জামাআতের স্বার্থে, দ্বীনের স্বার্থে নিজের চাহিদা অনুপাতে হোক বা না হোক আমীরের আনুগত্য করা- যতক্ষণ তা শরীয়তের আদেশের পরিপন্থী না হয়। শরীয়তের পরিপন্থী হলে তখন আমীরের আদেশ পালনযোগ্য নয়।
যেমনটা হাদিসে এসেছে-

(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)

"সৃষ্টিকর্তার নাফরমানি করে বান্দার আনুগত্য বৈধ নয়।"

তবে এক্ষেত্রেও আমীরের বিরুদ্ধে না গিয়ে, তার সাথে বেয়াদবি না করে বরং সবর করবে। বুঝানোর চেষ্টা করবে। তার জন্য দোয়া করবে।

কোথায় আমীরের আনুগত্য করতে হবে আর কোথায় করা যাবে না?

আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে শরীয়ত একটা সীমারেখা দিয়েছে। এর বাহিরে যাওয়া যাবে না। গেলে নাফরমানি হবে।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে আমীরের আনুগত্য করতে হবে:

- আমীরের আদেশ যদি শরীয়ত অনুযায়ী হয়, তাহলে আনুগত্য

করতে হবে।

- আমীরের আদেশের আনুগত্যে যদি কল্যাণ হবে মনে হয় এবং এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ না থাকে বা অধিকাংশ মা'মূরের ধারণা হয় যে, তাতে কল্যাণ রয়েছে: তাহলেও আনুগত্য করতে হবে। তদ্রূপ কল্যাণ হবে কি হবে না তা যদি নিশ্চিত না হয়, বরং উভয়টারই সম্ভাবনা থাকে: তাহলেও আনুগত্য করতে হবে। কেননা, আমীরের আনুগত্য আবশ্যক। সন্দেহের কারণে তা বাদ দেয়া যাবে না।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে আমীরের আনুগত্য করা যাবে না

- আমীরের আদেশ যদি সুস্পষ্ট শরীয়ত পরিপন্থী হয় তাহলে আমীরের আনুগত্য জায়েয হবে না।

- যদি সকলেই নিশ্চিত হয় যে, আমীরের আদেশ মানতে গেলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো বা আমাদের ক্ষতি হবে কিংবা অধিকাংশ মা'মূর এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়: তাহলেও আমীরের আনুগত্য করা যাবে না।

মোটকথা: যেখানে আমীরের আনুগত্যের করলে সকলের বা অধিকাংশের রায় অনুযায়ী ক্ষতি নিশ্চিত- সেখানে আমীরের

আনুগত্য করা যাবে না, অন্য সকল ক্ষেত্রে আমীরের আদেশ মানতে হবে। অতএব, যেখানে আমীরের আদেশ মানলে কল্যাণ হওয়া না হওয়া উভয়টারই সম্ভাবনা রয়েছে, কোন একটা নিশ্চত না- সেখানেও আমীরের আদেশ মানতে হবে। বাহানা ধরে আমীরের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে নিজের বুঝ মতো চলা জায়েয হবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯হি.) বলেন [ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০হি.) এর ব্যাখ্যা সহ]:

وإذا دخل العسكر دار الحرب للقتال بتوفيق الله عز وجل فأمرهم أميرهم بشيء من أمر الحرب؛ فإن كان فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطيعوه ... لقوله تعالى : { أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } النساء : 59 وكذلك إن أمروهم بشيء لا يدرون أ ينتفعون به أم لا؟ فعليهم أن يطيعوه لأن فريضة الطاعة ثابتة بنص مقطوع به، وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضاً للنص المقطوع .

وقد تكون طاعة الأمير في الكف عن القتال خيراً من كثير من القتال وقد يكون الظاهر الذي يعتمده الجند يدلهم على شيء والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند الأمير ولا يرى الصواب في أن يطلع على ما هو الحقيقة عامة الجند، فلهذا كان عليهم الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون فيه الهلكة وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم لا يشكون في ذلك، فإذا كان هكذا فلا طاعة له عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ...

وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين، فمنهم من يقول فيه الهلكة و منهم من
ولأن .يقول فيه النجاة: فليطيعوا الأمير في ذلك؛ لأن الاجتهاد لا يعارض النص
الامتناع من الطاعة فتح لسان اللائمة عليهم وفي إظهار الطاعة قطع ذلك عنهم
. فعليهم أن يطيعوه
إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة أو أمرهم بمعصية
فحينئذ لا طاعة عليهم في ذلك ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا على أميرهم
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتاه
من أميره ما يكرهه فليصبر فإن من خالف المسلمين قيد شبر ثم مات ما ت ميتة
الجاهلية . اه

"আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার তাওফিকে (মুসলিম) বাহিনি দারুল হরবে পৌঁছার পর তাদের আমীর তাদেরকে যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন কিছুর আদেশ দিলে- যদি তার আদিষ্ট বিষয়ে কল্যাণ থাকে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ পালন করা আবশ্যক। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,
'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের।'
... তদ্রূপ তিনি যদি তাদেরকে এমন কোন কিছুর আদেশ দেন, তারা বুঝতে পারছে না যে, তাতে তারা উপকৃত হবে কি'না- তাহলেও তাদের জন্য তার আদেশ পালন করা আবশ্যক। কেননা, আনুগত্য ফরয হওয়ার বিষয়টি অকাট্য নস দিয়ে প্রমাণিত। আর তাদের যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে যে, তিনি যা আদেশ করেছেন সেটা উপকারী কি উপকারী না- সেটা অকাট্য নসের সাংঘর্ষিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। অনেক সময় আমীরের আনুগত্য করে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার

মাঝে অনেক যুদ্ধের চেয়েও অধিক কল্যাণ নিহিত থাকে। কখনো এমন হয়, বাহ্যত যে বিষয়টির উপর সৈনিকরা নির্ভর করছে, সেটা তাদেরকে কোন এক বিষয়ের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে আমীরের নিকট বিষয়টি এর বিপরীত। কিন্তু সাধারণ সৈনিকরা বাস্তব বিষয়টির ব্যাপারে অবগত হোক এটা তিনি যথার্থ মনে করেন না। এজন্য তাদের উপর আবশ্যক- তার আনুগত্য করে যাওয়া, যতক্ষণ না তিনি এমন কোন কিছুর আদেশ দেন, যার মাঝে তারা নিজেদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা করছে এবং তাদের জামাআতের অধিকাংশের রায়ও এমনই; এ ব্যাপারে তাদের কোন সন্দেহ নেই। যদি এমনটাই হয়, তাহলে তাদের জন্য তার আনুগত্যের কোন বিধান নেই। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

‘সৃষ্টিকর্তার নাফরমানি করে বান্দার আনুগত্য বৈধ নয়।’

আর উক্ত আদিষ্ট বিষয়টিতে যদি লোকজনের বিভিন্ন রকম অভিমত থাকে; কেউ বলছে- এতে ধ্বংস নিহিত, আর কেউ বলছে- এতে মুক্তি মিলবে: তাহলে তারা যেন এতে আমীরের কথা মান্য করে। কেননা, ইজতিহাদ (আনুত্যের ব্যাপারে বর্ণিত সুস্পষ্ট) নসের সাংঘর্ষিক হতে পারে না। তাছাড়া আনুগত্য থেকে বিরত থাকার অর্থ উমারাদের ব্যাপারে ইতর লোকদের সমালোচনার যবান খোলে দেয়া। আর আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। তাই তাদের জন্য আবশ্যক- তার আনুগত্য করা।

তবে হ্যাঁ, তিনি যদি এমন সুস্পষ্ট ধ্বংসাত্মক কিছুর আদেশ দেন, যা ধ্বংসাত্মক হওয়াটা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়; কিংবা কোন গুনাহের আদেশ দেন- তাহলে তখন তাতে তাদের জন্য তার আনুগত্যের বিধান নেই। তবে তাদের উচিৎ সবর করা এবং আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার আমীরের কাছ থেকে এমন কিছুর সম্মখীন হয়েছে, যা সে অপছন্দ করে- তাহলে সে যেন সবর করে। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গিয়ে মৃত্যু বরণ করবে, সে (যেন) জাহিলী মরা মরল।"

[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/১০৯-১১০]

প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা! আপনাদের হীন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য- নসীহত। যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আমার সকল মুজাহিদ ভাইকে পূর্ণ ইতাআতের তাওফিক দান করেন।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা যারা তানজীমে যোগ দিয়েছি, আমাদের উচিৎ তানজীমের নির্দেশনা মেনে চলা। তানজীমের আমীরগণের কথা মান্য করা। নিজের মন মতো যেন না চলি। ইতাআতের মধ্যেই কল্যাণ। মন মতো চলার মধ্যে কোনই

কল্যাণ নেই। আর আমাদের উমারাদের ব্যাপারে আমাদের আস্থা আছে যে, তারা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুবিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তারা আমাদের যে নির্দেশ দেবেন, তা আমাদের ও তানজীমের সার্বিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করেই দেবেন। আমাদের উচিৎ সেগুলো মেনে চলে। বিরোধীতা না করা। সমালোচনা না করে। পালনে অবহেলা না করা। হ্যাঁ, কারো যদি কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমরা তানজীমকে তা জানাতে পারি। তানজীম তা বিবেচনা করবে। প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত বদলে দেবে। তবে তা বিনয়ের সাথে। ঔদ্ধত্তের সাথে নয়। সমালোচনার ভাষায় নয়, নসীহতের ভাষায়। দিলের দরদ নিয়ে।

প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা জানেন, তাগুতরা আমাদের হন্যে হয়ে খুঁজছে। এদের চোখ ফাঁকি দিয়েই কাজ করতে হবে। তানজীম আমাদেরকে এ ব্যাপারে যেসব নির্দেশনা দেবে- আমাদের উচিৎ সেগুলো যথাযথ মেনে চলা। সামান্য এদিক সেদিক হলেই সমূহ বিপদের আশঙ্কা। এটা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়।

তদ্রূপ আমাদেরকে কিভাবে যোগ্য মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে তানজীম সর্বদা ফিকিরে আছে। যে যে বিভাগে আছেন, সে অনুযায়ী তানজীম তাদের নির্দেশনা দেন। আমাদের উচিৎ সেগুলো মেনে চলা। জিহাদের রাস্তা বড়ই

কণ্টকাকীর্ণ। বহু দীর্ঘ রাস্তা। গন্তব্য অনেক দূর। চতুর্দিকে হায়েনার দল। অন্ধকার রাত্রির মতো ফিতনা সবখানে। একটু অধৈর্য হলেই, একটু গাফেল হলেই জীবনের সব নাস্তানুবাদ হয়ে যাবে। সব আশা নিরাশা হয়ে যাবে। তাই ভাইয়েরা! নিজের মন মতো চলবো না। ইতাআত করে চলবো।

আসলে একটা বাস্তব কথা না বলে পারছি না: আমরা আসলে আমীরের অধীনে চলতে অভ্যস্ত নই। ইমারাত কাকে বলে আমরা দেখিইনি। আমীরকে কিভাবে মানতে হয়- আমরা আসলে তা কখনো দেখিনি। আমরা খেলাফত হারিয়েছি, ইমারতও হারিয়েছি। নেতৃত্বের অধীনে চলার সৌভাগ্য আমাদের কখনো হয়নি। আমীরকে কিভাবে সম্মান করতে হয়, কিভাবে তার আদেশ নিষেধ মেনে চলতে হয়- তা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। বেশির চেয়ে বেশি কিতাবের দু'চারটা পাতায় পড়েছি। বাস্তবতা আমাদের থেকে অনেক দূরে। আমীর নামক নেআমত আমাদের জীবনে লাভ হয়নি কখনোও। তাই তার কদর বুঝি না। আমরা আসলে নতুন। আবেগের বশে হয়তো কাজে জড়িয়েছি। দ্বীনের দরদে কাফেলায় যোগ দিয়েছি। কিন্তু বাস্তব ময়দান আমাদের সামনে নেই। শরীয়তের প্রকৃত রূপও আমাদের সামনে নেই। তাই আমাদের পদে পদে ভুল হয়ে যায়। হঠাৎ এক সময় অনুভব হয়- এতদিন তাহলে আমি ভুলের উপর চলেছি। এটাই

বাস্তবতা। এটা অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই।

ভাইয়েরা আমার! আমরা দুর্বল বান্দা। আশাকরি আল্লাহ তাআলা আমাদের মাফ করবেন। তাঁর দ্বীনের জন্য আমাদের কবুল করবেন।

আমি কয়েকটি উদাহরণ দেই, যেগুলোতে আমাদের প্রায়ই ভুল হয়:

- আমরা সিকিউরিটির নিয়ম কানূন প্রায়ই অমান্য করি। অথচ একটা ভুল জীবনের সব কিছুকে তছনছ করে দিতে পারে।

- আমীর সাহেব কখনো কখনো নিষেধ করেন, আপনি অমুক ভাইয়ের কাছে যাবেন না। কিন্তু আমরা প্রায়ই যাই। ফলে ঐ ভাইয়ের বিপদ হলে আমিও আশঙ্কায় থাকি, আমার বিপদ হলে ঐ ভাইও আশঙ্কায় থাকেন।

- আমীর সাহেব বলেনে, আপনি নেটে ঢুকবেন না। কিন্তু আমরা ফাঁকি দিয়ে নেট চালাই।

- আমীর সাহেব বলেন, আপনি অমুক কিতাবটা পড়বেন বা অমুক শায়খের অমুক বয়ানটা শোনবেন। কিন্তু গাফলতি করে আমরা আর পড়ি না, শুনিও না।

- আমীর সাহেব বলেন, কারো সাথে তর্কে জড়াবেন না। কিন্তু আমরা আমাদের জযবা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হই।

- আমীর সাহেব বলেন, যে কাউকে জিহাদের দাওয়াত দেবেন না। কিন্তু আমরা কারো ভাল কথায় মুগ্ধ হয়ে তাকে জিহাদের দাওয়াত দিতে থাকি।

- আমীর সাহেব বলেন, আপনি অমুক মাসআলাটা দেখুন। আমরা সেটা ছেড়ে আরেকটা দেখি।

- আমীর সাহেব বলেন, পড়াশুনার বিকল্প নেই। আমরা বলি, পড়ে কি হবে? আমি তো শহীদ হতে চাই!

- আমীর সাহেব বলেন, আপনি ফেসবুকে এই ধরণের স্ট্যাটাস দেবেন না। কিন্তু আমরা তার বিপরীত করি।

- আমীর সাহেব বলেন, সকাল সকাল ঘুমিয়ে যাবেন। তাহাজ্জুদে মুজাহিদদের জন্য, মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া

করবেন। আমরা রাতভর নেট চালিয়ে তাহাজ্জুদের সময় ঘুমিয়ে থাকি।

এ ধরণের অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে, যেগুলোতে আমারা প্রায়ই আদেশ অমান্য করি।

ভাইয়েরা আমার! আমরা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেব। আমীরের কথার গুরুত্ব দেব। তাকে মেনে চলার চেষ্টা করবো। হতে পারেন তিনি আমার চেয়ে বয়সে ও ইলম-আমলে ছোট, কিন্তু তিনি তো আমার আমীর। কোথায় আবু বকর সিদ্দিক আর কোথায় খালেদ বিন ওয়ালিদ! কিন্তু তিনি কি তাকে মেনে চলতেন না? আমাদেরও এমনটা করা চাই। তদ্রূপ আমীর উমরা যারা আছেন, তাদেরও উচিৎ মা'মূরদের প্রতি বিবেচনা করে পরিচালনা করা। যাকে যেভাবে পরিচালনা করলে তিনি আপনাকে মেনে চলতে পারবেন, তাকে সেভাবে পরিচালনা করা। প্রত্যেকের তবিয়ত বুঝে তার সাথে আচরণ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ইসলাহ করে দিন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله و صحبه أجمعين

৯.আল কাউসারের একটি প্রবন্ধ নিয়ে ক'টি মন্তব্য

"ইসলামের বিধান, রাষ্ট্রীয় আইন এবং মুসলমানদের করণীয়" শিরোনামে আলকাউসারে মুফতি আবুল হাসান আব্দুল্লাহ সাহেবের একটি প্রবন্ধ এসেছে। গাজীপুরের এক পোশাক কারখানায় নামায বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। বিভিন্ন মহলের আপত্তির কারণে মালিক শেষে এ আইন উঠিয়ে নেয়। এ প্রসঙ্গে হুজুরের প্রবন্ধটি। এ ধরনের বিষয়ে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন। আমরা হুজুরকে অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ তাআলা উনার খেদমত কবুল করেন। জাযায়ে খায়র দান করেন। তবে কয়েকটি বিষয়ে আমার আপত্তি হচ্ছে। সেটিই বলতে চাচ্ছি।

এক.

বিরোধী মহলের দাবি ছিল 'নামায বাধ্যতামূলক করা সংবিধান পরিপন্থী'। তাই নামায বাধ্যতামূলক করা যাবে না। হুজুর দেখাতে চেয়েছেন যে, নামায বাধ্যতামূলক করা সংবিধান পরিপন্থী নয়। হুজুর বলেন,

"বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও আছে,

ধর্মীয় স্বাধীনতার কথাও আছে। স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অধিকারের কথাও আছে। ইসলামে কালেমার পর সবচেয়ে বড় ইবাদত নামায। যথাসময় নামায পড়তে হয়। ইসলামে জামাতের সাথে নামায পড়ার নির্দেশনা রয়েছে এবং নামায পড়ার জন্য এটাই সর্বোত্তম পন্থা। তাই একটা কারখানার মুসলিম কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য জামাতের সাথে নামায পড়ার এই নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনাকে এদেশের সংবিধান অনুযায়ীই 'সংবিধান-বিরোধী' বলা যায় না। সংবিধানের মূলনীতির সাথে মুসলমানদের জন্য নামায পড়ার নির্দেশনাকে 'সংবিধান-বিরোধী' দাবি করাটা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।"

মন্তব্য

ঈমানের পর যে নামাযের স্থান, সে নামায যে সংবিধান বিরোধী নয় সেটা প্রমাণ করতে হয় যে দেশে, সে দেশ কতটুকু ইসলামী আর সে দেশের সরকার কতটুকু ঈমানদার- সকলের ভাবা দরকার। সে সরকারের আনুগত্যের কি বিধান সেটাও চিন্তার বিষয়। সে শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে উগ্রপন্থা হবে কি'না দেখার বিষয়।

আজ নামায বাধ্যতামূলক করার বিরোধীতা হয়েছে। এটি তো এক দিনে হয়নি। ইসলামের অসংখ্য বিধান, বরং বলতে

গেলে সকল বিধান শুরু থেকেই সংবিধান বিরোধী ছিল।

সংবিধানের মূলনীতি হলো, 'ধর্মীয় আইনের যতটুকু সংবিধানের অনুমোদনের বাহিরে সেগুলো বাতিল বলে গণ্য'। আর সংবিধান তো চার কুফরি মতবাদ: পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা তখন সংবিধানের সমালোচনা করিনি। জিহাদ ও ইসলামী শাসন যে সংবিধান বিরোধী ছিল তখন আমরা এর প্রতিবাদ করিনি। বরং যারা ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য জিহাদে নেমেছেন তাদের সমালোচনা করেছি, উগ্রপন্থী, জযবাতি আখ্যা দিয়েছি। **সেটারই কর্মফল আজ- নামায সংবিধান বিরোধী।**

দুই.

হুজুর বলেছেন,

"সংবিধান কোনো অমোঘ বিষয় নয়। এটা অনেকবার সংশোধন হয়েছে। নাগরিকদের চাওয়া-পাওয়া বা প্রাধান্য নির্ণয়ের সুবিধার প্রয়োজনে সংবিধান ভবিষ্যতেও সংশোধন করা যেতে পারে।"

মন্তব্য

হুজুর সাহস করে সংবিধান সংশোধনের কথা বলেছেন।

আমরা হুজুরকে সাধুবাদ জানাই। তবে এখানে একটা সূক্ষ্ম কথা না বলে পারা যায় না। সেটা হল:

সংবিধানের ভিত্তি কুফরের উপর। এটি ভিন্ন একটি কুফরি ধর্ম। এর কিছু আইন, কিছু ধারা সংশোধনের আহ্বান জানানো তো তাওহিদ পরিপন্থী। তাওহিদের দাবি তো ছিল, এ কুফরি সংবিধান এবং কুফরি শাসন বিলুপ্ত করে আল্লাহর শাসন জারি করার আওয়াজ তোলা। যারা এ শাসনের বিরোধীতা করবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করা। সংবিধান বহাল রেখে সময়ে সময়ে পরিবর্তন করার আহ্বান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুন্দর মনে হলেও আসলে এটি একটি কুফরি দাবি।

আসতাগফিরুল্লাহ! আমি একথা বলছি না যে, হুজুর কুফরি দাবি করেছেন। আমি শুধু বাস্তবতাটা তুলে ধরতে চাচ্ছি যে, তাওহিদের দাবি কোনটি। অধিকন্তু হুজুর সংবিধান বহাল রাখার পক্ষে না। তবে অপারগতার হালতে যতটুকু পেরেছেন বলেছেন।

তিন.

হুজুর বলেছেন,

"মুসলমানদের জন্য অবশ্য-পালনীয় ধর্মীয় বিধান এবং

সংবিধানের কোনো নীতির মধ্যে যদি বিরোধ তৈরি হয় বা তৈরি করা হয় তখন মুসলিম নাগরিকদের মতামত থেকে তাদের ‘প্রাধান্য’ বেছে নিতে দিন। যেমন, আমরা ধরে নিলাম, দেশের কোনো প্রতিষ্ঠান ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য এমন কোনো নীতি বা বিধি চালু করল, যেটা ইসলামী আইন ও শরীয়তেরই বিষয়, আবার অপরদিকে কেউ কেউ মতামত দিলেন যে, ওই নীতি বা বিধিটি সংবিধান-বিরোধী, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের করণীয় হল, নাগরিকদের জিজ্ঞাসা করা যে, তারা কী করতে চান।”

মন্তব্য

কথাটা বাহ্যত সুন্দর মনে হলেও বাস্তবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কুফরি আইন আর ইসলামী আইনের কোনো একটা বেছে নেয়ার অপশন দেয়া হবে? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। যারা ইসলাম কায়েম না করে ইসলাম ও কুফর একটা বেছে নেয়ার অপশন দেবে তাদের ঈমানের কি হবে? রেজা বিল কুফর তো স্পষ্ট যে, জনগণ কুফর চাইলে কুফর প্রতিষ্ঠা করবে, আর ইসলাম চাইলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে। যে শাসক এ ধরনের অপশন দেবে তার ঈমান থাকবে কি? আর আমি একজন মুমিন হয়ে এ ধরনের অপশন দাবি করবো, না’কি সরাসরি ইসলাম কায়েমের দাবি করবো?

হুজুর পরক্ষণেই অবশ্য বলেছেন,

“এটা প্রায় বিদিত যে, এজাতীয় পরিস্থিতিতে মুসলিম নাগরিকরদের মত ও ভাষ্য হবে ইসলামী বিধি বহাল রাখা হোক এবং সংবিধান সংশোধন করা হোক। তারা এমন বলবেন না যে, শরীয়তের ওই আইন বা বিধিটি বন্ধ বা স্থগিত করা হোক, যেমনটি বলার অধিকার আসলে কারো নেই।”

জনগণ পরে ইসলাম মেনে নেবে কি নেবে না সেটা পরের কথা। কিন্তু আগে কথা হলো, ঈমান কুফরের এ পুলসিরাতে দাঁড় করানো জায়েয হবে কি? তখন যদি কিছু লোক কুফর বেছে নেয় তাহলে এর দায় কে নেবে? এজন্য দাবি এমনটা হবে না। দাবি হবে, আমরা ইসলাম চাই। এর বিপরীতে সবকিছু প্রত্যাখ্যিত। যেসব শাসক ইসলামে রাজি হবে না তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ। এটাই মুমিনের দাবি। এটাই তাওহিদের দাবি। ঈমান কুফরের সন্ধিস্থলে দাঁড় করানোর কথা বলবেন না দয়া করে।

আরো মজার কথা হল, জনগণ ইসলাম বেছে নেবে এ ভয়েই হয়তো শাসকগোষ্ঠী জনগণকে এ দাবির সুযোগটুকুও দেয় না। তখন আপনা আপনিই প্রশ্ন এসে যায়, যেসব শাসকগোষ্ঠী কুফরের বিপরীতে আল্লাহর আইনের দাবিটুকুও জানাতে দেয় না তারা কি ঈমানদার? তারা কি আমীরুল

মুমিনিন? তাদেরও কি আনুগত্য করতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তরগুলো বড়ই দরকার ছিল।

চার.

হুজুর বলেন,

“আমরা মনে করি, প্রত্যেক অফিস-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে এমন আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা রাখা দরকার, যেন মুসলমান শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তারা যথাসময়ে নামায পড়ার সুযোগ পান। যেন ইসলাম পালনে কারো কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়। নামাযের জন্য বিরতিসহ এমন ব্যবস্থাপনা যেন সব জায়গায় রাখা হয় যে, মানুষ প্রশান্তির সঙ্গে নামায ও অন্যান্য ইবাদত করতে পারে। এমনকি আমরা এ-ও বলি, ভিন্ন ধর্মের মানুষেরা যদি চায়, যথাসময়ে তাদের ধর্ম পালনেরও সুযোগ তাদের দেওয়া হোক।”

মন্তব্য

ভিন্ন ধর্মের কুফরের প্রসারের দাবিটা না জানালে ভাল হতো। কাফেরকে যদি কুফর পালনের সুযোগ না দেয়া হয় তাহলে এটা তো খুশির কথা। সেখানে আমরা নিজ থেকে কিভাবে দাবি করছি, কাফেরকেও কুফর করার সুযোগ দেয়া হোক? হুজুর এ দাবিটা না জানালেও পারতেন। দাবিটা

জানাতে হুজুরকে কেউ চাপ দেয়নি। আল্লাহর যমিনে আল্লাহ বিদ্রোহের এ দাবি বড় ভয়ানক ঠেকছে।

***

আবেদন: সকলের কাছে দাবি থাকবে- জযবার তাড়নায় কেউ যেন অশোভন কমেন্ট না করি।

১০.আল-কায়েদা দ্বীন কায়েমের মিশন, শুধু জিহাদি সংগঠন নয়!

আল-কায়েদার কর্যক্রম শুধু জিহাদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, আল-কায়েদা কেবল একটা জিহাদি সংগঠনই নয়; বরং আল-কায়েদার টার্গেট পূর্ণ দ্বীন কায়েম করা। কুফর-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে শরীয়া-ভিত্তিক শাসন কায়েম করা। খিলাফা আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সমাজের প্রতিটি স্তর, প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোয় আলোকিত করা। দুনিয়ামুখী মানুষদের আখেরাতমুখী করা। আল্লাহ-ভুলা বান্দাকে আল্লাহর দিকে টেনে নেয়া।

এ কারণেই আপনারা দেখতে পাবেন, যে কেউ আল-কায়েদার সদস্য হতে চাইলেই আল-কায়েদা তাকে সদস্য বানায় না, যতক্ষণ না তাকে একজন দ্বীনদার ব্যক্তিরূপে গড়ে তোলে। একজন মানুষের যথাসাধ্য ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধি করে একজন দ্বীনদার ও দ্বীনপ্রেমী ব্যক্তিতে পরিণত করার পরই কেবল তাকে সদস্য বানায়।

অধিকন্তু আল-কায়েদা সদস্য বানায় কমসংখ্যক ব্যক্তিকেই, কিন্তু সমাজের সর্বস্তরেই তার ইসলাহী কার্যক্রম পরিচালনা করে। কারণ, আল-কায়েদার উদ্দেশ্য শুধু কিছু ব্যক্তিকে সদস্য বানিয়ে তাদের দিয়ে যুদ্ধ করে ক্ষমতা দখল করত ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করা নয়, বরং তার উদ্দেশ্য গোটা সমাজ ও সমাজের মানুষকেই পরিশুদ্ধ করে দ্বীনদার ও দ্বীনপ্রেমী বানানো। কাজেই, আল-কায়েদা যেমন একটি জিহাদি সংগঠন, তেমনি একটি ইসলাহী মিশন। বিষয়টি ভালভাবে মনে রাখা চাই। এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার না হওয়া চাই। যারা আল-কায়েদার সদস্য বা সমর্থক, তাদের উচিৎ নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজন ও অধিনস্থদের দ্বীনের উপর উঠানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এমনটি যেন না হয় যে, জিহাদের কথা বলে বলে বাকি সব ভুলে যাই। যেন মনে না করি- জিহাদ পেয়ে গেছি আর কিছুর দরকার নেই। নিজের মাঝেও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করুন, সমাজ বদলানোর চেষ্টায়ও নিয়োজিত থাকুন।

১১.আলকায়েদা-আইএস: ঐক্য সম্ভব কি?

গত কয়েক দিন ধরে ফোরামে এক কমেন্টে আলকায়েদা আইএস নিয়ে কথা উঠেছে।

https://82.221.139.217/showthread.php?21638

এক ভাই তামান্না জাহির করেছেন যে, আলকায়েদা আইএসের মাঝে সমঝোতা হয়ে উভয়ে এক প্লাটফর্মে চলে আসলে ভাল হতো। এতেই উম্মাহর খায়র।

মুহতারাম ভাইয়ের তামান্না অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। গোটা উম্মাহ এক প্লাটফর্মে এসে গেলেই তো ভাল হয়। এটাই তো খাঁটি মুমিনের আকাঙ্খা। তবে এখানে কিছু কথা আছে।

উম্মাহর দ্বন্দ্ব থেকেই যাবে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, উম্মাহ তিয়াত্তর দলে ভাগ হয়ে পড়বে। এক দল জান্নাতি। বাকিরা জাহান্নামি। হযরত উসমান রাদি.কে শহীদ করার ঘটনা কেন্দ্র করে উম্মাহর বিভক্তি শুরু। কিয়ামত পর্যন্ত উম্মাহর আর কখনও এক হতে পারবে না। দ্বন্দ্ব থেকেই যাবে। এটিই আল্লাহ তাআলার ফায়সালা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

سألت ربى ثلاثا فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة سألت ربى أن لا يهلك أمتى بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتى بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. -صحيح مسلم : 7442

(আমার উম্মতের ব্যাপারে) আল্লাহ তাআলার কাছে তিনটি আবেদন করেছিলাম। আল্লাহ তাআলা দু'টি কবুল করেছেন, একটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। ১. আবেদন করেছিলাম যেন (পূর্বেকার উম্মতদের মতো) ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে উম্মতকে ধ্বংস না করেন। এটি কবুল করেছেন। ২. আবেদন করেছিলাম যেন পানিতে ডুবিয়ে উম্মতকে (সমূলে) ধ্বংস না করেন। এটিও কবুল করেছেন। ৩. আবেদন করেছিলাম উম্মত

যেন নিজেরা মারামারি না করে। এটি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। -সহীহ মুসলিম: ৭৪৪২

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন,

فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مسند أحمد: 17115قال المحققون ،: حديث صحيح. اهـ

আমার উম্মতের মাঝে যখন একবার তরবারি জারি হবে, কিয়াম পর্যন্ত আর বন্ধ হবে না। -মুসনাদে আহমাদ: **১৭১১৫**

উসমান রাদি.কে শহীদ করার মধ্য দিয়ে তরবারি জারি হয়ে গেছে। তা চলবেই কিয়ামত পর্যন্ত।

অতএব, মুসলিম উম্মাহর নিজেদের মাঝেই হক বাতিলের দ্বন্দ্ব থাকবে। নিজেরা পরস্পর মারামারি করবে। একেবারে সম্পূর্ণ বিভেদ কখনও উঠে যাবে না। এটি আল্লাহ তাআলার চিরন্তন ফায়সালা।

অন্য হাদিসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وإن ربى قال يا محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا. -صحيح مسلم للنيسابوري: 7440

আর আমার রব আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আমি যখন কোনো ফায়সালা দিয়ে দিই তা আর কিছুতেই ঘুরানো হয় না। আপনার আবেদনের আমি এই সিদ্ধান্ত দিয়েছি যে, ১. ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়েও আপনার উম্মতকে ধ্বংস করবো না; ২. ভিন জাতি কোনো শত্রুও তাদের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দেবো না যে, তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেবে। গোটা বিশ্বের সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আসলেও না। ৩. তবে অবশেষে তারা নিজেরাই একে অপরকে ধ্বংস করবে এবং একে অপরকে বন্দী করবে। -সহীহ মুসলিম: ৭৪৪০

খাওয়ারেজদের ব্যাপারে সুন্নাহর নির্দেশনা

সার্বিকভাবে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা এটাই যে, উম্মাহর মাঝে বিভক্তি, বিভেদ ও পরস্পর মারামারি থাকবে। বিশেষ

করে চরমপন্থী খারেজিদের ব্যাপারে সুন্নাহয় বিশেষ নির্দেশনা এসেছে। এখানে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করছি,

এক.

عن علي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا، لمن قتلهم عند الله يوم القيامة». -صحيح البخاري: 6930

আলী রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কিছু কথাবার্তা বলবে। তারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ যথাযথ বুঝবে না)। তীর শিকারের দেহ ভেদ করে যেমন বের হয়ে যায় তেমনই তারা দ্বীন থেকে। তাদেরকে যেখানেই তোমরা পাবে হত্যা করবে। তাদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালার নিকট মহা প্রতিদান রয়েছে। -সহিহ বুখারী: ৬৯৩০

দুই.

ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء، ذلقة ألسنتهم بالقرآن، لا يجاوز تراقيهم، ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم، ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم، فالمأجور قاتلهم -مسند أحمد: 20446؛ قال المحققون: إسناده قوي على شرط مسلم. اهـ

শোনে রাখো! অচিরেই আমার উম্মতে এমন কতক লোক বের হবে যারা হবে কঠোর প্রকৃতির। যবান হবে ধারালো। যবানে কুরআনের অনল বর্ষাবে, কিন্তু কুরআন তাদের গলদেশ পেরিয়ে নিচে নামবে না। শোনো! যখন তাদের পাবে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আবারও যদি পাও আবারও নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাদের হত্যাকারীরাই পাবে প্রতিদান। –মুসনাদে আহমাদ: ২০৪৪৬

তিন.

لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم -صلى الله عليه وسلم- لاتكلوا عن العمل. –صحيح مسلم: 2516

যে বাহিনী তাদের মোকাবেলা করবে তারা যদি জানতো তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানিতে তাদের জন্য যে কি প্রতিদানের ফায়সালা করে রাখা হয়েছে, তাহলে তারা এর উপর ভরসা করে অন্য সকল আমল ছেড়ে দিয়ে বসতো। -সহীহ মুসলিম: ২৫১৬

চার.

لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. -صحيح البخاري: 3166

যদি আমি তাদের পেয়ে যাই, আদ জাতির মতো (সমূলে) হত্যা করবো। -সহীহ বুখারি: **৩১৬৬**

ইমাম নববি রহ. (৬৭৬হি.) বলেন,

لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" أي قتلاً عاماً مستأصلاً كما قال " تعالى: {فهل ترى لهم من باقية} وفيه الحث على قتالهم. -شرح مسلم للنووي: 13\175

‘যদি আমি তাদের পেয়ে যাই, আদ জাতির মতো হত্যা করবো’ অর্থাৎ ব্যাপকভাবে হত্যা করে সমূলে উৎপাটন করবো। যেমন আল্লাহ তাআলা (আদ জাতির ব্যাপারে) বলেছেন, ‘তাদের একজনও কি আল্লাহর এই গজব থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে দেখতে পাচ্ছেন?’ এ হাদিসে এদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। -শরহে মুসলিম: **১৩/১৭৫**

খাওয়ারেজদের সমূলে নিঃশেষ করতে উৎসাহ দেয়া হল কেন?

আমরা দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজি

শ্রেণীর উদ্ভব হবে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তাদের ব্যাপারে যুদ্ধ করার উৎসাহ দিয়ে গেছেন। এমনকি একেবারে আদ-সামুদের মতো সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বলে গেছেন। কেন?

অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়াহুদ নাসারাসহ সকল কাফেরের ব্যাপারে শরীয়ত বলেছে, যদি তারা তাওবা করে মুসলিম হয়ে যায় বা জিযিয়া কবুল করতে রাজি হয় তাহলে আর যুদ্ধ করা হবে না? যেখানে ইয়াহুদ নাসারা ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে শরীয়ত এত কঠোর ফায়সালা দেয়নি সেখানে খারেজিদের ব্যাপারে কেন এত কঠিন ফায়সালা? অথচ তারা তো আমাদেরই ভাই। যেমনটা আলী রাদি. বলেছেন,

إخواننا بغوا علينا.

আমাদের ভাইয়েরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। -মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা: ৩৮৯১৮

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২হি.) এর হিকমত উল্লেখ করে বলেন,

قال بن هبيرة وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ راس مال الإسلام وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى. –فتح الباري: 12\301

ইবনে হুবায়রা রহ. বলেন, এ হাদিস প্রমাণ যে, খাওয়ারেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুশরেকদের বিরুদ্ধে (আক্রমণাত্মক) যুদ্ধ করার চেয়ে অগ্রগণ্য। এর হিকমত এই যে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারা ইসলামের মূলধন হেফাজত হবে, আর মুশরেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে। মূলধন হেফাজত করা অগ্রাধিকারযোগ্য। -ফাতহুল বারি: ১২/৩০১

খারেজিদের বিরুদ্ধে কঠোরতার মৌলিক কারণ বলা যায়,

ক. এরা ঘরের শত্রু। আগে ঘর ঠিক করা জরুরী। নয়ত যেকোনো সময় সুযোগ বুঝে এরা সর্বনাশ করবে।

খ. খারেজিরা আমাদের মুরতাদ মনে করে আর কাফেররা আমাদেরকে আসলি কাফের মনে করে। স্পষ্ট যে, মুরতাদের বিধান কঠিন। এ কারণে বাগে পেলে খারেজিরা আমাদেরকে কখনও ছাড়বে না। কারণ, তাদের আকিদা অনুযায়ী আমরা মুরতাদ। আর মুরতাদকে বাঁচিয়ে রাখা নাজায়েয। পক্ষান্তরে আসলি কাফেরকে জিযিয়া নিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এ কারণে হাদিসে এসেছে, তারা মুশরিকদের ছেড়ে দেবে কিন্তু মুসলিমদের অবশ্যই হত্যা করবে।

এ দু’টি দিক বিবেচনা করলে খারেজিরা কাফেরদের চেয়েও বেশি ভয়ংকর, যদিও তারা আমাদের ভাই। এ কারণে এদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে বলা হয়েছে হাদিসে।

ঐক্য কখন সম্ভব?

ঐক্য তখনই সম্ভব যখন আপনি আমার ব্যাপারে আশ্বস্ত, আমিও আপনার ব্যাপারে আশ্বস্ত। কিন্তু যখন জানা আছে, সুযোগ পেলেই আপনি আমাকে হত্যা করবেন, তখন কি ঐক্য সম্ভব?

তাহলে খারেজিদের সাথে কিভাবে ঐক্য সম্ভব? তাদের সাথে ঐক্য করবো আর তারা বাগে পেয়ে ধরে ধরে আমাদের হত্যা করবে। আমরা দেখেছি, শামে যখন মুজাহিদরা নুসাইরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেছেন, আইএসে এসে পিছন দিয়ে মুজাহিদদের উপর হামলা করেছে। এদের না সামলে আপনি কিভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন?

কাজেই আইএস আলকায়েদা ঐক্য বিবেকও সমর্থন করে না। বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তি-সমঝোতা করা গেলেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব না।

খারেজিদের সাথে ঐক্যের ইতিহাস আছে কি?

যেদিন থেকে খারেজিদের উৎপত্তি, গোটা ইসলামি ইতিহাসের সকল খলিফা ও সুলতান (আদেল হোন আর জালেম হোন) খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। নিরুপায় হয়ে আফ্রিকার মুসলিমরা একবার এদের সাথে মিলে বাতিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন। শেষে সুযোগ মতো এরা আহলুস সুন্নাহকে কাফেরদের হাতে ছেড়ে চলে গেছে। কাফেররা আহলুস সুন্নাহর আলেমদের পাইকারি হত্যা করেছে। ইতিহাস খুলে দেখুন। এদের সাথে ঐক্যের পরিণতি এর চেয়ে ভাল কিছু হবে না।

আলী রাদি. ও মুআবিয়া রাদি. প্রসঙ্গ

ভাই আলী রাদি. ও মুআবিয়া রাদি. এর প্রসঙ্গ এনেছেন। মুহতারাম ভাই, পক্ষ সেখানে তিনটি ছিল: ১. আলী রাদি.; ২. মুআবিয়া রাদি.; ৩. হারুরিয়া তথা খারিজিরা।

মুআবিয়া রাদি.র বিরুদ্ধে আলী রাদি. যুদ্ধ করেছেন; তবে আগ্রহভরে নয়। নাখোশ দিলে। চেয়েছেন কোনোভাবে সমঝোতা হয় কি'না। পক্ষান্তরে খারিজিরা ছিল আলী রাদি.

এর দলে। এরা যখন দল ত্যাগ করলো, আলী রাদি. বড় উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহের সাথে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এমনভাবে হত্যা করেছেন যে, এদের দশটা লোকও বাঁচতে পারেনি।

মুআবিয়া রাদি. ইজতিহাদি ভুল করে আলী রাদি.র বিরুদ্ধে গেছেন। তারা কেউ কাউকে তাকফির করতেন না। পক্ষান্তরে খারিজিরা উভয়কে তাকফির করতো। এরা ভয়ংকর সাপের চেয়েও ভয়ংকর। এজন্য আলী রাদি. এদের দশটা লোককেও বাঁচতে দেননি। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, যে কয়টা খারেজি বাঁচতে পেরেছিল, এককেটা ফিতনার বীজরূপে কাজ করেছে।

শাহরিসতানি রহ. (৫৪৮হি.) বলেন,

فقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان مقاتلة شديدة، فما انفلت منهم إلا أقل من عشرة، وما قتل من المسلمين إلا أقل من عشرة، فانهزم اثنان منهم إلى عمان، واثنان إلى كرمان، واثنان إلى سجستان، واثنان إلى الجزيرة، وواحد إلى تل مورون باليمن، وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم وبقيت إلى اليوم. –

الملل والنحل، ج: 1، ص: 117، مؤسسة الحلبي

নাহরাওয়ানে তাদের সাথে আলী রাদি.-র ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তাদের দশটা লোকও বাঁচতে পারেনি আর মুসলমানদের দশটা লোকও শহীদ হয়নি। এরপর তাদের দু’জন পালিয়ে যায়

উম্মানে, দু’জন কারমানে, দু’জন সিজিস্তানে, দু’জন জাযিরায় এবং একজন ইয়ামানে। এদের থেকে ঐসব অঞ্চলে খাওয়ারেজদের বিদআত ছড়িয়েছে এবং আজ পর্যন্ত জারি আছে।” –আলমিলাল ওয়াননিহাল: **১/১১৭**

এ হল খারিজি। যেখানে যাবে ফিতনার চারা গজাবে। এরা সাধারণ বাগি নয়। সাধারণ ফাসেকও নয়। এমনকি ডাকাতও নয়। এরা আরও ভয়ংকর। এদের সাথে ঐক্য মানে নিজের কবর রচনা। বুদ্ধিমান কখনও এ ভুল করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা উম্মাহকে সকল ধরনের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

***

আবেদন

মুহতারাম ভাইয়েরা, কাউকে কষ্ট দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। হক, যা না বলে উপায় নেই তাই বলতে বাধ্য। কারও কাছে কোনো বিষয় অযৌক্তিক মনে হলে দলীলভিত্তিক সমালোচনার দাবি। অহেতুক ভুল ধরাধরি থেকে বেঁচে থাকবো ইনশাআল্লাহ।

১২.আলেমের ফজিলত বেশি না'কি শহীদের?

প্রশ্ন: আলেমের ফজিলত বেশি না'কি শহীদের?

উত্তর: বিষয়টিকে দু'দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে।
এক. যার ইখলাছ যত বেশি, যে যত বেশি কষ্ট সহ্য করেছে, বিপদাপদের সম্মুখিন হয়েছে, সবর করেছে তার ফজিলত তত বেশি।

দুই. জিহাদের ফজিলত বেশি না'কি ইলমের ফজিলত বেশি? স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এ দু'য়ের ফজিলতের মাঝে তফাৎ হবে। যেটির দরকার বেশি সেটির ফজিলত বেশি। যখন ইলমের তুলনায় জিহাদের দরকার বেশি তখন জিহাদের ফজিলত বেশি। আর যখন জিহাদের তুলনায় ইলমের দরকার বেশি তখন ইলমের ফজিলত বেশি। আবার কোন ব্যক্তির জন্য ইলমের তুলনায় জিহাদের দরকার বেশি, আর কোন ব্যক্তির জন্য জিহাদের তুলনায় ইলমের দরকার বেশি। এ হিসেবে ফজিলতের মাঝে তারতম্য হবে।

উত্তর প্রদানে: আবুল মুনযির আশ-শানকীতি। শরয়ী বিভাগ, মিম্বারুত তাওহীদ।

(সংক্ষেপিত)

১৩.আল্লাহর আযাব: বেঈমানদের সহাবস্থান থেকে সাবধান হে মুমিন

বিদেশ ফেরত বাংলাদেশীদের বেশ কয়েকজন করোনায় আক্রান্ত। বর্তমান করোনা ভাইরাসের সার্বিক অবস্থা লক্ষ করলে বুঝা যায়, এটি আল্লাহর আযাব। আর আল্লাহর আযাব যখন আসে তখন শুধু অপরাধীদের উপরই আসে না, সাথে যারা থাকে সকলের উপরই আসে।

 # আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ -الأنفال25

“তোমরা ঐ আযাবকে ভয় কর যা শুধু তোমাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে বিশেষত তাদের উপরই পতিত হবে না। আর জেনে রাখ, আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন।” –আনফাল ২৫

অর্থাৎ সকলের উপরই আসবে।

ইমাম তবারি রহ. এ আয়াতের তাফসিরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন,

أمر الله المؤمنين أن لا يقرُّوا المنكر بين أظهرهم، فيعمَّهم الله بالعذاب -جامع البيان في تأويل القرآن، ج: 13، ص: 474، ط. الرسالة

"আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আদেশ দিয়েছেন তারা যেন তাদের মাঝে কোন মন্দকে প্রশ্রয় না দেয়। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে সকলকে আযাবে নিপতিত করবেন।" – জামিউল বায়ান ১৩/৪৭৪

মুসলিম সমাজে কিছু লোক গুনাহ করলে বাকিরা যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিহত না করে তাহলে সকলের উপরই আযাব আসবে: যারা করেছে তাদের উপরও, যারা প্রতিহত করেনি তাদের উপরও।

প্রিয় ভাই, যখন মুসলিম সমাজই আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে না, তখন কাফেরদের সাথে সহাবস্থান করে

তাদের সকল পাপাচারকে মৌন সমর্থন দিয়ে গেলে, এমনকি তাদের পাপাচারে নিজেরাও শরীক হলে কিভাবে আযাব থেকে বাঁচা যাবে? তখন যে আযাব কাফেরদের উপর আসবে, সে আযাব সেসব মুসলমানের উপরও আসবে।

 # আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ –الأنعام 68

“যারা আমার আয়াতসমূহের সমালোচনায় রত থাকে তাদেরকে যখন দেখবে তাদের থেকে দূরে সরে যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। যদি শয়তান কখনও তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয় তাহলে স্মরণ হওয়ার পর আর জালিম লোকদের সাথে বসবে না।” –আনআম ৬৮

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا – النساء140

“তিনি ইতিপূর্বেও কিতাবে তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে ও তার সাথে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোনো প্রসঙ্গে লিপ্ত হবে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ সকল মুনাফিক ও কাফিরকে জাহান্নামে একত্র করবেন।” –নিসা ১৪০

জালেম ও কাফেররা যখন গুনাহ ও কুফর করতে থাকে আল্লাহ তাআলা তখন তাদের সাথে বসতে নিষেধ করেছেন। যদিও সে উক্ত গুনাহ বা কুফরে শরীক না হয় তবুও সে অপরাধী। তাদের উপর যে আযাব আসবে তার উপরও সে আযাব পতিত হবে।

 # অন্য হাদিসে তো আরো ভয়ানক কথা এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم

“আল্লাহ তাআলা যখন কোনো কওমের উপর আযাব নাযিল করেন তাদের মাঝে থাকা (নেককার বদকার) সকলের উপরই আযাব আপতিত হয়। এরপর (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেকে তার

আপন আমল অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে।” –সহীহ বুখারি ৬৬৯১

সহীহ ইবনে হিব্বানে এসেছে,

عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن الله إذا أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم؟ فقال: "يا عائشة إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم" –صحيح ابن حبان: 7314

“হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা যখন কোনো ভূমির অধিবাসীদের উপর আযাব নাযিল করেন আর তাদের মাঝে কিছু নেককার লোকও থাকে তাহলে তারাও কি তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলা যখন তার নাফরমানদের উপর আযাব নাযিল করেন তখন তাদের মাঝে কিছু নেককার লোক থাকলে তাদের সাথে তারাও আযাবের শিকার হয়। এরপর (কিয়ামতের দিন) তারা তাদের আপন নিয়ত ও আমল অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে।” –সহীহ ইবনে হিব্বান ৭৩১৪

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন নেককারগণ যদিও উক্ত গুনাহগারদের গুনাহর কারণে পাকড়াওয়ের শিকার হবেন না, তবে দুনিয়াতে তাদের ভূমিতে থাকার কারণে এবং তাদের সাথে সহাবস্থানের

কারণে তারাও তাদের সাথে আযাবে নিপতিত হবেন।

এর বাস্তব দৃষ্টান্ত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত সহীহ বুখারির এক হাদিসে এসেছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم) . قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ . قال (يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একটি বাহিনি আগ্রাসনের জন্য কা’বার উদ্দেশ্যে আসবে। যখন বাইদা নামক স্থানে এসে পৌঁছবে তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলকে কিভাবে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে অথচ তাদের মাঝে এমন লোকজনও থাকবে যারা ব্যবসার জন্য এসেছে এবং এমন লোকজন যারা তাদের দলভুক্ত নয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, এরপর (কিয়ামতের দিন) তারা আপন নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে।” –সহীহ বুখারি ২০১২

অর্থাৎ একটা বাহিনিতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকে। কিছু লোকের উদ্দেশ্য শুধু ব্যবসা। তারা আগ্রাসনে শরীক নেই। বাহিনির লোকদের কাছে জিনিসপত্র বিক্রি করে লাভ করাই তাদের উদ্দেশ্য। আবার কিছু লোক হয়তো রাস্তার লোক। হয়তো পথ চলতে গিয়ে বাহিনির সাথে এক জায়গায় হয়ে গেছে। আবার কিছু লোককে হয়তো জোরপূর্বক সাথে আনা হয়েছে যারা আগ্রাসনের পক্ষে নয়। আল্লাহ তাআলা সকলকেই ধ্বসিয়ে দেবেন। সাথে থাকার কারণে বা রাস্তায় এক জায়গায় হয়ে যাওয়ার কারণে সকলের উপর আযাব নিপতিত হবে।

 # অন্য হাদিসে আরো সতর্কবাণী এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم

“যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে (ফলে তাদের উপর আযাব নাযিল হয়েছিল) তোমরা তাদের আবাসভূমিগুলোতে প্রবেশ করবে না। প্রবেশ করতে হলে কাঁদতে কাঁদতে করবে। কেননা, তাদের উপর যে আযাব নাযিল হয়েছিল তোমাদেরকেও সে আযাব পেয়ে বসতে পারে।” –সহীহ বুখারি ৩২০১

তাবুক যুদ্ধে গমনকালে যখন কওমে সামূদের বস্তি দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ দেন, সে বস্তি দ্রুত অতিক্রম করতে এবং বলেন,

لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم

“আযাবে পতিত এসব লোকর ভূমিতে প্রবেশ করবে না। করতে হলে কাঁদতে কাঁদতে করবে। যদি কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করতে না পারো তাহলে প্রবেশ করবে না। যেন তাদের উপর যে আযাব নাযিল হয়েছিল তা তোমাদেরকেও পেয়ে না বসে।” –সহীহ বুখারি ৪২৩

অর্থাৎ আযাবে নিপতিত জালিমদের ভূমি দিয়ে অতিক্রম করাও নিরাপদ নয়। যেকোনো সময় সে আযাব আবার নাযিল হতে পারে।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২হি.) বলেন,

ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينه عن المنكر وإن لم يتعاطاه قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم إذا مثلهم.
ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة.
هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم؛ فإن أعان أو رضي فهو

منهم. ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم بالإسراع في الخروج من ديار ثمود. اهـ فتح الباري 13\61

"গুনাহ করেনি তবে বাধা দেয়নি এদের উপরও যে আযাব আসবে এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী, 'তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোনো প্রসঙ্গে লিপ্ত হবে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে'।

এ থেকে কাফের ও জালেমদের থেকে দূরে থাকার বিধান বুঝে আসছে। কারণ, তাদের সাথে সহাবস্থানের অর্থ নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া।

এ তো হচ্ছে যখন সে তাদের সহায়তাও করবে না, তাদের কর্মের প্রতি সন্তুষ্টও থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি সহায়তা করে বা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তো সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কাওমে সামূদের বস্তি থেকে দ্রুত বের হওয়ার যে আদেশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের দিয়েছিলেন) তা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।" –ফাতহুল বারি ১৩/৬১

উপরোক্ত কুরআন ও সুন্নাহর আলোচনা থেকে বুঝা গেল, আযাব যখন আসবে তখন নিম্নোক্ত সকল শ্রেণীর উপরই আসবে:

এক. যারা সরাসরি গুনাহ করেছে।

দুই. যারা নিজেরা গুনাহ করেনি তবে সহায়তা করেছে বা সমর্থন করেছে।

তিন. যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধা দেয়নি।

চার. যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গুনাহগারদের সাথে ছিল। তাদের থেকে দূরে সরে থাকেনি।

পাঁচ. যারা আযাবে নিপতিতদের ভূমিতে যাবে।

মুহতারাম ভাই, এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের দেশে বসবাসকারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন,

سنن ابي داود: -أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين
2645، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. اهـ

“মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করে এমন প্রত্যেক মুসলমান থেকে আমি দায়মুক্ত।” –আবু দাউদ ২৬৪৫

বর্তমান চীন, ইতালি, ফ্রান্সসহ অন্য যেকোনো কাফের রাষ্ট্রে অবস্থানরত মুসলমান ভাইদের একটু ফিকির করা উচিৎ যে, তারা যেকোনো সময় ভয়ানক আযাব গজবের সম্মুখীন হতে পারেন। তখন আফসোস করে কোনো লাভ হবে না।

আল্লাহর দুশমনদের উপর যেসব আযাব গজব আসবে সেগুলোতে আপনাদেরও পড়তে হবে।

বর্তমানে বিদেশে চাকরি করতে পারাটাকে একটা সৌভাগ্যের প্রতীক গণ্য করা হচ্ছে। অথচ উলামায়ে কেরাম পরিষ্কার ফতোয়া দিয়ে রেখেছেন যে, অর্থ উপার্জনের জন্য একান্ত জরুরত না পড়লে কাফের রাষ্ট্রে গমন জায়েয নয়। কারণ, সেগুলোর পরিবেশ ভালো না। আমল আখলাক আর চরিত্র তো পরের কথা ঈমানই নষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে। অধিকন্তু কাফেরদের অধীনস্ত হয়ে চাকুরি করা মুমিনের শান পরিপন্থী। কিন্তু তাগুতের দল এ গোলামিকেই বানিয়েছে সৌভাগ্যের প্রতীক। আর আমরাও এমনই দুনিয়ালোভী হয়ে পড়েছি যে, একেই গ্রহণ করে নিয়েছি। জমিজমা সর্বস্ব বিক্রি করে হলেও বিদেশ যেতে পারাকে জীবনের বড় সফলতা মনে করছি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আর কিছু না হোক, অন্তত এতটুকু তো কিছুতেই এড়ানো যাবে না যে, এসব কাফেরের উপর আযাব গজব নাযিল হলে সেসব মুসলমানকেও সে আযাবে নিপতিত হতে হবে। করোনা ভাইরাস নামক গজবের বেলায় আমরা কিছুটা হলেও তা প্রত্যক্ষ করছি। অতএব, সাবধান হে মুমিন, সময়

থাকতে কাফেরদের থেকে দূরে সরে যাও, নতুবা আযাব তোমার উপরও পতিত হবে।

ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ

১৪.ই’দাদে আসকারি এবং একটি ভুল ধারণা

ই’দাদ ফরয। নামাযের জন্য অজু যেমন জিহাদের জন্য ই’দাদ তেমন। যখন জিহাদ ফরযে কিফায়া তখন ই’দাদও ফরযে কিফায়া। আর যখন জিহাদ ফরযে আইন তখন ই’দাদও ফরযে আইন। তবে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে, যেটা না বুঝার কারণে কোনো কোনো ভাই সংশয়ে ভুগেন। এমনকি তানজিমের নাফরমানি পর্যন্ত করে বসেন।

জিহাদ ও ই’দাদ একটি সামষ্টিক ইবাদাত। অর্থাৎ সকলে মিলে কাজগুলো আঞ্জাম দিতে হবে। এমন নয় যে, প্রত্যেককে সব কাজ করতে হবে বা সব কাজের যোগ্যতা হাসিল করতে হবে। আমাদের কাজের গণ্ডি অনেক বড়। বর্তমান জিহাদে অনেক শাখা প্রশাখা। সবগুলোতে একজন মানুষ কাজ করতে পারবে না। সবার মাঝে সব রকমের যোগ্যতা থাকেও না। এজন্য কাজ ভাগ করতে হয়। যেমন ধরুন আইটি, ইলমী, মিডিয়া ও আসকারি চারটি বিভাগ।

একজনের পক্ষে সবগুলো কাজ করা সম্ভব নয়, সবার মাঝে সবগুলো কাজের যোগ্যতাও নেই। তাই ভাগ করতে হয়। কেউ ইলমী, কেউ আইটি, কেউ মিডিয়া আর কেউ আসকারি। প্রয়োজনীয় বিষয়ে একজন আরেকজন থেকে সহায়তা নেবে।

আবার ধরুন আসকারি। এখানেও কিন্তু অনেক বিভাগ। অস্ত্র শস্ত্রও অনেক। সবগুলো বিভাগে সবাই কাজ করতে পারে না। সবাই সব ধরণের অস্ত্রে বিশেষজ্ঞতাও অর্জন করতে পারে না। এজন্য কাজ ভাগ করতে হয়। কেউ বারুদ বিশেষজ্ঞ, কেউ ট্যাংক বিশেষজ্ঞ, কেউ পাইলট ... এভাবে। আবার সাধারণ সৈনিকদেরও সবাই সব অস্ত্র পারবে না। এজন্য গ্রুপ গ্রুপ করতে হয়।

মোটকথা, কাজের শাখাও অনেক, একেক শাখায় আবার উপশাখাও অনেক। সবগুলো একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে কে কোনটা করবে? এখানে আমরা দু'টো বিষয় ধরতে পারি:

এক. কোন কাজের কতটুকু হাজত।
দুই. কার মাঝে কোন বিষয়ের যোগ্যতা আছে।

স্বাভাবিক এ দু'টি দিক লক্ষ করে আমরা ভাগ করতে পারি।

জিহাদের প্রাথমিক স্তরে ইলমী ও মিডিয়ার কাজের দরকার বেশি। তখন আলেম উলামা ও দাওয়াতি ভাইদের বেশি দরকার পড়ে। এর পরের স্তরে যখন ই'দাদ ও রিবাতের স্তর আসে বা কিতালের স্তর আসে তখন হয়তো আসকারি দরকার বেশি। আসলে লাগে সবগুলোই তবে কম বেশ আছে।

আবার যখন শত্রু এমনভাবে হামলা করে বসেছে যে, সকলে বের না হলে আর প্রতিরোধ করা সম্ভব না, তখন আলেম উলামারা আপাতত ইলমী কাজ বন্ধ রেখে সরাসরি ময়দানে কিতালে শরীক হবেন। এভাবে প্রয়োজন অনুপাতে কাজ ভাগ হয়।

কিন্তু অনেকে বিষয়টা এভাবে চিন্তা না করে তালগুল পাকিয়ে ফেলেন। মনে করেন ই'দাদে আসকারি সকলের উপর ফরযে আইন। তাই তানজিম থেকে অন্য কোনো কাজ দিলে তিনি খুশ দিলে করতে পারেন না। কিংবা উমারাদের নিষেধ অমান্য করে আসকারি শুরু করেন। এর পরিণতিতে অনেক সময় তানজীমের বিপুল ক্ষতিও হতে পারে।

আসল কথা হল, আপনাকে যে কাজ দেয়া হয়েছে সেটা আপনার জন্য ফরয। বাকিগুলো সমষ্টিগতভাবে ফরয। অন্যরা করলে আপনার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। আর

আপনাকে যেটা দেয়া হয়েছে সেটা না করে যদি অন্যগুলো নিয়ে টানাটানি করেন তাহলে একেতো তানজিমের নাফরমানির কারণে গোনাহগার হবেন, দ্বিতীয়ত এ কারণে কোনো সমস্যা হলে এর দায়ভারও আপনার উপরই বর্তাবে। এজন্য ভাইদের প্রতি আবেদন, সহীহ করে বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করুন। ই'দাদ ফরযে আইন কথাটা মুতলাক। একটু ভেঙে বিস্তারিত বুঝুন। মুতলাক বিষয়টা ভুল বুঝে ভিন্নপথ ধরে নিজেও গুনাহগার হবেন না, তানজিমকেও মুসিবতে ফেলবেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ ও সহীহ আমল দান করুন। আমীন।

১৫.ইমামের ডাক এবং একটি হাদিস নিয়ে বিভ্রান্তি

এক হাদিসে এসেছে,

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. -صحيح البخاري: 2670

ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতহে মক্কার দিন ইরশাদ করেন, (মক্কা) বিজয়

হয়ে যাওয়ার পর আর (মক্কা ছেড়ে মদীনায় বা দারুল হরব ছেড়ে দারুল ইসলামে) হিজরতের আবশ্যকীয়তা নেই (যদি দারুল হরবে দ্বীন পালন করা যায়)। তবে জিহাদ (-এর উদ্দেশ্যে) ও (অন্যান্য) নেক (আমলের) নিয়ত (করে হিজরত) বাকি রয়ে গেছে। অতএব, যখন (জিহাদ বা অন্য কোনো নেক উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে পড়তে আহ্বান জানানো হয়, বেরিয়ে পড়ো।
-সহীহ বুখারি: ২৬৭০

হাদিসের তরজমায় ব্র্যাকেটের কথাগুলো ফাতহুল বারিসহ অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। ১

সামনে এ সম্পর্কে আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

এ হাদিস থেকে সরকারি কিছু আলেম বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছেন যে, জিহাদের জন্য ইমামের আহ্বান লাগবে, নতুবা জিহাদে গেলে নাজায়েয হবে। ফরযে আইন, ফরযে কিফায়া কোনো ক্ষেত্রে তারা কোনো ব্যবধান করেননি। এ ব্যাপারে তালিবুল ইলম ভাই একটি দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছেন। আমিও এ সংশয়টি দূর করণার্থে সামান্য একটু অংশ নিচ্ছি ইনশাআল্লাহ।

আহ্বানকারী কে?

হাদিসে وإذا استنفرتم ফে’লটি মাজহুল আনা হয়েছে- ‘যখন বেরিয়ে পড়তে আহ্বান জানানো হয়’। এখন প্রশ্ন: আহ্বান জানাবে কে?

হাদিসে সুনির্দিষ্ট আহ্বানকারীর কথা আসেনি। অতএব, আহ্বানকারী আম। আমরা একে আমই রাখবো। খাস করতে হলে দলীল লাগবে।

আমরা দেখতে পাবো, আহ্বান করার অধিকার প্রথমে রাখে শরীয়ত, দ্বিতীয় পর্যায়ে ইমাম। তবে উভয়ের আদেশে বেশ কম আছে-

শরীয়ত: শরীয়ত সকলের উপর কর্তৃত্ব করার একচ্ছত্র অধিকার রাখে। শরীয়তের আহ্বাবানে সাড়া দেয়া সকলের জন্য জরুরী। শরীয়তের আদেশ হয়ে গেলে অন্য কারও আদেশের অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই। আর শরীয়তের আদেশ হয়ে গেলে অন্য কারও এর বিপরীত আদেশ দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। দিলেও সেটা মান্য নয়।

ইমাম: ইমামের আহ্বানের অধিকার দ্বিতীয় পর্যায়ে। এটি একচ্ছত্র অধিকার নয়, শরীয়ত প্রদত্ত অধিকার। শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য এ অধিকার। ইমামের ঐ আদেশই কেবল পালনযোগ্য, যা শরীয়তের মুওয়াফিক। অন্যথায় পালনীয় নয়।

পক্ষান্তরে শরীয়তের সকল আদেশ পালনীয়। ব্যতিক্রম করার কোনো অবকাশ নেই।

কিসের আহ্বান?

হাদিসে এটিও পরিষ্কার নেই যে, আহ্বান কিসের প্রতি। যখন সুনির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি, তখন আম রাখতে হবে। খাস করতে হলে দলীল লাগবে। অতএব, আহ্বান জিহাদেরও হতে পারে, অন্য কিছুরও হতে পারে। ২

আর হাদিসের শব্দও এর উপর দালালত করে। হাদিসে বলা হয়েছে, ولكن جهاد ونية। নিয়তের মধ্যে সকল নেক আমলের নিয়ত অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে জিহাদের নিয়তও অন্তর্ভুক্ত। তবে জিহাদের বিশেষ গুরুত্বের কারণে জিহাদের কথা আলাদা বলা হয়েছে। অতএব, জিহাদের নিয়তে হোক, অন্য কোনো নেক আমলের নিয়তে হোক (যেমন, ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য কিংবা তলবে ইলমের জন্য), প্রয়োজন পড়লে যে আপন ভূমি ত্যাগ করে মুওয়াফিক ভূমিতে চলে যাওয়ার বিধান বাকি আছে কেয়ামত পর্যন্ত। এরপর বলা হয়েছে, وإذا استنفرتم فانفروا- অর্থাৎ জিহাদ হোক বা অন্য কোনো নেক আমল হোক, প্রয়োজনের সময় যখন আহ্বান আসবে, তখন সেটা অর্জন করার জন্য বেরিয়ে পড়বে। যেমন, ইলম অর্জনের জন্য কিছু

তালিবুল ইলমকে অন্য ভূমিতে পাঠানো আবশ্যক হয়ে পড়লে যাদের ইলম অর্জনের যোগ্যতা আছে, মুসলিমদের প্রয়োজনে, তাদেরকে ভিন্ন ভূমিতে গমন করার আহ্বান জানানো হলে তারা যেনো বেরিয়ে পড়ে।

***

বুঝতে পারলাম, হাদিসে আহ্বানকারীও আম, আহ্বানের বিষয়বস্তুও আম। আহ্বানকারী শরীয়তও হতে পারে, ইমামও হতে পারে। আহ্বানের বিষয় জিহাদও হতে পারে অন্য নেক আমলও হতে পারে। তাহলে হাদিসের অর্থ দাঁড়াবে,

শরীয়ত যখন জিহাদ বা অন্য কোনো নেক আমলের প্রয়োজনের তাগাদায় বের হয়ে পড়ার আদেশ দেবে, তখন গড়িমসি না করে বেরিয়ে পড়বে। তদ্রূপ ইমামুল মুসলিমিনও যখন জিহাদ বা অন্য কোনো নেক আমলের প্রয়োজনের তাগাদায় বের হয়ে পড়ার আদেশ দেবে, তখন গড়িমসি না করে বেরিয়ে পড়বে।

হাদিসের প্রয়োগ

হাদিসের ব্যাখ্যা থেকে বুঝতে পারলাম, শরীয়ত যখন বের হতে আদেশ দেবে, তখন বেরিয়ে পড়তে হবে। জিহাদের আদেশ দিলেও, অন্য কিছুর আদেশ দিলেও। যেমন ধরুন, কোনো এলাকায় কয়েকশো মুসলমান মরে পড়ে আছে। দাফন কাফনের কেউ নেই। তখন শরীয়তের আদেশ, দাফন কাফনের জন্য কিছু লোক বেরিয়ে পড়ো। এখানে বেরিয়ে পড়া আবশ্যক। এমনকি দারুল হরবে হলেও। ইমাম থাকা না থাকা, আদেশ দেয়া না দেয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। শরীয়তের পক্ষ থেকে তাগাদা আসার পর আর কারও আদেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে না। এমনকি কেউ এর ব্যতিক্রম আদেশ দিলে সেটাও পালন করার মতো থাকবে না।

জিহাদের বেলায় শরীয়তের আদেশ

এখন যদি আমরা তাকাই, দেখতে পাবো, জিহাদের বেলায় শরীয়ত আমাদের দু'রকমের আদেশ দিয়ে রেখেছে,

এক. কাফেররা যদি নিজ দেশে থাকে, মুসলিমদের কোনো ভূমিতে আগ্রাসন না চালায় কিংবা কোনো মুসলিমকে বন্দী না করে, তাহলে কাফেরদের বিরুদ্ধে ইকদামি জিহাদের মাধ্যমে তাদের শক্তি চূর্ণ করে ইসলামি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা।

দুই. কাফেররা মুসলিম ভূমিতে আগ্রাসন চালালে কিংবা মুসলিমদের বন্দী করে নিয়ে গেলে ভূমি ও মুসলিমদের উদ্ধারের জন্য কিতাল করা।৩

এ দু’টি আদেশ শরীয়ত দিয়ে রেখেছে। অতএব, এ দু’টি বাস্তবায়ন করতেই হবে। এখানে ভিন্ন কেউ কোনো ব্যতিক্রম আদেশ দিলে তা মানা যাবে না। ***এ কারণে আমরা সালাফে সালিহিন ও ফিকহের কিতাবাদিতে দেখতে পাচ্ছি, ইমাম যদি জিহাদ না করে বা করতে নিষেধ করে, তাহলে ইমামের আদেশ অমান্য করে জিহাদ করতে বলা হয়েছে। কারণ, শরীয়তের আদেশ এসে যাওয়ার পর ইমামের নিষেধের কোনো মূল্য নেই।*** এ প্রসঙ্গে আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আর সেদিকে যাচ্ছি না।

সরকারি আলেমদের জবাবে

সরকারি আলেমরা যদি বলতে চান, ইমামের আদেশ না হলে জিহাদ করা যাবে না, তাহলে আমাদের প্রশ্ন- অন্য সকল আমলের ক্ষেত্রেও কি একই কথা হবে না? তাহলে শরীয়তের আদেশের কারণে কোনো আমল আমলযোগ্য থাকছে না, যতক্ষণ ইমামের আদেশ না হয়। আপনারা কি তা স্বীকার করছেন?

আর যদি ইমাম না থাকে তাহলে কি করণীয়? তখন কি শরীয়তের কোনো কিছুই আমল করা যাবে না?

ভয়ানক শিরক

সরকারি আলেমদের বক্তব্য অনুযায়ী জিহাদের আমলটি ইমামের অনুমতির উপর নির্ভরশীল, শরীয়তের আদেশ এখানে ধর্তব্য নয়। তাহলে তাদের মতে পালনীয় হচ্ছে ইমাম, শরীয়ত নয়। আমরা দেখেছি, জিহাদের বেলায় এ কথা বলতে হলে বাকি সকল আমলের ব্যাপারেও একই কথা বলতে হবে। তাহলে শরীয়ত সম্পূর্ণ পাওয়ার লেস। সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র ইমাম। আল্লাহ, রাসূল, শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে ইমামকে একমাত্র মাননীয় গ্রহণ করার চেয়ে বড় শিরক আর কি হতে পারে! এটাই তো সেই ইয়াহুদিদের শিরক, যে কারণে আল্লাহ তাআলা এদের শাসক শাসিত সকলকে মুশরিক বলেছেন। ঠিক একই শিরকে লিপ্ত যামানার তাগুত শাসকরা। আপনারা –ওহে সরকারি পোষা আলেমরা- সেই শাসকদেরকেই রব হিসেবে গ্রহণ করছেন। তাহলে কি আপনারা সেই শিরকের দরজাই খোলছেন? সেই শিরকের দাওয়াতই দিচ্ছেন? তাওহিদ আর সুন্নাহর জিগিরের আড়ালে এটাই আপনাদের মিশন?

***

د

قَوْلُهُ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ قَالَ الطِّيبِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ حُكْمِ مَا بَعْدَهُ لِمَا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْهِجْرَةَ الَّتِي هِيَ مُفَارَقَةُ الْوَطَنِ الَّتِي كَانَتْ مَطْلُوبَةً عَلَى الْأَعْيَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ انْقَطَعَتْ إِلَّا أَنَّ الْمُفَارَقَةَ بِسَبَبِ الْجِهَادِ بَاقِيَةٌ وَكَذَلِكَ الْمُفَارَقَةُ بِسَبَبِ نِيَّةٍ صَالِحَةٍ كَالْفِرَارِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ وَالْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْفِرَارِ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ وَالنِّيَّةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا قَالَ النَّوَوِيُّ يُرِيد أَن الْخَيْر الَّذِي انْقَطَعَ بِانْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِالْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ وَإِذَا أَمَرَكُمُ الْإِمَامُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَاخْرُجُوا إِلَيْهِ. -فتح الباري لابن حجر (6/ 39)

ح

أقول: وقد خص الاستنفار بالجهاد، ويمكن أن يحمل علي العموم أيضا أي إذا استنفرتم إلي الجهاد فانفرا، وإذا استنفرتم إلي طلب العلم وشبهه فانفروا؛ قال تعالي: { فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ} أي هلا نفروا حين استنفروا. -شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (8/ 2643)

ى

وإذا استنفرتم) : بصيغة المجهول (فانفروا) : بكسر الفاء ; أي: (إذا استخرجتم بالنفير العام فاخرجوا، فالأمر على فرض العين، أو إذا دعيتم إلى قتال العدو فانطلقوا، فالأمر على فرض الكفاية. - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(6/ 2473)

১৬.ইমারতে ইসলামিয়ার ভবিষ্যত: মোল্লা খায়রখাহ –র সাক্ষাতকার

২৯শে ফেব্রুয়ারি আমেরিকার সাথে দোহা চুক্তির পর (ইসলামি ইমারতের ভবিষ্যত নিয়ে) আলজাযিরা টিভি চ্যানেল মোল্লা খায়রুল্লাহ খায়রখাহ -এর একটি তাফসিলি ইন্টারভিও নেয়। তালেবানদের অফিসিয়াল উর্দু সাময়িকি **'মাসিক শরীয়ত'** জুলাই ২০২০ইং (মোতাবেক জিলদক ১৪৪১হি.) সংখ্যায় সেটি প্রকাশ হয়। ইন্টারভিওটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। পড়ার সময় মনে হলো সারসংক্ষে লিখে ফেলি। অনেকের উপকার হবে। এ হিসেবেই এ লেখাটি। সুওয়াল জওয়াব হুবহু অনুবাদ নয়। নিজের ভাষায় সারসংক্ষেপ। বিস্তারিত শরীয়ত সংখ্যায় পাবেন।

মোল্লা খায়রুল্লাহ খায়রখাহ –এর পরিচয়
তিনি তালেবানদের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের অন্যতম। তালেবান শাসনামলে প্রথমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। শেষ দু বছর হেরাতের গভর্নর ছিলেন। আমেরিকান আগ্রাসনের সময় গ্রেফতার হন। ১৩ বছর গোয়ান্তানামুতে বন্দী জীবনের পর তালেবানদের হাতে আটক হওয়া আমেরিকান এক জেনারেলের সাথে বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে ২০১৪ সালে তাকে মুক্ত করা হয়। তিনি দোহা আলোচনা কমিটির সদস্য ছিলেন।

ইন্টারভিও (সারসংক্ষেপ)

আলজাযিরা: কাবুল প্রশাসন বলছে, আপনারা কাবুল সেনাদের উপর আরও জোরদার হামলা করছেন। যদি শান্তিই আপনাদের উদ্দেশ্য তাহলে হামলা করছেন কেন?

মোল্লা খায়রুল্লাহ: হামলার জন্য তারাই দায়ী। তারা তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে চৌকি বানাতে আসে। তখন হামলা না করে উপায় কি?

তাছাড়া কাবুল প্রশাসনের সাথে যুদ্ধ বিরতির কোনো কথা হয়নি। চুক্তি হয়েছে আমেরিকার সাথে। তারা আমাদের উপর হামলা করবে না আমরা তাদের উপর হামরা করবো না। কাবুল পুতুল সেনাদের উপর হামলা হবে না এমন কোনো চুক্তি হয়নি। এতদসত্ত্বেও আমরা শহরগুলোতে এবং তাদের

বড় সেনা ক্যাম্পগুলোতে হামলা করছি না।

আলজাযিরা: আপনারা কি মনে করছেন অচিরেই আফগান শান্তি আলোচনা শুরু হবে?

মোল্লা খায়রুল্লাহ: জি, হ্যাঁ। এমনটাই আশা করছি।

আলজাযিরা: কিন্তু আপনারা তো কাবুল প্রশাসনকে স্বীকৃতিই দেন না। একে অপরকে হত্যা করতে প্রস্তুত। তাহলে শান্তি আলোচনা কিভাবে হবে?

মোল্লা খায়রুল্লাহ: শান্তি আলোচনা কাবুল প্রশাসনের সাথে হবে এমনটাতো আমরা বলিনি। আমেরিকার সাথে চুক্তিতে কথা হয়েছে আমরা আফগান জনগণের সাথে আলোচনা করবো। কাবুল প্রশাসনের সাথে আলোচনা হবে তা তো চুক্তিতে বলা হয়নি। আমরা আফগানের প্রতিটি নাগরিকের সাথে আলোচনায় বসতে সম্মত। এটাই আমরা বলেছি। কাবুল প্রশাসনকে তো আমরা একটা বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবেও স্বীকৃতি দেই না যে, তাদের সাথে আলোচনায় যাব। চুক্তিতে পাঁচ হাজার মুজাহিদ মুক্তির শর্ত এজন্যই লাগানো হয়েছিল যে, কাবুল প্রশাসনকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। তবে যদি তারা শর্তমতো পাঁচ হাজার তালেবানকে মুক্তি দিয়ে দেয় তাহলে কিছুটা বিশ্বাস জন্মাবে। এজন্যই বন্দী মুক্তির শর্তটি

করা হয়েছে।

অধিকন্তু শর্তটি তো কাবুল প্রশাসনের সাথে করা হয়নি। করা হয়েছে আমেরিকার সাথে। আমরা কখনই কাবুল প্রশাসনের কাছে বন্দী মুক্তি তলব করবো না। আমেরিকা কাবুল প্রশাসনকে আদেশ দেবে আর কাবুল প্রশাসন আমাদের বন্দীদের মুক্তি দেবে। আমরা কাবুল প্রশাসনের কাছে তলব করবো না।

আলজাযিরা: আমেরিকা চলে যাওয়ার পর কি হবে?

মোল্লা খায়রুল্লাহ: আমরা আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাই। আফগান চল্লিশ বছর যাবত যুদ্ধে জড়িয়ে আছে। এ ভূমিতে শক্তির জোরে কখনও সমাধান হয়নি। তাই আলোচনা দরকার। আমরা সারা আফগানবাসীর সাথে আলোচনায় বসবো। আফগানের একটা অংশ হিসেবে কাবুল প্রশাসনও আলোচনায় শরীক থাকবে। সকলের পরামর্শক্রমে যে হুকুমত প্রতিষ্ঠা হবে তাই হবে একটি কামিয়াব হুকুমত। শক্তির জোরে ক্ষমতা দখল করে আফগান ভূমিতে কখনও সমাধান আনা সম্ভব নয়।

আলজাযিরা: বলা হচ্ছে, আমেরিকান সৈন্যদের হত্যার বদলায় তালেবান রাশিয়া থেকে অর্থ নিয়েছে। এটি কতটুকু সঠিক?

মোল্লাখায়রুল্লাহ: এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। আমরা তদন্ত করে দেখেছি যে, এটি কাবুল প্রশাসানের গোয়েন্দা বিভাগের কাজ। এরা বন্দীদের উপর নির্যাতন করে স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে, তারা আমেরিকান সৈন্যদের হত্যার বিনিময়ে রাশিয়া থেকে অর্থ পাচ্ছে। এরপর একটি রিপোর্ট তৈরি করে মিডিয়ায় প্রচার করেছে। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে, তালেবান রাশিয়া থেকে অর্থ বা সামরিক সহায়তা নিয়েছে। কাবুল চাচ্ছে বিদেশি সৈন্যরা আফগান ছেড়ে না যাক। এজন্যই তারা প্রোপাগাণ্ডা ছড়াচ্ছে যে, আমেরিকা চলে গেলে আফগানে রাশিয়া প্রভাব বিস্তার করবে।

আলজাযিরা: আফগানের কত ভাগ এলাকা আপনাদের দখলে? সেখানকার অবস্থা কেমন?

মোল্লাখায়রুল্লাহ: মোটামুটি সত্তর ভাগ এলাকা তালেবানের দখলে। এখানকার অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাল। আদালত ব্যবস্থা কায়েম আছে। কাবুল প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো থেকে পর্যন্ত লোকজন আমাদের এখানে মামলা নিয়ে আসে। কারণ, এখানে ঘুষ চলে না। বিচারও হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। বিনা কারণে অনর্থক দেরি করা হয় না। অবশ্য আমাদের একটা দুর্বলতা যে, আমরা এখন অর্থ সংকটে আছি। অধিকাংশ এনজিও, ট্রাস্ট কাবুলকে সহায়তা দেয়, আমাদের

দেয় না। তবে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশাবাদি যে, অচিরেই এ সংকট দূর হয়ে যাবে। তালেবান শাসন কায়েম হয়ে যাওয়ার পর উন্নতি হবে। আফগানবাসী শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে।

আলজাযিরা: পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো বলছে যে, তালেবান ক্ষমতায় আসলে আফগানের উন্নতি বলতে কিছু থাকবে না। নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতা কিছু থাকবে না।

মোল্লা খায়রুল্লাহ: তালেবানরা প্রথমে যখন ক্ষমতায় ছিল তখনও আফগানে উন্নতি হয়েছিল। যদিও যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল তথাপি যথেষ্ট উন্নতি ছিল এবং নজির বিহিন শান্তি কায়েম ছিল। নারীদের শিক্ষা দীক্ষারও সুব্যবস্থা ছিল। অবশ্য আমরা খুব বেশি এগুবার সুযোগ পাইনি সেটা ভিন্ন কথা।

আর নারী অধিকারের ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট স্বোচ্চার। নারী জাতি বড়ই মজলুম। গোটা তালেবান শাসনামলে অল্প দুয়েকটি ছাড়া নারী নির্যাতনের কোনো ঘটনা ছিল না। অথচ আজ কাবুল প্রশাসনে অহর্নিশি নারী নির্যাতিত হচ্ছে। আমেরিকা নারী অধিকারের বুলি আওড়াচ্ছে তো এগুলোর কোনো প্রতিকার নেই কেন? আমরা ইসলামের গণ্ডির ভিতরে থেকে নারীদের শিক্ষা দীক্ষা ও উন্নতির ফিকির করছি। কিন্তু কিছু মহিলা আছে ইউরোপ আমেরিকার মতো চলতে চায়। এটা তো

কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।

আলজাযিরা: আলকায়েদা ও অন্যান্য জঙ্গি সংগঠন এক সময় আফগানে ছিল এবং সেখানে তাদের গোপন আস্তানা ছিল। কি নিশ্চয়তা আছে যে, তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠার পর আবার আফগান তাদের অভয়ারণ্য হবে না?

মোল্লা খায়রুল্লাহ: আসলে তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে তারা আফগানে এসেছিলেন। তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠার পর আস্তে আস্তে নিজ নিজ দেশ ও অন্যান্য রাষ্ট্রে চলে যান। আফগান জিহাদে তখন তাদের প্রয়োজনও ছিল। এখন তো তালেবানরা যথেষ্ট শক্তিশালী। সব কিছু তাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে। বাহিরের লোকজনের দরকার নেই। আর আমরা এখন চুক্তিও করেছি যে, আমাদের ভূমি কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। আর তারা জানেন যে, আমরা চুক্তি রক্ষায় কঠোর। তাই আশাকরি এখন তারা আর এ উদ্দেশ্যে এখানে আসবেন না। এ উদ্দেশ্যে কেউ আসতে চাইলে অনুমতি দেয়া হবে না।

(এ প্রসঙ্গটি ইনশাআল্লাহ আমি একটি স্বতন্ত্র পোস্টে আলোচনা করবো। আশাকরি তখন এ শর্তের মূল মাকসাদ এবং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধতা পরিষ্কার হবে। আর

তালেবানরা পরিষ্কার বলেছে, সকল শর্ত শরীয়তের প্রতি লক্ষ রেখেই করা হয়েছে।)

আলজাযিরা: আফগানে কিছু কিছু অমানবিক হামলা হয়েছে। যেমন হাসপাতালে হামলা, উলামাদের টার্গেটকিলিং। বলা হয় এগুলো তালেবান করেছে। এগুলোর ব্যাপারে কি বলেন?

মোল্লা খায়রুল্লাহ: এগুলো কাবুল গোয়েন্দা সংস্থার কাজ। জনগণের কাছে তালেবানদের বদনাম করার জন্য তারা এসব অমানবিক কাজ করেছে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেছে। জনগণ জানে যে, তালেবান মুসলমান। জাতির প্রতি দরদি। তারা এগুলো করেনি। কোনো কোনো আলেম তো বড় বড় মজলিসে প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, এগুলো কাবুল প্রশাসনের কাজ।

আলজাযিরা: সর্বশেষ প্রশ্ন, তালেবান শাসন পতন হয়েছে বিশ বছর হলো। এতদিনে তো আফগানের মানুষ অনেক বদলে গেছে। চিন্তাধারা পাল্টে গেছে। এখন নতুন তালেবান শাসনে তাদের উন্নতি এবং স্বাধীনতা কেমন হবে?

মোল্লা খায়রুল্লাহ: হ্যাঁ, মানুষ অনেক বদলে গেছে। ব্যাপকভাবেই বদলে গেছে। এটা আমাদেরও ফিকির আছে। তবে আমরা সবসময় জাতির তারাক্কি-উন্নতির জন্য নিবেদিত। আমরা আমাদের জাতিকে একটি উন্নত জাতি হিসেবে দেখতে

চাই। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ জাতির উন্নতিকল্পে হবে। জাতি চল্লিশ বছর যাবৎ দুঃখ কষ্টে জর্জরিত। আমরা তাদের আরও কষ্ট দিতে চাই না।

আর ইসলামী গণ্ডির ভেতর থেকে যতটুকু স্বাধীনতা দেয়া যায় তার সর্বোচ্চটুকু আমরা দেবো। এ ধরনের স্বাধীনতার আমরা কখনই বিরোধী নই।

১৭.ইরতিদাদের সয়লাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস!

ইমাম হাকেম রহ. (মৃত্যু: ৪০৫ হি.) মুস্তাদরাকে হাকেমের কিতাবুল ফিতানে একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হলো-

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : تلا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا "

[হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতদ্বয়

তিলাওয়াত করলেন-

{إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا}

‘যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দেখবেন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে’। (নাসর: ১-২)

তারপর বললেন,

ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا

‘দলে দলে যেমন তাতে প্রবেশ করেছে, তেমনি দলে দলে তার থেকে বের হয়ে যাবে।’]

ইমাম যাহাবী রহ. (মৃত্যু: ৭৪৮হি.) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

ফাতহে মক্কার পর দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, আজ যেমন দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে, আখেরি যামানায় ঠিক তেমনি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হিড়িক পড়বে। দলে দলে মুসলমান নামধারীরা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে পড়বে।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, আখেরী যামানায় ইরতিদাদ শুধু ব্যক্তি বিশেষের থেকে হবে না, বরং দলে দলে হবে, যেমন ফাতহে মক্কার পর একেকটা গোত্র এসে মুসলমান হয়েছে।

বাস্তব দুনিয়াতে আমরা এমনই দেখছি। খেলাফত যতদিন ছিল, ততদিন এত ব্যাপক হারে দেশ, গোত্র ও জেনারেশনভিত্তিক ইরতিদাদ ছিল না। কিন্তু আজ যেন গোটা জাতিই ইরতিদাদের দিকে চলে গেছে। শাসক শ্রেণী তো অনেক আগেই মুরতাদ হয়ে গেছে। আর নাস্তিকতাপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার কারণে আজ এমন এক প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে, যারা ঈমান-ইসলাম বুঝা তো দূরের কথা, বরং পরিপূর্ণ ইসলাম-বিদ্বেষের উপরই বড় হচ্ছে। মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়েছে শুধু এতটুকুই, নতুবা তারা আসলে ছোট বেলা থেকে কাফের অবস্থাতেই বড় হচ্ছে। এভাবে একটা মুরতাদ জেনারেশন তৈরি হচ্ছে। এগুলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তবায়ন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং আমাদের আহলে আওলাদদের হেফাজত করুন।

কিন্তু দুঃজনক, আজ আমাদের আলেম সমাজের অবস্থা এমন যে, তারা যেন মনে করেন, দুনিয়াতে ইরতিদাদ বলে কিছু নেই। হয়তো দু'চার জন মুরতাদ হতে পারে। দলে দলে হওয়ার তো প্রশ্নই নেই। তারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলোর দিকে তাকান না?

আজ আমরা যখন শাসকদের মুরতাদ বলি, তখন তারা

একেবারে ক্ষেপে যান। “তোমরা কি সবাইকে কাফের বানিয়ে ফেলতে চাচ্ছো?”... ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ সকলেই অবগত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের কিছু দিনের মধ্যেই আরবের লোকেরা দলে দলে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। যদি সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যামানাতেই এই হয় অবস্থা, তাহলে আজ যেখানে একশো বছর যাবৎ খেলাফত নেই, তখন অবস্থা কতটুকু ভয়াবহ হতে পারে!! হে আল্লাহ তুমি আমাদের বুঝার তাওফীক দান কর! আমীন!

১৮.ইসলামে খলিফা নির্বাচনের ত্বরীকা- একটি সংশয় ও নিরসন!

এক ভাই পোস্ট দিয়েছেন, *ইসলামে খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে এক জনের সংশয় দেখা দিয়েছে। তার কাছে মনে হচ্ছে- আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোন শূরা ছাড়াই নির্বাচন করা হয়েছে। আর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই নির্বাচন করে গিয়েছেন, যা স্বৈরতন্ত্রের মতো দেখাচ্ছে।*

এই সংশয় নিরসন কল্পেই আমার এ লেখা।

ইসলামে খলিফা নির্বাচনের ত্বরীকা

ইসলামে খলিফা নির্বাচনের ত্বরীকা কি? এক কথায় এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে- (উম্মাহর রেজা তথা সন্তুষ্টি)। উম্মাহ যাকে খলিফা নির্ধারণ করে নেবে তিনিই খলিফা হবেন, অন্য কেউ নন। তবে উম্মাহর পক্ষ থেকে খলিফা নির্বাচনের এই দায়িত্ব পালন করবেন উম্মাহর ‘আহলে হল্ ওয়াল আকদ’ ব্যক্তিগণ। ‘আহলে হল্ ওয়াল আকদ’ হচ্ছেন- উম্মাহর ঐসকল আলেম উলামা, আমীর-উমারা, গভর্নর, সৈন্যপ্রধান এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ও গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে উম্মাহ মেনে চলে। যাদের সন্তুষ্টি উম্মাহর সন্তুষ্টি বলে গণ্য হয়। যারা কাউকে খলিফা হিসেবে বাইয়াত দিলে উম্মাহর সকলে কিংবা অধিকাংশ ব্যক্তি তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেবে। যারা কাউকে খলিফা হিসেবে বাইয়াত দিলে উক্ত খলিফার এ পরিমাণ সমর্থক হয়ে যাবে এবং এ পরিমাণ শক্তি-সামর্থ্য অর্জন হয়ে যাবে যে, তখন উম্মাহর কোন একটা অংশ খলিফার বিরোধিতায় চলে গেলেও তারা খলিফাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে সমর্থ্য হবে না।

মোটকথা- খলিফা হওয়ার জন্য এ পরিমাণ শক্তি সামর্থ্য লাগবে যে, তিনি তার বিরোধিদের দমন করতে পারবেন, হুদুদ-কেসাস কায়েম করতে পারবেন, চোর-ডাকাত-সন্ত্রাসী ইত্যাদি বিশৃখলা ও নাশকতাকারীদের দমন করতে পারবেন,

লোকদের মাঝে শরীয়তের বিধান কায়েম করতে পারবেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারবেন; যারা সন্তুষ্ট চিত্তে শরীয়ত মানতে প্রস্তুত নয় তাদেরকে শক্তি ও বল প্রয়োগে জোরপূর্বক শরীয়ত মানতে বাধ্য করতে পারবেন। খলিফা হওয়ার জন্য এ পরিমাণ শক্তি-সামর্থ্য, সমর্থক ও সৈন্যবাহিনী আবশ্যক। আর এই পরিমাণ সমর্থক, সামর্থ্য ও সৈন্যবাহিনী উম্মাহর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাইয়াতের দ্বারা অর্জন হবে- তারাই হলেন আহলে হল ও ওয়াল আকদ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে এঁরা উম্মাহর- নেতৃত্বস্থানীয় আলেম উলামা, আমীর-উমারা, গভর্নর, সেনাপ্রধান এবং সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় ও গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে উম্মাহ মেনে চলে এবং তারা যে সিদ্ধান্ত দেন উম্মাহ তা মেনে নেয়।

বি.দ্র.

শুধু মুত্তাকী, পরহেযগার, বিশিষ্ট ও স্বনামধন্য আলেম হলেই বা গণ্য মান্য কেউ হলেই আহলে হল ওয়াল আকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবেন না। আহলে হল ওয়াল আকদ হওয়ার জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অত্যাবশ্যক যে, উম্মাহ তার কথা মেনে চলে। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন সমাজের লোক তা মেনে নেবে। তার বাইয়াতের দ্বারা বাইয়াতকৃত ব্যক্তির শক্তি ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ রকম না হলে আহলে হল ওয়াল আকদ হবেন না।

যদি এমন কতক ব্যক্তি বাইয়াত দেয়, যাদের বাইয়াতের দ্বারা বাইকৃত ব্যক্তির উল্লিখিত পরিমাণ সামর্থ্য ও সমর্থক সৃষ্টি হয়নি, তাহলে উক্ত ব্যক্তি খলিফা হবে না।

দ্বিতীয়ত: আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরে মতবিরোধ দেখা দিলে তখন তাদের অধিকাংশ যাকে বাইয়াত দেবেন তিনিই খলিফা হবেন। বাকি সংখ্যক বিরোধিদের বিরোধিতার কারণে খলিফা হওয়াতে কোন সমস্যা হবে না। কেননা, তাদের অধিকাংশের বাইয়াতের দ্বারা এ পরিমাণ শক্তি সামর্থ্য অর্জন হয়ে যাবে যে, বাকিদের বিরোধিতায় তার ক্ষমতার মধ্যে কোন প্রভাব পড়বে না।

শূরা আবশ্যক

আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিবর্গের অবশ্য কর্তব্য- কাউকে বাইয়াত দেয়ার আগে অন্যান্য আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে নেয়া। পরামর্শের পর তাদের সকলে কিংবা অধিকাংশ যাকে বাইয়াত দেবেন তিনিই খলিফা হবেন। পরামর্শ ব্যতীত শুধু স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি মিলে কাউকে বাইয়াত দেয়া জায়েয নয়। যদি কেউ এ ধরণের বাইয়াত দেয়, তাহলে শরীয়তে এই বাইয়াতের কোন মূল্য নেই। এ বাইয়াতের দ্বারা কেউ খলিফা হবে না, বরং বাইয়াত দেয়ার কারণে তাদেরকে শাস্তির সম্মুখিন করা হবে। বিশেষ পরিস্থিতি

হলে তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করার বিধান আছে।

খলিফার অসিয়ত

বর্তমান খলিফা যদি তার পর কে খলিফা হবে- তার নাম ঘোষণা করে যান, তাহলে তার এ ঘোষণা একটা প্রস্তাবরূপে গৃহীত হবে। পরবর্তীতে উম্মাহ উক্ত ঘোষিত ব্যক্তিকে বাইয়াত দিলে তিনি খলিফা হবেন, অন্যথায় নয়।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আমার তিনটি বিষয় পরিষ্কার করা উদ্দেশ্য-

১. খলিফা নির্বাচন করবেন উম্মাহর আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিবর্গ। সাধারণ ব্যক্তিদের রায় এখানে ধর্তব্য নয়।

২. আহলে হল্ ওয়াল আকদের জন্য আবশ্যক-বাইয়াতের আগে পরামর্শ করে নেয়া। পরামর্শ ব্যতীত কাউকে বাইয়াত দেয়া জায়েয নয় এবং এ বাইয়াতের কোন মূল্য নেই।

৩. খলিফার অসিয়ত একটা প্রস্তাবের মর্যাদার উর্ধ্বে কিছু নয়।

***

সংশয়

উপরোক্ত আলোচনাটি আমি করেছি ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য। ভাইয়ের প্রশ্ন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়কে ঘিরে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয়ের নির্বাচন পদ্ধতিটাই ঝামেলা মনে হচ্ছে । কারণ- আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ব্যাপক পরামর্শের ভিত্তিতে বাইয়াত দেয়া হয়নি। বরং তখন সাক্বিফায়ে বনি সায়িদাতে যে সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম উপস্থিত ছিলেন তারাই তাঁকে বাইয়াত দিয়েছেন প্রথমত। বাকি সাহাবী ও অন্যান্য মুসলমানের সাথে পরামর্শ করে তারপর বাইয়াত দেয়া হয়নি। কাজেই এখানে আপত্তি আসছে- শূরা ছাড়াই তাঁকে খলিফা নির্বাচন করা হল।

আর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বয়ং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ওফাতের পূর্বে নির্বাচন করে গেছেন। এখানে আপত্তি আসছে যে, তা স্বৈরতন্ত্রের মত হয়ে গেল।

উত্তর:

আসলে পূর্ণ ইতিহাস না জানা থাকার কারণে আপত্তি সৃষ্টি হয়েছে। উভয়ের নির্বাচনের বিস্তারিত ইতিহাস জানা থাকলে আর আপত্তি হতো না। আমি সংক্ষেপে বিষয়টা বুঝাতে চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ-

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত

সাহাবায়ে কেরামের কাছে সুস্পষ্ট ও স্বীকৃত ছিল- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বকর

রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হবেন। তা বিভিন্ন কারণে:
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব।
- বিভিন্ন হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হবেন।
- বিভিন্ন হাদিসের ইশারা।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পূর্বে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে নামাযের ইমামতি করানো।
- নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

এসব কারণে সাহাবায়ে কেরামের নিকট স্পষ্ট ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা হবেন। কাজেই তারা তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে মানসকিভাবে আগে থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আনসারী সাহাবীগণ সাক্বিফায়ে বনি সায়িদাতে জড়ো পরামর্শের জন্য যে, এখন আমীর কে হবেন? খবর পেয়ে মুহাজির সাহাবাগণও সেখানে উপস্থিত হন।

আনসারী সাহাবীদের জানা ছিল না যে, উম্মাহর খলিফা

একাধিক হতে পারে না। তাই তারা প্রস্তাব করেন, আমরা আনসারদের থেকে একজন আমীর হোক আর আপনাদের– অর্থাৎ মুহাজিরদের- থেকে একজন আমীর হোক। আনসারগণ তাদের মধ্য থেকে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমীর নির্ধারণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনা করে জানান যে, খলিফা একাধিক হতে পারে না এবং খলিফা কুরাইশি হওয়া শর্ত। আনসাররা যেহেতু কুরাইশি নন তাই তারা খলিফা হতে পারবেন না। তাই মুহাজিরদের থেকেই খলিফা বানাতে হবে।

এমতাবস্থায় আশঙ্কা ছিল, যদি আনসারদের কিছু অবুঝ লোক হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাইয়াত দিয়ে দেন, তাহলে পরবর্তীতে তাকে অপসারণ করে মুহাজিরদের কাউকে খলিফা নির্ধারণ করতে গেলে একটা ফিতনা দেখে দেবে। উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হবে। এই আশঙ্কায় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগে বাগেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, আপনার হস্ত প্রসারিত করুন, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত হব। এই বলে তিনি এক রকম জোর করেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত দিয়ে দেন। দেখাদেখি উপস্থিত বাকি সাহাবায়ে কেরামও তাকে বাইয়াত দিয়ে দেন। কারণ, আগেই বলে এসেছি- আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা বানাতে সাহাবায়ে কেরাম আগে

থেকেই প্রস্তুত ছিলেন।

এই বাইয়াতের পরের দিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে আরোহণ করেন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নেতৃত্বস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় আগমন করেন। তারা তার হাতে বাইয়াত দেন। এভাবে তিনি খলিফা নির্বাচিত হন।

সংশয়

বাহ্যিকভাবে এখানে সংশয় সৃষ্টি হয়- উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ আরো যে ক'জন সাহাবী সর্বপ্রথম বাইয়াত দেন, তারা তো কোন পরামর্শ ছাড়াই বাইয়াত দিয়েছেন। অথচ আমি পূর্বে বলে এসেছি, পরামর্শ ছাড়া কাউকে বাইয়াত দিয়ে দেয়া জায়েয নয় এবং এ ধরণের বাইয়াতের দ্বারা কেউ খলিফাও হবে না। তাহলে এখানে-

- উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিভাবে বাইয়াত দিলেন?

- এ বাইয়াতের দ্বারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা কিভাবে হলেন?

নিরসন

প্রথম কথা হল- উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আরো যারা প্রথমে বাইয়াত দিয়েছেন, তাদের এই বাইয়াতের দ্বারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হননি, বরং খলিফা হয়েছেন যখন

সাকিফায়ে বনি সায়িদার বাকি সাহাবায়ে কেরাম এবং পরের দিন মিম্বরে নেতৃত্বস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম বাইয়াত দিয়েছেন- তখন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

أنه متى صار إماما، فذلك بمبايعة أهل القدرة له ... ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة، الذين هم أهل القدرة والشوكة. اهـ

"তিনি কখন ইমাম হয়েছেন? তা হয়েছে যখন ক্ষমতাশীলগণ তাকে বাইয়াত দিয়েছেন। ... যদি এমন হতো যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথে আরোও কতকে তাকে বাইয়াত দিয়েছেন, কিন্তু বাকি সাহাবায়ে কেরাম বাইয়াত থেকে বিরত থেকেছেন, তাহলে তিনি ইমাম হতেন না। জুমহুরে সাহাবা, যারা ক্ষমতা ও দাপটের অধিকারী, তাদের বাইয়াতের পরই কেবল তিনি ইমাম হয়েছেন।" (মিনহাজুস সুন্নাহ্: ১/৫৩০)

দ্বিতীয়ত: উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে পরামর্শ ছাড়াই বাইয়াত দিয়ে দিলেন তা কিভাবে জায়েয হল?

এর উত্তর: প্রথমত সাহাবায়ে কেরাম আগে থেকেই জানতেন এবং তারা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

খলিফা হবেন। এ কারণেই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বাইয়াত দেয়ার পর কেউ তাতে আপত্তি জানাননি, বরং স্বতস্ফূর্তভাবে সকলে বাইয়াত দিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: আনসারিদের কোন কোন অবুঝ লোক সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাইয়াত দিয়ে দিলে একটা ফিতনা সংঘটিত হওয়ার এবং মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এ ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য তিনি আগে বাগে বাইয়াত দিয়ে দিয়েছেন। তার এ বাইয়াতের দ্বারা কোন ফিতনা তো হয়-ই-নি বরং ফিতনা আগমনের পূর্বেই তা দূর হয়েছে। তাই তা জায়েয হয়েছে। এমন বিশেষ পরিস্থিতিতে এ বাইয়াতই দরকার ছিল।

এ থেকে এই ফলাফল বের করা যাবে না যে, পরামর্শ ছাড়াই যে কেউ যে কাউকে বাইয়াত দিয়ে দিতে পারবে এবং এই বাইয়াতের দ্বারা উক্ত ব্যক্তি খলিফা হয়ে যাবে- যেমনটা আবু বকর বাগদাদির বেলায় ঘটেছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং নিজেই এ ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি শুনিয়ে গেছেন। এক ব্যক্তি বললো, উমরের ওফাতের পর আমি অমুকের হাতে বাইয়াত হয়ে যাবো। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এ কথা

পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন। মদীনায় এসে সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে মিম্বরে আরোহণ করে বললেন-

((بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلايبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا))

"আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, তোমাদের এক ব্যক্তি বলছে- 'আল্লাহর শপথ, উমর মারা গেলে আমি অমুকের হাতে বাইয়াত হয়ে যাব।' সাবধান! কোন ব্যক্তি যেন ধোঁকায় পড়ে বলে না যে, 'আবু বকরের বাইয়াত তো পরামর্শ ছাড়াই হয়েছিল, এরপর তা পূর্ণতায় পৌঁছেছে।' শুনে রাখ! আবু বকরের বাইয়াত এমনভাবেই হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার ফলে কোন অনিষ্ট সংঘটিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, মানুষ আবু বকরের আনুগত্যের দিকে যেভাবে ধাবিত হয়েছে, তার দিকেও তেমনই ধাবিত হবে। যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত কারো হাতে বাইয়াত হবে, তাহলে তাকেও বাইয়াত দেয়া যাবে না, সে যার হাতে বাইয়াত দিয়েছে তাকেও না। কেননা, আশঙ্কা আছে, তাদের উভয়কে হত্যা করে দেয়া হবে।" (সহীহ বুখারি: ৬৮৩০)

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ওফাতের পূর্বে বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন, তার ওফাতের পর কে খলিফা হতে পারে? তারা রায় দেন- উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলিফা হবেন। তিনিই আপনার পর সবচেয়ে যোগ্য মানুষ। এভাবে ব্যাপকভাবে পরামর্শ করার পর তিনি অসিয়ত করে যান, তার ওফাতের পর যেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা বানানো হয়।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত হয়ে যান। এভাবে তিনি খলিফা হন।

এখানে প্রশ্ন হল- তিনি কখন খলিফা হয়েছে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসিয়তের দ্বারা? না'কি পরে যখন সাহাবায়ে কেরাম তার হাতে খেলাফতের বাইয়াত দিয়েছেন তখন?

উত্তর: বাইয়াত দেয়ার পর। শুধু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তাবের দ্বারা তিনি খলিফা হননি। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলন,

وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما. اهـ

“তেমনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করে গেলেন, তখন তিনি খলিফা হয়েছেন যখন সাহাবায়ে কেরাম তার হাতে বাইয়াত হয়েছেন এবং তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। যদি তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসিয়ত বাস্তবায়ন না করতেন, তাহলে তিনি- উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু- ইমাম হতেন না।” (মিনহাজুস সুন্নাহ্: ১/৫৩০)

এখানে স্বৈরতন্ত্রের কোন নাম গন্ধও নেই, বরং সাহাবায়ে কেরাম স্বেচ্ছায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা নির্বাচন করেছেন।

আশাকরি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। সময় সুযোগ থাকলে কুরআন, হাদিস ও ইতিহাস থেকে বিস্তারিত আলোচনা করতাম। যতটুকু বলেছি- আশাকরি মূল কথাটুকু এসে গেছে। যদি কেউ বিস্তারিত আলোচনা করে দেন, তাহলে বড়ই ভাল হয়।

এ ব্যাপারে আমি ভাইদের দু’টি কিতাব পড়ার নসীহত করবো-

(الوجيزفي فقه الخلافة (د\صلاح الصاوي -

(مسائل في فقه الخلافة (الشيخ أبو الحسن رشيد البليدي -

والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم

১৯.এদেশে দারুল হরবের সব বিধান ফিট হবে না

এক ভাই জানতে চেয়েছেন,

‘বাংলাদেশ দারুল হরব কি’না ? যদি দারুল হরব হয়ে থাকে তাহলে দারুল হরবের সমস্ত মাসয়ালা এখানে পালন করা যাবে কি না ? কুরআন হাদিসের দলিল সহ জানালে ভাল হয়।’

উত্তর:

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

♣ বাংলাদেশ দারুল হরব। কারণ, এখানকার শাসনক্ষমতা মুরতাদ কাফেরদের হাতে।

♣ তবে দারুল হরবের সকল বিধান এখানে পালন করা যাবে না। যেমন, দারুল হরবের একটা বিধান হল, যাকে সামনে পাওয়া যাবে- নারী, শিশু ও এছাড়াও শরীয়ত যাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছে তারা বাদে- সকলকেই হত্যা করা যাবে। তবে সুস্পষ্ট আলামত দ্বারা যদি মুসলমান বুঝা যায় তাহলে হত্যা করা যাবে না। অন্যথায় ঢালাওভাবে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা যাবে।

কিন্তু আমাদের এসব দারুল হরবে এ বিধান পালন করা যাবে না। এখানে ঢালাওভাবে যাকে পাওয়া যায় হত্যা করা যাবে না। যারা হত্যার উপযুক্ত তাদেরকেই হত্যা করা যাবে। বাকিদেরকে নয়।

এর কারণ, আসলী দারুল হরবগুলোতে সাধারণত কাফেররাই বসবাস করে। মুসলমান নিতান্তই কম। বিশেষত খেলাফতের যামানায়। এ কারণে ঢালাওভাবে সকলকে হত্যা বৈধ।

পক্ষান্তরে আমাদের দেশগুলোর মতো দারুল হরবে সাধারণত মুসলমানরা বসবাস করে। এ কারণে হত্যার আগে বুঝে নিতে হবে, আমি অন্যায়ভাবে কোন মুসলমান হত্যা করছি না তো? এ ব্যবধানের মূল কারণ দারের ভিন্নতা না, মূল কারণ সাধারণ অধিবাসীরা মুসলমান না কাফের- সেটা। অতএব, দারুল হরব হলেও যেহেতু এখানকার অধিবাসীরা সাধারণত মুসলমান, তাই হত্যার আগে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

যেমন, দারুল হরবে কোন একটা মহল্লা যদি মুসলমানদের বসবাসের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বরাদ্দ করা হয় এবং সেখানে কয়েক লাখ মুসলমান বসবাস করে- তাহলে কি আপনি তাদের উপর হামলা করতে পারবেন? না! কিছুতেই না। দারুল হরব হওয়ার কারণেই শুধু হামলা করা যাবে না। মূল কথা সেটাই যে, যেখানকার সাধারণ অধিবাসী কাফের, সেখানে ঢালাওভাবে হত্যা জায়েয। আর যেখানকার সাধারণ অধিবাসী মুসলমান সেখানে হত্যা নাজায়েয। হত্যা করতে হলে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে, সে হত্যার যোগ্য। দারের ভিন্নতার কারণে এখানে কোন ব্যবধান হবে না।

এজন্য বলা যায়, আমাদের এসব রাষ্ট্র দারুল হরব হলেও আসলী দারুল হরবের সকল বিধান এখানে প্রযোজ্য হবে না। বরং এখানে একটা মাঝামাঝি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ণরূপে দারুল ইসলামের বিধানও প্রয়োগ করা যাচ্ছে না, পূর্ণরূপে

দারুল হরবের বিধানও প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর একটি ফতোয়া আছে। ‘মারিদিন’ এলাকা- যেটি তাতাররা দখল করে নিয়েছিল কিন্তু সাধারণ জনগণ মুসলমান ছিল, সেটি- সম্পর্কে তিনি এ ফতোয়া দিয়েছিলেন। মাজমুউল ফাতাওয়া থেকে সুওয়াল জওয়াবসহ ফতোয়াটি তুলে দিচ্ছি-

:- وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ
عَنْ بَلَدِ "مَارِدِينَ" هَلْ هِيَ بَلَدُ حَرْبٍ أَمْ بَلَدُ سِلْمٍ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُقِيمِ بِهَا الْهِجْرَةُ إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ وَلَمْ يُهَاجِرْ وَسَاعَدَ أَعْدَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ هَلْ يَأْثَمُ فِي ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَأْثَمُ مَنْ رَمَاهُ بِالنِّفَاقِ وَسَبَّهُ بِهِ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالُهُمْ مُحَرَّمَةٌ حَيْثُ كَانُوا فِي "مَارِدِينَ" أَوْ غَيْرِهَا. وَإِعَانَةُ الْخَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمَةٌ سَوَاءٌ كَانُوا أَهْلَ مَارِدِينَ أَوْ غَيْرَهُمْ. وَالْمُقِيمُ بِهَا إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ إقَامَةِ دِينِهِ وَجَبَتْ الْهِجْرَةُ عَلَيْهِ. وَإِلَّا اُسْتُحِبَّتْ وَلَمْ تَجِبْ. وَمُسَاعَدَتُهُمْ لِعَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الِامْتِنَاعُ مِنْ ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ أَمْكَنَهُمْ مِنْ تَغَيُّبٍ أَوْ تَعْرِيضٍ أَوْ مُصَانَعَةٍ؛ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِالْهِجْرَةِ تَعَيَّنَتْ. وَلَا يَحِلُّ سَبُّهُمْ عُمُومًا وَرَمْيُهُمْ بِالنِّفَاقِ؛ بَلْ السَّبُّ وَالرَّمْيُ بِالنِّفَاقِ يَقَعُ عَلَى الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .فَيَدْخُلُ فِيهَا بَعْضُ أَهْلِ مَارِدِينَ وَغَيْرُهُمْ
وَأَمَّا كَوْنُهَا دَارَ حَرْبٍ أَوْ سِلْمٍ فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ: فِيهَا الْمَعْنَيَانِ؛ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ دَارِ السِّلْمِ الَّتِي تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ؛ لِكَوْنِ جُنْدِهَا مُسْلِمِينَ؛ وَلَا بِمَنْزِلَةِ دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي أَهْلُهَا كُفَّارٌ؛ بَلْ هِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ يُعَامَلُ الْمُسْلِمُ فِيهَا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ وَيُقَاتَلُ مجموع الفتاوى، ج:28، ص:241-240 .الْخَارِجُ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ

“শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহর কাছে মারিদিন শহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সেটা কি দারুল হরব না দারুল ইসলাম? সেখানকার মুসলমানদের কি অন্যান্য দারুল ইসলামে হিজরত করতে হবে না'কি হবে না? হিজরত আবশ্যক হলে যদি হিজরত না করে বরং মুসলিমদের দুশমনদেরকে নিজের জান-মাল দিয়ে সাহায্য করে তাহলে কি গুনাহগার হবে? এমন ব্যক্তিকে যে মুনাফিক বলবে এবং এ বলে তাকে গালি দেবে সে কি গুনাহগার হবে?

তিনি উত্তর দেন: আলহামদু লিল্লাহ। মারিদিন বা অন্য যেখানেই থাকুক মুসলমানের জান-মালের ক্ষতিসাধন হারাম। মারিদিন হোক বা অন্য কোন ভূখণ্ড হোক- ইসলামী শরীয়ত থেকে বহিষ্কৃত (কাফের)দের সাহায্য করা সর্বাবস্থায় হারাম। সেখানে বসবাসরত মুসলিম যদি নিজের দ্বীন কায়েমে অপারগ হয়, তাহলে হিজরত ফরয। অন্যথায় মুস্তাহাব, ফরয নয়। জান-মাল দিয়ে মুসলমানদের দুশমনদের সাহায্য করা তাদের জন্য হারাম। যেকোনভাবে সম্ভব তাদেরকে এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আত্মগোপন করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলে বা তোষামোদ করে- যেভাবেই হোক। হিজরত করা ব্যতীত সম্ভব না হলে হিজরত করাই আবশ্যক। ব্যাপকভাবে তাদের সকলকে গালি দেয়া বা মুনাফিক বলা বৈধ হবে না। কুরআন সুন্নাহয় (মুনাফিকদের) যেসব সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে,

সেগুলোর ভিত্তিতে গালি দেয়া হবে বা মুনাফিক বলা হবে। মারিদিন ও অন্যান্য ভূখণ্ডের কতক অধিবাসী এসব সিফাতের মধ্যে পড়বে।

আর তা দারুল হরব কি দারুল ইসলাম- তো এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে: তা দারে মুরাক্কাবা। এতে উভয় দিকই বিদ্যমান। দারুল ইসলামের মতো নয়, যেখানকার সৈনিকরা মুসলিম হওয়ায় সেখানে ইসলামী বিধি বিধান চলে। আবার এমন দারুল হরবের মতোও নয়, যেখানকার অধিবাসীরা কাফের। বরং তা তৃতীয় এক প্রকার। সেখানকার মুসলমানদের সাথে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী মুআমালা হবে, আর শরীয়ত থেকে বহিষ্কৃত (কাফের)দের সাথে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী যুদ্ধ করা হবে।”- মাজমুউল ফাতাওয়া: খণ্ড-২৮, পৃষ্ঠা-২৪০-২৪১

শায়খুল ইসলামের উদ্দেশ্য, মারিদিন যদিও দারুল হরব, তবে বিধানের দিক থেকে এটি মাঝামাঝি একটা প্রকার। এমনটি উদ্দেশ্য নয় যে, তা দারুল ইসলামও নয়, দারুল হরবও নয়। কেননা, এটি আহলুস সুন্নাহর আকীদা পরিপন্থী। দার হয়তো দারুল ইসলাম, নতুবা দারুল হরব। মাঝামাঝি কোন সূরত নেই। ওয়াল্লাহু তাআলা আ’লাম।

২০.কাফের মুরতাদদের উপর হামলায় মুসলিম মারা গেলে কি বিধান

***

অনেক দিন ধরেই মাসআলাটা আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আর হয়ে উঠছে না। মাঝখানে একবার এক ভাই এ বিষয়টাতে একটু আপত্তিও করেছিলেন। তখন ইজমালি জওয়াব দেয়া হয়েছিল। বিস্তারিত আলোচনার ফুরসত হয়নি। এখন ফ্রান্স ঘটনার প্রেক্ষিতে মাসআলাটা আলোচনায় আনা উপকারী মনে হচ্ছে। মাসআলাটি হলো,

কাফের মুরতাদদের উপর হামলায় কোনো মুসলিম মারা গেলে কি বিধান?

***

বর্তমান তাগুতি রাষ্ট্রগুলোতে কাফের মুসলিম একাকার হয়ে বসবাস করে। কাফের মুরতাদদের উপর হামলা করতে গেলে দুয়েকজন মুসলিম অনিচ্ছাকৃত মারা যাওয়া স্বাভাবিক।

কাফের রাষ্ট্রগুলোতেও মুসলিম সংখ্যা যথেষ্ট। সেগুলোতে হামলা করতে গেলেও কোনো কোনো সময় মুসলিম মারা যাওয়া বা আঘাত পাওয়া অস্বাভাবিক না।

এখন দু'টি প্রশ্ন:

১. মুসলিম আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কি হামলা বন্ধ রাখা আবশ্যক?

২. কোনো মুসলিম মারা গেলে কি কিসাস, দিয়াত বা জরিমানা আসবে?

***

মুসলিমের রক্ত সমগ্র দুনিয়ার চেয়েও দামি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ -سنن الترمذي، رقم: 1395؛ ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، [حكم الألباني] : صحيح.

"আল্লাহ তাআলার কাছে (অন্যায়ভাবে) কোনো মুসলিমকে হত্যার চেয়ে সমগ্র দুনিয়া নিঃশেষ হয়ে যাওয়াও তুচ্ছ ব্যাপারে।" -সুনানে তিরমিযি: ১৩৯৫

এজন্যই অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমকে হত্যা করলে কুরআনে কারীমে ভয়ানক শাস্তির কথা এসেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,
{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]
"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম। তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন এবং তার জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন মহা শাস্তি।" -সূরা নিসা: ৯৩

অধিকন্তু মুজাহিদ ভাইয়েরা যে নিজেদের জান মাল জিহাদের পথে ব্যয় করছেন তা তো কেবল মুসলিমদেরই স্বার্থে। কাজেই মুসলিমদের রক্তের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। যেনো কোনো অবস্থায়ই কোনো মুসলিম মারা না যায় বা আক্রান্ত না হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা হয়তো মুজাহিদদের আচরণ বিধি ও জিহাদের সাধারণ দিক নির্দেশনা দেখে থাকবেন। সেখানে আলকায়েদার নীতি এই সতর্কতার ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য জনসমাগমস্থলতে (যেমন বাজার, মসজিদ, মাহফিল, অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে) হামলা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য দেখা যায়, এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে মুজাহিদদের প্রোগ্রামে দীর্ঘ দিন লেগে যায় বা কোনো কোনো সময় প্রোগ্রাম বাদও দিতে হয়।

***

কিন্তু সতর্কতা যতই গ্রহণ করা হোক আশঙ্কা কিন্তু থেকেই যায়। কারণ, মুসলিম কাফের একাকার হয়ে আছে। মুসলিমরাও কাফেরদের থেকে দূরে থাকে না, কাফের-মুরতাদরাও মুসলিমদের সাথে মিশে থাকে। ফলে সতর্ক ব্যবস্থা যতই নেয়া হোক আশঙ্কা থেকেই যায়। অনেক সময় এমনও হতে পারে যে, দুয়েকজন মুসলিম নিহত হওয়া ছাড়া অপারেশন সম্ভবই নয়। তখন কি করণীয়?

কাফের মুরতাদদের থেকে দূরে থাকা কাম্য

প্রথমত মুসলিম উম্মাহর উচিৎ ওয়ালা বারার ফরিজা যিন্দা করা। কাফের-মুরতাদদের থেকে বারাআত ঘোষণা করা।

তাদের থেকে দূরে থাকা। হাদিসেও এ ব্যাপারে নির্দেশ এসেছে। কারণ, আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ হলো, আযাব যখন আসে শুধু জালেমদের উপর আসে না, সাথে যারা থাকে তাদের উপরও আসে। হ্যাঁ, জালেমের সহযোগী না হলে আখেরাতে তারা মাফ পেয়ে যাবেন, কিন্তু দুনিয়ার আযাবের বেলায় সুন্নাহ এটাই যে, ব্যাপকভাবে আসে, জালেম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ -الأنفال25

“তোমরা ঐ আযাবকে ভয় কর যা শুধু তোমাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে বিশেষত তাদের উপরই পতিত হবে না। আর জেনে রাখ, আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন।” -আনফাল ২৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم

“আল্লাহ তাআলা যখন কোনো কওমের উপর আযাব নাযিল করেন তাদের মাঝে থাকা (নেককার বদকার) সকলের উপরই আযাব আপতিত হয়। এরপর (কিয়ামতের দিন)

প্রত্যেকে তার আপন আমল অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে।” -সহীহ বুখারি ৬৬৯১

সহীহ ইবনে হিব্বানে এসেছে,

عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن الله إذا أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم؟ فقال: "يا عائشة إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم" -صحيح ابن حبان: 7314

“হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা যখন কোনো ভূমির অধিবাসীদের উপর আযাব নাযিল করেন আর তাদের মাঝে কিছু নেককার লোকও থাকে তাহলে তারাও কি তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলা যখন তার নাফরমানদের উপর আযাব নাযিল করেন তখন তাদের মাঝে কিছু নেককার লোক থাকলে তাদের সাথে তারাও আযাবের শিকার হয়। এরপর (কিয়ামতের দিন) তারা তাদের আপন নিয়ত ও আমল অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে।” -সহীহ ইবনে হিব্বান ৭৩১৪

এর বাস্তব দৃষ্টান্ত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত সহীহ বুখারির এক হাদিসে এসেছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم) . قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ . قال (يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم)

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একটি বাহিনি আগ্রাসনের জন্য কা'বার উদ্দেশ্যে আসবে। যখন বাইদা নামক স্থানে এসে পৌঁছবে তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলকে কিভাবে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে অথচ তাদের মাঝে এমন লোকজনও থাকবে যারা ব্যবসার জন্য এসেছে এবং এমন লোকজন যারা তাদের দলভুক্ত নয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, এরপর (কিয়ামতের দিন) তারা আপন নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে।" -সহীহ বুখারি ২০১২

বলা হয়, ইমাম মাহদি মক্কায় আত্মপ্রকাশের পর শাম থেকে তার বিরুদ্ধে একটা বাহিনি পাঠানো হবে। আল্লাহ তাআলা মক্কা মদীনার মাঝখানে তাদের সকলকে যমিনে ধ্বসিয়ে দেবেন। এ হাদিসে তাদের কথাই বলা হয়েছে।

অতএব, মুমিনদের খুবই সতর্ক থাকা উচিৎ। কাফের-মুরতাদদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা উচিৎ। নয়তো তাদের উপর যে আযাব পতিত হবে তা তাদেরকেও পেয়ে বসবে। তখন আপসোস করে কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের হিফাজত করুন। আমীন।

এবার আমাদের মূল প্রশ্নে আসি।

প্রশ্ন ১. মুসলিম আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কি হামলা বন্ধ রাখা আবশ্যক?

প্রথমত কথা হলো, যেখানে মুসলিম আক্রান্ত হওয়া ছাড়াই হামলার সুযোগ রয়েছে সেখানে ইচ্ছাকৃত বা অসতর্কতার

দরুন কোনো মুসলিমকে হত্যা বা আক্রান্ত করা হারাম। আমাদের আলোচনা সে সূরত নিয়ে, যেখানে কোনো মুসলিম আক্রান্ত হওয়া ছাড়া অপারেশন সম্ভব নয়, কিংবা অন্তত আক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। অবস্থাটা এমন যে, হয় দুয়েকজন মুসলিম আক্রান্ত হবে বা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, অন্যথায় অপারেশন বন্ধ করে দিতে হবে। এমতাবস্থায় কি অপারেশন চালানো যাবে? না'কি বন্ধ করে দিতে হবে?

ইনশাআল্লাহ এ বিষয়টি তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করবো।

এক. জিহাদ কাফের মুরতাদদের জন্য আল্লাহর আযাব

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14)} [التوبة: 14]

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর; আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের আযাব দেবেন, তাদেরকে অপদস্থ করবে, তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন

কওমের অন্তর জুড়িয়ে দেবেন। -তাওবা: ১৪

আরও ইরশাদ করেন,

{ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ} [التوبة: 52]

আপনি বলে দিন, তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের প্রতিক্ষায় আছো তা তো এ ছাড়া কিছু নয় যে, দু'টি মঙ্গলের একটি না একটি আমরা লাভ করবো (অর্থাৎ জয়লাভ করবো বা শহীদ হয়ে যাবো)। আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে এই প্রতিক্ষায় আছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন সরাসরি নিজের পক্ষ থেকে কিংবা আমাদের হাত দ্বারা। অতএব, তোমরাও প্রতিক্ষায় থাকো, আমরাও তোমাদের সাথে প্রতিক্ষায় আছি। -তাওবা: ৫২

আরও বলেন,

{ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال: 17]

তোমরা তাদের হত্যা করনি, আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন তখন

আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। - আনফাল: ১৭

বুঝা গেল, জিহাদ আল্লাহর আযাব। আগেকার কাফের কওমদেরকে আল্লাহ তাআলা বাতাস, পানি, আগুন ইত্যাদি দিয়ে নিজ হাতে আযাব দিতেন; আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হয়ে আসার পর এ আযাবের সূরত ভিন্ন। এখন মুমিনরা আল্লাহর তীর। আল্লাহর অস্ত্র। জিহাদের মাধ্যমে এ অস্ত্র দিয়ে তিনি কাফেরদের আযাব দেন। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর ব্যাপক আযাব খুব কমই নাযিল হয়েছে, যেমনটা আগে হতো।
ইদ্রিস কান্ধলবি রহ. সিরাতে মুস্তফার মাগাজি অধ্যায়ের শুরুতে এ ব্যাপারে খুবই মূল্যবান আলোচনা করেছেন। যাদের সুযোগ হয় দেখে নেয়ার আবেদন।

আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে আল্লাহর সুন্নাহ আমরা দেখেছি যে, তিনি ব্যবধান করে আযাব নাযিল করেন না, ঢালাওভাবে নাযিল করেন। অথচ আল্লাহ তাআলার পক্ষে বেছে বেছে শুধু জলেমদের আযাব দেয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তিনি তা

করেননি। ঢালাওভাবে দিয়ে থাকেন।

যদি তাই হয়, তাহলে আমরা তো অক্ষম। ব্যবধান করে হামলা করার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের রক্ত আমাদের জন্য হারাম করেছেন। সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন। আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবো। আমাদের অনিচ্ছায় যদি কেউ আক্রান্ত হয় তাহলে এর দায়ভার আমাদের না। আর অনিচ্ছায় আমাদের হাতে যেসব মুসলিম নিহত হবেন তারা ইনশাআল্লাহ শহীদ হবেন। যেহেতু তারা দ্বীনি অপারেশনে দ্বীনের খাতিরে নিহত হয়েছেন।

তাতার বাহিনিতে যেসব মুসলিমকে জবরদস্তি আনা হয়েছিল তাদের হত্যা প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

وَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ إذَا قُتِلُوا كَانُوا شُهَدَاءَ وَلَا يُتْرَكُ الْجِهَادُ
الْوَاجِبُ لِأَجْلِ مَنْ يُقْتَلُ شَهِيدًا. فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إذَا قَاتَلُوا الْكُفَّارَ
فَمَنْ قُتِلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ شَهِيدًا وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ لَا
وَقَدْ ثَبَتَ فِي .يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ الْإِسْلَامِ كَانَ شَهِيدًا
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {يَغْزُو هَذَا
الْبَيْتَ جَيْشٌ مِنْ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ إذْ خُسِفَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِيهِمْ الْمُكْرَهُ. فَقَالَ: يُبْعَثُونَ عَلَى :بِهِمْ. فَقِيلَ

نِيَّاتِهِمْ} فَإِذَا كَانَ الْعَذَابُ الَّذِي يُنْزِلُهُ اللَّهُ بِالْجَيْشِ الَّذِي يَغْزُو الْمُسْلِمِينَ يُنْزِلُهُ بِالْمُكْرَهِ وَغَيْرِ الْمُكْرَهِ فَكَيْفَ بِالْعَذَابِ الَّذِي يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ بِهِ أَوْ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلَّا إحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا} . وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْمُكْرَهَ وَلَا نَقْدِرُ عَلَى التَّمْيِيزِ. فَإِذَا قَتَلْنَاهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ كُنَّا فِي ذَلِكَ مَأْجُورِينَ وَمَعْذُورِينَ وَكَانُوا هُمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ فَمَنْ كَانَ مُكْرَهًا لَا يَسْتَطِيعُ الِامْتِنَاعَ فَإِنَّهُ يُحْشَرُ عَلَى نِيَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. -مجموع الفتاوى (28/ 547)

এ মুসলিমরা নিহত হলে শহীদ হবেন। আর শহীদ হয়ে যাবেন আশঙ্কায় ফরয জিহাদ তরক করা যাবে না। মুসলিমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে মুসলিম বাহিনির যারা মারা যাবে শহীদ হবে। তদ্রূপ বাহিরের কোনো মুসলিম যদি দ্বীনের খাতিরে নিহত হন, অথচ বাস্তবে তিনি হত্যার উপযোগী ছিলেন না, তাহলে তিনিও শহীদ হবেন। সহীহাইনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন,

‘একটি বাহিনি আগ্রাসনের জন্য এই কা’বার উদ্দেশ্যে আসবে। যখন বাইদা নামক স্থানে এসে পৌঁছবে তাদের সকলকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের মাঝে তো এমন ব্যক্তিও থাকতে পারে যাকে জোরপূর্বক বাহিনিতে নিয়ে আসা হয়েছে? তিনি উত্তর দেন, (কিয়ামতের দিন) তারা আপন আপন নিয়ত

অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে'।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে আসা বাহিনিটির উপর আল্লাহ তাআলা (স্বয়ং নিজে) যে আযাব নাযিল করবেন, তা যখন তিনি যে স্বেচ্ছায় এসেছে আর যাকে জবরদস্তি আনা হয়েছে সকলের উপরই নাযিল করবেন, তাহলে সে আযাবের ব্যাপারে আর কি কথা থাকতে পারে যে আযাব তিনি নিজ হাতে তাদের দেবেন বা (জিহাদের মাধ্যমে) মুমিনদের হাতে দেবেন?! যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

'আপনি বলে দিন, তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের প্রতিক্ষায় আছো তা তো এ ছাড়া কিছু নয় যে, দু'টি মঙ্গলের একটি না একটি আমরা লাভ করবো (অর্থাৎ জয়লাভ করবো বা শহীদ হয়ে যাবো)। আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে এই প্রতিক্ষায় আছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন সরাসরি নিজের পক্ষ থেকে কিংবা আমাদের হাত দ্বারা। অতএব, তোমরাও প্রতিক্ষায় থাকো, আমরাও তোমাদের সাথে প্রতিক্ষায় আছি'।

কাকে জবরদস্তি আনা হয়েছে তা আমাদের জানা নেই, তাকে আলাদা করার সামর্থ্যও আমরা রাখি না। আমরা যখন আল্লাহর আদেশে তাদের হত্যা করবো আমরা সওয়াব পাবো এবং মা'জুর গণ্য হবো। আর তারা তাদের নিয়ত অনুযায়ী

প্রতিদান পাবে। যাকে বাস্তবেই জবরদস্তি আনা হয়েছে যে, না এসে পারার কোনো সামর্থ্য তার ছিল না- কিয়ামতের দিন সে তার নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে। -মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫২৭

মোটকথা, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো যেন কোনো মুসলিম মারা না যায়। কিন্তু যদি অবস্থা এমন হয় যে, দুয়েকজন নিহত হওয়া ছাড়া অভিযান সম্ভব নয়, তাহলে এ কারণে অভিযান বন্ধ রাখা হবে না। অভিযানে তো মুজাহিদরাও মারা যেতে পারেন। এ ভয়ে তো জিহাদ বন্ধ রাখা হচ্ছে না। তাহলে বাহিরের মানুষ মারা যাবে আশঙ্কায় কিভাবে বলা যায় যে, জিহাদ বন্ধ রাখতে হবে?! বাহিরের কারো রক্তের মূল্য অবশ্যই মুজাহিদদের রক্তের চেয়ে বেশি না, যারা সব কিছু ত্যাগ করে দ্বীনের খাতিরে মৃত্যুর পথে পা দিয়েছেন।

দুই. হত্যা যখমই জিহাদের তবিয়ত, তথাপি আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন

জিহাদ মানেই রক্ত। জিহাদ মানেই হত্যা। আল্লাহ তাআলা জানেন যে, কাফেরদের আশপাশে কিছু না কিছু মুসলমান

থাকেই। কেউ ব্যবসার জন্য যায়, কেউ অন্য প্রয়োজনে যায়, আর কেউ বন্দী থাকে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা জিহাদের আদেশ দিয়েছেন। যদি এমন হতো যে, বিলকুল কোনো মুসলিম মারা যেতে পারবে না, তাহলে আল্লাহ তাআলা জিহাদের আদেশ দিতেন না। যেহেতু দিয়েছেন বুঝা গেল, আমাদের সামর্থ্যের বাহিরের দায়িত্ব আমাদের না। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। এরপরও কেউ মারা গেলে আমাদের দায়ভার নেই।

আল্লামা কাসানি রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

ولا بأس برميهم بالنبال، وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى والتجار لما فيه من الضرورة، إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير، أو تاجر فاعتباره يؤدي إلى انسداد باب الجهاد، ولكن يقصدون بذلك الكفرة دون المسلمين؛ لأنه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حق.
وكذا إذا تترسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمي إليهم؛ لضرورة إقامة الفرض، لكنهم يقصدون الكفار دون الأطفال، فإن رموهم فأصاب مسلما فلا دية ولا كفارة. - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 100)

যদিও জানা থাকে যে, কাফেরদের মাঝে কিছু বন্দী বা ব্যবসায়ী মুসলিম রয়েছে তথাপি তীর নিক্ষেপে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, এখানে জরুরত রয়েছে। কারণ, বন্দী বা ব্যবসায়ী কিছু মুসলিম বলতে গেলে সব সময়ই কাফেরদের দূর্গগুলোতে থাকে। যদি এটার বিবেচনা করতে

যাই, তাহলে জিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে তারা তীর নিক্ষেপের দ্বারা কাফেরদের হত্যা করা উদ্দেশ্যে নেবেন, মুসলিমদের নয়। কারণ, না-হক মুসলিম হত্যার ইচ্ছা করার তো কোনো জরুরত নেই।

তদ্রূপ যদি মুসলিম শিশুদেরকে কাফেররা মানবঢাল বানিয়ে সামনে ধরে রাখে (যে, কাফেরদের উপর আক্রমণ করতে গেলে আগে মুসলিম শিশুরা মারা পড়বে) তাহলেও তীর নিক্ষেপে সমস্যা নেই। কারণ, ফরয আদায় করতে গেলে এটা ছাড়া উপায় নেই। তবে টার্গেট থাকবে কাফেররা, শিশুরা নয়। কাফেরদের টার্গেট করে নিক্ষেপের পর যদি মুসলিম আক্রান্ত হয় তাহলে কোনো দিয়াতও দিতে হবে না, কাফফারাও দিতে হবে না। -বাদায়িউস সানায়ি: ৭/১০০

তিন. এ ধরনের পরিস্থিতিতে ঐ মুসলিমরা হারবিদের নারী শিশুদের মতো

কাফেরদের নারী শিশুদের হত্যা করা নিষেধ, যদি তারা নিজেরা কিতালে না আসে বা সহায়তা না করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন-

وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله » عليه وسلم، «فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। (তা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দেন।” -সহিহ বুখারী ৩০১৫, সহিহ মুসলিম ১৭৪৪

রাবাহ ইবনে রবি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا، فقال: "انظر علام اجتمع هؤلاء" فجاء، فقال: على امرأة قتيل. فقال: "ما كانت هذه لتقاتل"، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا، فقال: "قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا". (قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح)

“আমরা এক যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি লোকদেরকে একটা কিছুর পাশে একত্রিত দেখতে পেলেন। তখন তিনি একজনকে এ বলে পাঠালেন যে, ‘দেখো তো এরা কেন একত্রিত হয়েছে’? লোকটি এসে জানালেন, (তারা) একজন নিহত মহিলার

পাশে একত্রিত হয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আপত্তির সুরে) বললেন, ‘এ তো লড়াই করার মতো ছিল না’। বর্ণনাকারী বলেন, সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগের দায়িত্বে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে তার কাছে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, খালিদকে বলবে সে যেন কোন মহিলাকে বা শ্রমিককে হত্যা না করে।” -সুনানে আবু দাউদ ২৬৬৯

কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞা হলো ঐ সময় যখন নারী শিশুরা আক্রান্ত হওয়া ব্যতীতই কাফেরদের উপর হামলা করা সম্ভব। পক্ষান্তরে যখন পরিস্থিতি এমন হয় যে, নারী শিশুদের বাঁচিয়ে হামলা করা সম্ভব নয় -ভারী অস্ত্র দিয়ে ব্যাপক হামলার সময় সাধারণত যেমনটা হয়ে থাকে- তখন এ নিষেধাজ্ঞা নেই। যতটুকু বাঁচানো সম্ভব ততটুকু সতর্কতা রেখে হামলা করে দেবে। এরপর যদি নারী শিশু মারা যায় তাহলে এর দায়ভার আমাদের নেই।

হাদীসে এসেছে-

سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الدار من المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم

“রাতের আঁধারে মুশরিকদের ভূমিতে অতর্কিত আক্রমণের ফলে আক্রান্ত নারী-শিশুদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, ‘ওরাও ওদের বাপ-দাদাদের অন্তর্ভুক্ত’।” -সহীহ মুসলিম:২/৮৪, হাদীস নং: ৪৬৪৭

অর্থাৎ এ অবস্থায় ওদের বিধান ওদের কাফের বাপ দাদারই অনুরূপ। কাজেই তারা আক্রান্ত হলে তার দায় আমাদের উপর বর্তাবে না এবং তাদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় আক্রমণও বন্ধ রাখা যাবে না।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মাযিরি রহ. (৫৩৬ হি.) বলেন,

المراد بقوله "هم منهم" أنّ أحكام الكفّار جارية عليهم في مثل هذا، والدّار دار كفر بكل من فيها منهم ومن ذراريهم. وإن اعتُرِض هذا بالنّهي عن قتل النّساء والولدان قلنا: هذا وارد فيهم إذا لم يتميّزوا وقتلوا من غير قصد لقتلهم بل كان القصد قتل الكبار فوقعوا في الذّراري من غير عمد ولا معرفة، والأحاديث المتقدمة وردت فيهم إذا تميّزوا. اهـ

“রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ‘ওরাও ওদের বাপ-দাদাদের অন্তর্ভুক্ত’ দ্বারা উদ্দেশ্য, এমন ক্ষেত্রে ওদের

উপর কাফেরদের বিধানই বর্তাবে। কাফের এবং তাদের সন্তান-সন্ততি সকলকে নিয়েই দারুল কুফর। এখানে যদি আপত্তি করা হয় যে, অন্য হাদীসে নারী-শিশু হত্যায় নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তাহলে বলবো, (নারী-শিশু হত্যার বৈধতা প্রদানকারী) এ হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে, যখন তারা পৃথক ও আলাদা না থাকে এবং তাদেরকে টার্গেট বানিয়ে হত্যা না করা হয় বরং উদ্দেশ্য থাকে পুরুষদের হত্যা করা, কিন্তু অনিচ্ছায় বা অজান্তে নারী শিশুরাও হত্যার শিকার হয়ে যায়। আর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত পূর্ববর্তী হাদীসগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র হল, যখন নারী ও শিশুরা পৃথক ও আলাদা থাকে।" -আলমু'লিম: ৩/১১

ফুকাহায়ে কেরাম এ মাসআলার উপর মুসলিমদের মাসআলা কিয়াস করেছেন। মুসলিম হত্যা নিষেধ, কিন্তু যখন জিহাদে পরিস্থিতি এমন হবে যে, তারা আক্রান্ত হওয়া ছাড়া অভিযান সম্ভব নয়, তখন কথা ভিন্ন। আমরা কাফের-মুরতাদদের টার্গেট করে হামলা করে দেবো। অনিচ্ছায় যদি মুসলিম মারা যায় তাহলে এর দায়ভার আমাদের না।

এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

وجه الإطلاق أمران. الأول أنا أمرنا بقتالهم مطلقا، ولو اعتبر هذا المعنى انسد بابه، لأن حصنا ما أو مدينة قلما تخلو عن أسير مسلم فلزم من افتراض القتال مع الواقع من عدم خلو مدينة أو حصن عادة إهدار اعتبار وجوده فيه، وصار كرميهم مع العلم بوجود أولادهم ونسائهم فإنه يجوز إجماعا مع العلم بوجود من لا يحل قتله فيهم واحتمال قتله وهو الجامع. [فتح القدير:5\431]

"ব্যাপক আক্রমণ (যেখানে মুসলিমও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা) বৈধ হওয়ার কারণ দুটি: প্রথমত আমাদেরকে নিঃশর্তভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়েছে। এখন যদি আমরা কাফেরদের ভূমিতে মুসলমান থাকার বিষয়টি বিবেচনা করি, তাহলে জিহাদের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা এমন দূর্গ বা শহর খুব কমই থাকে, যেখানে কোনো মুসলিম বন্দী থাকে না। সাধারণত কোন শহর বা দূর্গ মুসলিম বন্দী থেকে মুক্ত না থাকা সত্ত্বেও জিহাদ ফরজ হওয়া থেকে আবশ্যিকভাবে এটাই সাব্যস্ত হয়ে যে, মুসলিম বন্দী থাকার বিষয়টা ধর্তব্য নয়। এ বিষয়টা দারুল হারবে কাফেরদের নারী-শিশু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হামলা জায়েয হওয়ার অনুরূপ দাঁড়াল। এটি সর্বসম্মতভাবে জায়েয। অথচ জানা কথা যে, সেখানে এমনসব লোক বিদ্যমান, যাদের হত্যা বৈধ নয় এবং হামলা করলে তারা নিহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই কারণ এ মাসআলাতেও বিদ্যমান।" -ফাতহুল ক্বাদীর: ৫/৪৩১

***

প্রশ্ন ২. কোনো মুসলিম মারা গেলে কি কিসাস, দিয়াত বা জরিমানা আসবে?

উত্তর: যদি কাফের মুরতাদদের টার্গেট করে হামলা করা হয় আর এতে মুসলিম আক্রান্ত হয় তাহলে কিসাস, দিয়াত, কাফফারা বা জরিমানা কিছুই আসবে না- যেমনটা ইমাম কাসানির বক্তব্যে গত হয়েছে। তবে শর্ত হলো মুসলিমকে হত্যা করা উদ্দেশ্যে থাকতে পারবে না। উদ্দেশ্য থাকবে কাফের, যদিও মারা পড়েছে মুসলিম। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

***

সারকথা

♣ মুসলিমের জান সমগ্র দুনিয়ার চেয়েও দামি। ইচ্ছাকৃত কোনো মুসলিমকে হত্যা করা ভয়ানক শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

♣ মুমিনদের উচিৎ কাফের মুরতাদদের থেকে দূরে থাকা। নতুবা এদের উপর যে শাস্তি আপতিত হবে তা তাদের উপর এসে পড়তে পারে।

♣ জিহাদ আল্লাহ তাআলার অকাট্য ফরয বিধান। জিহাদ কাফেরদের জন্য আল্লাহর শাস্তি। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো যেন এ শাস্তি শুধু কাফেরদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, কোনো মুসলিম যেন আক্রান্ত না হয়।

♣ মুসলিম আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় জিহাদ বন্ধ রাখা যাবে না। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। আমাদের অনিচ্ছায় বা অপারগ অবস্থায় কোনো মুসলিম আক্রান্ত হলে এর দায়ভার আমাদের না। কিসাস, দিয়াত, কাফফারা, জরিমানা কিছুই আসবে না।

***

২১.কাফের হত্যা- একটি উপমা!

ইসলাম কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয করেছে- যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায় কিংবা জিযিয়া প্রদান করত ইসলামী হুকুমতের অধীনস্ত হয়ে দারুল ইসলামে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এই জিহাদের নাম- ইকদামি তথা আক্রমণাত্মক জিহাদ।

আর যদি তারা মুসলমান ভূমিতে আগ্রাসন চালায়, তাহলে তাদেরকে প্রতিহত করতে জিহাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। এই জিহাদ- দিফায়ি তথা প্রতিরক্ষামূল জিহাদ। এ উভয় প্রকার জিহাদে কাফেরদের সামরিক-বেসামরিক (প্রচলিত অর্থে) সকল পুরুষকে হত্যার বিধান দেয়া হয়েছে।

কেউ কেউ আপত্তি করে থাকে- কাফেররা যদি আমাদের উপর আক্রমণ না করে তাহলে অযথা কেন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে? কেন তাদের হত্যা করা হবে?

আবার কেউ কেউ বলেন- সামরিক কাফেরকে তো না হয় মানলাম হত্যা করা যাবে, কিন্তু সাধারণ কাফেরদের কেন হত্যা করা হবে?

এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি-

ধরুন একটা বসতির আশেপাশে কয়েকটা ঝোঁপ আছে। এগুলোর প্রত্যেকটাতেই অনেকগুলো করে সাপ থাকে। এসব ঝোঁপের কোনটা বসতি থেকে কাছে আর কোনটা দূরে। স্বভাবতই যে ঝোঁপগুলো কাছে সেগুলো থেকে সাপ বেরিয়ে এসে কামড়ানোর সম্ভাবনা বেশি।

এক দিন হঠাৎ একটা ঝোঁপ থেকে কয়েকটা সাপ বেরিয়ে এসে গ্রামবাসীদের ছোবল মারতে লাগল। এমতাবস্থায় করণীয় কি? সবাই বলবেন, সাপগুলোকে মেরে ফেলতে হবে। এতে কেউ দ্বিমত করবে না।

আর যেসব সাপ এখনোও কামড়াতে আসেনি সেগুলো প্রায়ই ঝোঁপের আশেপাশে এবং রাস্তার কিনারায় ঘুরে বেড়ায়। যে কোন সময় কামড়াতে পারে। লোকজন এগুলোকে দেখে ভয় পাচ্ছে। এমতাবস্থায় করণীয় কি? যত দ্রুত সম্ভব সাপগুলোকে মেরে ফেলা। সুযোগ বুঝে এক সময় দল বেঁধে ঝোপ ঘেরাও করে সেগুলোকে মেরে ফেলাই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ।

আবার ঝোঁপগুলোর মাঝে যেটা বসতির সবচেয়ে কাছে, যেটা থেকে কামড়ানোর সম্ভবনা বেশি, সেটার সাপগুলোকে আগে মেরে ফেলাই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। আর যেগুলো দূরে, যেগুলো থেকে কামড়ানোর সম্ভবনা কম- সেগুলো আপাতত না ধরলেও চলবে।

তদ্রূপ কাফেররাও সাপের মতোই ভয়ংকর, বরং আরো মারাত্মক। কারণ, সাপ একটা ব্যক্তির দুনিয়ার জীবন নষ্ট করবে, কিন্তু কাফেররা মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া সবই বরবাদ করবে। (অধিকন্তু কাফেররা আল্লাহদ্রোহের অপরাধে

অপরাধী)। তাই তাদের বিষদাঁত ভেঙে দেয়া, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া, যাতে তারা আল্লাহর কোন বান্দার ক্ষতি করতে না পারে, কোন বান্দাকে দ্বীন থেকে ফেরাতে না পারে- এটাই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। যেসব কাফের মুসলিম ভূমিতে আগ্রাসন চালায়, তাদের ব্যাপারটাতো একেবারেই সুস্পষ্ট। আর যারা আগ্রাসন এখনও চালায়নি, তারা রাস্তার কিনারায় ঘুরাফেরাকারী সাপের ন্যায়। তাদেরকে হত্যা করে দেয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

আর যেসব কাফের রাষ্ট্র মুসলিম ভূমির তুলনামূলক কাছে, সেগুলোকে আগে ধরাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, এদের থেকে ক্ষতির আশঙ্কা তুলনামূলক বেশি। এদের ছেড়ে আগে দূরের কাফেরদের ধরতে গেলে সুযোগ বুঝে এরা মুসলমানদের ক্ষতি করে বসবে। তাই এদেরকে আগে ধরাই অধিক সঙ্গত। আল্লাহ তাআলা এরই আদেশ দিয়েছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً

“হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়।” (তাওবা ১২৩)

অতএব, কাফের- আগ্রসী হোক বা না হোক, সামরিক হোক বা না হোক- সবগুলোই সাপের মতো ভয়ংকর। এদের বিষদাঁত ভেঙে দেয়াই বুদ্ধিমত্তার কাজ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ ও আমলেও তাওফীক দান করুন। আমীন!

২২.কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার ত্বরীকা এবং প্রচলিত তাবলীগিদের গোমরাহি!

কাফেরদেরকে কিভাবে দাওয়াত দেয়া হবে, তা মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসে এসেছে:

عن سليمان بن بريدة عن ابيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امّر اميرا على جيش أو سرية ... قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فان هم ابوا فسلهم الجزية، فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.اه

“হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা - বুরাইদা রাদি. - থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন জাইশ-বড় বাহিনী বা সারিয়্যা-ছোট দলের আমীর নিযুক্ত করতেন ... তখন তাকে বলে দিতেন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে। ... যখন তুমি তোমার দুশমন মুশরেকদের মুকাবেলায় যাবে, তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের আহ্বান জানাবে; এর যে কোন একটায় তারা সম্মত হলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করবে: (প্রথমত) তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। যদি তারা এতে অসম্মতি জানায় তাহলে জিযিয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে।

যদি তারা এতেও অসম্মতি জানায় তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।”

[সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭৩১; বাব: তা’মীরুল ইমামিল উমারা আ’লা বুয়ূস।]

এ হাদীসে কাফেরদেরকে দাওয়াত দিতে বলা হয়েছে তাদের সাথে যখন সামনা সামনি মুকাবেলা হবে, তখন। অর্থাৎ মুসলমান বাহিনী প্রথমে দারুল হরবে গিয়ে কাফেরদেরকে

অবরোধ করবে, যাতে তারা এদিক সেদিক পালিয়ে যেতে না পারে। পাকা-পোক্তা অবরোধ বসানোর পর তাদেরকে ইসলাম এবং তা গ্রহণ না করলে জিযিয়ার দাওয়াত দেবে।

কুরআন-হাদীসের আলোকে কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার এ ত্বরীকাটিই সর্ব-স্বীকৃত।

হিদায়া গ্রন্থকার (মৃত্যু: ৫৯৩হি.) বলেন,

" وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام" لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الإسلام. قال "فإن أجابوا كفوا عن قتالهم" لحصول المقصود "وقد قال صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث. "وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية" به أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أمراء الجيوش... "فإن أبوا ذلك استعانوا بالله عليهم وحاربوهم" لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن بريدة "فإن أبوا ذلك فادعهم إلى إعطاء الجزية إلى أن قال فإن أبوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم". اهـ

“মুসলমানগণ দারুল হরবে প্রবেশ করে কোন শহর বা দুর্গ অবরোধ করার পর, (প্রথমত) হরবীদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবে। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, ‘ইসলামের দাওয়াত দেয়া ব্যতীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না’।

যদি তারা এতে সাড়া দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হবে। কেননা, উদ্দেশ্য যা ছিল, তা হাসিল হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

‘আমি লোকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে’।
যদি তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে জিযিয়া আদায়ের আহ্বান জানাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর প্রেরিত) বাহিনীর সেনা প্রধানদেরকে এ আদেশই দিয়েছেন।
...
যদি তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. এর হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যদি তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানের আহ্বান জানাবে। ... যদি তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে’।” [হিদায়া: ২/২৫২-২৫৩]

অতএব, ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া হবে কাফেরদেরকে অবরোধ করার পর। আর দাওয়াতও শুধু ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের রাষ্ট্র মুসলামনদের হাতে সমর্পণ করতে এবং এরপর জিযিয়া দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যিম্মি হয়ে থাকার আহ্বান জানাতে হবে। যদি এতে রাজি না হয়, তাহলে যুদ্ধ করে তাদেরকে ইসলাম বা জিযিয়া কবুলে বাধ্য করতে হবে এবং তাদের রাষ্ট্রকে ইসলামী হুকুমতের অধীনে নিয়ে এসে

দারুল ইসলামে পরিণত করতে হবে। যদি ইসলাম বা জিযিয়া কোনটাই কবুল করতে রাজি না হয়, তাহলে যাকে হত্যা করার হত্যা করতে হবে আর বাকিদেরকে গোলাম-বাঁদিতে পরিণত করতে হবে।

এ দাওয়াত হলো সেসব কাফেরদের বেলায়, যাদের কাছে ইতিপূর্বে দাওয়াত পৌঁছেনি। পক্ষান্তরে যাদের কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, ইসলাম নামক একটি ধর্ম আছে, উক্ত ধর্ম যারা গ্রহণ না করবে কিংবা জিযিয়া দিতে রাজি না হবে, মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; যাদের কাছে এ কথা পৌঁছে গেছে তাদেরকে আর দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে দু'টি শর্ত সাপেক্ষে তাদেরকে দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব:

এক. দাওয়াত দেয়ার দ্বারা মুসলামনদের ক্ষতির কোন আশংকা না থাকতে হবে।
দুই. এই আশা থাকতে হবে যে, তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে কিংবা জিযিয়া আদায়ে সম্মত হবে।

পক্ষান্তরে যদি তারা এত উদ্ধত জাতি হয় যে, তাদের থেকে ইসলাম বা জিযিয়া কোনটারই আশা করা যায় না, বরং দাওয়াত দিতে গেলে তারা মুসলামনদের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটবে বলে আশংকা করা হচ্ছে; তাহলে এদেরকে দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব নয়, বরং জায়েযই নয়।

হিদায়া গ্রন্থকার (মৃত্যু: ৫৯৩হি.) বলেন,

"ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار، ولا يجب ذلك، لأنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، وعهد إلى أسامة رضي الله عنه أن يغير على أبنى صباحا ثم يحرق، والغارة لا تكون بدعوة. اهـ

"যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেছে, অতিরিক্ত সতর্কীকরণার্থে তাদেরকে (পুনরায়) দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব; তবে আবশ্যক নয়। কেননা, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিত হামলা করেছেন এবং উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ দিয়েছেন, উবনা'র উপর অতর্কিত হামলা করে একে জ্বালিয়ে দিতে। আর অতর্কিত হামলা তো দাওয়াত দিয়ে হয় না।" [হিদায়া: ২/২৫২]

আল্লামা হাছকাফী রহ. (মৃত্যু: ১০৮৮হি.) বলেন,

(و ندب دعوة من بلغته) ... لكن بشرطين، أحدهما: أن لا يكون في التقديم ضرر بالمسلمين، كتحصن واحتيال، ولو بغلبة الظن، والثاني: أن يطمع فيهم ما يدعوهم إليه، كما في المحيط. اهـ

"যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেছে, তাদেরকে (পুনরায়) দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব; তবে দুই শর্তে:

এক. এটা মুসলামনদের কোনরূপ ক্ষতির কারণ না হতে হবে। যেমন, প্রবল ধারণা হওয়া যে, (দাওয়াত দিতে গেলে) তারা

দুর্গে আশ্রয় নিয়ে নেবে কিংবা অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করবে।

দুই. যে বিষয়ের প্রতি তাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তারা তা কবুল করে নেবে বলে আশাবাদি হতে হবে। 'আল-মুহীত' এ এমনই বলা হয়েছে।" [আদ-দুররুল মুনতাক্বা: ২/৪১২]

এ হলো কাফেরদের দাওয়াত দেয়ার শরীয়ত-বর্ণিত পন্থা। তবে মনে রাখতে হবে, এ দাওয়াত হলো তখন,যখন কাফেররা তাদের নিজ দেশে অবস্থান করে, ইসলাম, মুসলমান বা কোন ইসলামী ভূমিতে আঘাত না হানে। পক্ষান্তরে যদি তারা কোন মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে বসে, তখন আর কোন দাওয়াত নেই, বরং তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ করে মুসলিম ভূমিকে এসব নাপাক বাহিনী থেকে পবিত্র করা ফরয।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (মৃত্যু: ১৮৯হি.) বলেন,

(ولو أن قوماً من أهل الحرب الذين لم يبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمون} بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم ، }المسلمين في دارهم ، يقاتلهم فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا أموالهم فهذا جائز ...) أه.

"এমন কোন কাফের সম্প্রদায়, যাদের কাছে ইসলাম বা দাওয়াত কিছুই পৌঁছেনি, যদি তারা মুসলমানদের রাষ্ট্রে তাদের

বিরুদ্ধে এসে পড়ে, তাহলে আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানরা কোন প্রকার দাওয়াত ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তখন তারা তাদেরকে হত্যা, বন্দি কিংবা তাদের মাল লুণ্টন- যাই করবে, সবই বৈধ...।”

ইমাম সারাখসী রহ. (মৃত্যু: ৪৯০হি.) ব্যাখ্যায় বলেন,

(والمعنى في ذلك أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين وأموالهم وأنفسهم فلا يجب الدعاء) أهـ.

“কেননা, তখন যদি তারা ইসলামের দাওয়াত দিতে যায়, তাহলে মুসলামানদের হত্যা, বন্দী বা মাল লুণ্টনের শিকার হতে হতে পারে। কাজেই তখন দাওয়াত দেয়া আবশ্যক হবে না।” [শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ৫/২৫৩-২৫৪]

ইবনুল কায়্যিম রহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.) বলেন,

(ومنها أن المسلمين يدعون الكفار – إلى الإسلام- قبل قتالهم هذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم ، ومستحب إن بلغتهم الدعوة ، هذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار، فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم بغير دعوة لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم) أهـ.

“যুদ্ধের পূর্বে মুসলমানগণ কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। এটি আবশ্যক, যদি তাদের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। আর দাওয়াত পৌঁছে থাকলে তখন মুস্তাহাব। এ হচ্ছে

যখন স্বয়ং মুসলমানরা কাফেরদের উপর আক্রমণের জন্য যাবে। পক্ষান্তরে কাফেররা যখন মুসলিম ভূমিতে মুসলমানদের উপর হামলা করতে আসবে, তখন কোন প্রকার দাওয়াত ব্যতীতই তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে। কেননা, তখন তারা নিজেদের জান ও ভূমি রক্ষার জন্য লড়ছে।" [আহকামু আহলিয যিম্মাহ্: ১/৫]

তাবলীগিদের গোমরাহি:

আজ যখন প্রায় সবগুলো মুসলিম ভূমি কাফের মুরতাদদের দখলে, তখন মুসলমানদের উপর ফরয, তাদের জান-মাল সর্বস্ব ব্যয় করে কাফের-মুরতাদদের থেকে মুসলিম ভূমিগুলো উদ্ধার করা। ইসলাম ও মুসলমানকে এদের নাপাক থাবা হতে রক্ষা করা। এ ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রচলিত তাবলীগ পন্থীরা আল্লাহ তাআলার ফরযকৃত এ বিধান ছেড়ে, কাফেরদেরকে দাওয়াত দিতে ব্যস্ত। তাও ঐ দাওয়াত নয়, যে দাওয়াত ইসলাম শিখিয়েছে। ঐ দাওয়াত তারা দিচ্ছে, যার পিছনে নেই কোন তরবারি, নেই কোন জিযিয়ার আহ্বান। এমন দাওয়াত, যে দাওয়াতে জান-মালের কোন আশংকা নেই। যে দাওয়াত শুধু ইসলামের ফরয বিধান তরকের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে দাওয়াত ইসলাম ও মুসলামনকে চরম

অপদস্থি আর লাঞ্ছনার শিকার করেছে। যে দাওয়াত ছিল কাফেরের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার, সে দাওয়াতকে তারা কাফেরদের পা ধরে পড়ে থাকার দাওয়াতে পরিণত করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

এর চেয়ে পরিতাপের বিষয়, এই চরম গোমরাহি কোন নির্দিষ্ট এলাকা, নির্দিষ্ট কতক ব্যক্তি, এমনকি নির্দিষ্ট কতক জাতি-গোষ্ঠীর মাঝেও সীমাবদ্ধ রয়নি, বরং তা গোটা উম্মাহকে গ্রাস করেছে। গোটা উম্মাহর লাখো লাখো যুবককে আত্মমর্যাদাহীন আর পুরুষত্ব বিবর্জিত কতগুলো ভেড়ার পালে পরিণত করে ছেড়েছে। হিন্দুস্থান থেকে উদগত এই ফিতনা গোটা উম্মাহকে লাঞ্ছিত করে ছেড়েছে। এটা এমন এক ফিতনা, যাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আলেম-গাইরে আলেম, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই নিপতিত হয়েছে।

এ যেন ঐ হাদিসের বাস্তবায়ন, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই বলে গিয়েছেন।
হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « إن الفتنة تجىء من ها هنا ».
« وأومأ بيده نحو المشرق » من حيث يطلع قرنا الشيطان

(আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেন, 'নিশ্চয়ই এই দিক থেকে ফিতনার আগমন ঘটবে; যেদিকে শয়তানের শিংদ্বয় উদিত হয়।) [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৮১]

অনেক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কথা তিনবার বলেছেন।

স্পষ্ট যে, হিন্দুস্তান মদীনা থেকে শুধু পূর্ব দিকেই নয়, বরং দুনিয়ার প্রায় শেষপ্রান্তে। মদীনা থেকে যত বেশি দূরে হবে, তত বেশি ফিতনা তাতে জন্ম নেবে, এটাই স্বাভাবিক। আজকের এই তাবলীগ এ হাদিসের প্রকৃষ্ট বাস্তবায়ন। আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমান আমল হিফাজত করুন। আমীন।

২৩.কুফফার জনসাধারণ নিয়ে ক'টি কথা

কাফেরদের জনসাধারণ হত্যার ব্যাপারে অনেকের যথেষ্ট সংশয়

প্রথমত আমাদের দেখা উচিৎ, কাফেররা আমাদের জনসাধারণের সাথে কি ধরনের আচরণ করছে?

কেউ কি বলতে পারবে যে, কাফেররা আমাদের জনসাধারণকে হত্যা করে না?

বরং বলতে গেলে মুসলিম জনসাধারণই কাফেরদের টার্গেট। মুজাহিদদেরকে সাধারণত তারা পায় না। যদি হিসাব করা হয় দেখা যাবে এ পর্যন্ত যে সংখ্যক মুজাহিদ কাফেরদের হাতে শহীদ হয়েছেন সে হিসাবে নিহত মুসলিম জনসাধারণের সংখ্যা শত গুণ বেশি। আমাদের নারী, শিশু, বৃদ্ধ- কেউই এদের হাত থেকে নিরাপদ নয়।

ইরাকে কত লাখ শিশু হত্যা করেছে আমেরিকা তা কি আমাদের সামনে নেই?

মায়ানমারে যাদের হত্যা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তারা কি মুজাহিদ না সাধারণ?

***

কাফেরদের এটাই চিরাচরিত রীতি। আল্লাহ তাআলা বার বার আমাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন,

{ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ}

"(তাদের চরিত্র হচ্ছে এই যে) যদি এরা তোমাদের কাবু করতে পারে, তাহলে এরা তোমাদের মারাত্মক শত্রুতে পরিণত হবে। (শুধু তাই নয়) নিজেদের হাত ও কথা দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে। (আসলে) এরা এটাই চায় যে, তোমরাও তাদের মতো কাফের হয়ে যাও।" -মুমতাহিনা: ২

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9)

"মহাপরাক্রমশালী, স্বীয় স্বত্তায় প্রশংসিত এবং আকাশ ও নভোমণ্ডলীর রাজাধিরাজ সম্রাট আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনা ছাড়া এদের শাস্তি দেয়ার আর কোন কারণই ছিল না।

(সর্বোপরি সেই) আল্লাহ (জালেম ও মজলুমসহ) সকলের কার্যাবলী (যথাযথ) অবলোকন করছেন।” -সূরা বুরূজ: ৮-৯

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)

“কোনো ঈমানদারের ব্যাপারে এরা যেমন আত্মীয়তার ধার ধারে না তেমনি কোনো অঙ্গীকারের মর্যাদাও রক্ষা করে না। মূলত এরাই হচ্ছে সীমালঙ্গনকারী।” –তাওবা ১০

একমাত্র অস্ত্র ব্যতীত আর কিছুর মূল্য এরা বুঝে না। এরা বিবেচনা করে ঈমানের ভিত্তিতে। প্রতিটি ঈমানদার এদের দুশমন। যখন সুযোগ পাবে তখনই হত্যা করবে, ক্ষতি করবে। সামরিক বেসামরিকের কোনো ব্যবধান তাদের কাছে নেই। মহিলা-বৃদ্ধের সম্মান তারা দিতে জানে না। কোমলমতি শিশুদের প্রতি দয়া ভালবাসাও তাদের জন্মে না। তাদের কাছে হিসাব একটাই। সেটা হলো ঈমান।

তারা যখন আমাদের সাথে এ আচরণ করে, তখন আমরাও যদি করতাম তাহলে প্রচলিত দুনিয়ার হিসেব অনুযায়ী সমালোচনার কিছু হওয়ার তো কথা ছিল না। কিন্তু দেখা যায় যখনই মুজাহিদগণ সুযোগ পেয়ে কাফেরদের কোনো বারে, ক্লাবে বা সমাবেশে হামলা করেন তখনই এক দল লোক চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। অথচ লাখো লাখো শিশু যে নির্দয়ভাবে নিহত হচ্ছে এ সীমালঙ্ঘন যেন তাদের চোখে পড়ে না।

তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা আল্লাহ তাআলার এ আয়াত দু'টি নিয়ে একটু ফিকির করবেন,

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ- البقرة 194

'যে তোমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করবে, তোমরাও ওর প্রতি বাড়াবাড়ি কর, যেরূপ বাড়াবাড়ি সে তোমাদের প্রতি করেছে।' -সূরা বাকারা: ১৯৪

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ - النحل 126

'আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ

প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে।’ –সূরা নাহল: ১২৬

জনসাধারণ কি যুদ্ধে শরীক নয়?

অধিকন্তু আমরা একটু বাস্তব দুনিয়ার প্রতি লক্ষ করি; আশাকরি পরিস্ফুটিত হয়ে যাবে যে, কাফেরদের জনসাধারণ ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনিতে লিপ্ত কি'না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক কি'না।

ভারতের চিত্র কি আমাদের সামনে নেই। প্রতি দিন যে খবর পাওয়া যাচ্ছে ভারতে এতজন মুসলিম নিহত এতজন আহত- এগুলো কারা করছে?

প্রশাসন তো শিকার করে না যে, তারা করছে। দুনিয়াব্যাপী কোনো চক্ষুষ্মানের কাছে অস্পষ্ট নয় যে, বেসামরিক মালউনরাই এগুলো করে যাচ্ছে আর প্রশাসন পেছন থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে। এ কারণেই তো এক কিছু কিছু উলামায়ে সূ ফতোয়াও দিয়েছে যে, ভারত দারুল আমান। কারণ, হত্যা যা করছে জনাসাধারণ করছে; তাদের দৃষ্টিতে সরকারিভাবে না'কি

হচ্ছে না এসব। এ ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ একবার আলোচনা করেছিলাম।

ভারতে এ পর্যন্ত যতগুলো গণহত্যা হয়েছে সেগুলো কারা করেছে?

বাবরি মসজিদ কারা গুঁড়িয়েছে?

এখন যদি আমরা ভারতের মালউনদের হত্যা করতে থাকি, তাহলেই চেঁচামেচি শুরু হবে- আমরা বেসমারিক নিরপরাধ নাগরিক হত্যা করে ফেলছি। যেন এতদিন মালউনরা যা করেছে এর বদলা নেয়ার সামান্য অধিকারটুকুও আমাদের নেই।

এ গেল এক কথা।

আরো কয়েকটি প্রশ্ন করি। এগুলোর সদোত্তর দিলে আশাকরি সন্দেহ অনেকটাই কাটবে।

@ আমেরিকার সরকার ও নেতা-নেত্রীদের কি তাদের জনগণ নির্বাচন করেনি?

@ তাদের সামরিক খরচ, অস্ত্রপাতি, যুদ্ধের আসবাবপত্র, বেতন-ভাতা এগুলো কি জনসাধারণ থেকে আসছে না?

@ আমেরিকার সৈনিক ও গোয়েন্দাবাহিনির সদস্যদের কি জনসাধারণ থেকে নেয়া হয়নি? না'কি তারা মায়ের পেট থেকেই সৈনিক আর গোয়েন্দা হয়ে এসেছিল? মালউন নরেন্দ্র মোদি তো এক সময় একটা চায়ের দোকানদারই ছিল।

@ আমেরিকার সাধারণ জনগণ কি এ আকাঙ্খা রাখে না যে, যদি তারা এমপি-মন্ত্রী হতে পারতো? যদি তারা আর্মি, পুলিশ বা নেভিতে চাকরি পেতো? যদি তারা কোনো রাজনৈতিক নেতা পারতো?

সকলেরই জানা যে, এ ধরনের আকাঙ্খা তাদের বলতে গেলে সকলের অন্তরেই বিদ্যমান। এ কারণে তারা নিজেরা যদি অশিক্ষিত বা অযোগ্য হওয়ার কারণে কোনো পোস্টে চাকরি না

পায়, সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তাদের ছেলে মেয়েরা যেন অন্তত শিক্ষিত হয়ে কোনো বড় চাকরি করতে পারে। আমরা আমাদের দেশের জনগণের দিকে একটু লক্ষ করলেই বিষয়টা আরো স্পষ্ট বুঝতে পারবো।

@ আজ যদি আমেরিকার এক লাখ নতুন সৈন্য দরকার পড়ে তাহলে তারা কোত্থেকে নেবে? স্পষ্ট যে, জনসাধারণ আর তাদের সন্তানাদি থেকেই নেবে।

@ যদি আমেরিকার এক হাজার কোটি ডলার দরকার পড়ে তাহলে কোত্থেকে নেবে?

স্পষ্ট যে, জনসাধারণ থেকেই নেবে। এমনকি জনসধারণের অনেকে তো দ্বীনের কাজ মনে করে পরকালীন নাজাত আর খৃস্ট ধর্মের বুলন্দির লক্ষে অকাতরে দান করবে।

@ আজ যদি আমেরিকায় হামলা হয় আর সৈনিকরা প্রতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে কি আমেরিকা জনসাধারণকে মাঠে নামাবে না? তাদের অস্ত্র আর ট্রেনিং দেবে না?

আমরা ভারতের দিকে লক্ষ করি। তাদের জনগণ, এমনকি মহিলা এবং ছোট ছোট বাচ্চারাও ইসলামের বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র ট্রেনিং নিচ্ছে।

আমাদের দেশেও তো একাত্তরে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। বাঙালী জনগণকে তখন অস্ত্র-ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল কথাটা সকলের জানা। আজ যাদের মুক্তিযোদ্ধা বলে পরম শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে তারা সকলেই নিয়মতান্ত্রিক বাহিনি ছিল না।

যখন ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী যুদ্ধের জনবল অর্থবল সবই জনসাধারণ থেকে আসছে, যখন জনগণ একটা সামরিক পোস্টে চাকরি পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, যখন তাদের ছেলে-মেয়েগুলোকে সৈনিক ও গোয়েন্দা বানাতে তাদের প্রচেষ্টার কোনো কমতি নেই, যখন দেশ ও ধর্মের প্রতিরক্ষার জন্য তারা প্রয়োজনে মাঠে নামতে প্রস্তুত আছে- এত কিছুর পরও কিভাবে বলা যায় যে তারা নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিক?

সহজ কথা, যুদ্ধ একটি ব্যাপক ময়দান। এ ময়দানে যে কেউ

যেকোনোভাবে সহায়তা করবে বা তার মধ্যে সহায়তা করার মতো যোগ্যতা আছে সে-ই মুহারিব, মুকাতিল এবং ইসলামের দুশমন। হিংস্র বাঘ আর বিষাক্ত সাপের মতো তারা। যেকোনো সময় থাবা মারতে পারে। ছোবল দিয়ে বসতে পারে। এদেরকে হত্যা করাই যুক্তির দাবি। হ্যাঁ, মাসলাহাতের বিবেচনায় না করা হলে সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু বাস্তবতা এটাই যে এরা হিংস্র জানোয়ার আর বিষাক্ত সাপ। আল্লাহ তাআলা সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

২৪.কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন সূরত এবং তার বিধান

শরীয়ত বিরোধি আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা কুফর। মৌলিকভাবে এর দু’ সূরত হতে পারে-

এক. ইসলামী শরীয়াহ’র উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শরীয়াহ্ অনুযায়ী পরিচালিত কোন ইসলামী রাষ্ট্রে কোন এক বা একাধিক আইন ইসলামী আইনের বিপরীত প্রবর্তন করা। এর তিন সূরত হতে পারে-

ক. শরীয়তের হারামকে বৈধতা দিয়ে দেয়া। যেমন, সুদ বা মদের বৈধতা দেয়া।

খ. শরীয়তের হালালকে অবৈধ করা। যেমন, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে নিষিদ্ধ করা।

গ. শরয়ী আইনের স্থলে ভিন্ন আইন জারি করা। যেমন, চুরির শাস্তি হাত কাটার পরিবর্তে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা। এখানে চুরিকে বৈধ করা হয়নি তবে তার শাস্তিতে পরিবর্তন করা হয়েছে।

দুই. শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি ইসলামী শরীয়াহ'র উপর না হয়ে অন্য কোন মতবাদের উপর হওয়া। যেমন- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদী। যেমন- বর্তমান বিশ্বে আমাদের গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসন ব্যবস্থা।

এই সকল সূরতে শরীয়ত বিরোধি উক্ত আইন বা মতবাদ তারা নিজেরাই রচনা করতে পারে কিংবা অন্যের থেকে (যেমন- ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া বা ফ্রান্স থেকে) আমদানীও করতে পারে। তদ্রূপ উক্ত কুফরী শাসন বা কুফরী আইনকে পূর্ব থেকে চলে আসা ইসলামী শাসন বা ইসলামী

আইন অপসারণ করেও জারি করতে পারে কিংবা পূর্ব থেকেই চলে আসা কুফরী আইন বা কুফরী শাসনকে বহালও রাখতে পারে। এই সকল সূরতই কুফর এবং তাতে লিপ্ত শাসকরা ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের ও মুরতাদ।

দলীল:

ক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার মুশরিকরা হারাম মাসকে হালাল করত এবং হালাল মাসকে হারাম করতো। তবে তারা তা নিজেরা চালু করেনি। তাদের পূর্বপুরুষরা চালু করে গিয়েছিল আর তারা শুধু তা ধরে রেখেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করেছেন এই আয়াতে-

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

[নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেররা (তাদের পূর্ববৎ পথভ্রষ্টতার উপর আরোও) পথভ্রষ্ট হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে।

তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।] [তাওবা: ৩৭]

কাজেই বুঝা গেল, শরয়ী আইনের পরিবর্তে কুফরী আইন প্রবর্তনই কুফর, যদিও আইন একটাই হয় এবং চাই উক্ত আইন তারা নিজেরাই চালু করুক কি পূর্ব থেকে চলে আসা আইনকে বহাল রাখুক।

খ. ইয়াহুদীদের পূর্ব পুরুষরা যিনার শাস্তি পরিবর্তন করেছিল। পরের যামানার ইয়াহুদীরা তা অনুসরণ করে চলেছে মাত্র। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করেছেন।

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

‘যারা আল্লাহ তাআলা যে বিধান নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারাই প্রকৃত কাফের।’

(মায়েদা: ৪৪)

এ আয়াতটি তো মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার ইয়াহুদীদের কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে। শরয়ী বিধান অপসারণ করে কুফরী বিধান চালু করার কাজটা পূর্বসূরি ইয়াহুদীরা করেছিল। কিন্তু কাফের শুধু তারাই সাব্যস্ত হয়নি, উত্তরসূরি যারা একে বহাল রেখেছে তারাও কাফের সাব্যস্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইয়াহুদীরা পূর্ণ শরীয়ত পরিবর্তন করেনি, কিছু আইন পরিবর্তন করেছিল। এতেই তারা কাফের সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই পূর্ণ শরীয়তকেই শাসন ব্যবস্থা থেকে অপসারণ করে দিয়ে শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি কোন কুফরী মতবাদের উপর স্থাপন করা তো এর আগেই কুফর এবং অতি জঘন্য কুফর হবে।

গ. কুফরী সংবিধান ইয়াসিক প্রণয়ন করেছিল মূলত চেঙ্গিস খান। পরবর্তী তাতাররা তা অনুসরণ করে চলেছিল। কিন্তু ইবনে কাসীর রহ. এই পরের যামানার তাতারদেরকেই কাফের ফতোয়া দিয়েছেন।

২৫.কুফরী শাসন এবং আল্লামা শাওকানী রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.) এর ফতোয়া

আল্লামা শাওকানী রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.) এর যামানায় কতক এলাকার অধিবাসীরা তৎকালীন সুলতানের আয়ত্ব থেকে বের হয়ে যায়। তারা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেসব এলাকা দখল করে নিয়ে নিজেদের শাসন কায়েম করে। এরপর তারা শরয়ী বিধান ছেড়ে কুফরী বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করতে এবং করাতে থাকে। তিনি তাদের ব্যাপারে বলেন,

أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير انكار ولا حياء من الله ولا من عباده ولا يخافون من أحد بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم. وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس لا يقدر أحد على انكاره ودفعه وهو أشهر من نار على علم. ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله. بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية. و مع هذا، فهم مصرون على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكم إليه. وكل واحد منها على انفراده يوجب كفر فاعله و خروجه من الإسلام. و ذلك إطباقهم على قطع ميراث النساء، و إصرارهم عليه وتعاضدهم على فعله. اهـ

"**তারা তাদের সকল বিষয়ে বিচারক বানায় এবং বিচার নিয়ে যায় তাদের ঐসব লোকদের নিকট যারা তাগুতী বিধি-বিধান জানে।** এতে তাদের কোন আপত্তিও নেই, আল্লাহ তাআলা বা তার বান্দাদের থেকে কোন লজ্জাবোধও নেই। কাউকে তারা ভয়ও করে না। কখনোও কখনোও তো বরং তারা তাদের আশেপাশের বাসিন্দা এবং অন্যান্য প্রজাসাধারণের যাদেরকে বাগে পায় তাদের মাঝেও এই সব বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে। বিষয়টি সর্বজন বিদিত। কেউ তাতে আপত্তি জানাতে কিংবা প্রতিহত করতে সক্ষম নয়। পর্বতচূড়ায় অগ্নিকুন্ডের চেয়েও তা অধিক প্রসিদ্ধ।

কোন সন্দেহ, কোন সংশয় নেই যে, এটি আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর শরীয়তের সাথে কুফরী; যে শরীয়তের আদেশ তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত তিনি তার বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন। বরং তারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত অবতীর্ণ সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে। **এদের বিরুদ্ধে জিহাদ আবশ্যক। এদের সাথে কিতাল করা ফরযে আইন;** যতক্ষণ না তারা ইসলামী বিধি-বিধান কবুল করে, তার সামনে আত্মসমর্পণ করে, পবিত্র শরীয়ত দিয়ে নিজেদের মাঝে বিচার ফায়সালা করে এবং যত শয়তানী তাগুতের মাঝে তারা লিপ্ত আছে তার সব থেকে বের হয়ে আসে।

তাগুতী বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করা-করানো ছাড়াও তারা আরোও কতক এমন কর্মে নিমজ্জিত আছে যার প্রত্যেকটাই স্বতন্ত্রভাবে তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফেরে পরিণত করে এবং তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তা হচ্ছে, **তারা মহিলাদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।** এর উপরই অটল অবিচল আছে। এ বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগীতা করছে।”

[আদ-দাওয়াউল আ-জিল: ১২-১৩, (‘মাজমুআতুর রাসায়িলিল মুনিরিয়্যাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত এক রিসালা।)]

প্রিয় পাঠক, শাওকানী রহ. যেসব লোকের কুফরীর ফতোয়া দিচ্ছেন তাদের চেয়ে কি আমাদের শাসকগুলোর অবস্থা আরোও জঘন্য নয়? তাহলে কেন তারা কাফের হবে না?

আবার দেখুন, তিনি শুধু মহিলাদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হওয়াকেই ইসলাম থেকে বহিষ্কৃতকারী স্বয়ংসম্পূর্ণ কুফর সাব্যস্ত করেছেন। অথচ তা তো শরীয়তের একটামাত্র বিষয়। যদি তাই হয়, তাহলে আজ যারা গোটা শরীয়তকেই প্রত্যাখান করেছে, এর বিপরীতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীয়ত বিরোধি আইন প্রবর্তন করেছে- পাঠক একটু ভাবুন! এদের কুফর কত জঘন্য হবে?!

২৬.খাওয়ারেজদের মানহাজ দিয়ে বিচার করবেন না

আমাদের দেশের একজন বড় আলেম মারা গেলেন। তাঁর এক শাগরেদ তাঁর জানাযায় শরীক হয়নি। কেনো? কারণ, তিনি না'কি মুরতাদ ছিলেন।

নিঃসন্দেহে এ ধরণের আকিদা বর্তমান খারেজি শ্রেণীর অনেকে পোষণ করে। এ ধরনের ঘটনাকে দলীল বানিয়ে আলেম সমাজের অনেকেই জিহাদ বিমুখতার প্রয়াস পান। জিহাদের আলোচনা তুলতে গেলেই তারা এ ধরনের দুয়েকটা উদাহরণ সামনে নিয়ে আসেন।

আমরা এ ধরনের বাড়াবাড়ি অস্বীকার করি না। এর চেয়ে বড় বাড়াবাড়িও আছে। **কিন্তু প্রশ্ন হলো,**

- **সবাইকে কি একই মানহাজে বিচার করবেন**?

- **এ ধরনের বাড়াবাড়ির কারণে কি জিহাদের ফরজিয়্যাত রহিত হয়ে যাবে আপনার উপর থেকে**?
প্রশ্নগুলোর উত্তর দরকার।

খাওয়ারেজ দুনিয়াতে আজ নতুন জন্ম নেয়নি। তারা পুরাতন ভাইরাস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানাতেই এর উৎপত্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন গনিমত বণ্টন করছিলেন। এক বুযুর্গ টাইপের লোক এসে আপত্তি শুরু করলো, 'মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন। কি ধরনের বণ্টন করছেন! এ বণ্টন তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হচ্ছে না'।

সুবহানাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বণ্টন আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী হচ্ছে না!! সে রাসূলকে দ্বীন শিখাতে এসেছে। অথচ বাহ্যত লোকটা মুনাফিক ছিল না। ইবাদতগুজার ছিল। কিন্তু এমনই নির্বোধ যে, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আপত্তি তুলতেও পরোয়া করেনি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.

"এ লোকের বংশ থেকে এমন এক সম্প্রদায় বের হবে, যারা করআন তো পড়বে কিন্তু তা তাদের গলদেশ পেরিয়ে নিচে নামবে না (অর্থাৎ কুরআন পড়বে কিন্তু বুঝবে না)। শিকারের দেহ ভেদ করে নিক্ষিপ্ত তীর যেমন বেরিয়ে যায়, তেমনি তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। তারা মুসলমানদের হত্যা করবে কিন্তু মূর্তি পূজারিদের ছেড়ে দেবে। যদি আমি তাদের পেয়ে যাই, তাহলে আদ জাতির মতো এদেরকে (সমূলে) হত্যা করবো।" -সহীহ বুখারি ৩৩৪৪, সহীহ মুসলিম ২৪৯৯

আরেক হাদিসে এসেছে,

إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.

"এ লোকের বংশ থেকে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সতেজভাবে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করবে; কিন্তু তা তাদের গলদেশ পেরিয়ে নিচে নামবে না। শিকারের দেহ ভেদ করে নিক্ষিপ্ত তীর যেমন বেরিয়ে যায়, তেমনি তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। -বর্ণনাকারী বলন- আমার ধারণা, তিনি এও বলেছেন, যদি আমি তাদের পেয়ে যাই, সামূদ জাতির মতো তাদেরকে (সমূলে) হত্যা করবো।" - সহীহ বুখারি ৪৩৫১, সহীহ মুসলিম ২৫০০

উল্লেখ্য, এ লোকের বংশ বলতে এ ধরনের লোক উদ্দেশ্য, সরাসরি এ লোকের বংশ উদ্দেশ্য নয়। কারণ, পরবর্তী খাওয়ারেজরা সরাসরি তার বংশের লোক নয়।

অন্য হাদিসে এসেছে,

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من

الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.

“শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের বয়স হবে স্বল্প আর বুদ্ধিতে হবে নির্বোধ। (বাহ্যত) সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ বাণী তারা বলবে, (আর বাস্তবে) শিকারের দেহ ভেদ করে নিক্ষিপ্ত তীর যেমন বেরিয়ে যায়, তেমনি তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। তাদের ঈমান তাদের গলদেশ পেরিয়ে নিচে নামবে না। শোন, যেখানেই তোমরা তাদের পাবে, হত্যা করে দেবে। কেননা, তাদের হত্যা করাটা কিয়ামত দিবসে হত্যাকারীর জন্য মহা প্রতিদানের কারণ হবে।” -সহীহ বুখারি ৩৬১১, সহীহ মুসলিম ২৫১১

হযরত উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার যামানা থেকে এ ধরনের লোকের বিস্তৃতি। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত এ শ্রেণীটি বিদ্যমান আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كلما خرج قرن منهم قطع، حتى يخرج الدجال في بقيتهم – مجمع الزوائد، رقم: 10406، قال الهيثمي: رواه أحمد في حديث طويل. وشهر ثقة، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ

“যখনই তাদের কোনো একটি শিং গজাবে কেটে দেয়া হবে। অবশেষে তাদের অবশিষ্ট লোকদের মাঝে দাজ্জাল আগমন

করবে।” -মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদিস নং ১০৪০৬

অন্য হাদিসে এসেছে,

لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال -مجمع الزوائد، رقم: 10409، قال الهيثمي: رواه أحمد والأزرق بن قيس وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ

“তাদের উৎপত্তি হতেই থাকবে। অবশেষে তাদের শেষাংশটি দাজ্জালের সাথে আগমন করবে।” -মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদিস নং ১০৪০৯

হাদিসের উদ্দেশ্য হয়তো এমন যে, দাজ্জালের আগমনের পর্যন্তই এ ধরনের লোক থেকে যাবে।

বুঝা গেল, এ ধরনের লোক থাকবেই চিরকাল। যদি এদেরকে ভিত্তি বানিয়ে গোটা মুজাহিদ জামাতের সমালোচনা এবং জিহাদ ত্যাগ বৈধ হতো, তাহলে জিহাদের বিধান একেবারেই উঠে যেতো। অথচ আমরা সালাফের সিরাতের দিকে তাকাই: তারা একই সাথে কাফের মুরতাদদের সাথেও কিতাল করেছেন, খাওয়াজেরদের সাথেও করেছন। উমাইয়া আব্বাসি উভয় খেলাফতকালেই খাওয়ারেজদের দৌরাত্ম্য

ছিল। সালাফ তাদের বিরুদ্ধেও কিতাল করেছন, কাফেরদের বিরুদ্ধেও।

মুহাতারাম পাঠক! আমাদের দায়িত্ব ছিল সালাফের পথে চলা। খাওয়ারেজদের ভ্রান্ত মানহাজ সংশোধনের চেষ্টা করা। তাদের ব্যাপারে অপরাপর মুসলমানদের সচেতন করা। হক মানহজা ও হক মুজাহিদ জামাতের প্রচার প্রসার করা। লোকদেরকে তাদের জামাতে ভিড়ানো। হকপন্থীদের সাথে হয়ে কুফরের বিরুদ্ধে কিতাল করা। বিভ্রান্ত শ্রেণীর ভুল-ভ্রান্তিকে অজুহাত বানিয়ে ঢালাওভাবে মুজাহিদদের সমালোচনা করা, জিহাদ পরিত্যাগের সুযোগ খোঁজা এবং অন্যকেও বিমুখ করার চেষ্টা করা- এগুলো হকঅন্বেষী কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না। এগুলো তো ছিল মুনাফিকদের চরিত্র। ঠুনকো অজুহাতে সাহাবাদের সমালোচনা করতো। জিহাদ তরকের সুযোগ খুঁজে বেড়াতো।

উলামায়ে কেরামের উচিৎ মুজাহিদদের সমালোচনার বেলায় আল্লাহকে ভয় করা। একের দোষ অন্যের ঘাড়ে না চাপানো। আল্লাহর ফরয বিধানগুলো তরক করার বাহানা তালাশ না করা। শুধু ভুল খোঁজে না বেড়িয়ে মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে

একটু ফিকির করা। মা-বোনদের আহাজারিতে একটু কান দেয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

“প্রত্যেক ব্যক্তি যা কামাই করে তা কেবল তার উপরই বর্তাবে। কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।” -আনআম ১৬৪

আরো ইরশাদ করেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিজেদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধন কর এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা- যদি (প্রকৃত অর্থেই) তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।” -আনফাল ১

আরো ইরশাদ করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না আল্লাহর রাস্তায় এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য? যারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে নিন এ

জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং নিযুক্ত করে দিন আপনার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যকারী।" -নিসা ৭৫

***

২৭.খেলাফত না থাকলে কি অন্য কোন তানজীম করা যাবে না? একটি সংশয়ের নিরসন

এক ভাই একটা হাদিস উল্লেখ করে বর্তমান যামানার আলোকে হাদিসটির ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। ভাইয়ের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, এ হাদিসের আলোকে বর্তমান যামানায় - যেখানে খেলাফত নেই – অন্য কোন জিহাদি তানজীম গঠন করা বা তাতে যোগ দেয়া নাজায়েয প্রমাণিত হয়। হাদিসটি সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য কিতাবে এসেছে। সহীহ বুখারীতে হাদিসটি এমন:

بَاب كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا

دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

“হুযাইফাহ ইবনু ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণের বিষয়াবলী জিজ্ঞেস করত। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে পেয়ে না বসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো জাহিলীয়্যাত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে কিছুটা ধূম্রজাল থাকবে। আমি প্রশ্ন করলাম, এর ধূম্রজাল কিরূপ? তিনি বললেনঃ এক জামা‘আত আমার তরীকা ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। তাদের থেকে ভাল কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!

তাদের কিছু স্বভাবের কথা আমাদের বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদের লোকই এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে কী করতে হুকুম দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি আরজ করলাম, যদি তখন মুসলিমদের কোন (সংঘবদ্ধ) জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তাহলে তুমি তখন ঐ সকল (গোমরাহ) দল-মত পরিত্যাগ করে আলদা হয়ে যাবে। এ কারণে যদি কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকতে হয়- তাহলেও। যতক্ষণ না সে (বিচ্ছিন্ন) অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।" – **সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ৬৬৭৩**

হাদিসে সংশয়ের অংশটুকু হল, فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا (তুমি তখন ঐ সকল দল-মত পরিত্যাগ করে আলদা হয়ে যাবে।)

সংশয়ে যারা পড়েছেন তারা বলতে চাচ্ছেন, এ অংশ থেকে বুঝা যায়, খেলাফত না থাকলে অন্য সকল দলমত পরিত্যাগ করে আলাদা হয়ে যেতে হবে। কোন দল বা তানজীমে যোগ দেয়া যাবে না। বর্তমানে যেহেতু খেলাফত নেই, তাই কোন জিহাদি তানজীম করা যাবে না। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও একাকী থাকতে হবে।

এ হলো সংশয়। যেহেতু এ পোস্ট যাদের নজরে পড়বে, তাদের কেউ কেউ হাদিসের সহীহ ব্যাখ্যা না জানার কারণে সন্দেহের শিকার হয়ে পড়তে পারেন, তাই সন্দেহ নিরসনকল্পে হাদিসের সহীহ ব্যাখ্যা তুলে ধরা আবশ্যক মনে করছি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ্।

হাদিসের সহীহ ব্যাখ্যায় গেলে দুই দিক থেকে সন্দেহটা খণ্ডন হয়ে যায়:

এক.

হাদিসে হক-বাতিল সকল দল ও তানজীম পরিত্যাগ করতে বলা হয়নি, বরং গোমরাহ দল পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। এসব গোমরাহ দলের পরিচয় হাদিসে একটু আগেই এভাবে দেয়া হয়েছে,

دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا

‘জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।’

হাদিসের পরের অংশে এদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে, فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا (তুমি তখন ঐ সকল দল-মত পরিত্যাগ করে

আলদা হয়ে যাবে।)

হাদিসের উদ্দেশ্য, খেলাফতে রাশেদা পার হওয়ার পর ফেতনা দেখা দেবে। তখন যদিও খেলাফত থাকবে, কিন্তু খেলাফতের রাশেদার মতো হবে না। তারা বিভিন্ন *জুলুম অত্যাচার ও গোমরাহির শিকার হবে। এ সময় জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী বিভিন্ন ফেরকা সৃষ্টি হবে। তোমরা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না। ইমামুল মুসলিমীন ও তার জামাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। যদিও তারা জালেম ও অত্যাচারি হয়, তথাপি তাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করে ঐসব বিচ্ছিন্ন ও গোমরাহ এবং জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী দলসমূহের কোনটাতে গিয়ে মিলিত হবে না। আর যদি খেলাফত না থাকে, তাহলে বিচ্ছিন্ন থাকবে। তবুও কোন গোমরাহ দলে মিলিত হবে না। কোন গোমরাহ দলে যোগ দেয়ার চেয়ে একাকী মৃত্যুবরণ করা ভাল।

মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,

قال: "فاعتزل تلك الفرق كلها" أي الفرق الضالة الواقعة على خلاف الجادة من طريق أهل السنة والجماعة. اهـ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘তাহলে তুমি তখন ঐ সকল দল-মত পরিত্যাগ করে আলাদা হয়ে

যাবে’- অর্থাৎ ঐ সকল দল-মত, যেগুলো আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআর সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।” – **মিরকাত: ১৫/৩৪২**

তাহলে হাদিসের অর্থ দাঁড়ালো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা মানহাজ থেকে বিচ্যুত সকল দলমত পরিত্যাগ করতে হবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত দলের সাথে মিলিত হতে হাদিসে নিষেধ করা হয়নি।

এ হাদিসের মর্ম পরিষ্কার হয় অন্য একটি হাদিস দ্বারা। ইমাম তিরিমিযি রহ. বর্ণনা করেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي.

“আমার উম্মত তেয়াত্তর (৭৩) দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাদের এক দল ব্যতীত বাকি সব জাহান্নামী হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে (মুক্তিপ্রাপ্ত) দলটি কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, তারা হল সেই দল, যারা আমি ও আমার সাহাবাদের ত্বরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত।” – **তিরমিযি: ১৭১**

হাদিসটি বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো মিলে হাদিসটি হাসান পর্যায়ের তথা দলীল হওয়ার উপযুক্ত।

এ হাদিসে যে গোমরাহ বায়াত্তর (৭২) ফেরকার কথা বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারেই আমাদের আলোচ্য হাদিসে বলা হয়েছে, فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا(তুমি তখন ঐ সকল দল-মত পরিত্যাগ করে আলদা হয়ে যাবে।) অবশিষ্ট একদল, যারা মুক্তিপ্রাপ্ত হবে, তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের ত্বরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর দল- তাদের সাথে মিলিত হতে নিষেধ করা হয়নি।

দুই.

দ্বিতীয়ত যদি এ হাদিস দ্বারা ব্যাপক অর্থ তথা সকল দলমত ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন থাকার অর্থও গ্রহণ করা হয়, তাহলেও সঠিক আকীদা মানহাজের কোন তানজীম গড়ে তোলা বা তাতে যোগ দেয়া নাজায়েয সাব্যস্ত হয় না। কেননা, শরীয়তের বিধান শুধু দুয়েকটা আয়াত বা হাদিসে থেকে নেয়া যায় না,

শরীয়তের বিধান নিতে হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সকল আয়াত ও হাদিসের সমষ্টি থেকে। সকল আয়াত ও হাদিস একত্র করলে দেখা যাবে একটা হাদিস বাহ্যত আম, কিন্তু অন্য হাদিসের দ্বারা সেটা খাছ। আরেকটা হাদিস বাহ্যত মুতলাক, কিন্তু অন্য হাদিসের দ্বারা সেটা মুকাইয়্যাদ। এভাবে সকল আয়াত হাদিস জমা করে আম-খাছ, মুতলাক-মুকাইয়্যাদ নির্ধারণ করার পর শরীয়তের বিধান গ্রহণ করতে হয়। তখন সঠিক ফলাফল অর্জন হবে। অন্যথায় শুধু বিশেষ কিছু আয়াত বা হাদিসের দিকে তাকিয়ে বিধান গ্রহণ করে নিলে, আর বাকি আয়াত হাদিস ত্যাগ করলে ফলাফল ভুল হবে এবং গোমরাহির শিকার হতে হবে।

আমরা দেখতে পাই, অসংখ্য হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়ে গেছেন, পরিস্থিতি যা-ই হোক, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বীনের জন্য কিতালরত একটা দল সর্বদাই বিদ্যমান থাকবে। যাদেরকে ‘তায়েফায়ে মানুসুরাহ্’ বলা হয়। তাদের মাঝেই ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং সর্বশেষ তারাই দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস এসেছে। যেমন, সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة - قال - «
فينزل عيسى ابن مريم -صلى الله عليه وسلم- فيقول أميرهم تعال صل لنا.
فيقول لا. إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة ».

"আমার উম্মতের একটা দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। (এই ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) অবশেষে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম (তাদের মাঝে) অবতরণ করবেন। তখন তাদের আমীর (অর্থাৎ ইমাম মাহদি) তাঁকে বলবেন, 'আসুন, আমাদের নিয়ে নামায পড়ান।' তিন বলবেন, না। তোমরা নিজেরাই পরস্পর পরস্পরের আমীর। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের সম্মানস্বরূপ।" – **সহীহ মুসলিম: ৪১২**

এ ধরণের অসংখ্য হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা-মানহাজবিশিষ্ট একটা দল সর্বদাই কিতাল করতে থাকবে।

অন্যদিকে বিভিন্ন হাদিস থেকে এটাও প্রমাণিত [যেমনটা আমাদের আলোচ্য হাদিসের এ অংশ থেকেও বুঝা যায়- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ- যদি তখন মুসলিমদের কোন (সংঘবদ্ধ) জামাআত ও ইমাম না থাকে?] এমন একটা সময় আসবে, যখন মুসলমানদের কোন একক খলিফা থাকবে না। কিন্তু

তায়েফায়ে মানুসুরার হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে, খলিফা না থাকার এ সময়েও একটা দল জিহাদরত থাকবে।

যদি খলিফা না থাকাবস্থায় যেকোন দল ও তানজীম নাজায়েয হতো, তাহলে তায়েফায়ে মানুসুরাও নাজায়েয হতো। অথচ হাদিসে এ তায়েফাকে মুসলমানদের জন্য সুসংবাদরূপে বিষয় বলা হয়েছে। এ তায়েফার সাথে মিলিত হওয়ার কথা এসেছে। সকলে একমত যে, সামর্থ্য পেলে ফেতনার সময় এ তায়েফার সাথে মিলিত হতে হবে। তার সাথে মিলে কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে।

এবার যদি আমরা উভয় শ্রেণীর হাদিস সমন্বয় করি, তাহলে স্পষ্ট বুঝে আসবে, যে হাদিসে বলা হয়েছে- فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا , সে হাদিসে তায়েফায়ে মানুসুরা অন্তর্ভুক্ত নয়। তায়েফায়ে মানসুরার হাদিস দ্বারা এ হাদিস এবং এ ধরণের অন্যান্য হাদিস মাখসূস হয়ে যাবে। অর্থাৎ ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য না হয়ে বিশেষ ফেরকা তথা গোমরাহ ফেরকা থেকে নিষেধ করা উদ্দেশ্য হবে। **ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) এ বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন,**

هذه الأحاديث وما جانسها معناها الخصوص، وليس المراد بها أن الدين ينقطع كله فى جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شىء؛ لأنه قد ثبت عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبًا كما بدأ، وروى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على) : (قال: قال النبى (صلى الله عليه وسلم
الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال) ... فبين (صلى الله عليه وسلم)
فى هذا الخبر خصوصه سائر الأخبار التى خرجت مخرج العموم. اهـ

"এ সকল হাদিস এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদিসের দ্বারা বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য (ব্যাপকতা উদ্দেশ্য নয়)। এমনটা উদ্দেশ্য নয় যে, দুনিয়ার সকল ভূখণ্ড থেকে দ্বীনে ইসলাম এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যে, তার কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে যে, কেয়ামত পর্যন্তই দ্বীনে ইসলাম টিকে থাকবে। তবে দুর্বল হয়ে পড়বে। ইসলামের শুরু যামানার মতো গরীব-অসহায় হয়ে পড়বে। যেমন, হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের একটা দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা কিতাল করতে থাকবে। (এই ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটি মাসীহে দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে।' ... রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ হাদিসের দ্বারা (বাহ্যত) ব্যাপকতা নির্দেশক অন্য সকল হাদিস খাছ হয়ে যাবে তথা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হবে।" – **শরহু সহীহিল বুখারী লি ইবনি বাত্তাল: ১০/৬০**

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) তিনিও একই কথা বলেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি স্পষ্ট যে, হাদিসের নিষেধাজ্ঞা গোমরা দলের ব্যাপারে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা মানহাজ বিশিষ্ট দল গঠন করতে বা তাতে যোগ দিতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং জিহাদের প্রয়োজনে অনেক সময় তা আবশ্যক- যেমনটা অন্যান্য পোস্টে আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

২৮.গণতন্ত্রকে যারা মরা গরুর মতো জায়েয বলেন

মুফতি কাজি ইব্রাহিম সাহেব গণতন্ত্রকে মরা গরুর মতো জায়েয বলেছেন। অর্থাৎ গণতন্ত্র হারাম তবে নিরুপায় হয়ে করতে হচ্ছে। এজন্য জায়েয। যেমন- নিরুপায় অবস্থায় মরা গরুর গোশত খাওয়া জায়েয। এ ধরণের আরো যুক্তি আরো অনেকেই দিয়ে থাকেন।

তারা যদি গণতন্ত্রকে হারাম মনে করে থাকেন, তাহলে গণতন্ত্রে যোগ দেয়ার আগে বুঝে নিতে হবে: কোনো হারামে লিপ্ত হওয়া কখন বৈধ হয়?

হারাম থেকে বেঁচে থাকা ফরয। হারামে লিপ্ত হওয়া হারাম। যেমন, নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। হত্যা করা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। হত্যা করা হারাম।

গণতন্ত্র যদি হারাম হয়ে থাকে, তাহলে তাতে লিপ্ত হওয়া হারাম। তা থেকে বেঁচে থাকা ফরয।

নিরুপায় অবস্থায় কি সব হারাম বৈধ হয়ে যায়?

সাধারণত অনেকে মনে করেন, নিরুপায় অবস্থায় সব হারাম বৈধ হয়ে যায়। ব্যাপকভাবে এ কথা সহীহ নয়। নিরুপায় অবস্থায় সকল হারাম বৈধ হয়ে যায় না। নিরুপায় অবস্থায় কেবল সেসব হারামই বৈধ হয়, যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা নিরুপায় অবস্থায় বৈধ করেছেন। যেমন, মৃত প্রাণী ভক্ষণ। এটা নিরুপায় অবস্থায় বৈধ। কিন্তু কোন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। যদি কারো মাথায় অস্ত্র ঠেকানো হয় যে, যদি তুই মৃত প্রাণীর গোশত না খেয়েছিস, তাহলে তোকে হত্যা করে দেব; তাহলে তার জন্য তা খাওয়া হালাল। কিন্তু যদি কারো মাথায় অস্ত্র ঠেকানো হয়

যে, যদি তুই অমুক মুসলমানকে হত্যা না করিস, তাহলে তোকে হত্যা করে দেব; তাহলে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য মুসলমান হত্যা জায়েয হবে না। যদি হত্যা করে, তাহলে হারাম হবে। আল্লাহ তাআলা মাফ না করলে জাহান্নামী হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } [النساء 93]

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে জেনে-শুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যাতে সে সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তার উপর রুষ্ট হবেন ও তাকে লা’নত করবেন। আর তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন মহা শাস্তি।”- নিসা ৯৩

আল্লাহ তাআলা অন্যায়ভাবে মুসলমান হত্যা হারাম করেছেন। অন্য কোন আয়াতে বা হাদিসে এর বৈধতা দেননি। অতএব, নিরুপায় অবস্থায় এবং জীবন বাঁচানোর স্বার্থেও কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা জায়েয নয়।

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله بإتفاق المسلمين وإن اكرهه بالقتل. اهـ

“কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন নিরপরাধ

মুসলমানকে হত্যা করতে বাধ্য করলে তার জন্য তাকে হত্যা করা জায়েয হবে না- যদিও তাকে হত্যার ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে। এ ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত।”- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৫৩৯

আল্লামা মারগিনানি রহ. (৫৯৩ হি.) বলেন,

"وإن أكرهه بقتله على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل، فإن قتله كان آثما" لأن قتل المسلم مما لا يستباح لضرورة ما. اهـ

“যদি হত্যার ভয় দেখিয়ে কাউকে অন্য কোন মুসলমান হত্যা করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে হত্যার অনুমোদন হবে না। নিজেকে হত্যা করা হলেও বিরত থাকবে। যদি হত্যা করে ফেলে তাহলে গুনাহগার হবে। কেননা, যতই জরুরত ও নিরুপায় অবস্থা হোক, কোন মুসলমান হত্যা বৈধ নয়।”- হিদায়া ৩/২৭৪, কিতাবুল ইকরাহ

নিরুপায় অবস্থায় কাকে বলে?

গণতন্ত্রকে যারা মরা গরুর মতো জায়েয বলেন, তাদের কাছে প্রশ্ন- নিরুপায় অবস্থা কাকে বলে?

যখন হারাম করলে ফায়েদা ও লাভ হবে, কিন্তু না করলে ক্ষতি হবে না- তাকে জরুরত বলে না। একে নিরুপায় অবস্থা বলে না।

যখন হারাম না করলে লোকসান বা কষ্ট হবে- একেও জরুরত বা নিরুপায় অবস্থা বলে না।

নিরুপায় অবস্থা বলে একে যে, হারামে লিপ্ত না হলে জীবন চলে যাওয়াটা প্রায় নিশ্চিত। কিংবা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হওয়া বা দীর্ঘ দিনের জন্য বা অত্যন্ত জুলুমপূর্ণ জেলে আটক হওয়া প্রায় নিশ্চিত। একে জরুরত বলে। একে নিরুপায় অবস্থা বলে।

যখন কোন ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে যে, যদি এই হারামে লিপ্ত না হয়, তাহলে তার জীবন চলে যাবে বা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হবে কিংবা জেলে বন্দী হবে- তাহলে তাকে বলা হবে, সে নিরুপায় অবস্থার সম্মুখীন। এই নিরুপায় অবস্থায় আল্লাহ তাআলা কিছু হারামে লিপ্ত হওয়া জায়েয করেছেন| যেমন- মদ, শুকর বা মৃত খাওয়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ

[اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة173
"তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। অবশ্য যে ব্যক্তি চরম নিরুপায় অবস্থায় পতিত হয় (ফলে এসব নিষিদ্ধ বস্তু হতে কিছু খেয়ে নেয়) আর তার উদ্দেশ্য মজা ভোগ করা না হয় এবং (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রম না করে, তার কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"- বাকারা ১৭৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة 3]

"কেউ যদি ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয় (ফলে হারাম বস্তু ভক্ষণ করে) আর গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা না করে, তাহলে আল্লাহ্ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"- মায়েদা ৩

ক্ষুধার তাড়নায় যখন জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং হারাম ছাড়া অন্য কোন হালাল খাবার না পাওয়া যায়, তখন আল্লাহ তাআলা হারাম ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। তবে দুই শর্তে:

ক. মজা সম্ভোগের জন্য খেতে পারবে না।
খ. প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে পারবে না। যতটুকুতে জীবন বাঁচে শুধু ততটুকু।

আয়াতে আল্লাহ তাআলা ক্ষুধার তাড়নায় জীবনের আশঙ্কা হলে প্রয়োজন পরিমাণ হারাম ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। আইম্মায়ে কেরাম এ থেকে বের করেছেন, ক্ষুধার তাড়নায় জীবনের আশঙ্কা হলে যেমন হারাম ভক্ষণ বৈধ, অন্য কোন কারণে জীবনের আশঙ্কা হলেও হারাম ভক্ষণ বৈধ।

এখানে লক্ষণীয় যে, নিরুপায় অবস্থায় আয়াতে শুধু হারাম ভক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্য কোন হারামে লিপ্ত হওয়ার অনুমতির কথা আয়াতে নেই। তবে অন্যান্য আয়াত ও হাদিসের দ্বারা আরো কিছু হারাম ও কুফরে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়। বিশেষত যেসব বিষয় একান্ত আল্লাহ তাআলার হক, যেগুলোতে বান্দার ক্ষতি হয় না, সেগুলোর বৈধতা আছে। বিস্তারিত ফিকহের কিতাবাদিতে দেখা যেতে পারে।

বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের আলোকে নিরুপায় অবস্থা বলতে-

জীবনের আশঙ্কা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্টের আশঙ্কা বা দীর্ঘ মেয়াদী কিংবা অতিশয় জুলুমপূর্ণ জেল সাব্যস্ত হয়। বিস্তারিত ফিকহের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

তাহলে সারকথা দাঁড়াল:

- শরীয়তের স্বাভাবিক নিয়ম, হারামে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।
- একান্ত নিরুপায় ও জীবনের আশঙ্কামূলক ক্ষেত্র হলে কোন কোন হারামে লিপ্ত হওয়া বৈধ। আর কিছু হারাম এমন আছে, যেগুলোতে কোন অবস্থাতেই লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। জীবন গেলেও না।

গণতন্ত্রকে যারা হারাম বলা সত্ত্বেও জায়েয বলেন, তাদের নিকট প্রশ্ন:

গণতন্ত্র কোন ধরণের হারাম? নিরুপায় অবস্থায় যে ধরণের হারামে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি আছে সে ধরণের হারাম, না'কি যে ধরণের হারামে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি নেই সে ধরণের হারাম?

যদি উত্তর হয়, যে ধরণের হারামে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি নেই, সে ধরণের হারাম- তাহলে তো পরিষ্কার যে, গণতন্ত্র করা যাবে না। নিরুপায় হলেও না।

আর যদি উত্তর হয়, যে ধরণের হারামে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি আছে সে ধরণের হারাম; তাহলে:

প্রথমত জিজ্ঞেস করি, কুরআন সুন্নাহয় এর দলীল কি?

দ্বিতীয়ত: জায়েয হলে সকলের জন্য জায়েয, না'কি একান্ত নিরুপায় যারা তাদের জন্য জায়েয?

এটার উত্তর একটাই যে, একান্ত নিরুপায় যারা কেবল তাদের জন্যই জায়েয, বাকিদের জন্য হারাম।

তাহলে বেশির চেয়ে বেশি এটা বলা যায়, গণতন্ত্রে যোগ না দিলে যাদের প্রাণ যাবে বা জেল-জুলুমের শিকার হবে, কেবল তাদের জন্যই জীবন বাঁচে পরিমাণ বা জেল-জুলুম দূর করা যায় পরিমাণ জায়েয। এর বেশি জায়েয নয়। বাকিদের জন্যও জায়েয নয়।

যেমন, কারো পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, সে ভোট না দিতে গেলে তাকে গ্রেফতার করা হবে, তাহলে তার জন্য ভোট কেন্দ্রে যাওয়া জায়েয। তবে যদি ভোট না দিয়ে পারা যায় বা না ভোট দেয়া যায় বা ভোট নষ্ট করে ফেলার সুযোগ থাকে,

তাহলে ভোট দেয়া জায়েয হবে না। কেননা, গ্রেফতারি থেকে বাঁচার জন্য শুধু ভোট কেন্দ্রে যাওয়াই যথেষ্ট। গোপন কক্ষে যখন ভোট দেবে, তখন কেউ সামনে থাকবে না। তাই ভোট দিতে সে বাধ্য নয়। হ্যাঁ, কাউকে যদি সামনাসামনি ভোট দিতে বলে, তাহলে তার কথা ভিন্ন।

তাহলে গণতন্ত্রকে যারা মরা গরুর মতো জায়েয বলেন, তাদের কথা মতোও কেবল তাদের জন্যই জায়েয, যারা নিরুপায়। যাদের গ্রেফতারি বা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য গণতন্ত্র নামক হারামে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন কোন উপায় নেই। তাও কেবল ততটুকুই জায়েয, যতটুকুতে গ্রেফতারি বা মৃত্যু প্রতিহত হয়। এর বেশি নয়। যাদের গ্রেফতারি বা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে না, তাদের জন্য জায়েয নেই। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বেশি বলার সুযোগ নেই। তাহলে তারা ঢালাওভাবে সকলের জন্য – এমনকি মাহদি আলাইহিস সালামের আগমন পর্যন্ত- কিভাবে গণতন্ত্রকে জায়েয বলছেন?

২৯.গুপ্তচরবৃত্তি ধ্বংসকরণ আলকায়েদা জাযিরাতুল আরব নিরাপত্তা পরিষদের বিবৃতি

আলহামদু লিল্লাহ! ভিডিওটা ডাউনলোড করেছি। পিডিএফ টেক্সটের সাথে মিলিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনেছি। এই সিরিয়ালের সবগুলো ভিডিও খুব মনোযোগের সাথে ফিকির নিয়ে দেখা উচিৎ হবে।

গোয়েন্দাদের জবানবন্দীগুলো প্রায়টাই আঞ্চলিক আরবীতে। আরবীজান্তা ভাইদের যারা আঞ্চলিক আরবী পারেন না তাদের জন্য এর তরজমা করা কঠিন। আর বাকি পূর্ণ ভিডিওটি ভাষ্যকারের বক্তব্য। এটি সহজ সরল আরবী। তরজমা সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। জবানবন্দীর তরজমার জন্য আঞ্চলিক আরবীতে পারদর্শী কাউকে না পাওয়া গেলে ইংরেজীতে পারদর্শী ভাইয়েরা ইংলিংশ সাবটেইল থেকে সেটা তরজমা করে দিতে পারেন। তাহলে এ অংশটা আরবী পারদর্শীদের

জন্য সহজ হবে। আর বাকি অংশ তারা নিজেরাই তরজমা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

ফোরামের সবাই তরজমার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আমি ইনশাআল্লাহ ভিডিওর শুরুর অংশের তানজীমের নিরাপত্তা পরিষদের বিবৃতিটুকু তরজমা করে দিচ্ছি।

هدم الجاسوسية

গুপ্তচরবৃত্তি ধ্বংসকরণ

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)

"আর বলুন, 'হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে । আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি'। এবং বলুন, 'হক এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল'।" (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮০-৮১)

নিরাপত্তা পরিষদের বিবৃতি

তারিখ: যিলহজ্ব, ১৪৩৯হি.

আলকায়েদা জাযিরাতুল আরব শাখার নিরাপত্তা পরিষদের বিবৃতি

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد

পূর্ণ এক বৎসর সক্রিয় ও নিরবিচ্ছিন্ন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের পর আল্লাহ তাআলা জাযিরাতুল আরবের মুজাহিদগণকে সউদি প্রশাসনের গোয়েন্দা বিভাগের অন্তর্গত গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ধরে ফেলার তাওফিক দিয়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে কেবলই আল্লাহ তাআলার ইহসান ও তাওফিকে।

এই গোয়েন্দা সেলটি ইয়ামানে আমেরিকান বিমান হামলার বড় অংশের এবং তানজীমের

অভ্যন্তরে সৃষ্ট অধিকাংশ হাঙ্গামার মূল কারণ বলে ধরা হয়। তদ্রূপ এই সেলটি শত্রুর নিকট বিমান হামলার নকশা বাস্তবায়নের দায়িত্বও পালন করতো।

এই সেলটি শুধু গোয়েন্দাবিমানের জন্য ইলেকট্রনিক সিম কার্ড স্থাপনেই সীমাবদ্ধ থাকতো না, বরং তানজীমের সাথে দুশমনদের কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাদের উপদেষ্টার ভূমিকাও পালন করতো।

এই সেলের সদস্যরা হল:

১. গোয়েন্দা: ইয়াকুব আলহাজরামি – খালেদ বিন সালেম।

২. গোয়েন্দা: আবু উমার আশশিহরি – উসমান

ইবনে আলী আশশিহরি।

৩. গোয়েন্দা: আবু তুরাব আসসুদানী – রাশাদ কুরাশী উসমান।

৪. গোয়েন্দা: আবু আয়েজ আশশারুরী - জাবনুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আশশারুরী।

৫. গোয়েন্দা: হামযা আশশারুরী – সালেহ বিন আলী আশশারুরী।

৬. গোয়েন্দা: আবু আমের আলমক্কী- আব্দুল্লাহ ইবনে না'আম আসসুলামী।

৭. গোয়েন্দা: ফারেস আলকাছিমী- আব্দুররহমান ইবনে মুহাম্মাদ আলকাছিমী।

পরিশেষে-

নিরাপত্তা পরিষদ গোয়েন্দা সেল অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও গ্রেফতারে নিযুক্ত গ্রুপসমূহের সম্মানিত সকল ভাইয়ের প্রতি পূর্ণ শুকরিয়া ও

সম্মান প্রদর্শন করছে। তদ্রূপ পরিষদ সকলের প্রতি প্রভূত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে, যারা পরিষদের সাথে এই প্রচেষ্টায় শরীক হয়েছেন, এর গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন, তাদের সাথে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং এ পথে সীমাহীন কষ্ট বরদাশত করেছেন। আমরা তাদেরকে বলবো- উমর আপনাদের না চিনলেও আপনাদের কোন ক্ষতি নেই, যদি আল্লাহ তাআলা আপনাদের চিনে থাকেন।

وصلى الله وبارك على نبيننا محمد وعلى آله وصحبه،

والحمد لله رب العالمين.

নিরাপত্তা পরিষদ, তানজীমা আলকায়েদা,
জাযিরাতুল আরব
যিলহজ্ব, ১৪৩৯হি. (আগস্ট, ২০১৮ ইং)

৩০.চিরসত্যটি না বললে দোষমুক্ত হতে পারবেন না কিছুতেই

আলেম উলামারা ইসলামের কথা বলেন। ইসলাম সত্য ধর্ম এবং একমাত্র সত্য ধর্ম। সবই বলেন। কিন্তু যখনই উগ্রবাদের কথা আসে, উলামারা মোড় ঘুরিয়ে বলেন, ইসলামে উগ্রবাদ নেই।

নাস্তিকরা বলে, 'সবাই আল্লাহর সৃষ্টি, সবারই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। ভিন্ন ধর্মীদের হত্যা করা হবে কেন'?

তখন উলামারা সুর ঘুরিয়ে বলেন, ইসলামে হত্যা নেই। ইসলাম শান্তির ধর্ম।

নাস্তিকরা পাল্টা প্রশ্ন করে, তাহলে ইসলামের নামে যে জিহাদ হচ্ছে সেটাকে কি বলবেন?

উলামারা তখন ঘুরিয়ে বলেন, ইসলামে জিহাদ আছে। তবে হত্যা নেই। যারা হত্যা করছে তারা ইসলাম বুঝে না। জিহাদ

বুঝে না।

এভাবে উলামারা জিহাদের অপব্যাখ্যা করে গা বাঁচাতে চাইছেন। কিন্তু যখন ইসলামের মূলে আঘাত আসে, ঈমানি তাগাদায় উলামারা আর চুপ থাকতে পারেন না।

যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যখন কটূক্তি হলো, তারা চুপ থাকতে পারলেন না। দাবি করলেন, কটূক্তিকারীদের ফাঁসি দিতে হবে। কিন্তু তখনই সেই এড়ানো অপবাদটি আবার সামনে চলে আসছে। বলা হচ্ছে, জঙ্গিরাও হত্যা করে, আপনারাও হত্যার কথা বলছেন। তাহলে কি আপনারা এদেশে জঙ্গিবাদ কায়েম করতে চাচ্ছেন?

মূর্তি ইস্যুতে ঈমানি তাগাদায়ই উলামারা চুপ থাকতে পারেননি। কিন্তু সেই এড়ানো অপবাদই আবার গায়ে এসে পড়ছে: দেশটাকে আফগানিস্তান বানাতে চাইছেন? তালিবানি মোল্লাতন্ত্র কায়েম করতে চাচ্ছেন? মোল্লা উমরের সাম্প্রদায়িকতা কায়েম করতে চাচ্ছেন, যে মোল্লা উমর মূর্তি ভেঙেছিল?

এভাবে ইসলামের যেকোনো ইস্যু উঠে আসলে উলামারা যখনই কথা বলছেন, তখনই সে জঙ্গিবাদ আর তালেবানির ট্যাগ তাদের উপর এসে পড়ছে; যে জঙ্গিবাদকে তারা এতোদিন ইসলামে নেই বলে আসছিলেন। এভাবে উলামারা এখন পড়েছেন উভয় সংকটে। না পারছেন চুপ থাকতে, আর না পারছেন জঙ্গিবাদের অপবাদ সইতে। না পারছেন আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেদের নিষ্কলুষ রাখতে, আর না পারছেন সরকারের কাছে নিরপরাধ থাকতে।

এ সত্যটিই আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন,

{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)}

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো, তাহলে এর মধ্যে অনেক গরমিল দেখতে পেতো। -নিসা: ৮২

কুরআনের বিধানকে, কুরআনের নির্দেশকে ঘুরিয়ে নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন, তাই সীমাহীন অসংগতির মধ্যে পড়ে গেছেন উলামা সমাজ। যে অপবাদ থেকে তারা আজীবন জানেপ্রাণে বাঁচতে চেষ্টা করছেন, সে অপবাদই এসে পড়ছে তাদের উপর। যতই বুঝাতে চাইছেন যে তারা উগ্র না,

জঙ্গি না, সাম্প্রদায়িক না- সরকারপক্ষকে কিছুতেই আর মানাতে পারছেন না।

মুহতারাম উলামায়ে কেরাম, কুরআনের একটি চিরসত্যকে শুধু তুলে ধরুন, সকল গরমিল দূর হয়ে যাবে। তুলে ধরুন, কাফের আল্লাহর দুশমন। তার দুনিয়াতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। একমাত্র যদি মুসলমান হয় কিংবা জিযিয়া দিয়ে নত হয়ে নিম্নশ্রেণীর নাগরিক হিসেবে লাঞ্ছিত অবস্থায় মুসলিমদের অধীনস্থ হয়ে বসবাস করতে চায়, তাহলেই শুধু বাঁচতে পারবে। অন্যথায় তাই করা হবে যা আল্লাহর নির্দেশ,

{ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}

মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর, পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং তাদের (পাকড়াওয়ের) জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক। -তাওবা: ৫

বলুন: না আছে তোমাদের জানের নিরাপত্তা, না আছে তোমাদের মালের নিরাপত্তা। আমরা তোমাদের হত্যা করবো।

বন্দী করবো। গোলাম বাদী বানাবো। যতক্ষণ না আল্লাহর শাসনের সামনে নত হও।

বলুন, আমরা তালিবানি শাসন কায়েম করতে চাচ্ছি। খিলাফার শাসন কায়েম করতে চাচ্ছি। মূর্তিপূজারি শাসনের অবসান ঘটাতে চাচ্ছি।

মুহতারাম উলামায়ে কেরাম, শুধু এ চিরসত্যটি তুলে ধরুন। তাহলে আর কোনো গরমিল থাকবে না।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে ভয়ানক একটি অপরাধ আপনারা করেছেন: কাফেরকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছেন। কুফরি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হারাম বলেছেন। যার ফলশ্রুতিতে জিহাদের অপব্যাখ্যা আপনাদের করতে হচ্ছে। না পারছেন আল্লাহকে রাজি করতে, না পারছেন তাগুতের কাছে নির্দোষ থাকতে।

আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا}

যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হয়ে পড়বে সংকীর্ণ। -তোয়াহা: ১২৪

***

৩১.চুক্তি এবং কিছু কথা

দরবারি আলেমরা ছাড়াও কোন কোন বড় ব্যক্তি থেকে এ ধরনের কথা শুনা গেছে যে, **বর্তমানে কোনো দারুল হরব নেই। কারণ, জাতিসংঘের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মাঝে চুক্তি হয়ে গেছে। তাই ফিকহ ফাতাওয়ার কিতাবাদিতে যে দারুল হরবের কথা বলা হয়েছে সেটা এ যামানায় নেই। তবে হ্যাঁ, ইজরাঈলকে দারুল হরব বললে বলা যেতে পারে।**

অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে ইজরাঈলও পূর্ণ দারুল হরব না। তবে বললে বলা যেতে পারে বা কেউ কেউ বলেনও।

এ মতের প্রবক্তারা প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন যে, মুসলিম বিশ্বের দালাল শাসকগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক কাফের গোষ্ঠীর সাথে যেসকল চুক্তি করে এসেছে – শরীয়তের মুওয়াফিক হোক কি মুখালিফ- সব ধরনের চুক্তি সহীহ হয়েছে এবং প্রতিটি মুসলিমকে তা মেনে চলতে হবে। যদি চুক্তি

সহীহ না-ই হতো তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকতো না আর সকল কাফের রাষ্ট্র দারুল হরব থেকেও বের হয়েও যেতো না। চুক্তি সহীহ হয়েছে বলেই এমনটা হয়েছে। অতএব, চুক্তি সহীহ হয়নি বলার কোনো সুযোগ তাদের নেই।

কাফেরগোষ্ঠীর সাথে কি কি চুক্তি হয়েছে?

যেসব চুক্তি হয়েছে সেগুলোর অন্যতম হলো,

- মুসলিমদেরকে তাদের রব প্রদত্ত ধর্ম ইসলামের বিপরীতে কুফরি ধর্মের নিয়মকানুন এবং কাফের মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষদের বানানো মনগড়া আইনকানুন দিয়ে শাসন করতে হবে।

- যেকোনো মূল্যে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের সকল আন্দোলন ও প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে হবে। আন্দোলনকারীদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী, দেশদ্রোহী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে জঘন্য অপরাধী সাব্যস্ত করতে হবে এবং যেকোনো মূল্যে তাদেরকে নাস্তানুবাদ করতে হবে। হ্যাঁ, গৃহপালিত ও নামসর্বস্ব কিছু ইসলামী দল রাখতে অসুবিধে নেই, যারা নামে ইসলামিক, কাজে-কর্মে গণতান্ত্রিক।

- সন্ত্রাস দমনের নামে কুফরি বিশ্ব ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যখন ও যেখানে যুদ্ধে নামবে, দালাল শাসকগোষ্ঠী তাদের সমর্থন করবে এবং সর্বপ্রকার সহায়তা করবে।

- যত জায়গায় মুসলিমদের উপর নির্যাতন আসবে, সেগুলোকে উক্ত ভূখণ্ডগুলোর আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে চালাতে হবে এবং দালাল শাসকগোষ্ঠী মুসলিমদের সহায়তার জন্য সেখানে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং অপরাপর মুসলমানদেরকেও করতে দেবে না।

- কোনো মুসলিম দেশ কোনো কাফের দেশে জিহাদের নামে বা অন্য কোনো ইস্যু ধরে আক্রমণ চালাতে পারবে না বা কেউ আক্রমণ চালালে সহায়তা করতে পারবে না, বরং প্রতিরোধ করবে।

এগুলো মৌলিক কিছু পয়েন্ট। এগুলোর বাস্তবতা আমরা এক শতক ধরেই দেখে আসছি।

পরিণতিতে:

- মুসলিম বিশ্ব থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জিহাদ সম্পূর্ণ উৎখাত হয়েছে এবং জিহাদ সবচেয়ে বড় অপরাধে পরিণত হয়েছে, যার অপরাধীরা কোনোভাবেই মাফ পাওয়ার যোগ্য নয়।

- মুসলিমরা আজ রবের শরীয়তের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জন্তু জানোয়ারদের বানানো কুফরি আইনকানুনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

- বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে মুসলিমরা নির্যাতিত। দালাল শাসকগোষ্ঠী সেগুলোকে আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে চুপ করে আছে। বরং সমর্থন করে যাচ্ছে এবং সর্বপ্রকার সহায়তা করে যাচ্ছে।

- যারা নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে দাঁড়াতে চাচ্ছে বা শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন ও জিহাদে নামতে চাচ্ছে তারা জঘন্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বের আগ্রাসনের একক টার্গেটে পরিণত হয়েছে।
মোটামুটি এগুলো চুক্তির মৌলিক ফলাফল।

উপরোল্লিখিত চুক্তি এবং সেসব চুক্তির উপরোল্লিখিত ফলাফলের পরিণতিতে সকল কাফের রাষ্ট্র দারুল হরব থেকে বেরিয়ে গেছে। আজ যারা মুসলিমদের কর্ণধার বলে সমাজে পরিচিত তাদের বক্তব্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সারকথা এটাই।

একটি আপত্তি

হয়তো কেউ আপত্তি করবেন যে, তারা বলেছেন দারুল হরব

রয়নি। কিন্তু তাই বলে যে সেগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ হারাম হয়ে গেছে তা তো জরুরী নয়। দারুল হরব না হলেও তো জিহাদ হতে পারে। যেমন বাগী ও খাওয়ারেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়। তাদের এলাকা তো দারুল হরব হয়ে যায়নি।

জওয়াব

কল্পনার প্রাসাদ নির্মাণ করে লাভ নেই। আকলপ্রসূত নতিজা অনেক বের করা যাবে; বাস্তবতা এর বিপরীত। যারা বলেছেন দারুল হরব রয়নি, তারা কখনও এ অর্থে বলেন না যে, সেগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ জায়েয। দারুল হরব থেকে বের করার মূল মাকসাদই তো জিহাদ হারাম করা। নয়তো দারুল হরব থেকে বের করার কি ফায়েদা আছে তাদের কাছে? তাদের কেউ কেউ তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, সেগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ হারাম। বরং সেসব কাফের রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করার আহ্বানও মুসলিমদের তারা জানিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ তো আরো এগিয়ে বলেছেন, আমেরিকার পক্ষ হয়ে আফগান তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমেরিকার মুসলমানদের জন্য জায়েয। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

পর্যালোচনা

কর্ণধারদের বক্তব্য ও বক্তব্যের ফলাফল আমরা দেখলাম। এবার শরীয়তের আলোকে আমরা একটু পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

এক.

চুক্তি মুসলমানদের উপর বর্তানোর জন্য চুক্তিকারী ঈমানদার হতে হবে। আর বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বেঈমান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মু'মিনদের উপর কোন (কর্তৃত্বের) পথ রাখবেন না।" –নিসা ১৪১

কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

ومنها: الإسلام، فلا يصح أمان الكافر. اهـ

"আমান (শান্তি চুক্তি) সহীহ হওয়ার আরেক শর্ত হল- আমানদাতা (চুক্তিকারী) মুসলমান হওয়া। কাজেই কাফেরের আমান (চুক্তি) সহীহ নয়।" -বাদায়িউস সানায়ি': ১৫/৩০৪

তারা হয়তো এর জওয়াবে বলবেন, আমরা শাসকদের কাফের মনে করি না। উলূল আমর মনে করি। খলিফা-সুলতান মনে করি।

তখন দ্বিতীয় পয়েন্ট আসবে:

দুই.
চুক্তিকারীরা মুসলমানদের প্রতিনিধি নয়। মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের প্রতিনিধি বানায়নি। তারা নিজেরাই অস্ত্রবলে কাফেরদের সাথে আঁতাত করে মুসলমানদের উপর চেপে বসেছে এবং সুবিধামতো চুক্তি করে এসেছে। চুক্তির বিষয়াশয় মুসলমানদের সামনে পেশ করলে নিশ্চিত যে, জনসাধারণ এ ধরনের চুক্তি মানতো না।

এর উত্তরে হয়তো সহজেই তারা বলবেন, অস্ত্রবলে চেপে বসলেও খলিফা হয়ে যায়। আর খলিফার চুক্তি জনসাধারণের জন্য পালনীয়।

আমরা অবশ্য মেনে নিতে পারি না যে, চেপে বসলেই খলিফা হয়ে যায়। কেননা, খলিফা হওয়ার জন্য শরীয়ত কায়েম করা শর্ত। যেমনটা হাদিসে এসেছে,

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا

"যদি তোমাদের উপর কোনো গোলামকেও আমীর বানানো হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, তাহলে তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য

করবে।” –সহীহ মুসলিম ৪৮৬৪

অতএব, যে আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করবে না, কুফুর দিয়ে শাসন করবে সে আমাদের কেউ নয়। সে আমাদের, আমাদের ধর্মের এবং আমাদের রবের দুশমন। তাগুত।

কথা প্রসঙ্গে যদি মেনেও নেই যে, তারা মুসলমানদের উলূল আমর তবুও আপত্তি কাটছে না-

তিন.

চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য চুক্তি শরীয়ত অনুযায়ী হতে হবে। শরীয়ত বিরোধী চুক্তি শত হাজারো বার করলেও সহীহ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

“আল্লাহর কিতাবে নেই এমন যে কোন শর্তই বাতিল; যদিও শত শর্ত হয়।” -সহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ২১৬৮

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন,

«الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» [رواه الترمذي (1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح

"মুসলমানদের পরস্পরে সন্ধি বৈধ। তবে এমন সন্ধি নয়, যা কোন হালালকে হারাম করে বা কোন হারামকে হালাল করে। মুসলমানগণ তাদের কৃত শর্ত মেনে চলবে। তবে এমন শর্ত নয় যা কোন হালালকে হারাম করে বা হারামকে হালাল করে।" -সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ১৩৫২; আলমু'জামুল কাবীর- তাবারানী, ১৭/২২

ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

فإن أعطي الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه ما لا يصلح في الإسلام لقوله - صلى الله عليه وسلم - «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» -المبسوط 10\85

"যদি এসব (বাতিল শর্তে) সন্ধি ও যিম্মার চুক্তি করে তাহলে শরীয়তে সহীহ নয় এমন সকল শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহর কিতাবে নেই এমন সকল শর্তই বাতিল'।" –মাবসূত ১০/৮৫

শাসকগোষ্ঠী যদি চুক্তি করে আসে যে, মুসলমানরা নামায পড়তে পারবে না, রোযা রাখতে পারবে না, তাদের মেয়েদেরকে যিনার বাজারে বিকিয়ে দিতে হবে: আশাকরি

কর্ণধারগণও মানবেন না যে এগুলো সহীহ হবে এবং মুসলামনদের মেনে চলতে হবে।

যেসব শর্তের ভিত্তিতে কর্ণধারগণ কাফের রাষ্ট্রগুলোকে দারুল হরব থেকে বের করতে চাচ্ছেন সেসব শর্তের প্রত্যেকটাই শরীয়ত বিরোধী। আজীবনের জন্য জিহাদ বন্ধ করে দেয়া ও জিহাদকে অপরাধ সাব্যস্ত করা, শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে কুফরি আইন দিয়ে শাসন করা, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদের সহায়তা দেয়া, মুসলমানদেরকে কাফেরদের জুলুমে ঠেলে দেয়া- এসব শর্ত যে শুধু শরীয়ত বিরোধী তাই নয়, বরং কুফর। এ ধরনের চুক্তি সহীহ বলার কোনো সুযোগ নেই। আর মুসলমানদের জন্য মেনে চলা আবশ্যক হওয়ার তো প্রশ্নই নেই। আশাকরি কর্ণধারগণও এ ব্যাপারে দ্বিমত করবেন না।

চার.

এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, চুক্তি হতে হবে মুসলমানদের স্বার্থে। যে চুক্তি মুসলমানদের স্বার্থের বিপরীত হবে তা মুসলমানদের উপর বর্তাবে না। মুসলমানরা তা মানতে বাধ্য নয়। মাওসিলি রহ. (৬৮৩হি.) বলেন,

والمعتبر في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين، فيجوز عند وجود المصلحة دون عدمها

“চুক্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় হলো ইসলাম ও মুসলমানদের মাসলাহাত। মাসলাহাত থাকলে জায়েয, অন্যথায় জায়েয নয়।” –আলইখতিয়ার ৪/১২১

শাসকগোষ্ঠী যে কাফেরদের দালাল এবং তাদের সকল চুক্তি যে কাফেরদের স্বার্থে তা চক্ষুষ্মান কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই যে কেউ তা অনুধাবন করতে পারবে।

পাঁচ.

কাফেরদের সাথে কি কি চুক্তি কি কি শর্তে হতে হবে এগুলো শরীয়তে স্পষ্ট। সেসব শর্তে যদি সহীহ চুক্তিও করা হয়, তাহলেও যে দারুল হরব দারুল হরব থেকে বের হয়ে যায় এমন কোনো দলীল কুরআন হাদিসে নেই, আইম্মায়ে মুসলিমিনের কেউ এ কথা বলেছেন বলেও আমার জানা নেই।

অধিকন্তু কাফেররা যখন মুসলমানদের উপর আগ্রাসন চালাবে, তাদের ভূমি দখল করে নেবে, তাদের সম্পদ লুট করবে, তাদের ইজ্জত-আব্রু ও জান-মাল নষ্ট করবে, তাদের ধর্ম মানতে বাধা দেবে এবং কুফরি আইন মানতে বাধ্য করবে তখনও যে চুক্তি বহাল থাকবে এমনও তো কোনো কথা নেই। চুক্তি তো আর এমন কোন বস্তু নয় যে, একবার হয়ে গেলে কেয়ামত পর্যন্ত আর ভাঙবে না। চুক্তি হয়েই থাকে

মুসলমানদের জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু ও দ্বীন-ধর্ম রক্ষার্থে। যখন এগুলোর উপর আগ্রাসন আসবে তখন তো আর চুক্তি বহাল থাকার কোনো অর্থ নেই।

ছয়.

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, শাসকগোষ্ঠী কখনও বলে না যে, তারা শরীয়ত মোতাবেক চুক্তি করেছে তাই জনগণকে তা মানতে হবে। তারা শরীয়তের ধার ধারে না। শরীয়ত তাদের কাছে অচল। তারা শরীয়তের অনুসারিও নয়, শরীয়তের কোনো জায়গা তাদের শাসনের নীতিমালায় নেইও। তারা রাষ্ট্র চালায় সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের কুফরি নীতির আলোকে। কিন্তু কর্ণধারগণ নিজেদের দায় অন্যের পিঠে চাপাতে বারবার বলে বেড়ায় এবং ঠেলেঠুলে প্রমাণ করতে চায় যে, এসব শাসক আমাদের উলূল আমর। আমরা এখন দায়িত্বমুক্ত। শাসকরা যা বলবে তাই আমাদের মাননীয়, পালনীয়। আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

আসলে নিজেদের দায়সারা করতেই এ শোরগোল। কিংবা নিজেদের গদি ঠিক রাখতে। কিংবা পিঠ বাঁচাতে। কিংবা .....।

যারা চুক্তি করেছে তারা চুক্তির যোগ্য নয়, যেসব শর্তে চুক্তি হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী, বরং শরীয়তের

কোনো ধারই ধারা হয়নি, চুক্তি সম্পূর্ণ কাফেরদের মাসলাহাত ও কল্যাণে আর মুসলিমদের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র- তখন সে চুক্তি কিভাবে সহীহ হলো আর সেগুলোর আলোকে কিভাবেই বা সকল দারুল হরব মূহুর্তে তার অস্তিত্ব হারাল বুঝতে পারলাম না।

কর্ণধারগণ অবশ্য তাদের দাবির স্বপক্ষে কোনো দলীল দেন না।

এ মোটামুটি হাকিকত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

৩২.জনসাধারণের উপর সকল মাসআলায় নির্দিষ্ট এক মাযহাবের তাকলীদ আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে একটি সংশয়!

মুফতী শফী রহ. এর **‘জাওয়াহিরুল ফিকহ’** এবং মুফতী তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. এর **‘তাকলীদ কি শরয়ী হাইসিয়্যাত’** কিতাবদ্বয় থেকে বুঝা যাচ্ছে, জনসাধারণের জন্য সকল

মাসআলায় কোন এক মাযহাব মেনে চলা আবশ্যক। যা থেকে বুঝা যাচ্ছে, হানাফী মাযহাবের অনুসারী কোন সাধারণ মুসলামনকে সর্বদা হানাফী মুফতীর কাছেই মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হবে এবং সে অনুযায়ীই আমল করতে হবে। অন্য কোন মাযহাবের মুফতীর ফতোয়া অনুযায়ী আমল করতে পারবে না।

কিন্তু ফতোয়া শামী দেখার পর বিষয়টা খটকা লাগছে। ফতোয়া শামীতে ইবনুল হুমাম রহ. (মৃত্যু ৮৬১ হি.) এর যে বক্তব্য আল্লামা শামী রহ. (মৃত্যু ১২৫২ হি.) উল্লেখ করেছেন এবং তিনি নিজেও তা সমর্থন করেছেন তা থেকে এর বিপরীত বুঝা যাচ্ছে। সেখান থেকে বুঝা যাচ্ছে, সাধারণ জনগণের জন্য সকল মাসআলায় কোন এক মাযহাব মেনে চলা আবশ্যক নয়। তবে যে মাসআলায় একবার কোন মাযহাব মতে আমল করেছে, অনন্যোপায় না হলে সে মাসআলাতে উক্ত মাযহাব থেকে ফিরে গিয়ে অন্য মাযহাব মতে আমল করতে পারবে না। তবে যদি এমন মাসআলা সামনে আসে যে মাসলাতে এখনো সে কোন মাযহাব মতে আমল করেনি তাহলে উক্ত মাসআলাতে অন্য মাযহাব মতেও আমল করতে পারবে। তবে এরপর থেকে অনন্যোপায় না হলে উক্ত

মাসআলাতে উক্ত মাযহাব থেকে ফিরে গিয়ে অন্য মাযহাব মতে আমল করতে পারবে না। কারণ, ইতিপূর্বে যে মাযহাব মতে সে আমল করেছে তা তার বিশ্বাস অনুযায়ী সঠিক ছিল। এখন কোন ওজর ছাড়াই অন্য মাযহাবে চলে যাওয়াটা হবে দ্বীন নিয়ে তামাশার শামিল, যা নিষিদ্ধ। যদি বিশেষ কোন জরুরত ছাড়াই শুধু খাহেশাতের কারণে কিংবা দুনিয়াবী কোন লাভের কারণে অন্য মাযহাবে চলে যায় তাহলে এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। তাকে তা'জীর করা হবে এবং তার আদালাত-ন্যায়পরায়ণতা নষ্ট হয়ে গেছে বলা ধরা হবে। ফলে তার শাহাদাত-স্বাক্ষ্য কবুল হবে না।

এ থেকে বুঝে আসছে, বর্তমানে যারা হারামাইন শরীফাইন বা অন্য এমন কোন অঞ্চলে বসবাস করেন যেখানে বিভিন্ন মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মুফতী বিদ্যমান, তাদের সামনে যদি এমন কোন নতুন মাসআলা আসে যে মাসআলাতে ইতিপূর্বে তারা কোন মাযহাব মতে আমল করেননি, তারা চাইলে উক্ত মাসআলায় নিজের মাযহাবের মুফতীর কাছে না গিয়ে অন্য মাযহাবের মুফতীর কাছে জিজ্ঞাসা করেও আমল করতে পারবেন।

বি.দ্র: তবে এক্ষেত্রে যে মুফতীকে জিজ্ঞাসা করবেন তাকে

অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে। যে কোন আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। তদ্রূপ নিজে কোন বইয়ে পড়ে বা শুনে শুনে আমল করে ফেলা যাবে না।

এবারে আমি আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যটি তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

وفي آخر التحرير للمحقق ابن الهمام: مسألة لا يرجع فيما قلد فيه أي عمل به اتفاقا، وهل يقلد غيره في غيره؟ المختار نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة والشافعي، فقيل يلزم، وقيل لا، وقيل مثل من لم يلتزم، وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعا اهـ ملخصا

"মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহ. এর কিতাব 'আত-তাহরীর' এর শেষের দিকে বলা হয়েছে, 'মাসআলা: ((যে মাসআলায় একবার কোন ইমামের তাকলীদ করে আমল করেছে সে মাসআলা থেকে আর ফিরে আসতে পারবে না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। অন্য মাসআলাতে কি অন্য ইমামের তাকলীদ করতে পারবে? গ্রহণযোগ্য মত হল পারবে। কারণ, অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, সালাফগণ একসময় একজনের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন অন্যসময় অন্যজনের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন। আবশ্যিকভাবে কোন এক মুফতীকেই মেনে

চলতেন না।

যদি কোন এক মাযহাবকে নিজের জন্য মেনে চলা আবশ্যক করে নেয়; যেমন, হানাফী মাযহাব বা শাফিয়ী মাজহাব, তাহলে বলা হয়,

- (উক্ত মাযহাব মেনে চলাই) আবশ্যক হবে।

- আবার এও বলা হয় যে, আবশ্যক হবে না।

- এও বলা হয় যে, এই ব্যক্তির বিধান ঐ ব্যক্তির মতই যে কোন এক মাযহাব মতে চলা নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয়নি।

এই শেষোক্ত মতটিই সঠিক বলে প্রবল ধারণা হচ্ছে। কারণ, শরীয়তে এমন কোন দলীল নেই যা এক মাযহাব মতে চলাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করে।)) সংক্ষিপ্তাকারে ইবনুল হুমাম রহ. এর বক্তব্য শেষ হল।” **[ফাতাওয়া শামী: বাবুত তা’জীর।]**

এ থেকে এও বুঝে আসছে যে, আমরা যারা নিজেদেরকে হানাফী, হাম্বলী ইত্যাদী বলে দাবি করি তাদের জন্য সকল মাসআলাতে হানাফী বা হাম্বলী বা অন্য কোন মাযহাব মতে আমল করা জরুরী নয়। বরং যে মাসআলা নতুন, যাতে এখনোও কোন মাযহাব মতে আমল করিনি, সে মাসআলাতে

অন্য মাযহাব মতে আমল করা যাবে।

আল্লামা শামী রহ. অন্যত্র বলেন,

العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه ثم قال وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقييد بمذهب ولهذا قال في الفتح: الحكم في حق العامي فتوى مفتيه، وفي النهاية ويشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة ... ولا معتبر بغيره. اه (2\411 ، كتاب الصوم)

“সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য ওয়াজিব হল কোন আলেমের তাকলীদ করা, যদি আলেম এমন নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকেন যে, (উক্ত অঞ্চলে) তার ফতোয়া মেনে চলা হয়। ইবনে নুজাইম রহ. এরপর বলেন, ‘এ থেকে বুঝা গেল সাধারণ ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট কোন মাযহাব নেই। মুফতীর ফতোয়াই তাদের মাযহাব। ফাতহুল কাদীরে (ইবনুল হুমাম রহ.) বলেন, ‘সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুফতীর ফতোয়াই তার বিধান।’ ‘আন-নিহায়া’তে বলা হয়েছে, ‘শর্ত হচ্ছে, মুফতী এমন ব্যক্তি হতে হবে যার থেকে ফিকহ-ইসলামী আইনশাস্ত্র আহরণ করা হয় এবং এবং ঐ শহরে তার ফতোয়া গ্রহণ করা হয়। ... এমন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।” **[ফাতাওয়া শামী: কিতাবুস সাওম।]**

এ থেকে বুঝা গেল, যার তার কাছে জিজ্ঞাসা করা যাবে না – যেমনটা আজকাল করা হচ্ছে। মুফতীকে ইলমে ফিকহে এমন পারদর্শী হতে হবে যে, তার থেকে ইলমে ফিকহ শিখা হয় এবং ফতোয়া দানের ক্ষেত্রে এমন দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে যে, তার ফতোয়া উক্ত এলাকায় মেনে চলা হয়।

যারা খাহেশাতের কারণে কিংবা দুনিয়াবী লাভের উদ্দেশ্যে মাযহাব বদলায় তাদের ব্যাপারে বলেন,

أخاف عليه أن يذهب ... يعزر) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا إيمانه وقت النزع؛ لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منتنة، ولو أن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا. أما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه اهـ ملخصا.

“যদি শরীয়তে প্রশংসনীয় কোন উদ্দেশ্য ব্যতীরেকেই বদলিয়ে থাকে তাহলে শাস্তি দেয়া হবে। ... আমার ভয় হয় যে, মৃত্যুর সময় তার ঈমান না'কি চলে যায়। কেননা, সে তার নিজের মাযহাব যা তার বিশ্বাস মতে হক, তার অবমাননা করেছে।

পুঁতি-দুর্গন্ধময় আবর্জনা লাভের উদ্দেশ্যে সে তা ত্যাগ করে দিয়েছে। যদি কোন মুজতাহিদ সুস্পষ্ট ইজতিহাদের ভিত্তিতে নিজ মাজহাব তরক করতো তাহলে প্রশংসিত ও সওয়াবপ্রাপ্ত হতো। কিন্তু মুজতাহিদ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কোন প্রকার দলীল ছাড়াই বরং দুনিয়ার লোভে এবং খাহেশাতের কারণে মাযহাব ত্যাগ করা নিশ্চয় নিন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ, যার ফলে তাকে তা'জীর করা ও শাস্তি দেয়া আবশ্যক। কেননা, সে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিজনক কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং তার ধর্ম ও মাযহাবের অবমাননা করেছে। সংক্ষিপ্তাকারে তাতারখানিয়ার বক্তব্য শেষ হল।" **[ফাতাওয়া শামী: বাবুত তা'জীর]**

বিনা কারণে যারা নিজ মাযহাব বদলায় তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে বলেন,

ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب ، ويستوي فيه الحنفي والشافعي وإن انتقل إليه لقلة مبالاته في الاعتقاد والجراءة على الانتقال من مذهب إلى ... مذهب كما يتفق له ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لا تقبل شهادته ا ه .

"সাধারণ ব্যক্তি এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে যেতে পারবে না। হানাফী-শাফিয়ী সবাই এক্ষেত্রে বরাবর। যদি

আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব প্রদানের কারণে এবং দুনিয়াবী লাভের উদ্দেশ্যে মন মত এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে চলে যাওয়ার প্রতি দু:সাহসিকতার কারণে নিজ মাযহাব ত্যাগ করে তাহলে তার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।”

[ফাতাওয়া শামী: কিতাবুশ শাহাদাত।]

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল,

ক. সাধারণ ব্যক্তির জন্য সকল মাসআলায় এক মাযহাব মানা ওয়াজিব- কথাটা নি:শর্তভাবে প্রযোজ্য নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরত ছাড়াই অন্য মাযহাব মানারও অবকাশ আছে।

খ. যার তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা যাবে না এবং কারো কাছে জিজ্ঞাসা ব্যতীত নিজের মন মতোও আমল করা যাবে না। বরং নির্ভরযোগ্য মুফতীর কাছে জিজ্ঞাসা করে আমল করতে হবে।

গ. যে মাসআলায় যে মাযহাব মেনে আসছে কোন জরুরত ছাড়াই উক্ত মাসআলায় উক্ত মাযহাব ত্যাগ করা দ্বীন নিয়ে তামাশার শামিল, যার কারণে ব্যক্তি শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ে এবং স্বাক্ষ্য প্রদানের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

একটি অনুরোধ:

তাকলীদের এই মাসআলায় আমি ফতোয়া দিচ্ছি না। আমার কাছে খটকা লেগেছে তাই শুধু আরজ করছি। আপনারা কেউ আমার এই লেখার উপর ভিত্তি করেই অন্য মাযহাব মতে আমল শুরু করতে যাবেন না।

এই লেখার দ্বারা উদ্দেশ্য:

আমার উদ্দেশ্য মুফতী শফী রহ. কিংবা মুফতী তাকি উসমানী দা.বা.কে হেয় করা নয়। আমার খটকাটা শুধু আমি পেশ করেছি। তবে এ কথা অবশ্যই সত্য যে, বড়দের পেশকৃত তাহকীক অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে এমনটা নয়। তাঁদের

তাহকীকের উপরও আপত্তি থাকতে পারে। তাঁদের তাহকীকের পরও তাহকীক হতে পারে।

৩৩.জাতীয়তাবাদ (Nationalism): ইসলাম ধ্বংসের মোক্ষম হাতিয়ার!

আল্লাহ তাআলা মানব জাতীকে বিভক্ত করেছেন ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে। সকল ঈমানদার ও মুসলমান এক জাতি, আর সকল কাফের ও অমুসলিম এক জাতি। মুসলমান পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, যে জাতি-গোষ্ঠীরই হোক, যে রঙ-বর্ণেরই হোক, যে ভাষাতেই কথা বলুক- তারা পরস্পর ভাই ভাই। তারা পরস্পর ঈমানী বন্ধন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ। তাদের পরস্পরে মহব্বত, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক। একে অপরকে নুসরত করা, হেফাজত করা, কাফের-মুশরেকদের হাত থেকে একে অপরকে রক্ষা করা, তাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে সহায়তা করা অত্যাবশ্যক। মোটকথা, ইসলামে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' (শত্রুতা-মিত্রতা) ঈমান ও কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত। একে যদি জাতীয়তাবাদ বলা হয়, তাহলে ইসলাম এ জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি দেয়। একে বলা

যেতে পারে ইসলামী জাতীয়তাবাদ। যার মূল ভিত্তি হবে ঈমান ও কুফুর।

পক্ষান্তরে প্রচলিত জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে। তাদের 'ওয়ালা-বারা' তথা মহব্বত-ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ঐক্য-অনৈক্য সব কিছু এসবের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ঈমান ও কুফরে তফাৎ নেই। মুসলিম অমুসলিমের কোন পার্থক্য নেই। মুসলমান-কাফের, ইয়াহুদ-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ কারো মাঝে কোন তফাৎ নেই। যতক্ষণ তারা এক দেশ, এক জাতি কিংবা এক ভাষাভাষী হবে, ততক্ষণ তাদেরকে ভালবাসতে হবে, তাদের সাহায্য-সহায়তা করতে হবে, ন্যায়-অন্যায় সব কিছুতেই তাদের পক্ষাবলম্বন করতে হবে; তাদের কৃষ্টি-কালচার, রীতি-নীতি, প্রথা-প্রচলন, ইচ্ছা-অভিলাষ, খাহেশ-প্রবৃত্তি সব কিছুকেই সংরক্ষণ করতে হবে; তা সঙ্গত কি অসঙ্গত, শরীয়ত সম্মত কি শরীয়ত বিরোধি- কোন কিছুই দেখার সুযোগ নেই। জাতি যেটাকে আইন বানাতে চায়, কুফর কি শিরক- সেটাকেই আইন বানাতে হবে। এভাবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান পরিবর্তিত

হচ্ছে। হারাম হালাল হচ্ছে, হালাল হারাম হচ্ছে।

উল্লেখ্য, জাতীয়তবাদের মূল উদ্দেশ্য, পৃথিবী থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের শাসন-কর্তৃত্ব মুছে ফেলা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের একতা-ঐক্য বিলুপ্ত করে তাদেরকে পরস্পর বিদ্বেষী কতগুলো দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে পরিণত করা আবশ্যক ছিল। জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে পশ্চিমারা এ কাজটিই করতে সক্ষম হয়েছে। দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি: যেখানে যেটা সুবিধা মনে করেছে, সেটারই ধোঁয়া তুলে এক ও ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতিকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছে। সৌহার্দ-ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট করে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও দ্বন্ধে লিপ্ত করেছে। প্রত্যেককে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করে দিয়ে বাকি সমগ্র উম্মাহ থেকে বে-খবর বরং দুশমনে পরিণত করেছে। ফলত মুসলিম জাতি পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির পরিবর্তে একে অপরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই জাতীয়তাবাদের কারণে আজ আরাকান সমস্যা

মুসলিমদের সমস্যা না হয়ে বার্মার স্থানীয় সমস্যা বিবেচিত হচ্ছে। কাশ্মির সমস্যা ভারতের, চেচনিয়া সমস্যা রাশিয়ার স্থানীয় সমস্যা ধরা হচ্ছে। ফিলিস্তিন, আফগান, শাম, ইরাক-সবখানে একই কথা। এগুলো কোন কিছুই যেন মুসলিমদের সমস্যা নয়। এসব নির্যাতিত মুসলমানকে উদ্ধার করা, তাদেরকে নুসরত করা যেন মুসলিম উম্মাহর দায়িত্বে পড়ে না। এগুলো সব স্থানীয় সমস্যা। কারণ, তারা আমাদের দেশের লোক নয়। তারা আমাদের ভাষায় কথা বলে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে ভারত রক্ষায় হিন্দুদের সাথে হয়ে মুসলমানকেও লড়তে হবে- কারণ, সবাই ভারতী। হিন্দু-মুসলিম, নাস্তিক-মুরতাদ সকলে মিলে বাংলার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে- কারণ সবাই বাংলাদেশী। এভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে কাফের-মুশরিক-নামধারী মুসলমান সকলে মিলে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে কিছুতেই পরিপূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কারণ, মুসলমানরা ইসলাম চাইলেও, জাতীর কাফেররা কখনই ইসলাম চাইবে না।   তাই

জাতীয়তাবাদিদেরকে এমন আইন গ্রহণ করতে হবে- হিন্দু-মুসলিম, খৃস্টান-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ সকলেই যার প্রতি সন্তুষ্ট। এভাবে জাতীয়তাবাদ আল্লাহর রুবূবিয়্যাত প্রত্যাখ্যান করে নগণ্য মাখলুককে রবের আসনে সমাসীন করবে, যা সুস্পষ্ট কুফর। ফলে জাতীয়তাবাদি রাষ্ট্র কাফের রাষ্ট্রে পরিণত হতে বাধ্য।

অতএব, এই জাতীয়তাবাদ ইসলামের বিপরীতে নব-উদ্ভাবিত এক কুফরী মতবাদ। যারা এই মতবাদের প্রবর্তক, প্রচারক, ভক্ত; এর জন্য জীবন দেয়- তারা কুফরে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তআলা আমাদের হেফাজত করুন। সব মুসলিমকে এক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

৩৪.জামাআহ্ প্রসঙ্গ: কিছু মৌলিক কথা

জামাআহ্ প্রসঙ্গে এক ভাই কিছু বিষয় জানতে চাচ্ছিলেন। মুহতারাম ভাইয়ের প্রশ্নগুলো দেখে আসছিলাম। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে জওয়াব দেয়ার সুযোগ হয়নি। ইনশাআল্লাহ জামাআর

বিষয়ে মৌলিক কিছু কথা বলছি। বিস্তারিত কিতাবাদিতে খোঁজ করা যেতে পারে। সুযোগ পেলে তানজীমের কোন আলেমের সাথে কথাও বলে নেয়া যেতে পারে।

প্রথমত: আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ দেখতে চান। ঐক্যবদ্ধ থাকলেই শত্রুর বিরুদ্ধে কামিয়াব হওয়া যাবে। অন্যথায় সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ঐক্যবদ্ধ থাকতে আদেশ দিয়েছেন। সব ধরণের বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” (আলে ইমরান: ১০৩)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন, যারা সারিবদ্ধ হয়ে তার রাস্তায় যুদ্ধ করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।” (সফ: ৪)

পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হলে আল্লাহর নুসরত কমে যাবে। শত্রুর সামনে হীনমন্য হয়ে পরাজিত হতে হবে।

আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা`আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।” (আনফাল: ৪৬)

হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলেছেন। বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন থেকে মারা যাবে, সে জাহিলী

যামানার লোকদের মতো মারা যাবে বলে সতর্ক করেছেন।

এক হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه »

“যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘতও সরে গেল, যেন সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খোলে ফেলল।” (আবু দাউদ: ৪৭৬০)

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন,

من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

“কারো কাছে তার আমীরের কোন কিছু অপছন্দনীয় মনে হলে সে যেন সবর করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুলতান থেকে এক বিঘতও সরে গিয়ে মারা গেল, সে জাহিলী মরা মরল।” (বুখারী: ৭০৫৩)

মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য এতই গুরুত্বপূর্ণ যে,

মুসলমানগণ শরয়ী কোন এক খলিফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকাবস্থায় যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি খেলাফতের দাবি করে, তাহলে তাকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما »

"যদি দুই খলিফার বাইয়াত হয়, তাহলে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করে দাও।" (মুসলিম: ৪৯০৫)

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন,

« من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه »

"তোমরা এক ব্যক্তির (অর্থাৎ এক খলিফার) উপর ঐক্যবদ্ধ থাকাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে আসে বা জামাতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে আসে, তাহলে তাকে হত্যা করে দাও।" (মুসলিম: ৪৯০৪)

অতএব, সারা মুসলিম উম্মাহকে এক খলিফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এটাই শরীয়তের নির্দেশ।

তবে এ বিধান হল তখন, যখন খেলাফত কায়েম থাকবে এবং একজন শরয়ী ইমাম বিদ্যমান থাকবেন। তখন তার কাছে বাইয়াত না দিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকা গোমরাহি।

পক্ষান্তরে যদি খেলাফত কায়েম না থাকে, তাহলে খেলাফত কায়েম করতে হবে। এজন্য যুদ্ধ-জিহাদ যা কিছু লাগে করতে হবে। যেমন বর্তমান মুজাহিদ কাফেলাগুলো খেলাফত কায়েমের জন্য জিহাদ করে যাচ্ছেন।
স্পষ্ট যে, খেলাফত কায়েমের জিহাদে নামতে হলে জামাতবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। জামাত ছাড়া জিহাদ সম্ভব না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টার দ্বারা দ্বীনের কিছু খেদমত হলেও দ্বীন কায়েম সম্ভব না। খেলাফত প্রতিষ্ঠাও সম্ভব না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. জামাতের গুরুত্বটা এভাবে তুলে ধরেছেন-

يجب ان يعرف ان ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لاقيام للدين ولا للدنيا إلا بها فان بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض ولابد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبى إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم رواه أبو دواد من حديث أبى سعيد وابى هريرة
وروى الامام أحمد فى المسند عن عبد الله بن عمرو ان النبى قال لا يحل لثلاثة

يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم فأوجب تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولأن الله تعالى اوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والامارة.اه

"জানা আবশ্যক যে, জনগণের নেতৃত্ব দেয়া দ্বীনের অন্যতম সুমহান আবশ্যক দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ব্যতীত বরং দ্বীন-দুনিয়া কোনটাই চলতে পারে না। কেননা, পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ হওয়া ব্যতীত মানব জাতির মাসলাহাতসমূহের পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। কারণ, তারা একে অপরের মুখাপেক্ষী। আর ঐক্যবদ্ধ হতে গেলে তাদের একজন নেতা আবশ্যক। রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এমনটি পর্যন্ত বলেছেন:

إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم

'তিন ব্যক্তি সফরে বের হলে তারা যেন তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।'

ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি হযরত আবু সায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ রহ. মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

‘যে কোন তিন ব্যক্তির জন্য কোন মরু ময়দানে অবস্থান করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের একজনকে তাদের আমীর বানিয়ে নেয়।’

সফরের হালতে সৃষ্টি হওয়া ছোট্ট একটি জামাআতের বেলায়ও একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, সব ধরণের জামাআতের ক্ষেত্রেই আমীর বানিয়ে নেয়া আবশ্যক।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা ‘আমর বিল মা’রুফ ও নাহি আনিল মুনকার’ ফরয করেছেন। আর তা প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব ব্যতীত পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

তদ্রূপ: জিহাদ, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা; হজ্ব, জুমআ ও ঈদ কায়েম করা; মাজলুমকে সাহায্য করা, হদসমূহ কায়েম করা

ইত্যাদিসহ আল্লাহ তাআলার ফরযকৃত যাবতীয় বিধান প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব ব্যতীত পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৯০)

জামাতবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বের ব্যাপারে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য সর্বদা স্বরণ রাখা চাই।

তিনি বলেন:

لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة

"জামাআতবদ্ধ হওয়া ব্যতীত দ্বীনে ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর জামাআত হয় না নেতৃত্ব (তথা আমীর নির্ধারণ) ব্যতীত। আর (আমীরের) আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্বের কোন ফায়েদা নেই।" (জামিউ বয়ানিল ইলম: ১/২৬৩)

অতএব, কোন এক জিহাদি কাফেলার সাথে মিলে যেতে হবে। জিহাদি কাফেলা না থাকলে কাফেলা গঠন আবশ্যক। আর আগে থেকেই থেকে থাকলে তার সাথে মিলে যাওয়া আবশ্যক।

তবে যেকোন কাফেলার ক্ষেত্রেই এটা অত্যাবশ্যক যে, তা শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শরীয়তমতে পরিচালিত হতে হবে। কুরআন হাদিসে যত জায়গায় জামাতের সাথে মিলে থাকার কথা এসেছে, সবখানে জামাত দ্বারা এমন জামাতই উদ্দেশ্য। আল্লাহর রাসূল ও তার সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত জামাত উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে কাফেলা যদি জাতিয়তাবাদি বা ধর্ম নিরপেক্ষ হয় বা অন্য কোন গোমরাহির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তার সাথে যোগ দেয়া যাবে না। তদ্রূপ যদি পরিষ্কার জানা না থাকে যে, তা শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত কি'না- তাহলেও তার সাথে যোগ দেয়া যাবে না। এমন গোলক ধাঁধায় যুক্ত হওয়া নিষেধ। **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,**

ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية

“যে ব্যক্তি এমন ঝাণ্ডা তলে যুদ্ধ করে যা হক না বাতিল জানা নেই, যে তার আপন গোত্রের স্বার্থে ক্রোধান্বিত হয় কিংবা গোত্রের দিকে আহবান করে বা অন্যায়ভাবে গোত্রের সহায়তা করে আর এভাবেই মারা যায়, তাহলে সে জাহিলী মরা

মরল।” (মুসলিম: ৪৮৯২)

সারকথা দাঁড়াল: আপনি যে জামাতের সাথে যুক্ত হবেন, তাতে আবশ্যকীয়ভাবেই দু’টি বৈশিষ্ট থাকতে হবে,

ক. সঠিক আকীদা মানহাজ বিশিষ্ট জিহাদি জামাত হতে হবে।

খ. শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে।

এ দুই বৈশিষ্ট পাওয়া গেলে আপনি ইনশাআল্লাহ তাতে যুক্ত হতে পারেন।

প্রশ্ন: যদি একাধিক জামাত থাকে তাহলে কি করবো?

উত্তর: সকল জিহাদি কাফেলার উচিৎ সকলে মিলে এক কাফেলা গঠন করা। বিচ্ছিন্নতা আল্লাহ তাআলার পছন্দ নয়। তবে যদি বিশেষ পরিস্থিতি ও ওজরের কারণে এক হওয়া

সম্ভব না হয়, তাহলে আলাদা আলাদা থেকেই কাজ করে যাবে। এমতাবস্থায় যার জন্য যে জামাতে যুক্ত হওয়া সহজ এবং উম্মাহ ও জিহাদের জন্য অধিক উপকারী- সেটাতে যুক্ত হয়ে যাবে।

আলেম সমাজ প্রসঙ্গ:

আমাদের বর্তমান আলেম সমাজ মূলত কোন জামাতের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই যাতে যোগ দেয়া যাবে। ব্যক্তি পর্যায়ে যে যেভাবে পারছেন দ্বীনের খেদমত করার চেষ্টা করছেন। অবশ্য ছোটখাট কিছু সংগঠন-ঐক্য আছে। তবে সেগুলো জিহাদি নয়। আর রাজনৈতিক দলগুলো স্পষ্টই গোমরাহিতে লিপ্ত। অতএব, বর্তমান আলেম সমাজ যেভাবে আছেন, এমতাবস্থায় তাদের গণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ থেকে জিহাদের দায়িত্ব আদায় সম্ভব না। জিহাদের জন্য জিহাদি কাফেলায় যোগ দিতে হবে। তবে আলেম উলামাদের দ্বীনি খেদমতমূলক শরীয়তসম্মত যেসব জামাত বা সংগঠন আছে, জিহাদের কাজের ক্ষতি না হয় এমনভাবে তাতে মিলে কাজ করতেও সমস্যা নেই। বরং সামর্থ্যানুযায়ী তাদের সহযোগিতার চেষ্টা করা উচিৎ। কেননা,

আলেম উলামারাই জাতির রাহবার। যদি আলেম উলামারা নেতৃত্বে না থাকেন, তাহলে আমাদের জিহাদি কাফেলাগুলোও হক পথে চলতে পারবে না।

উল্লেখ্য, আলেম উলামারা জামাতবদ্ধ না থাকার কারণে ঢালাওভাবে তারা গোমরাহিতে লিপ্ত আছেন- এমনটা নয়। কারণ, এখন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত নেই। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকলে খলিফার হাতে বাইয়াত না দিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকলে সেটা গোমরাহি হতো। হাদিসে যেখানে বলা হয়েছে যে, বাইয়াত ছাড়া মারা গেলে জাহিলী মরা মরবে- সেখানে এটাই উদ্দেশ্য। তবে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদে যোগ দেয়া, জিহাদি কাফেলা গড়ে তোলা বা থেকে থাকলে তার সাথে মিলে যাওয়া এবং তাকে শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত করা আলেম সমাজের দায়িত্ব। সামর্থ্যানুযায়ী প্রত্যেককে তার দায়িত্ব আদায় করা জরুরী। যার জন্য তানজীমে যুক্ত হওয়া সম্ভব, তাকে তানজীমে যুক্ত হতে হবে। আর যার জন্য সম্ভব নয় বা অতিশয় কষ্টসাধ্য, তিনি সামর্থ্যানুযায়ী দ্বীনের খেদমত করে যাবেন। যতদূর পারেন, জিহাদ ও মুজাহিদদের নুসরত করবেন। এতেই তিনি মাফ পাবেন ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়ত: সাধারণ জনগণকে হকপন্থী আলেম উলামার কথামতো চলতে হবে- চাই তারা বাহ্যত তানজীমে যুক্ত থাকুন না থাকুন। বর্তমান পরিস্থিতি বড়ই কঠিন। আলেম উলামা সকলের জন্য প্রকাশ্যে তানজীমে যুক্ত হওয়া কঠিন। কাজেই তানজীমে যুক্ত থাকা না থাকাকে আনুগত্যের মানদণ্ড বানানো যাবে না। তবে অবশ্যই হকপন্থী হতে হবে। জিহাদ বিরোধী না হতে হবে। সামর্থ্যানুযায়ী হকপন্থী মুজাহিদদের সমর্থন ও নুসরত করেন এমন হতে হবে।

এ হল সাধারণ মাসআলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে। আর যেসব বিষয় তানজীমি কাজের সাথে জড়িত, সেগুলো তানজীমের উলামায়ে কেরাম ও উমারাদের থেকেই নিতে হবে। একান্ত তানজীমি বিষয়ে বাহিরের উলামাদের কথা ধর্তব্য নয়। তানজীমের উলামা ও উমারাগণ যারা এ ময়দানে অভিজ্ঞ, তাদের কথাই মেনে চলতে হবে।

তৃতীয়ত: আলেম যদি জিহাদ বিরোধী হয়, তাহলে তার থেকে দূরে থাকা উচিৎ। তবে শরীয়তের যেসব বিষয় তারা ছাড়া অন্যদের কাছে পাবো না, সেগুলো তাদের কাছ থেকে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। সেগুলো তাদের কাছ থেকে নিতে হবে। আর জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়াশয় সরাসরি মুজাহিদ বা হকপন্থী আলেম উলামা থেকে নিতে হবে।

শায়েখ আবু মুহাম্মদ আলমাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ বলেন,

وأوصي إخواني دوما بأن لا يحرموا أنفسهم من خير يستفيدونه من كائن من كان، ولا يمنعنا انحراف بعض العلماء في أبواب من الدين: أن نستفيد منهم في أبواب لم ينحرفوا فيها؛ خصوصا في زمن شح العلماء الربانيين وندرتهم، وحاجة طالب العلم إلى تلقي بعض أنواع العلوم من أفواه العلماء؛ ولو كان في الأمر سعة وتوفر لنا العلماء الربانيون الذين نرتضي دينهم ونهجهم؛ لما لجأنا لمثل هذا ولما اضطررنا إليه؛ ولَحَرِصنا على تطبيق مقالة السلف: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) ولكن هيهات ذاك في مثل زماننا ... فالحمد لله أولا وآخرا أن علّمنا ويسر التعلم لنا؛ فهدانا إلى تعلم ما نحتاجه لنصرة التوحيد ومحاربة الشرك وإبطال التنديد، فذلك هو المقصود وهو الهدف المنشود؛ ولأجله درسنا وتعلمنا وصبرنا على أخطاء كثير ممن أخذنا عنهم مفاتيح العلوم. اهـ

“আমি সর্বদা ভাইদের অসিয়্যত করি, তারা যেন ইলম অর্জন করা থেকে নিজেদের বঞ্চিত না করে- তা যার কাছ থেকেই

হোক। ইলমের কিছু অধ্যায়ে কিছু আলেমের বিচ্যুতি অন্যান্য বিষয় তাদের কাছ থেকে শিখার প্রতিবন্ধক নয়। বিশেষ করে প্রকৃত আলেমদের সল্পতার এ সময়ে। কেননা কিছু কিছু বিষয় আলেমদের থেকে সরাসরিই শিখতে হয়।

যদি সঠিক আকীদা-মানহাজের আলেমদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করা সম্ভব হতো তাহলে আমরা এধরণের আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করতে বাধ্য হতাম না। তখন আমরা সালাফের এই বাণী: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك (এই ইলম দ্বীনের অংশ। সুতরাং তুমি কার থেকে তোমার দ্বীন শিখছো তা লক্ষ্য রেখ) -র উপর আমল করতে আগ্রহী হতাম। কিন্তু এ যমানায় তা কি করে সম্ভব?

আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে ঐ সকল বিষয় শিখার তাওফিক দিয়েছেন, যা দ্বারা আমরা তাওহিদের সাহায্য ও শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। এ কারণেই আমরা যাদের কাছ থেকে ইলমের চাবিকাঠি বা মাধ্যমগুলো শিখেছি তাদের অনেক ভুলের উপর আমরা ধের্য ধারণ করেছি"। (ইরশাদুল মুবতাদী ইলা কাওয়ায়িদিস সা'দী; পৃ: ৪)

তালেবান প্রসঙ্গ:

মুহতারাম ভাই তালেবান প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছেন,

“অনেকেই বলে থাকেন যে, তালেবান হক না। কারণ তারা শিশুদেরকেও হত্যা করে। দলিল হিসেবে পেশ করে পেশওয়ারের ঘটনাকে। এখন প্রশ্ন হলো, তালেবান যদি এরকম আক্রমণ করেই থাকে তাহলে কেন করেছে?”

উত্তর: তালেবানদের বিষয়টা দুনিয়া অবধি সুস্পষ্ট যে, তারা হক জামাত। আর তারা শিশু হত্যা করেন কথাটা নির্জলা মিথ্যা। তবে কোন কোন অপারেশনে অনাকাঙ্খিতভাবে কিছু শিশু নিহত হয়ে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। তালেবানরা যেহেতু এমন ভূমিতে জিহাদরত, যেখানকার অধিকাংশ জনগণ মুসলমান- তাই মুরতাদদের উপর হামলা হলে অনাকাঙ্খিতভাবে কিছু মুসলমান নিহত হতেই পারে। সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও যদি কিছু মুসলমান নিহত হয়ে যায়, তাহলে এটা সমালোচনার কিছু নয়। এ ধরণের হামলা সম্পূর্ণ

শরীয়তসম্মত। মুজাহিদিনে কেরাম সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, যেন কোন মুসলমানের বা কোন শিশুর প্রাণ না ঝরে। এরপরও অনাকাঙ্খিতভাবে হয়ে গেলে এর জন্য মুজাহিদিনে কেরাম দায়ী থাকবেন না। এই আশঙ্কায় যদি হামলা বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে কোনো দিন জিহাদ করা সম্ভব হবে না। হাদিস ও ফিকহের কিতাবাদিতে এসব বিষয় সুস্পষ্ট বিধৃত আছে। একটু কষ্ট করে চোখ বুলালেই পাওয়া যাবে। কিন্তু দ্বীনের দুশমনেরা এ ধরণের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ফলাও করে অপপ্রচার করে মুজাহিদিনে কেরামের মুড নষ্ট করার চেষ্টায় থাকে। অনেক সময় তারা নিজেরাই হত্যা করে মুজাহিদদের নামে চালিয় দেয়।

অধিকন্তু মুজাহিদগণ তো আর মাছুম নন যে, তাদের কোন ভুল-ভ্রান্তি বা কোন গুনাহ হতে পারে না। অন্য দশজন মানুষের মতো তাদেরও গুনাহ হতে পারে। কিছু মুজাহিদের ভুল বা গুনাহের কারণে তো আর গোটা জামাত বাতিল হয়ে যায় না। যে গুনাহ করেছে, তার গুনাহের বুঝা তাকে বইতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে মাফও করতে পারেন। এ কারণে গোটা জামাত বাতিল হয়ে যাবে না। এ ধরণের বাহানা

খুঁজে জিহাদ থেকে সরে দাঁড়ানোরও কোন অবকাশ নেই। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

৩৫.জিহাদ উত্তম না নামায উত্তম?

আদনারমারুফ ভাইয়ের পোস্টের উপর এক ভাইয়ের প্রশ্ন:

আমরা সাধারণত জানি যে, একজন মানুষ নাবালেগ বা অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম যে ফরজ তার উপর অবশ্যক হয় তা হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া। এই বিষয়ে কোন দলিল আছে? ঈমান আনর পর প্রথম ফরজ নামাজ, জিহাদ, নাকি অন্য কোন ফরজ ইবাদত? আপনার লেখা থেকে বুঝলাম, ঈমানের পর প্রথম ফরজ জিহাদ। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর কিতাবেও আছে, ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা। প্রিয় ভাই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে দিলে ভালো হতো।

উত্তর:

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

আরকানে খামসা তথা ঈমান এবং ফরয নামায, ফরয রোযা, ফরয হজ্ব ও ফরয যাকাত- এগুলোর গুরুত্ব শরীয়তে সবচেয়ে বেশি। এগুলো শরীয়তের মূল ভিত্তি এবং ফরযে আইন। এগুলোর সমকক্ষ অন্য কোন ইবাদাত নেই। এমনকি ফরযে কিফায়া জিহাদও না। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় আমর বিল মা'রূপ, নাহি আনিল মুনকার ও জিহাদ সকল নফল ইবাদাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নফল নামায, নফল রোযা, নফল হজ্ব ও নফল যাকাতসহ অন্য যত নফল ইবাদাত রয়েছে, সেগুলোর চেয়ে জিহাদ উত্তম। এজন্য যদি বলা হয়, **'ঈমানের পর প্রথম ফরয জিহাদ'** কিংবা **'ঈমানের পর সর্বোত্তম ইবাদাত জিহাদ'**- তাহলে আপাত দৃষ্টিতে কথাটা কুরআন সুন্নাহর বিপরীত হয়। কেননা, ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল ফরয নামায। এটি কুরআন সুন্নাহয় সুস্পষ্ট। তবে যদি বলা হয়, **'সকল নফল ইবাদাতের চেয়েও উত্তম ইবাদাত জিহাদ'** তাহলে কথাটি ঠিক আছে। এ হল স্বাভাবিক অবস্থার কথা।

পক্ষান্তরে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে এবং নামায রোযার মতো জিহাদও ফরযে আইন হয়ে যায়, তাহলে ফরযে আইন

হওয়ার দিক থেকে জিহাদ-নামায একই সারিতে চলে এল। তবে এ ক্ষেত্রেও জিহাদ ফরয নামাযের চেয়ে উত্তম বলা মুশকিল। কুরআন সুন্নাহয় নামাযকে সর্বপ্রথম রাখা হয়েছে। ফরয নামাযের চেয়ে জিহাদ উত্তম এমন কোন হাদিস আছে বলে আমার জানা নেই। তবে এটা সত্য যে, তখন যদি নামায এবং জিহাদের মধ্যে তাআরুজ দেখা দেয় যে, একটা করতে গেলে আরেকটা ছুটে যাবে, তাহলে জিহাদ অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ নামায পিছিয়ে দিয়ে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। তবে এটা জিহাদ নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ট- এ কারণে নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, নামায এমন ইবাদাত যা কাযা করা সম্ভব, পরে আদায় করা সম্ভব। কিন্তু জিহাদ এমন যে, এটি পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। এটি পিছিয়ে দিতে গেলে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করবে। ইসলাম ও মুসলমানদের শেষ করে দেবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ অগ্রাধিকার পাবে। জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে আর নামায পিছিয়ে দিতে হবে। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন ওয়াক্ত নামায পিছিয়ে দিয়েছিলেন। পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ না থাকায় জিহাদ অগ্রে রাখা হচ্ছে। এতে জিহাদ নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম ক্বারাফি রহ. (৬৮৪ হি.) এর উদাহরণ দিয়েছেন কুরআন তিলাওয়াত এবং আযানের জওয়াব দিয়ে। কুরআন তিলাওয়াত আযানের জওয়াবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মুআযযিন আযান শুরু করে দিলে কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে আযানের জওয়াব দিতে হয়। কারণ, কুরআন তিলাওয়াত পরেও করা যাবে, কিন্তু আযানের জওয়াব আযান শেষ হয়ে গেলে আর দেয়া যাবে না। ইমাম ক্বারাফি রহ. বলেন,

إذا تعارضت الحقوق قدم منها المضيق على الموسع ... ويقدم الفوري على المتراخي... ولذلك يقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته، وإن كان أعلى رتبة منه كما تقدم حكاية قول المؤذن على قراءة القرآن؛ لأن قراءة القرآن لا تفوت. اهـ

"একাধিক হকের মাঝে যদি তাআরুজ দেখা দেয় (যে, একটা করতে গেলে আরেকটা করা যাবে না) তাহলে যেটা পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ আছে সেটাকে পিছিয়ে দিয়ে যেটা পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই সেটা করা হবে। ... যেটা এখনই করা জরুরী সেটাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, যেটা পরে করার সুযোগ আছে সেটার উপর। ... এ কারণেই যেটা ছুটে যাবার আশঙ্কা সেটা অগ্রাধিকার পাবে সেটার উপর, যেটা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা নেই; যদিও তা (যেটা আগে করা হচ্ছে সেটার

তুলনায়) উচ্চ মার্যাদার হয়। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত রেখে আযানের জওয়াব দেয়া হবে। কেননা, কুরআন তিলাওয়াত ছুটে যাবার ভয় নেই।”- আলফুরুক্ব: ২/২০৩

লক্ষ করুন- “যদিও তা (যেটা আগে করা হচ্ছে সেটার তুলনায়) উচ্চ মার্যাদার হয়।”

জিহাদ ও নামাযের বিষয়টাও এমনই। নামায পরে কাযা করা যাবে হিসেবে পিছিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নামাযের চেয়ে জিহাদ উত্তম।

ইবনে তাইমিয়া রহ., জাসসাস রহ. বা আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.- তাদের কেউ জিহাদকে ফরয নামাযের চেয়ে উত্তম বলেছেন বলে আমার জানা নেই। তারা এটা বলেছেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে ফরযে আইন জিহাদের গুরুত্ব ফরযে আইন নামাযের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ নামায ছুটে গেলেও জিহাদ বন্ধ রাখা যাবে না। জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে আর নামায পরে কাযা করে নিতে

হবে। যেখানে তারা জিহাদকে নামাযের চেয়ে উত্তম বলেছেন, সেখানে নফল নামায উদ্দেশ্যে। অনেক জায়গায় স্পষ্ট করেই বলা আছে। আর যেখানে স্পষ্ট বলা নাই, সেখানে উদ্দেশ্য এটাই। আশাকরি বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) এর একটি সুন্দর লেখা আছে। আরবি জানা ভাইদের উচিৎ সেটা পড়ে নেয়া। মাত্র পনের পৃষ্ঠার। শিরোনাম-

رد على سفر الحوالي وتعليقه على كتاب الشيخ المجاهد عبد الله عزام
"الدفاع عن أراضى المسلمين أهم فروض الأعيان"

এ গেল ফজিলতের কথা। আর ঈমানের পর প্রথম ফরয কোনটি- এ ব্যাপারে কথা হল, ঈমানের পর প্রথম ফরয একেক জনের জন্য একেকটি। যার তাওহিদের জ্ঞান নেই, ঈমান আনার পর প্রথম ফরয তাওহিদের জ্ঞানার্জন। যদি নামাযের সময়ে ঈমান এনে থাকে, তাহলে প্রথম ফরয নামায পড়ে নেয়া। যদি শত্রু আক্রমণের সময় ঈমান এনে থাকে, তাহলে প্রথম ফরয শত্রু প্রতিহত করা। এভাবে একেক জনের জন্য একেকটা প্রথম ফরয।

যদি আমার ভুল হয়, তাহলে শুধরে দিলে ইনশাআল্লাহ খুশি হবো।

***

৩৬.জিহাদ উত্তম না যিকির উত্তম?

তিরমিযি শরীফের একটি হাদিস নিয়ে এক ভাই দ্বিধাদ্বন্ধে ছিলেন। হাদিসের তরজমা তিনি এই উল্লেখ করেছিলেন,

“আবূদ দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কি তোমাদের অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হতে সবচেয়ে উঁচু, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খাইরাত করার চেয়েও বেশি ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি

বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার যিকর।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার যিকরের তুলনায় অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই।"

মূল হাদিসটি (সুনানে তিরমিযি: ৩৩৭৭) এই-

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلى، قال: ذكر الله تعالى. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله

ভাইয়ের পেরেশানীর কারণ সম্ভবত এই যে, এ হাদিসে যিকিরকে জিহাদের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে, অথচ জিহাদের ফজিলত সীমাহীন। অধিকন্তু এ হাদিসকে কেন্দ্র করে যিকিরপন্থীরা জিহাদ তরকের বাহানা খোঁজবে। ইনশাআল্লাহ আমি হাদিসটির সহীহ ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রথমে মনে রাখতে হবে, কোন আমলের ফজিলত বেশি হওয়ার অর্থ এই নয় যে, অন্য সকল ফরয-নফল বাদ দিয়ে এটাতেই লিপ্ত থাকতে হবে। এমনটা মনে করা সুস্পষ্টই গোমরাহি। যেমন ধরুন- নামাযের ফজিলত অনেক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সারাক্ষণ শুধু নামাযেই ব্যস্ত থাকবে; হজ্ব করবে না, যাকাত দেবে না, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেবে না... ইত্যাদি। বরং যার উপর যে যে বিষয় ফরয তাকে তা আদায় করতে হবে। ফরয দায়িত্ব আদায়ের পর বা পাশাপাশি অন্যান্য আমল করতে কোন অসুবিধা নেই। যে যত আমল করবে তার তত প্রতিদান মিলবে।

জিহাদ ও যিকিরের ক্ষেত্রেও একই কথা। যিকিরের ফজিলত যদি জিহাদের চেয়ে বেশিও হয়ে থাক, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, ফরয জিহাদ ছেড়ে যিকিরে মশগুল থাকবে। এটা তখন ফরয নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত ছেড়ে যিকিরে মশগুল থাকার মতোই হবে। বরং যিকিরের ফজিলতের অর্থ: নামায-

রোযা-হজ্ব-যাকাত-জিহাদ-কিতাল ইত্যাদি ফরয আদায়ের পাশাপাশি যিকিরেরও পাবন্দি করবে। ফরয ছেড়ে যে যিকিরে লিপ্ত থাকবে সে গোমরাহ হওয়ার ব্যাপারে আশাকরি কারো দ্বিমত নেই। ফরয জিহাদ ছেড়ে খানকাহ ও যিকির মশগুল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা।

দ্বিতীয়ত: আমলের সওয়াব তার কষ্টের ভিত্তিতে নয়, আমলের মর্যাদা হিসেবে। যে আমলের মর্যাদা বেশি তার সওয়াবও বেশি- যদিও তা সহজ হয় আর অন্যগুলো কঠিন হয়। যেমন- ঈমান আনা অনেক সহজ কাজ। কিন্তু এর প্রতিদান অন্য সকল আমলের চেয়ে বেশি। নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত-জিহাদ-কিতাল ইত্যাদি সকল আমলের চেয়ে ঈমানের প্রতিদান বেশি, অথচ এসবগুলোর তুলনায় ঈমান সহজ। এ বিষয়টি ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম রহ. পরিষ্কার আলোচনা করেছেন তার [ক্বাওয়ায়িদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম] কিতাবে। এক পর্যায়ে তিনি বলেন,

ومما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات ...

والحاصل بأن الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف. اهـ

“সকল ইবাদতে সওয়াবের পরিমাণ যে কষ্টের ভিত্তিতে নয় তার দলীল- এরপর তিনি উপরোক্ত হাদিসসহ যিকির সংক্রান্ত আরো হাদিস উল্লেখ করেন। তারপর বলেন- সারকথা: সওয়াব নির্ধারিত হয় আমলের মর্যাদার কম বেশ এর ভিত্তিতে।” (ক্বাওয়ায়িদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম: ১/৪৮)

অতএব, কোন আমলের মর্যাদা বেশি হলে তার সওয়াবও বেশি- যদিও তা অন্যান্য আমলের চেয়ে অনেক সহজ হয়। আর কোন আমলের মর্যাদা কম হলে তার সওয়াবও কম- যদিও তা অন্যান্য মর্যাদাবান আমলের চেয়ে কষ্টসাধ্য হয়।

এবার আমরা আলোচ্য হাদিসে আসি। এ হাদিসে আল্লাহ তাআলার যিকিরকে ইনফাক তথা যাকাত, দান-খায়রাতসহ অন্য সকল আর্থিক ইবাদাতের চেয়ে এবং জিহাদের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। এখানে যিকির দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

দু’টি উদ্দেশ্য নেয়া যায়:

১. কলবি যিকির। তথা সার্বক্ষণিক আল্লাহ তাআলার ইয়াদ ও নিয়তের পরিশুদ্ধি। যদি এমনটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে স্পষ্ট যে, পরিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া কোন আমলই সহীহ না। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, জিহাদ-কিতাল ইত্যাদি কোন কিছুই পরিশুদ্ধ ও খালেছ নিয়ত ছাড়া সহীহ না। খালেছ নিয়ত ছাড়া সওয়াব পাওয়া যায় না। তদ্রূপ, আল্লাহ তাআলার ইয়াদ ছাড়া শুধু ভাসা ভাসা আমলের দ্বারাও তেমন সওয়াব পাওয়া যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তাআলার যিকির অন্য সকল আমল হতে উত্তম হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণেই হাদিসে মু'মিনের নিয়তকে তার আমলের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। কাযি ইবনুল আরাবী রহ. এমনটিই বলেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح الا والذكر مشترط في تصحيحه فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية ويشير إلى ذلك حديث نية المؤمن ابلغ من عمله اهـ

“কাযি আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. এ হাদিসের এই জওয়াব দিয়েছেন যে, প্রতিটি নেক কাজ সহীহ হওয়ার জন্য যিকির শর্ত। যে ব্যক্তি- উদাহরণস্বরূপ- তার সাদাকা বা তার রোযা আদায়ের সময় অন্তরে আল্লাহ তাআলাকে ইয়াদ না করবে, তার আমল কামেল নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যিকির (তথা আল্লাহ তাআলার ইয়াদ) সর্বোত্তম আমল। হাদিস: ‘মু’মিনের নিয়ত তার আমল থেকে উত্তম’- এ দিকেই ঈঙ্গিত করে।” (ফাতহুল বারি: ১১/২১০)

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিছক মৌখিক যিকির জিহাদ ও অন্যান্য আমল থেকে উত্তম সাব্যস্ত হয় না। আর যিকির যদি বিদআতি যিকির হয়, তাহলে তো উত্তম হওয়ার প্রশ্নই আসে না। হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম ইবনুল মালাক রহ. (৮৫৪হি.) এ হাকিকতটিই তুলে ধরেছেন। তার যামানার জাহেল সুফিদের খণ্ডনকল্পে আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

المراد من هذا: هو الذِّكر القلبي ... لا الذِّكر اللِّساني المشتمل على صياحٍ
وانزجاعٍ، وشدةِ تحريكِ العنقِ واعوجاجٍ، كما يفعله بعض الناس زاعمين أن

ذلك جالبٌ للحضور، وموجبٌ للسرور، حاشا لله، بل هو سبب للغَيبة والغرور.
اهـ

“এখানে যিকির দ্বারা কলবি যিকির উদ্দেশ্য ... মৌখিক যিকির উদ্দেশ্য নয়, যে যিকিরে থাকে চিল্লা-ফাল্লা আর হৈ-হুল্লোর, জোরে জোরে ঘাড় নাড়ানো আর বক্র অঙ্গভঙ্গি। যেমনটা কতক লোক করে থাকে। মনে করে- এমন করলে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও অন্তরের প্রশান্তি অর্জন হবে। আল্লাহর পানা। কিছুতেই না। এসব বরং আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরা ও প্রবঞ্চনার কারণ।” (শরহু ইবনিল মালাক আলাল মাসাবিহ: ৩/৯২)

২. দ্বিতীয়ত যিকির দ্বারা যেকোন যিকির উদ্দেশ্য নয়, বরং কামেল যিকির উদ্দেশ্য। আর তা হবে আল্লাহ তাআলার আযমত ও ইস্তিহজার সহ যিকরে লিসানি তথা মৌখিক যিকির ও কলবি যিকিরের সমন্বিত যিকির। তাহলে এ যিকিরের জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরী:

ক. অন্তরে আল্লাহ তাআলার আযমত ও বড়ত্বের অনভূতি।

খ. ইস্তিহজার তথা আল্লাহ তাআলাকে হাজির নাযির মনে করে, তিনি আমাকে দেখছেন আমি তার সামনে আছি- এমন অনুভূতি নিয়ে যিকির করা।

গ. যিকিরের মা'না-মাফহুম তথা অর্থ ও মর্ম বুঝে যিকির করা।

ঘ. যিকির মাসনুন যিকির হওয়া বা শরীয়তসম্মত অন্য কোন যিকির হওয়া।

এ গেল যিকিরের কথা। আর যেসব আমলের তুলনায় এ যিকিরকে উত্তম বলা হয়েছে সেগুলোর অবস্থা হল- সেগুলোতে যথাযথ আল্লাহর ইয়াদ নেই, ইস্তিহযার এবং আযমত ও বড়ত্বের উপলব্ধি নেই। শুধু ভাসা ভাসা আমল। এমন ধরণের আমলের তুলনায় পূর্বোল্লিখিত যিকিরকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি জিহাদ করছে কিন্তু জিহাদরত অবস্থায় তার মুখে আল্লাহর যিকির নেই, অন্তরে আল্লাহর ইয়াদ ও আযমতের উপলব্ধি নেই- তার এ জিহাদের তুলনায় পূর্বোক্ত কামেল যিকিরের সওয়াব বেশি। যদিও তার জিহাদে কষ্ট হচ্ছে বেশি, কিন্তু যথাযথ লিসানি ও কলবি যিকিরের সমন্বয় না থাকার কারণে তার জিহাদের সওয়াব কমে গেছে। আর

কমবেই বা না কেন, জিহাদরত অবস্থায় তো অন্তরে আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে ইয়াদ করার এবং যবান আল্লাহ তাআলার যিকিরে মশগুল রাখার আদেশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

“হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনির সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করতে থাক, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।” (আনফাল: ৪৫)

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন,

وقوله تعالى: { واذكروا الله كثيرا} يحتمل وجهين: أحدهما: ذكر الله تعالى باللسان، والآخر: الذكر بالقلب، وذلك على وجهين: أحدهما: ذكر ثواب الصبر على الثبات لجهاد أعداء الله المشركين وذكر عقاب الفرار؛ والثاني: ذكر دلائله

ونعمه على عباده وما يستحقه عليهم من القيام بفرضه في جهاد أعدائه.
وضروب هذه الأذكار كلها تعين على الصبر والثبات ويستدعى بها النصر من الله
والجرأة على العدو والاستهانة بهم. وجائز أن يكون المراد بالآية جميع الأذكار
لشمول الاسم لجميعها. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী- ‘এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করতে থাক’ এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে:

এক. মুখে আল্লাহ তাআলার যিকির করা।

দুই. অন্তরের যিকির।

অন্তরের যিকির আবার দুই ধরণের:

এক. আল্লাহর দুশমন মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে সুদৃঢ় ও অটল-অবিচল থাকার সওয়াব এবং যুদ্ধ হতে পলায়নের শাস্তির কথা স্বরণ করা।

দুই. আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী, বান্দাদের উপর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতরাজি এবং তার দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদের যে ফরয দায়িত্ব তাদের উপর তার পাওনা রয়েছে- সেগুলো স্বরণ করা।

এই সব ধরণের যিকির অটল অবিচল থাকতে সহায়ক হবে। আল্লাহ তাআলার নুসরত লাভ এবং শত্রুর উপর দুঃসাহসিকতা দেখানো ও তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মাধ্যম হবে।

অধিকন্তু আয়াতের দ্বারা সব ধরণের যিকিরই উদ্দেশ্য হতে

পারে। কেননা, যিকির শব্দ সব ধরণের যিকিরকেই বুঝায়।”
(আহকামুল কুরআন: ৩/৮৬)

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে, যথাযথ কলবি ও লিসানি যিকির সহ, আল্লাহ তাআলার আযমত ও ইস্তিহজার সহ, সওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয় নিয়ে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বিজয়ের উদ্দেশ্যে জিহাদ করবে- তার এ জিহাদের প্রতিদান উপরোক্ত কামেল যিকিরের চেয়েও বেশি। কেননা, এখানে দু’টি আমলের সমন্বয় ঘটেছে:
ক. কামেল যিকির।
খ. জিহাদ।

অতএব, এমন মুজাহিদের জিহাদের সওয়াব ঐসব ব্যক্তির কামেল যিকিরের চেয়ে বেশি, যারা বাড়িতে বা মসজিদে বসে, পূর্ণ ধ্যান খেয়ালে, পূর্ণ আযমত ও ইস্তিহজারের সাথে, অর্থ ও মর্ম বুঝে বুঝে মাসনুন ও শরীয়তসম্মত যিকিরে লিপ্ত আছে। কেননা, এসকল ব্যক্তির আমল হল একটা। তা হচ্ছে- শুধু যিকির। পক্ষান্তরে মুজাহিদের আমল দু’টি: ক. যিকির। খ.

জিহাদ। কাজেই তার সওয়াব বেশি।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

أشرت إليه مستشكلا في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد انه كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر وغير ذلك مما يدل على افضليته على غيره من الأعمال الصالحة، وطريق الجمع والله اعلم ان المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وان الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك، وان أفضلية الجهاد انما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له انه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا فهو الذي بلغ الغاية القصوى. اه

“কিতাবুল জিহাদের শুরুতে এ হাদিসের দিকে ঈঙ্গিত করে এসেছি। মুজাহিদের যে ফজিলত বর্ণিত হয়েছে তার দাবি হল- জিহাদ অন্য সকল নেক কাজের চেয়ে উত্তম। যেমন- মুজাহিদ ঐ রোযাদারের মতো যে কখনোও রোযা ভাঙে না। ঐ ইবাদাত গুজারের মতো যে, কখনও বিরতি দেয় না। এছাড়াও অন্যান্য ফজিলত। এতদসত্ত্বেও এ হাদিসে যিকিরকে উত্তম বলাটা (বাহ্যত) মুশকিল মনে হয়। -ওয়াল্লাহু আ’লাম- উভয়ের সমন্বয় এভাবে হবে যে, আবুদদারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে

আল্লাহ তাআলার যিকির দ্বারা কামেল যিকির উদ্দেশ্য। আর কামেল যিকির হল ঐ যিকির, যে যিকিরে মৌখিক যিকির এবং অর্থ ও মর্মে ফিকির করে করে আল্লাহ তাআলার আযমতের খেয়াল রেখে অন্তরের যিকির- উভয়টার সমন্বয় ঘটবে। যার মাঝে এমন যিকির পাওয়া যাবে সে ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম- উদাহরণত- যে ব্যক্তি এই অবস্থা ব্যতিরেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর (ইস্তিহজার বিহীন) জিহাদ উত্তম হল (ইস্তিহজার বিহীন) মৌখিক যিকিরের চেয়ে। অতএব, যে ব্যক্তি এ উভয়টির সমন্বয় ঘটাবে; যেমন- উদাহরণত- ঐ ব্যক্তি, যে তার নামাযে, তার রোযায়, তার সাদাকায় বা কাফেরের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের হালতে ইস্তিহজারের সাথে তার যবানে ও অন্তরে আল্লাহ তাআলার যিকির করবে- তাহলে সে-ই (ফজিলতের) চূড়ান্ত দরজায় উপনীত হতে সক্ষম হবে।” (ফাতহুল বারি: ১১/২১০)

সারকথা দাঁড়াল-

♣ ইস্তিহজারের সাথে কামেল যিকিরের সওয়াব, ইস্তিহজার বিহীন জিহাদ ও অন্যান্য আমলের চেয়ে বেশি।

♣ ইস্তিহজার বিহীন জিহাদের সওয়াব, ইস্তিহজার বিহীন

যিকিরের চেয়ে বেশি।

♣ ইস্তিহজার বিশিষ্ট জিহাদ ও অন্যান্য আমলের সওয়াব, ইস্তিহজার বিশিষ্ট কামেল যিকিরের চেয়ে বেশি।

এ থেকে এই ফলাফল দাঁড়াচ্ছে যে, যেসকল মুজাহিদ পূর্ণ ইখলাস ও যিকিরের সাথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত আছেন তাদের জিহাদ, ঐসব শিরিক ও বিদআতমুক্ত মুখলিস অলী, দরবেশ ও পীর মাশায়েখদের যিকিরের চেয়ে উত্তম, যারা ইস্তিহজার ও আযমতের সাথে, অর্থ ও মর্ম খেয়াল করে করে যিকিরে লিপ্ত আছেন। কেননা, তারা যে ধরণের যিকিরে লিপ্ত আছেন, মুজাহিদগণও এমনই- কিংবা তার চেয়ে উত্তম- যিকিরে লিপ্ত আছেন। অতিরিক্ত এই যে, মুজাহিদগণ আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেদের জান-মাল ও সর্বস্ব ব্যয় করছেন আর তারা তা করছেন না। অতএব, যিকিরের দিক থেকে মুজাহিদগণ এবং মুখলিস ও শরীয়তের অনুগামী অলী দরবেশগণ সমানে সামান। আর মুজাহিদগণের শ্রেষ্টত্ব যে, তারা যিকিরের পাশাপাশি জিহাদেও লিপ্ত আছেন। অতএব, উক্ত হাদিস থেকে অলী দরবেশগণের উপর মুজাহিদগেণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

বি.দ্র.

ভুলে গেলে চলবে না যে, জিহাদ বর্তমানে ফরযে আইন। যিকির করা ফরয নয়, মুস্তাহাব। যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জিহাদ ছেড়ে যিকিরে লিপ্ত আছেন, তারা- যদি সব ধরণের শিরিক বিদআত থেকে মুক্ত থাকেন- তাহলে অন্তত এতটুকু বলতে হবে যে, ফরযে আইন তরকের গুনাহে লিপ্ত আছেন। আর যেসব মুজাহিদ ইস্তিহজার ও কামেল যিকির ছাড়া শুধু জিহাদে লিপ্ত আছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত যে, তারা নফল যিকিরের ফজিলত না পেলেও অন্তত কোন ফরয তরকের গুনাহে লিপ্ত নন। অতএব, এ হিসাবে জিহাদে লিপ্ত যেকোন মুজাহিদ- যদি তিনি অন্যান্য গুনাহ থেকে বিরত থাকেন, জিহাদ তরককারী- যদিও অন্য সকল ফরয আদায়কারী হয়ে থাকেন- যেকোন যিকিরকারীর চেয়ে উত্তম। কেননা, যিকিরকারী ফরযে আইন তরকের গুনাহে লিপ্ত, আর মুজাহিদ নফলে লিপ্ত না থাকলেও কোন ফরয তরকের গুনাহে লিপ্ত নন। আর স্পষ্ট যে, আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত ব্যক্তি কিছুতেই ঐ ব্যক্তির মতো নয়, যে আল্লাহর সবগুলো ফরয আদায়ে লিপ্ত আছেন এবং কোন ধরণের নাফরমানীতে লিপ্ত

নন।

যাহোক, সর্বদিক থেকে সকল মুজাহিদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এর হিসাব নিকাশ আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে। আমার উদ্দেশ্য এতটুকু দেখানো যে, উপরোক্ত হাদিস জিহাদ ছেড়ে ঘরে বা খানকায় বসে থাকার বৈধতা দেয় না, মুজাহিদদের উপর খানকাহবাসীদের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণ করে না।

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

৩৭.জিহাদ ও অন্যান্য ফরযের সমন্বয় সাধনই মধ্যম পন্থা

এক ভাই জিহাদ সম্পর্কে একটি সুন্দর পোস্ট দিয়েছেন। তাতে মুহতারাম ভাই অনেক সুন্দর কথা বলেছেন। তবে [কোন ইবাদতই জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে না] কথাটা অস্পষ্ট হওয়ায় তা থেকে ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে। তাই একটু তাম্বীহ করা প্রয়োজন মনে করছি।

তাছাড়া প্রাথমিকভাবে ভাইয়েরা যখন জিহাদে যোগ দেন, তখন সমাজের উলামায়ে কেরামের গাফলত, অপব্যাখ্যা, জিহাদ সম্পর্কে লোকজনের উদাসীনতা- ইত্যাদির কারণে অন্তরে প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে জিহাদে যোগ দেন। তাছাড়া জিহাদের ফাযায়েলগুলো প্রথমবার দেখার কারণে মনে হয়- দুনিয়াতে জিহাদের চেয়ে বা তার সমকক্ষ আর কোন ইবাদত নেই। আল্লাহ মাফ করুন- কারো কারো মধ্যে এমনটাও হয়ে থাকে যে, জিহাদের কাজের দরুণ অন্যান্য ফরয আদায়ে ত্রুটি করেন। পিতা-মাতার নাফরমানী, উস্তাদের অবাধ্যতা- ইত্যাদি প্রায়ই হয়ে থাকে। মনে করেন, জিহাদ ফরয হয়ে গেছে। এখন আর কোন কিছুই দেখার নেই। এ কারণে জিহাদ ও অন্যান্য ফরয নিয়ে কিছু কথা বলা সময়ের দাবি মনে হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, জিহাদ শরীয়তের একটি ফরয। শরীয়তে আরো অনেক ফরয রয়েছে। কোনোটা ফরযে আইন, কোনোটা ফরযে কেফায়া। আল্লাহ তাআলা কতৃক

আরোপকৃত সবগুলো ফরযই আদায় করতে হবে। একটা করতে গিয়ে আরেকটা ছাড়া যাবে না। অন্যান্য ফরয আদায় করতে গিয়ে যেমন জিহাদ ছাড়া যাবে না, জিহাদ করতে গিয়েও অন্য কোন ফরয ছাড়া যাবে না। একান্তই যদি কোথাও খন্দক যুদ্ধের অবস্থা তৈয়ার হয়, তাহলে কথা ভিন্ন। তদ্রূপ, জিহাদের প্রয়োজনে যেসব বিষয়ের অনুমোদন আছে, সেগুলোর কথাও ভিন্ন।

শরীয়তে স্বাভাবিক অবস্থায় আরকানে খামসা তথা ঈমান ও ঈমানের পর নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত সবচেয়ে বেশি। এগুলোর সমকক্ষ অন্য কোন ইবাদাত হতে পারে না। এমনকি জিহাদও না। কেননা, এগুলো ফরযে আইন (নামায-রোযা সকলের উপরই ফরযে আইন, আর হজ্ব-যাকাত সামর্থ্য সাপেক্ষে)। আর জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় ফরযে কেফায়া। আর ফরযে আইনের গুরুত্ব ও ফজিলত ফরযে কেফায়ার চেয়ে বেশি।

ঈমানের পরই ফরয নামাযের গুরুত্ব। বহু হাদিসে ফরযে কেফায়া জিহাদের চেয়ে নামায শ্রেষ্ট বলে বর্ণিত হয়েছে।

যেমন, **বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন,**

قال ? أفضل العمل أي الله رسول يا قلت (الصلاة على ميقاتها) . قلت ثم أي ? قال (ثم بر الوالدين) . قلت ثم أي ? قال (الجهاد في سبيل الله)

“আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি উত্তর দেন, সময়মতো নামায় আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন আমল? তিনি উত্তর দেন, এরপর হচ্ছে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন আমল? তিনি উত্তর দেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।” (সহীহ বুখারী: ২৬৩০)

এ হাদিসে ঠিক ঠিক মতো গুরুত্বের সাথে ফরয নামায সময়মতো আদায় করা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও ফরমাবরদারিকে জিহাদের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। কেননা, এ উভয়টি ফরযে আইন, আর জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় ফরযে কেফায়া। আর ফরযে আইন ফরযে কেফায়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এমনকি এমতাবস্থায় যদি পিতা মাতা অনুমতি না দেন, তাহলে জিহাদেও যাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, ফরযে

আইন হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। তখন পিতা-মাতা নিষেধ করলেও জিহাদে যেতে হবে। যেমনটা অন্য হাদিসে এসেছে।

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

لا يتردد في أن المواظبة على أداء فرائض الصلاة وأخذ النفس بها في أوقاتها على ما هو المراد من قوله الصلاة على ميقاتها أفضل من الجهاد. ولأن هذه فرض عين وتتكرر والجهاد ليس كذلك، ولأن افتراض الجهاد ليس إلا للإيمان وإقامة الصلاة. اهـ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ‘সময়মতো নামায় আদায় করা’ দ্বারা উদ্দেশ্য- দায়েমীভাবে ফরয নামায ওয়াক্তমতো আদায় করা এবং নিজের নফসকে এ ব্যাপারে শাসনে রাখা। সন্দেহ নেই যে, এটি জিহাদের চেয়ে উত্তম। তাছাড়া এটি হচ্ছে ফরযে আইন এবং বারবার এসে থাকে। কিন্তু জিহাদ এমন নয়। তাছাড়া জিহাদ তো ফরয করাই হয়েছে ঈমান ও নামায কায়েমের জন্য।” (ফাতহুল কাদির: ৫/৪৩৫)

অন্য হাদিসে এসেছে যে, সকল ফরযে আইন স্বাভাবিক

অবস্থায় জিহাদের চেয়ে উত্তম।

ইমাম দারেমী রহ. বর্ণনা করেন,

عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أن رسول الله (قام فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئا أفضل منه إلا الفرائض

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা তার পিতা আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, এক দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানার পর জিহাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করলেন। তখন তিনি ফারায়েজ ব্যতীত অন্য কিছুকেই জিহাদের চেয়ে উত্তম রাখেননি।" (সুনানে দারেমী: ২৪৬৭)

এ হাদিসে ফরযসমূহকে জিহাদের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। ফরয দ্বারা এখানে ফরযে আইন উদ্দেশ্য। আর জিহাদ দ্বারা ফরযে কেফায়ার হালতে জিহাদ উদ্দেশ্য। এ হাদিস থেকে বুঝা যায়: ফরযে কেফায়া জিহাদের চেয়ে ফরযে আইন ইবাদত উত্তম।

এ হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

يريد به الفرائض التي يثبت فرضها عينا ، وهي الأركان الخمسة .والجهاد فرض أيضا لكنه فرض كفاية ، والثواب بحسب وكادة الفريضة ، فما يكون فرضا عينا فهو أقوى ، فلهذا استثنى الفرائض من جملة ما فضل رسول الله عليه السلام الجهاد عليه .اه

"এখানে ফরযসমূহ দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ফরযে আইনগুলো। সেগুলো হল- আরকানে খামসা (ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত)। জিহাদও ফরয, তবে ফরযে কেফায়া। আর সওয়াবের পরিমাণ ফরযের গুরুত্ব হিসেবে হয়ে থাকে। যেটি ফরযে আইন, সেটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিষয়ের উপর জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, সেগুলো থেকে ফরযসমূহকে আলাদা রেখেছেন।" (শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/২৩)

তবে এমতাবস্থায় জিহাদ অন্য সকল নফল ইবাদত থেকে উত্তম। যেমনটা উপরোক্ত হাদিসসহ আরো অনেক হাদিস থেকে বুঝা যায়।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

والأمر بالجهاد وذكر فضائله فى الكتاب والسنة اكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الانسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع -كما دل عليه الكتاب والسنة. اهـ

"কুরআন-সুন্নাহয় জিহাদের আদেশ ও তার ফাযায়েলের আলোচনা অগণিত। এ কারণে জিহাদ কোন ব্যক্তির নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। উলামায়ে কেরাম সকলে একমত যে- হজ্ব, উমরা, নফল নামায ও নফল রোযার চেয়ে জিহাদ শ্রেষ্ঠ; যেমনটা কুরআন সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৫২)

অন্যত্র বলেন,

اتفق العلماء فيما اعلم على انه ليس فى التطوعات افضل من الجهاد فهو افضل من الحج وافضل من الصوم التطوع وافضل من الصلاة التطوع. اهـ

"আমার জানা মতে, উলামায়ে কেরাম সকলে একমত যে, নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে জিহাদের চেয়ে উত্তম কিছু নেই। জিহাদ হজ্বের চেয়ে উত্তম। নফল রোযা ও নফল নামাযের

চেয়ে উত্তম।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৪১৮)

যে হাদিসে জিহাদকে দিনভর রোযা আর রাতভর নামাযের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য- নফল নামায ও নফল রোযা।

তবে এমতাবস্থায় জিহাদ উত্তম না'কি ইলম উত্তম সেটা মতভেদপূর্ণ। কেননা, ইলমও জিহাদের মতোই ফরযে কেফায়া।

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন:

واعلم أن شغل العلم أفضل الأشغال عند أبي حنيفة، ومالك؛ وعند أحمد الجهاد أفضلها، كذا في «منهاج السنة» لابن تيمية، وفي كتاب السفاريني عن أحمد رواية نحو أبي حنيفـة، ومالك. وهذا كله إذا لم يكن الجهاد فرض الوقت، لأن الكلام في باب الفضائل دون الفرائض.اهـ

“জেনে রাখ, আবু হানিফা রহ. এবং মালেক রহ. এর মতে ইলমে দ্বীন অর্জনে ব্যাপৃত থাকা সর্বোত্তম কাজ। ইমাম আহমদ রহ. এর মতে সর্বোত্তম হল জিহাদ। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ‘মিনহাজুস সুন্নাহ’ তে এমনই বলা হয়েছে।

‘সিফারিনী’ রহ. এর কিতাবে আহমদ রহ. থেকে আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ. এর অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। তবে এ সব কিছু হচ্ছে, যখন জিহাদ ফরযে আইন না হয়ে থাকবে। কেননা, আলোচনা হচ্ছে ফজিলত নিয়ে, ফরয নিয়ে নয়।” (ফয়জুল বারি: ৩/৪১৯, কিতাবুল জিহাদ)

তবে যদি শত্রু মাথার উপর এসে যায়, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় এবং এই মূহুর্তে জিহাদে বের হওয়া ভিন্ন শত্রু প্রতিহত করার কোন উপায় না থাকে - তাহলে জিহাদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। **যেমনটা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,**

فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه.اه

“ঈমানের পর আগ্রাসী শত্রু যে দ্বীন ও দুনিয়ার বিনাশ করছে, তাকে প্রতিহত করার চেয়ে আবশ্যক কোন বিষয় নেই।” (আল-ফাতাওয়াল কুবরা: ৫/৫৩৮)

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, যে বিশেষ পরিস্থিতিতে জিহাদের গুরুত্ব সর্বাধিক, সে পরিস্থিতিতেও কিন্তু অন্য ফরযগুলো ফরয হিসেবেই থেকে যায়। অতএব, সেগুলোও

আদায় করতে হবে। তবে একান্তই যদি আদায়ের সুযোগ না হয়, তাহলে যে ফরয আপাতত পিছিয়ে দিলে চলে সেটাকে পিছিয়ে দিয়ে পরে আদায় করে নিতে হবে।

আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় জিহাদ ও অন্য সকল ফরযের মাঝে সমন্বয় করা জরুরী। কেননা, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদের সাথে অন্যান্য ফরয আদায় করা সম্ভব। অতএব, জিহাদের ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব দিতে হবে, অন্য সকল ফরযের ব্যাপারেও তেমনি গুরুত্ব দিতে হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে মিম্বারুত তাওহিদ থেকে একটি সুওয়াল-জওয়াব উল্লেখ করছি-

هل أقدم الحج على الجهاد؟ ... رقم السؤال: 2911

اذا كان المسلم يريد الخروج للجهاد ولم يحج حيث ان موعد الخروج قبل شهر الحج فهل يخرج قبل الحج او يفوت الخروج ويحج؟

السائل: محب ابى عبدالله

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

بسم الله الرحمن الرحيم ... الحمد لله رب العالمين ... وصلى اللهـ على نبيه

الكريم ... وعلى آله وصحبه أجمعين. ... وبعد: ... إذا كان هذا الأخ المجاهد ممن يحتاج إليه المجاهدون ويشق عليهم تأخره عنهم فعليه في هذه الحالة أن يقدم النفير ويعجل بمعونة إخوته المجاهدين. ... وأما إذا كانوا يحتملون تأخره عنهم بلا مشقة فعليه في هذه الحالة أن يبدأ بفريضة الحج ويثني بفريضة الجهاد. ... ففي ذلك جمع بين الفريضتين، وتقديم للمضيق وقته على الموسع وقته. ... والله أعلم ... والحمد لله رب العالمين.

أجابه، عضو اللجنة الشرعية: ... الشيخ أبو المنذر الشنقيطي

"জিহাদের আগে কি হজ্বে যাব?

প্রশ্ন:

একজন মুসলমান জিহাদে যেতে চান। তিনি এখনও হজ্ব করেননি। কথা হয়েছে যে, হজ্বের একমাস পূর্বে তিনি জিহাদে যাবেন। তিনি কি হজ্ব করার আগে জিহাদে যাবেন, না'কি জিহাদ রেখে হজ্বে যাবেন?

উত্তর:

بسم الله الرحمن الرحيم ... الحمد لله رب العالمين ... وصلى الله على نبيه الكريم ... وعلى آله وصحبه أجمعين. ... وبعد:

এই মুজাহিদ ভাই যদি এমন হন যে, তাকে মুজাহিদগণের

প্রয়োজন আছে এবং তিনি পিছনে থেকে গেলে মুজাহিদগণের কষ্ট হবে- তাহলে তাকে জিহাদে বের হওয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আগে তার মুজাহিদ ভাইদের সহযোগিতায় নিয়োজিত হতে হবে।

আর যদি এমন হন যে, কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই তার মুজাহিদ ভাইগণ তার পিছেনে রয়ে যাওয়া বরদাশত করে নিতে পারবেন- তাহলে বর্তমান অবস্থায় তাকে আগে ফরয হজ্ব আদায়ের কাজ শুরু করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জিহাদ করবেন। এতে উভয় ফরয আদায় করা সম্ভব হবে। তবে যে ফরযের সময় সংকীর্ণ (ফলে সেটাকে পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই) সেটাকে যে ফরযের সময় প্রশস্ত (ফলে তা পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ আছে) সেটার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। والله أعلم ... والحمد لله رب العالمين

উত্তর প্রদানে:
শায়খ আবুল মুনযির আশশানকীতি
সদস্য: শরয়ী বিভাগ, মিম্বারুত তাওহিদ”
-মিম্বারুত তাওহিদ, প্রশ্ন নং ২৯১১

মোটকথা- নিঃশর্তভাবে জিহাদকে সকল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ট বলা যায় না। কেননা, আরকানে খামসার গুরুত্ব সর্বাধিক। তবে এ কথা বলা যায়- সকল নফল ইবাদতের চেয়ে জিহাদ শ্রেষ্ট। তদ্রূপ, শত্রু মাথার উপর এসে গেলে তখন জিহাদের গুরুত্ব সর্বাধিক। এর প্রয়োজনে তখন অন্যান্য ফরয পিছিয়ে দিয়ে পরে আদায় করা যাবে। তবে যদি সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়, তাহলে সবগুলোই যথারীতি যথা সময়ে আদায় করতে হবে। যারা মনে করেন, জিহাদ ফরয হয়ে গেলে আর কোন ফরয ফরযই থাকে না, তারা ভুল করছেন। তদ্রূপ যারা অন্যান্য ফরযের বাহানা তুলে জিহাদ তরক করছেন তারাও ভুল পথে আছেন। সঠিক ও মধ্যমপন্থা হল- জিহাদ ও অন্য সকল ফরযের সমন্বয় সাধন। একটা করতে গিয়ে আরেকটা তরক করা যাবে না। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

৩৮.জিহাদ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর যা এক ভাই জানতে চেয়েছেন

এক ভাই নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চেয়েছেন:

১. ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া কাকে বলে?

২. বাংলাদেশে জিহাদ ফরয কি'না?

৩. ফরয হলে কেন ফরয?

৪. বাংলাদেশে জিহাদ ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া?

৫. জিহাদ করতে হলে তানজীমে যোগ দিতে হবে কি'না?

৬. এদেশে জিহাদ কিভাবে করবো?

৭. ফরযে কিফায়া জিহাদে যেতে হলে মা-বাবার অনুমতি লাগে এর দলীল কি?

বিস্তারিত জওয়াব লিখতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। সংক্ষেপে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ। অধিকন্তু

এসব বিষয় মুজাহিদদের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ। তাই বিস্তারিত জওয়াবের প্রয়োজন পড়ে না।

প্রশ্ন-১: ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া কাকে বলে?

উত্তর: এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা আপনি আব্দুল্লাহ আযযমা রহ. লিখিত **[আদদিফা আন আরাদিল মুসলিমীন]** কিতাবে পাবেন। **[মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা]** নামে এর বাংলা তরজমা হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে- যেসব ইবাদত প্রতিটি ব্যক্তির উপর ফরয, যেগুলো একজনের আদায়ের দ্বারা আরেকজনের দায়িত্ব আদায় হবে না, বরং সকলকেই আদায় করতে হবে: সেগুলো ফরযে আইন। যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত। এগুলো সকলকেই আদায় করতে হবে। একজনের নামাযের দ্বারা আরেকজনের দায়িত্ব আদায় হবে না। একজনের রোযার দ্বারা আরেকজনের রোযার দায়িত্ব আদায় হবে না। একজন যাকাত দিলে আরেকজনের যাকাতের দায়িত্ব আদায় হবে না। একজন হজ্ব করলে আরেক জনের হজ্বের দায়িত্ব আদায় হবে না। বরং প্রত্যেককেই তার নিজ

নিজ দায়িত্ব আদায় করতে হবে। এগুলো হল ফরযে আইন।

আর যেসব বিষয় প্রতিটি ব্যক্তি থেকে হওয়া মাকসাদ না, কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা কাজটি সম্পন্ন হয়ে গেলে অন্যদের থেকে এর দায়িত্ব সরে যায়- সেগুলো ফরযে কিফায়া। সাধারণত জনকল্যাণমূলক কাজগুলো ফরযে কিফায়া হয়ে থাকে। যেমন- মৃত ব্যক্তির কাফন দাফন। এটি ফরযে কিফায়া। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি মাকসাদ না, কাফন দাফন মাকসাদ। অতএব, যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান মৃত ব্যক্তির কাফন দাফনের দায়িত্ব আদায় করে ফেলে, তাহলে বাকিদের থেকে এর দায়িত্ব সরে যাবে। সকলের এতে অংশগ্রহণ জরুরী না। হ্যাঁ, অংশ নিলে সওয়াব পাবে, না নিলে সওয়াব পাবে না।

বি.দ্র.-১

পর্যাপ্ত পরিমাণ লোকের দ্বারা ফরযে কেফায়ার কাজটি সম্পাদন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা সকলের উপরই ফরয। এ সময় এটি ফরযে আইনের মতো। তবে ব্যবধান হল- ফরযে আইন সকলকেই আদায় করতে হবে, আর ফরযে কেফায়া কিছু লোকের দ্বারা আদায় হয়ে গেলে বাকিরা মুক্তি পেয়ে

যাবে। আর কেউই সম্পাদন না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

বি.দ্র.-২

সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরযে কেফায়া। এর অর্থ- তখন জিহাদ সকলের উপরই ফরয, তবে কিছু সংখ্যক মুসলমান বছরে এক বার বা দুই বার জিহাদ করতে থাকলে বাকি মুসলমানরা জিহাদে না গেলেও কোন গুনাহ হবে না। আর বছরে এক বারও জিহাদ না হলে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে।

আর কাফেররা আক্রমণ করে বসলে বা কোন ভূখণ্ড দখল করে নিলে, আক্রমণ প্রতিহত করতে বা ভূমি পুনঃরুদ্ধার করতে যে পরিমাণ মুসলমানের জিহাদের প্রয়োজন, সে পরিমাণ মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। অর্থাৎ সে পরিমাণ মুসলমানকে অবশ্যই জিহাদে বের হতে হবে। এ ফরয সর্বপ্রথম যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তাদের উপর বর্তাবে। তারা না পারলে বা না করলে তখন অন্য মুসলমানদের উপর বর্তাবে। এভাবে যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, বিশ্বের সকল মুসলমান জিহাদে শরীক হওয়া ব্যতীত

ভূমি উদ্ধার করা সম্ভব না- তাহলে সকলের উপর জিহাদে শরীক হওয়া ফরযে আইন। অর্থাৎ সকলকেই জিহাদে শরীক হতে হবে। প্রত্যেকে তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জান-মাল ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে শরীক হবে।

বর্তমানে যেহেতু প্রায় সকল মুসলিম ভূমি কাফের মুরতাদদের দখলে, তাই বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। প্রত্যেকের উপর তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে। জান, মাল, বুদ্ধি, পরামর্শ- যে যেটা দিয়ে পারে জিহাদে শরীক হবে। যে সবগুলোর সামর্থ্য রাখে তার উপর সবগুলো দিয়ে শরীক হওয়া ফরয। আর যে সবগুলোর সামর্থ্য রাখে না, সে যতটুকুর সামর্থ্য রাখে ততটুকু দিয়ে শরীক হবে।

বি.দ্র.-৩:

জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতেও অন্যান্য ফরযগুলো ফরয হিসেবেই থেকে যায়। তাই সেগুলো আদায়েও যত্নবান হতে হবে। বিশেষত বর্তমান যামানার জিহাদ যেহেতু দীর্ঘ দিনের ব্যাপার, তাই এটা একটা ঋণের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন ব্যক্তির কাছে কারো ঋণ পাওনা থাকলে, তার যদি পরিশোধের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে তাকে অর্থ

উপার্জন করে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবে এ অবস্থায় তাকে নামায, রোযা, স্ত্রী-সন্তান ও পিতা-মাতার হক্কও আদায় করতে হয়। ঠিক একই অবস্থা বর্তমানে জিহাদের। জিহাদও করতে হবে, অন্যান ফরয ও হক্কও আদায় করতে হবে। তবে কখনোও যদি কাফেররা কোথাও আক্রমণ করে বসে আর খন্দক যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তাহলে কথা ভিন্ন।

প্রশ্ন-২: বাংলাদেশে জিহাদ ফরয কি'না?

উত্তর: হ্যাঁ, বাংলাদেশে জিহাদ ফরয।

৩. ফরয হলে কেন ফরয?

উত্তর: মুরতাদ কাফেররা এদেশ দখল করে নিয়েছে। এদের থেকে এ দেশ উদ্ধার করে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ফরয।

৪. বাংলাদেশে জিহাদ ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া?

উত্তর: ফরযে আইন। তবে এর অর্থ- সকলকেই নিজ নিজ

সামর্থ্যানুযায়ী জিহাদে শরীক হতে হবে। পাশাপাশি অন্যান্য ফরযও যথাযথ আদায় করতে হবে। ফরযে কেফায়ার সূরতে যেমন কিছু মুসলমান আদায় করলে বাকিদের উপর ফরয থাকে না, এখন আর তেমন নয়। সকলের উপরই ফরয। সকলকেই শরীক হতে হবে। সাথে অন্যান্য ফরযও আদায় করতে হবে। তবে একান্ত যদি কোথাও কাফেররা আক্রমণ করে বসে, তাহলে সেখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী মাসআলায় কিছুটা তফাৎ হবে।

৫. জিহাদ করতে হলে তানজীমে যোগ দিতে হবে কি'না?

উত্তর: জিহাদের জন্য জামাতবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কেননা, জিহাদ একটি সামষ্টিক কাজ। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টায় জিহাদে সফলতা সম্ভব নয়। তাই কোন হক্ব তানজীমে যুক্ত হওয়া আবশ্যক। এ মূহুর্তে হক্ব তানজীম না পেলে বা যুক্ত হতে না পারলে, যুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালাতে থাকবে। পাশাপাশি সামর্থ্যানুযায়ী তাওহিদ ও জিহাদের দাওয়াত প্রচার করতে থাকবে।

৬. এদেশে জিহাদ কিভাবে করবো?

উত্তর: হক্ব তানজীমের উমরাগণের নির্দেশনা অনুযায়ী।

৭. ফরযে কিফায়া জিহাদে যেতে হলে মা-বাবার অনুমতি লাগে এর দলীল কি?

উত্তর: এর দলীল নিম্নোক্ত হাদিস-

বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত;

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنه في الجهاد فقال (أحي والداك) . قال نعم قال (ففيهما فجاهد

"এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিল: হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি তাদের মাঝেই জিহাদ কর।" (সহীহ বুখারী: ২৮৪২)

অর্থাৎ তাদের খেদমত ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা কর। তাহলে তুমি জিহাদে যাওয়ারই সওয়াব পাবে।

অন্য হাদিসে এসেছে,

عن معاوية بن جاهمة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال هل لك من أم؟ قال: نعم. فقال الزمها فإن الجنة عند رجلها. (قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن)

"হযরত মুআবিয়া ইবনে জাহিমা থেকে বর্ণিত যে, হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করলো, আমি যুদ্ধে যেতে চাচ্ছি। সেজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা আছেন কি? তিনি জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তাহলে তুমি তার খেদমতেই ব্যাপৃত থাক। কেননা, বেহেশত তার পায়ের নিচে।" (মুসনাদে আহমাদ: ১৫৫৭৭)

এ দুই হাদিসে পিতা-মাতা থাকাবস্থায় তাদের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত জিহাদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

কিন্তু আরেক হাদিসে এর বিপরীত এসেছে। ইবনে হিব্বান রহ. বর্ণনা করেন যে, এক সাহাবী আল্লাহ তাআলার কসম খেয়ে আরজ করেন,

والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولأتركنهما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أعلم

“ঐ সত্তার কসম যিনি (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন! আমি অবশ্যই অবশ্যই পিতা-মাতাকে ছেড়ে জিহাদে চলে যাবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার ব্যাপার তুমিই ভাল বুঝ।” (সহীহ ইবনে হিব্বান: ১৭২২)

এ হাদিসে সাহাবী আল্লাহর কসম করে বলছেন যে, তিনি পিতা-মাতাকে ছেড়ে জিহাদে চলে যাবেন, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করছেন না। এ থেকে বুঝা যায়, পিতা-মাতার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীতও জিহাদে যাওয়া যাবে।

এ দুই হাদিসের সমন্বয়কল্পে উলামায়ে কেরাম বলেন, প্রথম হাদিস ফরযে কেফায়ার সূরতে প্রযোজ্য আর দ্বিতীয় হাদিস

ফরযে আইনের বেলায় প্রযোজ্য।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

قال جمهور العلماء يحرم الجهاد إذا منع الابوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن ويشهد له ما أخرجه بن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ... فقال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما. قال: فأنت أعلم) وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين. اه

"জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন, মুসলিম পিতা-মাতার উভয়ে বা কোন একজন নিষেধ করলে জিহাদে যাওয়া হারাম। কেননা, তাদের ফরমাবরদারি ফরযে আইন আর জিহাদ ফরযে কেফায়া। তবে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে অনুমতির প্রয়োজন নেই। এর দলীল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে ইবনে হিব্বানের বর্ণিত হাদিস: 'এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। ... অতঃপর সে বললো, 'ঐ সত্তার কসম যিনি (ইয়া রাসূলাল্লাহ্) আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন! আমি অবশ্যই অবশ্যই পিতা-মাতাকে ছেড়ে জিহাদে চলে যাবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন, তোমার ব্যাপার তুমিই ভাল বুঝ’।
দুই হাদিসের মাঝে সমন্বয়সাধনকল্পে এ হাদিস ফরযে আইন জিহাদের বেলায় প্রযোজ্য ধরা হবে।” (ফাতহুল বারি: ৬/১৪০-১৪১)

অতএব, ফরযে আইন জিহাদের বেলায় পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। এমনকি নিরাপত্তাগত সমস্যার সম্ভাবনা থাকলে তাদেরকে জানানো ব্যতীতই কাজ করে যেতে হবে। তবে তাদের সাথে সদাচরণ সর্বদাই বজায় রাখতে হবে। তাদের খেদমতও করতে হবে। খোর-পোষের প্রয়োজন হলে তাও ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সাথে জিহাদের কাজও করে যেতে হবে। তবে একান্তই যদি কারো বেলায় বিশেষ কোন পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাহলে তখন উলামায়ে কেরামের কাছে সরাসরি জিজ্ঞেস করে মাসআলা জেনে নেবে। ওয়াল্লাহু তাআলা আ’লাম।

এ সংক্রান্ত মিম্বারুত তাওহিদের একটি ফতোয়া উল্লেখ করছি। ইনশাআল্লাহ এতে বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার হবে-

أريد أن الجهاد ولكن ليس لأمي- بعد الله - غيري رقم السؤال: 586

بسم الله والصلاة والسلام على أفضل رسل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فأنا شاب مسلم أريد أن أجاهد ولكن والدي متوفى وليس لأمي غيري فهل يسقط علي فرض الجهاد أما يعتبر هذا ليس بعذر شرعي محب الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله ورعاه

السائل: أبو عاصم المصري

المجيب: اللجنة الشرعية في الـمنبر

أخي السائل حفظك الله ... سبقت الأجابة على العديد من الأسئلة المشابهة لسؤالك فارجع إليها في قسم الجهاد وأحكامه إن شئت، وخلاصة الجواب أن الجهاد وإن كان فرض عين في زماننا ولا يسقط عنك لعدم وجود من يرعى والدتك سواك، إلا ان هناك تفصيلا بحسب البلد التي أنت فيها وهل حضر قتال العدو فيها، وهل تعينت حاجة المجاهدين إلى أمثالك ففي مثل هذه الأحوال يجب عليك النفير ولو لم تجد من يرعى والدتك سواك لأن مصلحة الدين مقدمة على كل المصالح، وإن كان الحال غير ذلك فإنه يسعك إن شاء الله أن ترعى والدتك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا مع استصحابك نية الجهاد وتحديثك نفسك بذلك وإعدادك له والعمل في الدعوة إلى توحيد الله في بلدك والصبر على ذلك ومساعدة المجاهدين بما استطعت إليه سبيلا ... وفقك الله

أجابه، عضو اللجنة الشرعية: الشيخ أبو أسامة الشامي

“আমি জিহাদে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু আমি ছাড়া আমার মাকে

দেখার মতো কেউ নেই

প্রশ্ন নং ৫৮৬

প্রশ্ন: আমি জিহাদে যেতে চাই। কিন্তু আমার পিতা মারা গেছেন। আমি ছাড়া আমার মায়ের আর কেউ নেই। আমার উপর কি জিহাদ ফরয? না'কি এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওজর ধরা হবে না?

উত্তর: ... বর্তমান যামানায় জিহাদ যদিও ফরযে আইন এবং আপনি ছাড়া আপনার মাকে দেখার কেউ না থাকলেও আপনি জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবেন না, তবে এখানে কিছু তাফসীল আছে। আপনি যে শহরে আছেন সে শহর হিসেবে। সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে কি'না এবং আপনার মতো লোকদের প্রতি মুজাহিদদের অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কি'না- সে হিসেবে। অবস্থা এমন হলে আপনাকে জিহাদে বের হতে হবে, যদিও আপনার মাকে দেখার কেউ না থাকে। কেননা, দ্বীনি মাসলাহাত সকল মাসলাহাতের তুলনায় অগ্রগণ্য।

আর যদি অবস্থা এমন না হয়ে থাকে, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি আপনার মায়ের দেখাশুনা করতে পারবেন, যত দিন

না আল্লাহ তাআলা ভিন্ন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। সাথে সাথে আপনি জিহাদের নিয়ত রাখবেন। জিহাদের আকাঙ্কায় থাকবেন। জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেবেন। আপনার শহরে আপনি আল্লাহ তাআলার তাওহিদের প্রতি দাওয়াত দেয়ার কাজ চালাতে থাকবেন। ধৈর্যের সাথে এগুলো করতে থাকবেন। সামর্থ্যানুযায়ী মুজাহিদদের সহায়তা করতে থাকবেন। وفقك الله

উত্তর প্রদানে:

আবু উসামা আশশামী

সদস্য, শরয়ী বিভাগ, মিম্বারুত তাওহিদ।”

প্রশ্নোক্ত সূরতে জিহাদ এবং মায়ের খেদমত উভয়টাই ফরযে আইন। উভয়টাই আদায় জরুরী। এজন্য মায়ের খেদমত করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সামর্থ্যানুযী দাওয়াত ও জিহাদের কাজ করে যেতে বলা হয়েছে। তবে কখনোও যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে এবং ময়দানে বের হওয়া ছাড়া উপায় না থাকে, তখন মাকে দেখার কেউ না থাকলেও

ময়দানে চলে যেতে বলা হয়েছে।

হুবহু একই পরিস্থিতি আমাদের দেশের। স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা সকলের প্রাপ্য হক আদায় করতে হবে। সাথে জিহাদের কাজও করে যেতে হবে। হ্যাঁ, কখনো বা কোন কোন ভাইয়ের ক্ষেত্রে যদি বিশেষ কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তাহলে কথা ভিন্ন।

আশাকরি ভাইদের কাছে বিষয়টি কিছুটা হলেও পরিষ্কার হয়েছে। আমি বার বার এ কথাটা আলোচনায় আনছি, যাতে আমাদের মাঝে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলার কোন ফরয যেন ভুল বুঝের কারণে বা গাফলতবশত তরক না করি। জিহাদ যে আল্লাহর জন্য করবো, অন্যান্য ফরযগুলো সে আল্লাহ তাআলাই নির্ধারণ করেছেন। এ জন্য জিহাদে যেমন গুরুত্ব দেব, অন্যান্য ফরযের ব্যাপারেও তেমনই গুরুত্ব দেব। তবে হ্যাঁ, যেহেতু জিহাদের ময়দান অবহেলিত, লোকের অভাব- সেজন্য জিহাদের ব্যাপারে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দেব। প্রয়োজনে আমাদের সব কিছু জিহাদের জন্য কুরবান

করে দেব। তবে অন্য কোন ফরয যেন না ছুটে যায় সেদিকেও সবিশেষ দৃষ্টি রাখবো। আল্লাহ তাআলার বিধানাবলীর প্রতি, তার বেঁধে দেয়া সীমার প্রতি সর্বোচ্চ দৃষ্টি রাখাই একজন মুজাহিদের সিফাত। আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের সিফাত উল্লেখ করে বলেন,

{ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ } (112)

"তারা তাওবাকারী, ইবাদতগুজার, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশ প্রদানকারী, অসৎকাজ হতে বারণকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিতসীমা হিফাযতকারী।" (তাওবা: ১১২)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝের সাথে জিহাদ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العلمين.

৩৯.জিহাদ-কিতাল: কাকে বলে ও কত প্রকার; এক ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর

এক ভাই জানতে চেয়েছেন:

১. জিহাদ কাকে বলে ?

২. জিহাদ কত প্রকার ও কি কি ?

৩. ক্বিতাল কাকে বলে ?

৪. ক্বিতাল কত প্রকার ও কি কি ?

৫. ২ টার মাঝে পার্থক্য কি কি ?

উত্তর:

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

মুহতারাম ভাই, কমেন্টে রিপ্লাই দিয়েছিলাম। তবে শুধু এতুটুকুতে হয়তো আপনার চাহিদা পূরণ হবে না। তাই রিপ্লাইটা সহ এখানে আরেকটু বিস্তারিত বলছি।

এক. জিহাদ কাকে বলে?

উত্তর: আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে কাফের-

মুরতাদদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা কিংবা জান-মাল ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাতে কোন ধরণের সহায়তা করাকে জিহাদ বলে। আমীরের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী যে যেভাবে সহায়তা করবে সবই জিহাদ হবে। যে যতটুকু কুরবানী দেবে সে ততটুকু সওয়াব পাবে। আশাকরি বুঝতেই পারছেন- জিহাদ বলতে শুধু যুদ্ধ নয়; কাফেরদের বিরুদ্ধে জয় লাভের জন্য যুদ্ধ এবং আমীরের নির্দেশনাধীন যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অন্য সকল কাজও জিহাদ।

দুই. জিহাদ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: জিহাদ দুই প্রকার:

১. ইকদামি তথা আক্রমণাত্মক জিহাদ। কাফেরদের দেশ বিজয় করে সেখানে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য এ জিহাদ করা হয়। এটি ফরযে কেফায়া।

২. দিফায়ী তথা প্রতিরক্ষামূলক। কাফেররা মুসলমানদের উপর বা তাদের কোন ভূমিতে আক্রমণ চালালে তা প্রতিহত করা ফরয। একে দিফায়ি জিহাদ বলে। এটি ফরযে আইন।

ফরযে কিফায়া ও ফরযে আইন কাকে বলে, ফরযে আইন কতজনের উপর হয়- কয়দিন আগে এ সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত পোস্ট দেয়া হয়েছিল। আপনি সেটা দেখতে পারেন।

লিংক:

https://dawahilallah.com/showthread....2503;&%232472;

জিহাদের প্রকারের ব্যাপারে আপনি এই লেখাটা দেখতে পারেন। এখানে উভয় প্রকার জিহাদ (ইকদামি ও দিফায়ি) সম্পর্কে দলীলভিত্তিক আলোচনা আছে। লেখাটা বিজয়ে লেখা, তাই এখানে পোস্ট করতে পারছি না।

https://my.pcloud.com/publink/show?c...0fQqkTajSkztoy

জিহাদের সংজ্ঞা ও প্রকারের গোছানো আলোচনা আপনি 'ফাযায়েলে জিহাদ' কিতাবে পাবেন। পৃষ্ঠা: ৩-৩৪

এক ভাই সেটার লিংক দিয়েছেন:

https://my.pcloud.com/publink/show?c...aeyA7sYQdQnJJX

তিন. কিতাল কাকে বলে?

উত্তর: কিতাল অর্থ- যুদ্ধ, লড়াই। কিতালের জন্য দু'টি পক্ষ থাকা জরুরী।

চার. কিতাল কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: মুহতারাম ভাই, এ প্রশ্নের দ্বারা আপনার কি উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না। বুঝিয়ে বললে হয়তো উত্তর দেয়া যাবে। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, কিতাল দুই প্রকার:

১. দ্বীনের জন্য কিতাল: এটা জিহাদ হবে। সওয়াব পাওয়া যাবে। নিহত হলে শহীদ হবে।

২. দুনিয়ার জন্য কিতাল: এটা ফাসাদ ও সন্ত্রাস হবে। গুনাহগার হবে। নিহত হলে বা অন্যকে হত্যা করলে জাহান্নামী হবে।

যেমন- এক হাদিসে হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এসেছে-

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.

"এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে আরজ করলো- কেউ যুদ্ধ করে গনিমতের লোভে, কেউ যুদ্ধ করে প্রশংসা লাভের জন্য আর কেউ যুদ্ধ করে তার বাহাদুরী ও বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। এদের কার যুদ্ধ আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ) গণ্য হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, আল্লাহর কালিমা বুলন্দীর জন্য যে যুদ্ধ করে, তারটাই কেবল আল্লাহর রাস্তায় গণ্য হবে।" (সহীহ বুখারী: ২৮১০, সহীহ মুসলিম: ৫০২৮)

অন্য হাদিসে হযরত আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله!
إنه كان حريصا على قتل صاحبه :هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال.

"দুই মুসলমান যদি (না-হক্ক) পরস্পর তরবারি নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হবে। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হত্যাকারী জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামী হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন- কারণ, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যার আকাংখায় ছিল।" (সহীহ বুখারী: ৬৮৭৫, সহীহ মুসলিম: ৭৪৩৪)

পাঁচ. জিহাদ ও কিতালের মাঝে পার্থক্য কি?

উত্তর: জিহাদ ব্যাপকার্থবোধক, যার মাঝে কিতাল এবং কিতাল সংশ্লিষ্ট সকল কাজ অন্তর্ভূক্ত। যেমন- মুজাহিদদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, খানা-পিনার ব্যবস্থা করা, আহত মুজাহিদদের চিকিৎসা করা, জিহাদে অর্থ প্রদান, বুদ্ধি-পরামর্শ বা টেকনোলোজি দিয়ে মুজাহিদদের সহায়তা- ইত্যাদি সব কিছু জিহাদে শামিল।

আর কিতাল হল জিহাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ মারহালা। অতএব, জিহাদ শুধু কিতালের মাঝেই সীমাবদ্ধ না। কিতাল জিহাদের চূড়ান্ত পর্ব। এই মারহালায় পৌঁছতে এবং তা চালিয়ে নিতে অন্য যত কাজের প্রয়োজন সবগুলোই জিহাদ। তবে তা মনমতো হলে হবে না, আমীরের নির্দেশনায় হতে হবে।

মুহতারাম ভাই, আপাতত এতটুকুই উত্তর দিলাম। যদি আপনার প্রশ্নের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা করে বললে ইনশাআল্লাহ উত্তর দেয়া যাবে।

ওয়াসসালাম।

৪০.জিহাদের ব্যাপারে ফতোয়া দেবে কারা?

ফতোয়া দেয়ার জন্য দুই ধরণের ইলম দরকার:

ক. যে বিষয়ে ফতোয়া দিতে যাচ্ছে, সে বিষয়ের বাস্তবতা বুঝা। সে বিষয়টি পরিপূর্ণ না জেনে ও না বুঝে ফতোয়া দেয়া

যাবে না। যেমন, ঝগড়া লেগে স্বামী স্ত্রীকে তালাক জাতীয় কিছু শব্দ বলেছে। মুফতি সাহেবের কাছে জানতে চাওয়া হল, তালাক হবে কি'না? এবং হলে কয় তালাক এবং কোন ধরণের তালাক- রজয়ী না'কি বাইন? এখন মুফতি সাহেবকে প্রথমেই উক্ত ঘটনাটি ভাল করে জানতে ও বুঝতে হবে।

খ. উক্ত বিষয় বা ঘটনার শরয়ী বিধান। যেমন, উপরোক্ত তালাকের মাসআলায় মুফতি সাহেব ঘটনাটি ভাল করে বুঝার পর উক্ত শব্দ দ্বারা ঐ অবস্থায় কি ধরণের তালাক হয় এবং কয় তালাক হয়- সে বিষয়ে তার যথাযথ শরয়ী ইলম থাকতে হবে। ঘটনাটি ভাল করে বুঝার পর এবং সে বিষয়ে শরয়ী বিধান ভাল করে জানা-বুঝার পরই কেবল ফতোয়া দিতে পারবে। এর কোন একটায় কমতি থাকলে ফতোয়া দেয়া জায়েয হবে না।

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১ হি.) বলেন,

ولا يتمكن المفتي [ولا] الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علمًا

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حُكْم اللَّه الذي حَكَم به في كتابه أو على لسان رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. اهـ

"মুফতি বা বিচারক দুই ধরণের জ্ঞান ব্যতীত সঠিক ফতোয়া ও সঠিক বিচার করতে সক্ষম হবে না:

এক. ঘটনার প্রকৃত অবস্থা ভালভাবে জানা ও বুঝা এবং আলামত, নিদর্শন ও সার্বিক অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করে ঘটনার প্রকৃত ইলম উদ্ধার করা;

দুই. ঘটনার (শরয়ী) বিধান বুঝা। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এই ঘটনায় তার কিতাবে বা তার রাসূলের যবানে কি নির্দেশ দিয়েছেন তা বুঝা অতঃপর একটিকে অপরটির উপর প্রয়োগ করা।"- **ই'লামুল মুআককিয়িন: ২/১৬৫**

উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে জিহাদ বিষয়ে ফতোয়া দিতে হলে প্রথমে জিহাদের বাস্তব ময়দান, মুজাহিদিনে কেরামের অবস্থা এবং তাদের প্রতিপক্ষ তাগুত-কাফের ও মুরতাদদের অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য ইলম লাগবে। দ্বিতীয়ত বাস্তব ময়দান বুঝার পর জিহাদের ব্যাপারে যথাযথ ও সহীহ

শরয়ী ইলম লাগবে। যাদের শরয়ী ইলম নেই তাদের জন্য যেমন ফতোয়া দেয়া জায়েয নেই, ময়দানের জ্ঞান যাদের নেই তাদের জন্যও ফতোয়া দেয়া জায়েয নেই। অতএব, একজন জেনারেল শিক্ষিত ব্যক্তি জিহাদের বাস্তব ময়দানের ব্যাপারে যতই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হোন না কেন, তার জন্য ফতোয়া দেয়া জায়েয নয়। তদ্রূপ, যত বড় আলেমই হোন না কেন, জিহাদের ময়দানের বাস্তবতা জানা না থাকলে তার জন্যও ফতোয়া দেয়া জায়েয নেই। আর যাদের উভয়টাতেই কমতি আছে- যেমনটা বর্তমানে যারা জিহাদ ও মুজাহিদিনের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন ও ভুল ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি- তাদের জন্য তো এর আগেই নাজায়েয।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا. اهـ الاختيارات الفقهية 609-610

“জিহাদি বিষয়াশয়ে আবশ্যক হল ঐ সকল সহীহ দ্বীনদারদের রায় গ্রহণ করা, সাধারণ দুনিয়াবাসীর অবস্থাদি সম্পর্কে যাদের

অভিজ্ঞতা আছে। সাধারণদের রায় গ্রহণ না করা, সাধারণত যারা দ্বীনের ভাসা ভাসা দিকটাই দেখে থাকে। এদের রায় গ্রহণ করা হবে না। তদ্রূপ, ঐসব দ্বীনদারের রায়ও গ্রহণ করা হবে না, দুনিয়ার ব্যাপারে যাদের অভিজ্ঞতা নেই।”- **আলইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ: ৬০৯-৬১০**

বর্তমানে যারা জিহাদ ও মুজাহিদিনের ব্যাপারে কথা বলছেন, তারা যদি এ উসূলটি রক্ষা করে কথা বলতেন, তাহলে কতই না ভাল হত!

৪১.জিহাদের স্বার্থে হারামে লিপ্ত হওয়া যাবে কি?

জিহাদের স্বার্থে হারামে লিপ্ত হওয়া যাবে কি’না- বিষয়টি ফোরামে আলোচিত হচ্ছে। পোস্ট ও কমেন্ট থেকে বুঝা যায়, আলহামদু লিল্লাহ ভাইদের এ ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা

আছে। তবে যেহেতু বিষয়টা হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট তাই এ ব্যাপারে শিথিলতার অবকাশ নেই। এ উদ্দেশ্যেই কিছু কথা বলছি। আল্লাহ তাআলা আমার জন্য এবং সকল মুজাহিদের জন্য তা উপকারী বানিয়ে দিন। আমীন।

মুহতারাম মুজাহিদ ভাইগণ, জিহাদের জরুরতে অনেক সময় এমন কিছু বিষয়ের অনুমোদন দেয়া হয়, যেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় নাজায়েয। কিন্তু এমন নয় যে, জিহাদের প্রয়োজনে যেকোন সময় যেকোন ধরণের নাজায়েয কাজের অনুমতি আছে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। **এখানে মৌলিকভাবে দু'টি বিষয় মনে রাখতে হবে-**

ক. আমি যতদূর জানি, জিহাদের জরুরতে ফাহেশা কাজ (যেমন যিনা, সমকামিতা ইত্যাদি) জায়েয নয়। এমনকি জীবন গেলেও না। অবশ্য কোন মহিলা যদি গ্রেফতার হন আর এমন হয় যে, যিনার সুযোগ না দিলে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে- তাহলে তার জন্য যিনার সুযোগ দেয়ার অবকাশ আছে। এটা শুধু মহিলার জন্য। কিন্তু পুরুষের জন্য কোন অবস্থাতেই যিনা করা বা সমকামিতা করা বা তার সাথে তা করার সুযোগ দেয়ার কোন অবকাশ নেই। এমনকি জীবন গেলেও না।

(ولو أكره على الزنا لا يرخص له)

(وفي جانب المرأة يرخص) ...

لها الزنا (بالإكراه الملجئ) ... (لا بغيره، لكنه يسقط الحد في

زناها لا زناه) لأنه لما لم يكن الملجئ رخصة له لم يكن غير الملجئ شبهة له.

[فرع]:

ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة كحكم المرأة لعدم الولد فترخص بالملجئ إلا أن يفرق بكونها أشد حرمة من الزنا لأنها لم تبح بطريق ما ولكون قبحها عقليا؛ ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح. اهـ [الدر المختار- على صدر رد المحتار: 6\137]

قال ابن عابدين رحمه الله تحته: (قوله: لكنه يسقط الحد في زناها) أي بغير الملجئ، لأنه لما كان الملجئ رخصة لها كان غيره شبهة لها. (قوله: لأنه لما لم يكن الملجئ رخصة له إلخ) تعليل لقوله لا زناه، وإذا لم يرخص له يأثم في الإقدام عليه وأما المرأة هل تأثم ذكر شيخ الإسلام إن أكرهت على أن تمكن من نفسها، فمكنت تأثم وإن لم تمكن وزنى بها فلا

وهذا لو بملجئ وإلا فعليه الحد بلا خلاف لا عليها ولكنها تأثم هندية. (قوله: وظاهر تعليلهم) أي بأنه لا يرخص للرجل، لأن فيه قتل النفس ويرخص للمرأة لعدم قطع قوله: أن حكم اللواطة) أي من الفاعل) .النسب منها والمفعول ولو برجل ط. (قوله: فترخص بالملجئ) في باب الإكراه من النتف لو أكره على الزنا واللواطة لا يسعه وإن قتل اهـ فمنع اللواطة مع أنها لا تؤدي إلى هلاك الولد ولا تفسد الفراش اهـ سرى الدين وظاهر إطلاق النتف يعم الفاعل والمفعول ط وقد ذكر في المنح أيضا عبارة النتف. (قوله: لأنها لم تبح بطريق ما) بخلاف الوطء في القبل فإنه يستباح بعقد وبملك فافهم. (قوله: ولكون قبحها عقليا) لأن فيها إذلالا للمفعول ويأبى العقل ذلك، وقد انضم قبحها العقلي إلى قبحها طبعا - فإنه محل نجاسة وفرث وإخراج لا رد]محل حرث وإدخال وطهارة -، وإلى قبحها شرعا ط. اهـ [المحتار: 6\137

খ. জিহাদের জরুরতে স্বাভাবিক শারীরিক বেশ-ভূষা পরিবর্তন করা, কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা (দাড়ি কাটা, টাকনুর নিচে কাপড় পড়া এগুলো এ শ্রেণীভুক্ত), ঘুরিয়ে কথা বলা বা মিথ্যা বলা এগুলো বৈধ। এগুলো الحرب خدعةএর অন্তর্ভুক্ত। তবে এমন নয় যে, ঢালাওভাবে সকল মুজাহিদের জন্য সর্বাবস্থায় এগুলো জায়েয। বরং এগুলো দু'টি অবস্থায় জায়েয:

এক. জীবনের বা গ্রেফতারির আশঙ্কা হলে।

দুই. এগুলো ছাড়া জিহাদ বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি হলে।

কিতাব থেকে মুরাবিত ভাইয়ের উল্লিখিত ইবারতেই এ কথাটি আছে-

وحلق اللحية محرم ويجوز للمجاهد في حالتين: إما أن يكون وجودها يعرض روحه للخطر الأكيد فيجوز له حلقها بدليل جواز أكل الميتة، وقول الله (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) .. وإما أن يكون وجودها يعيقه عن تنفيذ أمر الله تعالى بقتل أعداء الله أو إقامة الجهاد ضدهم، فيجوز ذلك بدليل قتل كعب بن الأشرف والخيلاء في الحرب والقواعد الشرعية والنصوص الأخرى تجيز ذلك ولا نطيل بذكرها، ولكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن إعفاء اللحية واجب وتبقى ذمة العبد مشغولة بإعفاء لحيته، ولا يجوز له أن يتوهم العوارض ليحلق لحيته، فإما أن يكون العارض أو الحال الذي يخافه متيقناً أو ليعلم أن ذمته مشغولة بإعفاء لحيته فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يترك ما تكون ذمته مشغولة به من أجل مصلحة أو خطر متوهم.

اهـ [أخبار القلم والسيف في رحلة الشتاء والصيف: 40-41]

যখন স্বাভাবিক অবস্থা থাকে এবং এগুলো পালন করেও জিহাদ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়- তখন এগুলোর বিপরীত করা যাবে না।

অতএব,

- যখন দাড়ি কাটা ছাড়া জীবনের, গ্রেফতারির বা জিহাদ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা হয় তখনই কেবল দাড়ি কাটা বৈধ; অন্যথায় নয়।

- টাকনুর নিচে কাপড় পড়ার বেলায়ও একই কথা।

- ঈমানের পরই নামাযের গুরুত্ব। নামায কায়েমের জন্যই জিহাদ। অতএব, জিহাদের

স্বার্থে বা জিহাদের কাজে লিপ্ত থাকার দরুন নামায ছাড়া যাবে না। একান্ত বিশেষ জরুরী অবস্থাতেই কেবল নামায ছাড়ার অনুমতি আছে। অন্যথায় নয়।

ইমাম জাসসাস রহ. বড়ই আজীব কথা বলেছেন। নামাযের গুরুত্বের ব্যাপারে তার এ কথাটা স্বরণ রাখা উচিৎ। তিনি বলেন,

ألا ترى أنهم لو قالوا لنا: اتركوا صلاة واحدة من فروضكم لنطلق لكم أسراكم، لم يسعنا إجابتهم إلى ذلك وإن كان فيه حقن دماء الأسرى، ووصولهم إلى دار الإسلام. اهـ (شرح مختصر الطحاوي: 7\160)

শত হাজারো মুসলিম বন্দী মুক্তির শর্তেও যদি এক ওয়াক্ত নামায ছাড়া জায়েয না হয়,

তাহলে আর জিহাদের কোন এমন মাসলাহাত আছে, যার দরুন নামায ছাড়া যাবে?! একান্তই যেখানে জীবনের আশঙ্কা বা গ্রেফতারির ভয়, সেখানেই কেবল নামায কাযা করা যাবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বিষয়গুলো বড়ই নাযুক এবং হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই প্রত্যেকের উচিৎ নিজের অবস্থা জানিয়ে সরাসরি উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ফতোয়া নেয়া। বিশেষত একজন দ্বীনের দাঈ ও মুজাহিদের জন্য কিছুতেই নিজের ধারণাপ্রসূত মাসলাহাতের কারণে হারামে লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফিক দান করুন।

বিষয়গুলো কিছু আন্দাজ করার সুবিধার্থে মিম্বারুত তাওহিদ থেকে আমি কয়েকটি ফতোয়া উল্লেখ করছি-

ফতোয়া- ১

هل يجوز لمجاهد سلفي في غزة أن يحلق لحيته أو شعره ؟

رقم السؤال: 974 القسم : الجهاد وأحكامه

تاريخ النشر: 16 /12/2009 المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال :

هل يجوز لمجاهد سلفي في غزة أن يحلق لحيته أو شعره أو

أحدهما كي يبعد الشبهة عن نفسه ويضمن عدم ملاحقة الحكومة له، مع العلم أن الناس يعتبرونه متشددا ومخطئا وكيف تتم توعية هؤلاء الناس وكل الشعب الفلسطيني اجتمعوا على السلفية الجهادية في غزة؟

السائل: أبو معتز الأحمدي الأنصاري

* * *

:الجواب

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ... وبعد

بداية: إعفاء شعر الرأس سنة حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقه لا بأس به، حتى وإن كان من غير سبب.

أما اللحية فإعفاؤها مطلوب شرعا، ويحرم حلقها، ولكن لابد أن نبين أن إعفاء اللحية عند أهل غزة ليس علامة على السلفي الجهادي فحسب، بل نجد أن من أفراد الحكومة ومن عناصر حماس والجهاد الإسلامي وألوية الناصر من يعفون لحاهم، بل يُوجد بعض عناصر التنظيمات اليسارية والعلمانية كالجبهة الشعبة وفتح من يعفون لحاهم، بحيث

إنَّك لو رأيته تحسب أنه ينتمي لتنظيم إسلامي، فهذا ليس مبررا لحلق اللحية، لهذا يجب ألَّا نتهاون ونقوم بحلقها لأتفه الأسباب، ونبرر لأنفسنا بمبررات قد تكون واهية.

أما إذا وُجِد بالفعل من هو مطلوب ومطارد للحكومة، ولديها صورة له وهو ملتحي، فيجوز له حلقها، من باب الضرورات تبيح المحظورات.

ثانيًا: يتم توعية الناس بدعوتهم إلى المنهج الصحيح الصافي بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، مع التحلي بالعلم والصبر، ويجب على الداعي أن يفقه حال المدعو، فينتهج التدرج مع من يقوم بدعوته، ويبدأ بـالأهم فالمهم، فشخص لا يُصلي ولا يُحسن الوضوء لا تبدأ دعوته بغوامض العقيدة التي قد لا يستوعبها عقله، أو شخص يجهل أساسيات التوحيد لا تبدأ دعوته بتكفير الأعيان؛ لأن هذا قد يُنفِّر الناس ويضر بالدعوة..هذا؛ وبالله تعالى التوفيق.

إجابة عضو اللجنة الشرعية :

الشيخ أبو الوليد المقدسي

ফতোয়া-২

حكم إسبال الإزار وحلق اللحى في العراق في ظل الظروف الحالية؟

رقم السؤال: 238 القسم : الجهاد وأحكامه

تاريخ النشر: 3 /1/2010 المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

: السؤال

..السلام عليكم..شيوخنا الكرام

الآن في العراق ظروفنا ليست جيدة ولا نستطيع التقصير من ملابسنا، فهل يجوز لنا أن نسبل الإزار و نحلق اللحية، علماً بأننا لو قصرنا من إزارنا فإننا سنتعرض عندها للإعتقال.

السائل: alghareeb

* * *

:الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فلا بأس للمجاهدين من أن يأخذوا من لحاهم أو أن يسبلوا من إزارهم إذا كان الجهاد لا يستمر إلا بذلك وإذا كان في ذلك تورية عن المجاهدين ودرء مفسدة اعتقالهم والتسلط عليهم والحال كما هو في العراق، فلقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) (ص 177-176 في معرض حديثه عن مخالفة الكفار في الهدي الظاهر: ((لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والإطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.

فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل

((على الكافرين بها الصغار والجزية: ففيها شرعت المخالفة .أ.هـ

ولقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في معرض كلامه عن قصة حصار الروم للمجاهدين في مدينة عكا في زمن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى والذي لم يكن هناك وسيلة لاختراق الحصار من أجل إيصال سفينة الإمدادات إلى المجاهدين إلا بحلق اللحى والتنكر بزي الروم ونحوه حيث قال: (وأمر - أي صلاح الدين الأيوبي - من فيها من التجار أن يلبسوا زي الفرنج حتى أنهم حلقوا لحاهم، وشدوا معهم - الزنانير، واستصحبوا في البطشة - أي السفينة شيئا من الخنازير، وقدموا بها على مراكب الفرنج فاعتقدوا أنهم منهم وهي سائرة كأنها السهم إذا خرج من كبد القوس، فحذرهم الفرنج غائلة الميناء من ناحية البلد، فاعتذروا بأنهم مغلوبون عنها، ولا يمكنهم حبسها من قوة الريح، وما زالوا كذلك حتى ولجوا الميناء فأفرغوا ما كان معهم من الميرة، والحرب خدعة، فعبرت الميناء فامتلأ الثغر بها خيراً) 12/354.

وهناك رسالة في المنبر بعنوان " وحلقوا لحاهم " فلتراجع فإن فيها فوائد طيبة في هذا الموضوع. كل ذلك يبنى على قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد المعروفة، هذا إذا كنت أخي الكريم ملتحقا بصفوف المجاهدين مقيما في ذروة سنام الدين، وأما إذا كنت من القاعدين عن الجهاد أو ممن يقيم بين ظهراني الروافض والمرتدين ولا تستطيع إقامة شعائر الدين، وعلى رأسها التوحيد والجهاد، فإنه يجب عليك أن تفر بدينك ونفسك وأهلك ومالك إلى مكان تستطيع فيه إظهار دينك .قال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا * وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

.((غَفُورًا رَحِيمًا

فيجب عليك أيها الحبيب في مثل هذه الحالة أن تتحول وتهاجر من المناطق التي يسيطر عليها الروافض والمرتدون إلى مناطق أهل السنة والجماعة، كما يجب عليك كذلك الإتحاق بإخوانك الموحدين الذين رفعوا لواء التوحيد وأعلوا راية الجهاد، ولا يخفى أن دفع العدو الصائل هو أوجب الواجبات بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .أجمعين

: إجابة عضو اللجنة الشرعية

الشيخ أبو النور الفلسطيني

ফতোয়া-৩

هل يجوز حلق اللحية لغاية التعلم ؟

رقم السؤال: 602 القسم : الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 18 /12/2009 المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

: السؤال

..السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

سؤالي هو : هل يجوز حلق اللحية لغاية التعلم عند الكفار ؟

السائل: أبو مجاهد الأنصاري

* * *

:الجواب

..وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن كنت تقصد الذهاب إلى بلاد الكفار لتعلم بعض علومهم الدنيوية فلا يجوز لك حلق لحيتك لهذا الغرض أبدا ، وذلك أن إعفاء اللحية واجب والدراسة في بلاد الكفار في أقصى أحوالها - إن سلمت من المحظورات - مباح ، والمباح لا يعارض الواجب ولا يتقدم عليه ، وارتكابك لمنكر حلق اللحية لا يجوز إلا لدفع منكر وضرر أكبر من حلقها وهو غير موجود هنا فبقي الحكم على التحريم ..والله أعلم.

: إجابة عضو اللجنة الشرعية

الشيخ أبو أسامة الشامي

ফতোয়া-৪

هل يجوز لي الكذب في مثل هذه الحالة ؟

رقم السؤال:132 القسم : الجهاد وأحكامه

تاريخ النشر: 1/10/2009 المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

:نص السؤال

... السلام عليكم ورحمة الله

شيخنا الفاضل أبو محمد حفظه الله ورعاه بداية

عندما كنت عائدا من زيارة احد الإخوة الذين تم إخراجهم

من سجن الطاغوت فوجئت بشخص ينادي علي ويقول لي

أنا أعرفك وتقابلنا في الجامعة ومع فلان وفلان ولكنني لم

أتذكر يوما ما أنني قابلته وربما قابلته ولكني لا أدري وأخذ

بالسؤال ما عرفتنا على نفسك وقال لي أنا من مسجد

كذا(عن نفسه) وحاله يريد أن يتعرف عليّ (ولكنني سجن

إخوان لي كثر ولم اسجن حتى الآن وذلك لأنني غير معروف

بالدرجة الكافية عند أنصار الطاغوت ولا يملكون عني

المعلومات الكافية مع وجود معلومات عني سابقة ولكنها

ضئيلة بالنسبة لما أعرف فخطر في بالي أن المرتدين

لعجزهم عن اختراقي أنهم قد يرسلون لي شخصا مثل هذا

الشخص)فسؤالي هل يجوز لي الكذب على هذا الشخص إذا

سألني عن بعض المعلومات الشخصية مثل في أي مسجد

ملتزم ورقم هاتفك لكي نتواصل ونصبح أصدقاء .. نرجو

منكم الإفادة بقدر المستطاع لضرورة الحاجة وبارك الله

فيكم وجزاكم عنّا وعن امة محمد خير الجزاء...

السائل: مجاهد

* * *

الجواب:

أخي السائل حفظك الله..

لا شك أن إعطاءك المعلومات الصحيحة عن نفسك في مثل

الظرف الذي تذكره ولمن لا تعرف أن هذا هو الخطأ والتقصير بعينه بل هي سذاجة في التفكير ...فالحرب خدعة كما تعلم وإذا كان سيد المرسلين استخدم المعاريض ولم يصرح بحقيقته عندما سأله الأعرابي في غزوة بدر من أي قبيلة أنت؟ فقال " من ماء" فهل نتورع نحن مما جوزه لعلنا نكون أصدق منه عليه الصلاة والسلام ؟! حاشا وكلا بل .. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة وعبد الله بن أنيس ونعيم بن مسعود وغيرهم من الصحابة أن يستعملوا المعاريض ويكذبوا لحاجة الحرب عندما أرسلهم في مهمات جهادية كما هو مذكور في السنن والسير... لذا فالواجب عليك إن خشيت أذى أعداء الله أو ترجح لديك أن المتعامل معك من جواسيسهم ألا تصرح عن نفسك بما يضرك ويسلطهم عليك وعلى إخوانك ؛ بل استخدم المعاريض ما استطعت " وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب" فإن لم تستطع استخدامها فلا حرج عليك في الكذب في هذه الأحوال ... وأنصحك أخي السائل أن تقرأ

الوقفة الرابعة من وقفات مع ثمرات الجهاد (ولتستبين سبيل المجرمين) للشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله لتزداد بصيرة .. حفظك الله.

إجابة عضو اللجنة الشرعية :

الشيخ أبو أسامة الشامي

ফতোয়া-৫

سؤال حول الكذب الجائز على الأهل وغيرهم لمصلحة الجهاد ؟

رقم السؤال: 290 القسم : الجهاد وأحكامه

تاريخ النشر: 2/11/2009 المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال :

سؤالي يا شيخ هل يجوز الكذب في مسائل لنصرة الدين كمثال يا شيخ أن أقول لأهلي أنا ذاهب للمنطقة الفلانية ثم

أذهب وأنفر في سبيل الله أو الذهاب لأحد التجار وأقول له عندي أسر فقيرة وأعطي المال للمجاهدين أو للمسجونين في سجون الطواغيت..جزاك الله خيرا يا شيخ.

السائل: مدمر الطواغيت

* * *

الجواب:

أخي السائل بارك الله فيك ..

الكذب لنصرة الدين يجوز على الكفار وأعداء الدين من الطواغيت ومن والاهم وأعانهم وذلك من باب أن الحرب خدعة كما فعل نعيم بن مسعود رضي الله عنه في غزوة الخندق عندما فرق بين صفوف الأحزاب من يهود بني قريظة وسائر المشركين حيث كذب على الطرفين كما هو مذكور في السير ونجح في تفريق صفوفهم ..

والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن أنيس عندما بعثه في مهمة جهادية "الحرب خدعة " ففي مثل هذه الحال - أقصد مع الكفار - يجوز الكذب مطلقا ما لم يكن فيه خيانة لأنا مأمورون بالوفاء. أما على المسلمين فالأصل أن

الكذب عليهم محرم وفي المعاريض مندوحة عن الكذب ، فلو قلت لأقاربك أنك مسافر للتجارة مثلا ثم ذهبت للجهاد ، فهذا من المعاريض وهو ليس بكذب فالجهاد تجارة تنجي من عذاب أليم كما هو في نص كلام الله تعالى ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة وارى بغيرها ، فالأولى استعمال المعاريض ما لم يكن في عدم الكذب الصريح مضرة على الجهاد والمجاهدين فتدفع المفسدة الأشد بارتكاب الأخف كما أوضحنا سابقا ، ولكن هنا لا بد من ضوابط لهذا الباب ؛ فلا يفتح على مصراعيه ، ولا يتوسع في الكذب على المسلمين كما يتوسع به على الكفار ..وننصحك في حالة الاضطرار للكذب على المسلمين لتحقيق مصلحة .. اكبر مدعاة بالاستفسار من أهل العلم الثقات أولا ولا تجوز الخيانة أو الإضرار بالغير ولا أخذ حقوق الآخرين .. والحالة التي ذكرتها من ذهابك لأحد التجار ...الخ ؛ هذا من الكذب الممنوع لأن الصدقة إذا أخرجها الإنسان لجهة معينة فإنها تتعين للمصرف الذي أخرجه له ، ولا يجوز لك التصرف فيها في مصرف آخر دون علمه لأنك موكل بذلك

ولست بمالك ، والتصرف فيما أؤتمنت عليه دون إذن

صاحبه ؛ يعد من خيانة الأمانة لأنك وكيل عنه في الإخراج

والموكل مؤتمن ، ولا تجوز خيانة الأمانة... والله أعلم

: إجابة عضو اللجنة الشرعية

الشيخ أبو أسامة الشامي

ফতোয়া-৬

هل يجوز النفير إلى ساحات الجهاد بالحصول على فيزا

بواسطة الاتصال بفتيات بحجة التعارف والصداقة ؟

رقم السؤال: 425 القسم : الجهاد وأحكامه

تاريخ النشر: 6 /11/2009 المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

: السؤال

:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

إخواننا الأعزاء كما تعلمون حال التضييق والخناق

المفروض على المسلمون في أنحاء العالم وفي غزة خاصة..
فبعض الشباب ممن يريدون النفير إلى أرض الجهاد سواء
في الجزائر أو العراق... يصعب السفر لأهل غزة بدون
تأشيرة وفيزا للخروج وعادة هذه الفيزا يحصل عليها بعد
إرسالها من قبل شخص آخر له من الخارج فسؤالنا أن
بعض الشباب يقومون بالتعرف على أناس من الخارج
بحجة الصداقة والصحبة وهناك ناس يتعرفون على البنات
بغرض إرسال فيزا للسفر للخارج ومن هناك... إذا سافر يفر
إلى أرض الجهاد. هذا من عدم التنسيق وعدم الاتصال
بالأخوة هناك وذلك لعدم وجود من يـنسقون معه والكل لا
يأمن على نفسه فكيف يأمن على غيره..ونعود إلى السؤال ألا
وهو هل يجوز للشباب المجاهد الملتزم بالتعرف على البنات
لكي يتمكن من السفر بالطريقة التي تعلمونها ؟؟؟ وإذا كان
لا يجوز فما الحل إذن في ظل الضعف والكبت الذي
يتعرض له الموحدون وعدم قدرتهم على إعلان عقيدتهم
نتيجة للإرهاب الطاغوتي المفروض عليهم؟؟
...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السائل: مجاهد

* * *

:الجواب

.وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

..وبعد

أولا: اعلم أخي السائل – أرشدك الله لطاعته - أنَّ ديننا العظيم قد حذرنا أشد التحذير من إقامة العلاقات بين الجنسين خارج نطاق الزواج، وأوصد الباب بشدة أمام فتنة برامج التعارف التي ذاعت وانتشرت عبر الصحف والمجلات وشبكة الإنترنت، وقد سدت الشريعة كل الأبواب والذرائع المفضية إلى الفتنة، ولذلك حرمت الخضوع بالقول، ومنعت الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة الأجنبية، وما ذلك إلا درءًا للفتنة، وسدًّا للذريعة، وهؤلاء وفقهم الله للخير - أخطئوا بادئ -الشباب المسؤول عنهم الأمر حين تعرَّفوا على بنات وتكلموا معهنَّ قبل أن يعرفوا الحكم الشرعي في هذه المسألة. فإن الـمحادثات الخاصة

بين الفتى والفتاة بهذه الطريقة - ولو كانت بادئ الأمر لغرضٍ شريف - فيها من المحاذير بعض ما في الخلوة المحرمة شرعا، ولذلك فقد تجر على أهلها شرًّا وبلاء لا يعلمه إلا الله، أضف إلى ذلك ما يترتب غالبا على هذه المحادثات من تساهل وخضوع في الحديث ما يدعو إلى الميل والمودة وافتتان كل منهما بالآخر، حتى توقعهم في العشق والهيام، وتقود بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك، خاصة إذا اجتمع معها نظر كل منهما إلى الآخر عن طريق الكاميرات، وهي من أعظم أسباب الفتنة كما هو مشاهد ومعلوم اليوم.

لهذا نصيحتنا لهؤلاء الشباب الابتعاد عن هذا الأمر؛ كيلا يُفتنوا في دينهم، فإن فتنة النساء عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".0

ثانيًا: قلت في سؤالك أنه لا يوجد تنسيق بين الإخوة ولا

اتصال، والواحد لا يأمن على نفسه، فمثل هذا لا ننصحه بالنفير إلا إن وجد الطريق الآمن؛ لأنه سيقع غالبا فريسة سهلة للأجهزة الأمنية الطاغوتية إما أسرًا وإما قتلًا،

وننصحه بأن يبقى في بلده ويجاهد إن لم يستطع بالسلاح فبالكلمة والدعوة إلى الله، والذب عن أعراض المجاهدين، وتحمل الأذى في ذلك، وعليه بالصبر، فإنه مفتاح النصر.

أما الكلام عن أهل غزة خاصة، فإن الجهاد فيها متاح، ولا مبرر لترك هذه الساحة إلى غيرها، بل البحث عن الراية الصحيحة والقتال تحتها وتقوية شوكتها في غزة أهون بكثير من مشقة التنسيق للخروج للساحات الأخرى، فكيف إذا كان الخروج بدون تنسيق ولا ترتيب مع الإخوة في تلك .الساحات. هذا؛ وبالله تعالى التوفيق

: إجابة عضو اللجنة الشرعية

الشيخ أبو الوليد المقدسي

৪২.জুমআর নামায ও জিহাদে ইমাম: একটু বিবেচনা করি

আমাদের হানাফি মাযহাব মতে জুমআর নামায আদায়ের জন্য স্বয়ং ইমামুল মুসলিমীন বা তার নায়েব বা তার নিয়োগকৃত বা অনুমোদিত ইমাম শর্ত। ইমামুল মুসলিমীনের অনুমতি ছাড়া কেউ জুমআ পড়ালে জুমআ সহী হবে না। এ বিধানটি হানাফি মাযহাবে একটি অতি প্রসিদ্ধ বিধান। তবে আমাদের আইম্মায়ে কেরাম বলেন, যদি কোন মুসলিম ভূমি কাফেররা দখল করে নেয়, তাহলে সেখানেও জুমআ কায়েম করতে হবে। মুসলমানরা নিজেরা একজন খতীব নির্বাচন করে নেবে, যিনি তাদের নিয়ে জুমআ আদায় করবেন। ইমামুল মুসলিমীন না থাকার অজুহাতে জুমআ ছাড়া যাবে না। তদ্রূপ কোন এলাকার পরিস্থিতি যদি এমন দাঁড়ায় যে, সেখানে ইমামুল মুসলিমীন বা তার নিয়োগকৃত কেউ জুমআ পড়াতে সক্ষম নন, তাহলে সেখানকার অধিবাসীরা একজনকে জুমআর ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়ে তার পিছনে জুমআ আদায় করবে।

আল্লামা কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

وأما السلطان فشرط أداء الجمعة عندنا حتى لا يجوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة نائبه، وقال الشافعي السلطان ليس بشرط؛ ... فأما إذا لم يكن إماما بسبب الفتنة أو بسبب الموت ولم يحضر وال آخر بعد حتى حضرت الجمعة ذكر الكرخي أنه لا بأس أن يجمع الناس على رجل حتى يصلي بهم الجمعة، وهكذا روي عن محمد ذكره في العيون؛ لما روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه لما حوصر قدم الناس عليا - رضي الله عنه - فصلى بهم الجمعة. اهـ

"আমাদের নিকট জুমআ আদায় করার জন্য সুলতান শর্ত। সুলতান বা তার নায়েবের উপস্থিতি ছাড়া জুমআ কায়েম করা জায়েয হবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেন, সুলতান শর্ত নয়। ... হাঁ, ফেতনা কিংবা মৃত্যুর কারণে যদি সুলতান না থাকেন এবং আরেকজন ওয়ালী বা শসনকর্তা এখনো উপস্থিত না হন, এমতাবস্থায় জুমআর সময় হয়ে যায়- ইমাম কারখী বলেন, জুমআ আদায়ের জন্য লোকজন একমত হয়ে কাউকে নির্ধারণ করে নিতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে এমনটিই বর্ণিত রয়েছে। 'আলউয়ূন' কিতাবে এমনটিই উল্লেখ করেছেন। কেননা, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন গৃহবন্দী হয়ে পড়েছিলেন, তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি তাদের নিয়ে জুমআ পড়িয়েছেন।" **(বাদায়েউস সানায়ে ১/৫৮৮)**

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

ولذا لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة ولم يوجد أحد ممن له حق إقامة الجمعة نصب العامة لهم خطيبا للضرورة كما سيأتي مع أنه لا أمير ولا قاضي ثمة أصلا وبهذا ظهر جهل من يقول لا تصح الجمعة في أيام الفتنة مع أنها تصح في البلاد التي استولى عليها الكفار كما سنذكره فتأمل. اهـ

"এজন্যই যদি শাসনকর্তা মৃত্যুবরণ করেন অথবা ফিতনার কারণে উপস্থিত না হতে পারেন এবং এমন কাউকে না পাওয়া যায়, যার জুমআ কায়েমের অধিকার রয়েছে তাহলে জরূরতের কারণে সাধারণ মানুষ নিজেদের জন্য একজন খতীব নির্ধারণ করে নেবে, যেমনটি সামনে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে। অথচ এখানে আমীর কিংবা কাযী কেউ-ই নেই। আমাদের এ বক্তব্য থেকে ঐ ব্যক্তির অজ্ঞতা স্পষ্ট হয়ে গেছে যারা বলে, ফেতনার দিনগুলোতে জুমআ সহীহ হবে না, অথচ ঐ সমস্ত শহরেও জুমআ সহীহ, যেগুলো কাফেররা দখল করে নিয়েছে, যেমনটি আমরা সামনে উল্লেখ করব।" **(রদ্দুল মুহতার: ৩/৬)**

বুঝা গেল, জুমআর জন্য যদিও ইমামুল মুসলিমীন বা বা তার নিয়োগকৃত ইমাম শর্ত, কিন্তু তা হলো- যখন যখন ইমাম

থাকেন এবং তার সামর্থ্য থাকে। পক্ষান্তরে যদি ইমামই না থাকে (যেমন- দারুল হরবে) কিংবা ইমাম থাকা সত্ত্বেও তার সামর্থ্য না থাকে (যেমন- মুসলমানদের নিজেদের পরস্পর দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়) তাহলে আর ইমাম শর্ত নয়। তখন লোকজনকে নিজেদের জুমআ নিজেদেরকেই আদায় করে নিতে হবে। কারণ, ইমামের শর্ত মূলত শৃঙ্খলার জন্য। যদি ইমাম না থাকে বা ইমামের সামর্থ্য না থাকে, তাহলে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই জুমআ আদায় করে নিতে হবে।

এ কারণেই, ইমাম থাকা অবস্থায় যদি ইমাম জুমআ কায়েম না করে কিংবা কায়েম করতে নিষেধ করে- তাহলে লোকজন নিজেরাই জুমআ আদায় করে নেবে। ইমামের আশায় বসে থাকবে না, কিংবা ইমামের নিষেধের কোন পরোয়া করবে না।

ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে বলা হয়েছে,

إذا نهاهم متعنتا أو ضرارا بهم فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة، كذا في الظهيرية. اهـ

“ইমাম যদি একগুঁয়েমি বশত কিংবা ক্ষতির উদ্দেশ্যে লোকজনকে জুমআ আদায় করতে নিষেধ করে, তাহলে তারা একমত হয়ে একজনকে নির্ধারণ করে নিতে পারবে, যিনি তাদেরকে নিয়ে জুমআ পড়াবেন। ফাতাওয়া জহিরিয়্যাতে এমনই আছে।” **(আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া: ১/১৪৬)**

প্রিয় পাঠক, দেখা গেল- জুমআর নামাযে ইমাম শর্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন ইমাম না থাকবে কিংবা ইমামের সামর্থ্য না থাকবে কিংবা ইমাম জুমআ কায়েম না করবে বা কায়েম করতে বাধা দেবে: তখন লোকজনকে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই পালন করতে হবে। কোন বাহানায় জুমআ তরক করা যাবে না।

প্রিয় পাঠক, এবার আমরা জিহাদের বিষয়ে আসি। জুমআর নামাযে ইমাম শর্ত হওয়ার কথা হানাফি মাযহাবের সব কিতাবেই আছে, কিন্তু জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত এমন কথা কিতাবাদিতে নেই। এতদসত্ত্বে কিভাবে যে সমাজে ছড়িয়ে গেল- জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত; বুঝে আসে না। অধিকন্তু

আমরা দেখেছি, ইমাম না থাকলেও জুমআ আদায় করতে হয়। যেখানে ইমাম শর্ত করা হয়েছে, সেখানেও যদি ইমাম না থাকে বা না করে, তাহলে লোকজনকে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকে পালন করতে হয়: তাহলে যেখানে জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত বলে কোন কথাই নেই, সেখানে কিভাবে ইমাম শর্ত হয়ে গেল? সেখানে কিভাবে ইমাম না থাকলে জিহাদ নিষিদ্ধ হয়ে গেল? বড়ই আশ্চর্যের বিষয়!

এক কথায়- শরীয়তের কোন বিধানের জন্যই ইমাম শর্ত নয়। ইমাম শুধু শৃঙ্খলার জন্য। ইমাম না থাকলে বা না করলে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই পালন করতে হবে। হুদুদ-কেসাসসহ অন্যান্য বিধানেরও একই বিধান। তবে যেখানে ফিতনার আশঙ্কা আছে, সেখানে পর্যাপ্ত সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। পূর্ণ সামর্থ্য না থাকলে যতটুকু সামর্থ্যে আছে আদায় করবে, বাকিটুকুর জন্য চেষ্টা করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহী বুঝ দান করুন। আমীন!

৪৩.তাগুতি হুকুমতের অধীনে চাকরি করার বিধান

প্রশ্ন নং: ৯২, বিষয়: আকিদা।

প্রকাশকাল: ৬/১০/২০০৯ ইং।

প্রশ্নের বিবরণ:

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

ইরাকের তাগুত সরকারের বিদ্যালয়ে নিয়োগ হওয়া এবং শিক্ষক হিসাবে চাকুরী করার বিধান কি?

প্রশ্নকারী: আবু উবায়দা আস-সালাফী।

উত্তর:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের যথাযথ অনুসরণ করবে তাদের উপর।

আম্মাবাদ!

প্রশ্নকারী ভাই! আল্লাহ আপনাকে ও আমাদেরকে সে কাজ করার তাওফিক দান করুন, যা তিনি ভালবাসেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

জেনে রাখুন, তাগুতী শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন পদে চাকুরী করার বিধান- চাই সেটা ইরাকে হোক বা অন্য কোন মুসলিম দেশে হোক, যেখানে কুফরী বিধি-বিধান বিজয়ী এবং কুফরের কর্তারা নেতৃত্ব দেয়- তা তিনটি বিধানের যেকোন একটির বাইরে হবে না।

১. হয়তো কুফরী হবে,

২. নয়ত হারাম হবে,

৩. নয়ত মাকরূহ হবে।

প্রতিটি হুকুম সাব্যস্ত হবে হুকুমের ইল্লত ও কারণের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে।

♣ যখন চাকুরির মধ্যে উক্ত হুকুমত ও তার কর্তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের সমর্থন ও সহযোগীতা করা এবং তাদের

আইন ও বিধানের সমর্থন ও সহযোগীতা করা পাওয়া যাবে- এটা চাই উক্ত শাসনব্যবস্থার প্রতি আহ্বান করার মাধ্যমে হোক বা তার দ্বারা শাসন পরিচালনা করার মাধ্যমে হোক বা সন্তুষ্টি ও গ্রহণের সাথে তার নিকট বিচার প্রার্থনা করার মাধ্যমে হোক- তাহলে কোন সন্দেহ নেই যে, এধরণের পদে চাকুরী করা প্রকাশ্য কুফর, স্পষ্ট শিরক্ এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে স্পষ্ট ইরতিদাদ। যে এ ধরণের পদসমূহে চাকুরী করবে, সে তাগুতদেরকে বর্জন করার সেই আবশ্যকীয় রুকনটি ভঙ্গ করল, যেটা ব্যতিত কারো ইসলাম গ্রহণই সহীহ হয় না।

♣ আর যখন চাকুরীতে উক্ত তাগুতী হুকুমতকে মানুষের উপর জুলুম করার ব্যাপারে অথবা অন্যায়ভাবে মানুষের মাল ভক্ষণ করার ব্যাপারে সাহায্য করা হবে- যেমন ট্যাক্স, টোল বা কোন কোন দেশে যেগুলোকে রাজস্ব বলে নামকরণ করা হয়, তা উসূলকারী হওয়া বা তাগুত সরকারকে সুদ খাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করা, যেমন তাগুতরা জনগণকে প্রথমে সংকীর্ণতায় ফেলে দেওয়ার পর ব্যবসার জন্য বা কৃষির জন্য সুদভিত্তিক যে ঋণ দেয় এবং এর ফলে জনগণ যা নিতে বাধ্য হয়, সেই সমস্ত মুআমালার লেখক বা সাক্ষী হওয়া- এ ধরণের পদে

চাকুরী করা অকাট্যভাবে হারাম এবং কবিরাহ গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম কবিরাহ গুনাহ।

যে এ সমস্ত পদে চাকুরী করে, সে তাগুতকে পরিপূর্ণ বর্জন করার সেই ওয়াজিব হুকুমটি পালন করল না, যা উক্ত গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী ঈমানকে ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল করে দেয়।

♣ তবে যদি চাকুরীর মধ্যে পুর্বোক্ত দু'টি কারণের কোন কারণ না পাওয়া যায়- যেমন ওয়াকফের ইমাম, তাদের খতিব ও মুআয্যিন অথবা শিক্ষা ও তরবিয়ত মন্ত্রণালয়ে শিক্ষক বা অন্য কোন কর্মকর্তা; স্বাস্থ মন্ত্রণালয় বা পৌরসভার কর্মকর্তারা, কিংবা অন্যান্য ঐ সকল পদ যেগুলোতে চাকুরীকারী ব্যক্তির সর্বনিম্ন অবস্থা হয় এই যে, সে ঐ সরকারের দল ভারিকারী এবং তার পদতলে লাঞ্ছিত ও অবনত থাকে- তাহলে এ ধরণের চাকুরীতে যদি অন্য কোন গুনাহ না পাওয়া যায়, তবে এটা আমরা এক্ষণে যে হুকুমগুলো উল্লেখ করলাম তার মধ্যে তৃতীয় নম্বরটি হবে। অর্থাৎ মাকরূহ হবে। অতএব এ ধরণের চাকুরিকারী ব্যক্তি তাগুতকে পরিপূর্ণ বর্জন করার মুস্তাহাব অংশটি বাস্তবায়ন করল না।

আমাদের শায়খ **আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসি** (হাফিজাহুল্লাহ) তার পুস্তক **“আলইশরাকাহ ফি সুওয়ালাতে সাওয়াকা”** এর দ্বিতীয় মাসআলায় বলেন-

আমরা যেটা বলেছি এবং বলবো, তা হল: আমরা একজন তাওহিদবাদী ভাইয়ের জন্য এটাই চাই যে, তিনি এই তাগুতী শাসনব্যস্থাকে পরিপূর্ণ বর্জন করার জন্য তা থেকে পরিপূর্ণ দূরে থাকবেন। কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি তাওহিদবাদীর জীবন পরিচালনার নীতিমালা হল আল্লাহ তা'আলার বাণী-{أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} “তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুত থেকে বেঁচে থাক।”

এটাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ। কিন্তু এর থেকে (অর্থাৎ তাগুতকে বর্জন করার পর্যায়সমূহ থেকে) কিছু হল ঈমানের জন্য শর্ত, যা পরিত্যাগ করা ঈমানকে ভঙ্গ করে দেয়। যেমন তাগুতের ইবাদত করা থেকে দূরে থাকা, ইচ্ছাকৃতভাবে তাগুতদের নিকট বিচার প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকা, তাগুতদের কুফরী আইন ও বিধি-বিধানের প্রহরা দেওয়া বা

তাকে শ্রদ্ধা করার ব্যাপারে শপথ করা বা এজাতীয় বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা।

আর কিছু হল ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার অংশ। এগুলো পরিত্যাগ করা ঈমানকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়। কিন্তু ঈমানকে ভেঙ্গে দেয় না। যেমন তাগুতের প্রতি কিছুটা নতঝানু হওয়া, শৈথিল্য করা, তাদের জুলুমের ক্ষেত্রে তাদের দল ভারী করা বা এজাতীয় গুনাহগুলো।

অত:পর শায়খ (হাফিযাহুল্লাহ) এই মাসআলার টীকায় লিখেন: এর দ্বারা এ সকল গুনাহর ব্যাপারে শৈথিল্যতা বুঝা উচিত নয়। কারণ এগুলোর মধ্যে কতিপয় আছে কবিরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। তবে আমাদের কথার উদ্দেশ্য ছিল, এ সকল গুনাহকে কুফরী কাজ থেকে পৃথক করা। যার গ্রহণকারী অন্তর রয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার এই ধমকি বাণীই যথেষ্ট, যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কাফেরদের প্রতি সামান্য ঝুঁকে যাওয়ার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন-

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة والضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصيرا

“আমি যদি তোমাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে তুমিও তাদের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হতে। আর তাহলে আমি দুনিয়ায়ও তোমাকে দিগুণ শাস্তি দিতাম এবং মৃত্যুর পরেও দিগুণ। অত:পর আমার বিরুদ্ধে তুমি কোন সাহায্যকারী পেতে না।”

এ ছিল সাধারণভাবে সকল মুসলিম দেশে বিরাজমান তাগুতী শাসনব্যবস্থায় যোগ দেওয়া বা সেখানে চাকুরী করার ব্যাপারে। এবার আসি ইরাকের তাগুতী শাসনব্যবস্থায় যোগ দেওয়া ও তাতে চাকুরী করার প্রসঙ্গে। সেখানকার অবস্থা তো সকলের জানাশোনা। যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। আল্লাহর সাথে শরীককারী ক্রুসেডের পূজারী এবং ইসলামের রক্ষক ও তাওহিদের সৈনিকদের মাঝে ঘোরতর লড়াই চলছে। রহমানের বন্ধু আর শয়তানের বন্ধুদের মাঝে যুদ্ধের চাকা ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই যদি কিছু বৈধ বিষয় থাকার কারণে সেখানে অধ্যাপনাকারী কাফের সাব্যস্ত নাও হয় বা গুনাহগার নাও হয়, -যেমন অঙ্কশাস্ত্র বা এজাতীয় বিষয় যেগুলোতে তাগুতী আইন ও তার শাসকদেরকে সম্মান করা হয় না- তথাপিও সে

গুনাহগার হবে, যদি এই আগ্রাসনের ছত্রছায়ায় থেকে তার মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দেয়, যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজে আইন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: যে আগ্রাসী দুশমন দ্বীন-দুনিয়া সব বরবাদ করে দেয়, ঈমানের পর তাকে দমন করা থেকে বড় আবশ্যকীয় বিষয় আর কিছু নেই।

একারণে হে প্রশ্নকারী ভাই! আমি আপনাকে উপদেশ দিব, আপনি **দাওলাতুল ইরাক আলইসলামিয়ার** সেনাবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না, যারা তাওহিদ ও জিহাদের পতাকা সুউচ্চ করেছে। আপনি তাদের কর্মী, তাদের সাহায্যকারী ও তাদের দলভূক্ত হওয়ার প্রতি আগ্রহি হোন। এমনকি যদি শুধু তাদের দল ভারি করা ব্যতিত আর কিছুই না করতে পারেন, তবে এর মধ্যেও শৈথিল্য করবেন না।

আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের ঐ সকল বিষয়ে আগ্রহ বাড়িয়ে দিন, যা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে এবং আমাদের প্রতি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। এ ছিল আমার কথা।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাশীল।

ওয়াসাল্লাল্লঅহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদিও ওয়ালা আলিহি ওয়াসাহবিহি আজমাঈন।

উত্তর প্রদান করেছেন: আল-লাজনাতুশ শরইয়্যাহ এর সদস্য শায়খ আবুন নুর আল-ফিলিস্তিনী।

[বি.দ্র. এ প্রশ্ন করা হয়েছে ২০০৯ ইং সালে। দাওলাতুল ইরাক তখনোও এতোটা গুমরাহিতে লিপ্ত হয়নি, যেমনটা পরে হয়েছে। এ কারণে তখন দাওলাতুল ইরাকে যোগ দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।]

৪৪.তামিম আদনানিকে নিয়ে সংশয়ের জওয়াব

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصبحه أجمعين. أما بعد

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের ছেলে আব্দুল্লাহ এক প্রশ্নের উত্তরে তামিম আদনানি হাফিজাহুল্লাহর ব্যাপারে মন্তব্য করেছে যে, তিনি মাজহুল। আর মাজহুলের বয়ান শুনা বা তার থেকে ইলম নেয়া জায়েয নেই।
এর আগেও কেউ কেউ এ ধরনের সংশয় ছড়িয়েছিল। এক ভাই বিষয়টির সমাধান জানতে চেয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আমি বিয়ষটি পরিষ্কার করতে চেষ্টা করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

এক.

যারা বলেন, তামিম আদনানি মাজহুল, তার থেকে ইলম নেয়া যাবে না: আসলে তাদের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে শরীয়তের উপর উঠানো, না'কি জিহাদ থেকে সরানো- একটু খেয়াল করে দেখা উচিৎ।

আসলে কি এ কথা তারা এ জন্য বলছে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তামিম আদনানির বয়ান শুনা হারাম হচ্ছে তাই জনসাধারণকে হারাম থেকে সতর্ক করছে, না'কি জিহাদ বিরোধী মিশন এবং তাগুতের দালালির অংশ হিসেবে বলছে- একটু ফিকির করা

উচিৎ।

দুই.

মাজহুলের বিধান কি শুধু তামিম আদনানির *উপরই প্রযোজ্য না'কি অন্য সকলের বেলায়ই প্রযোজ্য? তাদের শায়খদেরকে ক'জন চেনে? তারা যে শত শত কিতাব রিসালা আপলোড করে সেগুলোর লেখকদেরকে ক'জন চেনে?

যেমন ধরুন, আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। তার ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন করি-

১. তার বাড়ি কোথায়?

২. তার বংশ পরিচয় কি?

৩. তিনি কোথায় কোথায় পড়াশুনা করেছেন?

৪. তিনি কি কি যোগ্যতা লাভ করেছেন?

৫. তিনি কি তার উস্তাদ, পিতা মাতা ও অন্যান্য মুরব্বির ফরমাবরদার ছিলেন, না'কি নাফরমান ও অবাধ্য ছিলেন?

৬. তিনি কি পড়াশুনায় মনোযোগী ছিলেন না অমনোযোগী?

৭. ছাত্র যামানায় তিনি কি একজন দ্বীনদার তালিবে ইলম ছিলেন নাকি ভবঘুরে ও ফাসেক প্রকৃতির ছাত্র ছিলেন?

৮. তার উস্তাদগণ তার ব্যাপারে কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন? তারা কি তার জন্য দোয়া করেছেন না'কি বদদোয়া করেছেন?

৯. উস্তাদগণ কি তাকে কিতাবাদি পড়ানো, ওয়াজ নসিহত করা

ও ফতোয়া দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন না'কি দেননি? না'কি অযোগ্য হওয়ার কারণে এ থেকে বারণ করেছেন?

১০. পরিবারের লোকদের সাথে এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশিদের সাথে তিনি কি ভাল ব্যবহার করেন? তাদের হক আদায় করেন? না'কি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাদের হক নষ্ট করেন?

১১. তিনি কি নামাযি না'কি বেনামাযি?

১২. আদেল না ফাসেক?

১৩. সর্বোপরি তিনি কি বয়ান বক্তৃতা ও ফতোয়া প্রদানের যোগ্য না'কি অযোগ্য?

এ প্রশ্নগুলো তাদের একজন প্রসিদ্ধ শায়েখের ব্যাপারে করলাম। জিজ্ঞেস করি, **এদেশের কতজন আহলে হাদিস এ প্রশ্নগুলোর উত্তর যথাযথ জানেন? যদি না জেনে থাকেন তাহলে তার বয়ান শুনেন কিভাবে আর তার মাসআলা মাসায়েল নেন কিভাবে?**

আহলে হাদিসের তিনি তো একজন প্রসিদ্ধ শায়খ। আর যাদেরকে কেউ চিনে না, কখনও বাস্তবে দেখেনি- তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম।

আর তাদের সাইটে যেসব কিতাব-রিসালা আপলোড দেয়া হয়,

সেগুলোর লেখক অনুবাদকেরও তো একই হালত। সেগুলো ডাউনলোড করা ও পড়া কি তাদের দৃষ্টিতে হারাম হবে?

কাজেই তামিম আদনানিকে নিয়ে উঠেপড়ে লাগার আগে নিজের ঘরের খবর নিই।

তিন.

তামিম আদনানি বয়ান বক্তৃতায় ফতোয়া দিতে আসেন না। তিনি স্বাভাবিক এমনসব বিষয়ে সতর্ক করেন যেগুলো আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখি না বা দেখলেও সেভাবে অনুধাবন করি না।

আর মাসআলা মাসআয়েল যেগুলো আলোচনা করেন, সেগুলো তিনি নিজে থেকে বলেন না, প্রসিদ্ধ আইম্মায়ে কেরাম ও কিতাবাদির হাওয়ালায় কুরআন সুন্নাহ থেকে বলেন। এমনসব বিষয়ে কথা বলেন যেগুলো একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের বর্তমান যামানার প্রতিটি মুসলমানের জানা থাকার কথা ছিল। তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জিহাদ ইত্যাদি বিষয়ে একেবারে সাদামাটা কথা বলেন যেগুলো আমাদের আগে থেকেই জানা থাকার কথা ছিল। আমরা যখন গাফেল হয়ে আছি তখন তিনি আমাদের একটু সতর্ক করে দিচ্ছেন মাত্র।

তামিম আদনানির উদাহরণে অনেকটা এমন:

- এক এলাকায় রাতের গভীরে আগুন লেগেছে। কেউ টের পাচ্ছে না। দূর থেকে একজন অপরিচিত মুসাফির দেখতে পেয়ে পাহাড়ে উঠে চিৎকার করে এলাকাবাসীকে ডেকে বলছেন, হে এলাকাবাসী! দ্রুত জাগ্রত হন। আপনাদের বস্তিতে আগুন লেগেছে। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

- কিংবা এক এলাকায় সকলের অগোচরে শত্রু হামলা করতে আসছে। দূর পাহাড় থেকে একজন দেখতে পেয়ে এলাকাবসীকে সতর্ক করার জন্য চিৎকার করছেন।

এ ধরনের ক্ষেত্রে কেউ দ্বিমত করবে না যে, উক্ত অজানা অচেনা লোকের চিৎকারে সাড়া দিয়ে জাগ্রত হওয়া ও সতর্ক হওয়া সময়ের দাবি। মাজহুল লোকের এ চিৎকারকে কেউ ফতোয়া বলবে না। তার ডাকে সাড়া দিলে কেউ মাজহুল থেকে ফতোয়া নেয়া হচ্ছে বলবে না। একথাও কেউ বলবে না যে, তার ডাকে সাড়া দিয়ে আগুন ও শত্রু বাহিনির ব্যাপারে সতর্ক হলে বা খোঁজ খবর নিলে হারাম হবে।

অতএব, ভয়ানক কোন কিছুতে কারো ডাকে সতর্ক হওয়া এক জিনিস আর মাজহুল থেকে ফতোয়া নেয়া আরেক জিনিস। একেবারে মোটাবুদ্ধির বা মুআনিদ না হলে আশাকরি এতে কেউ দ্বিমত করবে না।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এর দু'টি দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন-

দৃষ্টান্ত ১

আল্লাহ তাআলা আনতাকিয়াবাসীর হিদায়াতের জন্য তিনজন রাসূল পাঠালেন। তারা রাসূলদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং হত্যার হুমকি ধমকি দিতে লাগল। এলাকার শেষ প্রান্তে হাবিব নামক এক লোক বাস করতেন। তিনি নেককার ছিলেন। ঘটনা শুনতে পেয়ে তিনি কওমের মায়ায় ছুটে আসলেন এবং কওমকে আহ্বান জানালেন, তোমরা রাসূলদেরকে মেনে চল। এতেই তোমাদের কামিয়াবি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ
20))

"শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল। বললো, হে আমার কওম! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর।"- ইয়াসিন

২০

আমরা যখন কুরআন সুন্নাহ থেকে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নুসরত থেকে পিছপা হয়ে গেছি তখন তামিম আদনানির মতো লোকেরা আমাদের ডেকে বলছেন, তোমরা কুরআন সুন্নাহ এবং রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ আঁকড়ে ধর। স্পষ্ট যে, এটা মাজহুল থেকে ইলম নেয়া না। তিনি ঐ দরদি লোকটির মতো শুধু এতটুকু আহ্বান জানাচ্ছেন যে, তোমরা রাসূল ও সাহাবাদের আদর্শ আঁকড়ে ধর।

দৃষ্টান্ত ২

মূসা আলাইহিস সালাম কিবতিকে হত্যা করে ফেললেন। ফিরাউনের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেল। সে তার মন্ত্রী পরিষদের সাথে পরামর্শে বসেছে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, তারা মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করে ফেলবে। এক লোক মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি দরদি ছিলেন। তিনি গোপনে এক সংক্ষিপ্ত পথ ধরলেন এবং সৈন্যদের আগেই মূসা আলাইহিস সালামের কাছে পৌঁছে গেলেন। গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক করে পালিয়ে যেতে বললেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21)

"শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল। আরজ করল, হে মূসা! পরিষদবর্গ আপনার ব্যাপারে পরামর্শ করছে যে, তারা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে। অতএব, আপনি (শহর ছেড়ে) বেরিয়ে যান। নিশ্চয়ই আমি আপনার একজন হিতাকাঙ্খী। এতে তিনি ভয়ে ভয়ে পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে (সতর্কতার সহিত) সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। দোয়া করলেন, হে আমার রব! জালিম কওম থেকে আপনি আমাকে মুক্তি দিন।" –কাসাস ২০-২১

আজ মুসলিমদের হালতও এমন। কুফফারগোষ্ঠী ও তাদের দালালরা উম্মাহর বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। তামিম আদনানির মতো দরদি লোকেরা কওমকে গোপনে গোপনে সতর্ক করছেন। এটা ফতোয়া ও ইলম নেয়ার বিষয় নয়, বিপদে সতর্ক করার বিষয়। অতএব, চিনি না জানি না- এসব বলে জনসাধারণকে এ ধরনের দরদি লোকের বয়ান থেকে বিরত রাখার অর্থ মূসা আলাইহিস সালামকে ফিরআউনের

হাতে তুলে দিতে সহায়তা করা। বিশেষত আমরা স্পষ্টই দেখছি যে, তারা নিজেরাও কিছু বলছে না, বরং তাদের অনেকে যামানার ফিরআউনদের পক্ষে দালালি করছে।

চার.

অধিকন্তু তামিম আদনানি ধরনের ব্যক্তিদের যে অর্থে মাজহুল বলা হচ্ছে তারা সে অর্থে মাজহুল নন। তামিম আদনানিকে মাজহুল বলা যেতে পারে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে জীবনের এই প্রথম তামিম আদনানির একটা বয়ান ইউটিউবে দেখতে পেলো। এর আগে সে তামিম আদনানি সম্পর্ক কিছু জানে না। কারো কাছ থেকে তার ব্যাপারে কিছু শুনেওনি। তিনি ভাল না মন্দ, বিদআতি না আহলে হক, দরবারি না দরদি- কিছুই জানে না। এ ধরনের ব্যক্তির বেলায় বলা যেতে পারে যে, তামিম আদনানি মাজহুল। তার বেলায় আমরা বলবো না যে, আপনি তামিম আদনানি থেকে ইলম নিন। বরং যাচাই বাছাই করে নিতে বলবো।

পক্ষান্তরে সাধারণত যারা তামিম আদনানির বয়ান শুনেন,

তারা বিভিন্ন মাধ্যমে স্পষ্ট করেই জানতে পেরেছেন যে, তামিম আদনানি একজন হকপন্থী ও দরদি মানুষ। তিনি কুরআন হাদিসের আলোকে হক ও সত্য কথা বলেন। উম্মাহর দুশমন ও দরবারিদের ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল ও অপব্যাখ্যার ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করেন। অনলাই-অফলাইন সব মিলিয়ে এমন অনেক মাধ্যমে তিনি বিষয়টি জানতে ও অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, এ ব্যাপারে তখন আর সন্দেহ থাকে না। তিনি তখন ঐ ব্যক্তির মতো নন, যিনি কোনে জানা শুনা ছাড়াই জীবনের প্রথম কোনো বক্তার বয়ান ডাউনলোড করছেন।

তামিম আদনানিদের বিয়ষটা অনেকটা এমন:

- কোনো রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে দুয়েকজন নির্ভরযোগ্য দূত মারফত কোনো ফরমান আসলো। এরপর সে ফরমান ছড়াতে ছড়াতে সারা দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে গেল।

- কিংবা কোনো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বা ডেইলি সংবাদ বা খবরের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করা হলো, অচিরেই আমাদের দেশে শত্রু বাহিনি হামলা করবে।

সকলে সতর্ক থাকবেন। কিংবা দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। সকলে সাবধান।

- কিংবা ইসলামী খিলাফতে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি ওয়েবসাইট খোলা হলো। সেখানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনসাধারণের ইসলাহের জন্য নিয়মিত বয়ান আপডেট দেয়া হয়। বক্তাদের সম্পর্কে জনগণ কিছু জানে না। তবে বয়ানের সাথে বক্তার নাম ও দেশের নাম দেয়া থাকে। এভাবে চলতে চলতে কয়েকজন বক্তা প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলে তাদের নাম জানে। তাদের ভাল মনে করে। শ্রদ্ধা করে। তাদের বয়ানের অপেক্ষায় থাকে।

এ ধরনের ক্ষেত্রে কেউ বলবে না যে, মাজহুল। তার কথা বিশ্বাস করা বা তার বয়ান শুনা হারাম। ... ইত্যাদি।

অতএব, তামিম আদনানিকে মাজহুল বলার আগে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তার হাইসিয়্যাত নিয়ে আবারও ফিকির করার আহ্বান জানাচ্ছি। নিজের মনমতো একটা বলে দিয়ে জাতিকে

বিভ্রান্ত করলে এর দায়ভার আপনাকেই নিতে হবে। আর আল্লাহ তাআলা ভাল করেই জানেন, ইসলাহ কার উদ্দেশ্য আর বিভ্রান্তি ছড়ানো কার উদ্দেশ্য।

অধিকন্তু আমরা এ কথাও বলি না যে, আপনারা অন্ধভাবে তামিম আদনানিদের কথা বিশ্বাস করে আমল শুরু করুন। বরং আপনারা নিজেরাই যাচাই বাছাই করে দেখুন, তারা সত্য বলেন কি'না। চোখ তো আপনাদেরও আছে। আর বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি তো আপনাদের চোখেরই সামনে। ফরযে আইন পরিমাণ ইলম অর্জন করা সকলের উপর ফরয। তামিম আদনানিরা তো কেবল সতর্ক করে যাচ্ছেন। বাকি দায়িত্ব কিন্তু আপনাদেরই। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

৪৫.তালেবান চুক্তির সেই সংশয়টির নিরসন (মূল উর্দু আর্টিক্যাল)

তালেবান চুক্তির যে ধারাটি নিয়ে এখনও অসংখ্য ভাই দ্বিধা সংশয়ে আছেন সেটি হল, **আফগানের মাটি ব্যবহার করে আমেরিকার স্বার্থে আঘাত হানতে দেয়া হবে না।**

আর বাস্তবেও ধারাটি দিলে লাগার মতো।

আমি বিগত এক পোস্টে বলেছিলাম এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র একটি পোস্ট দেব। তবে বিভিন্ন কারণে সেটি আর হয়ে উঠেনি। তবে তালেবানদের অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন 'মাসিক শরীয়ত' এর ১০১ সংখ্যায় তারা নিজেরাই এ সংশয় নিয়ে মোটামুটি বিস্তারিত একটি আর্টিক্যাল দিয়েছেন। মূল উর্দুটি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। যারা উর্দু বুঝি তারা তো বুঝবোই। যারা বুঝি না, কোনো ভাই তরজমা করে দিলে তাদের জন্য সহজ হবে। তখন আলোচনা পর্যালোচনা ও কমেন্টে আরো অনেক বিষয়ই হয়তো পরিষ্কার হবে। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করুন। আমীন

دوحہ اور حدیبیہ کے دو معاہدے

مفتی ابو سعید راشد

ہجرت کے چھٹے سال ماہ ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ سو صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔

مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہوئے جب یہ لشکر

عسفان پہنچا تو کفار نے ان کا راستہ روکا۔خالد بن ولیدجو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ دو سو افراد کے ساتھ آکر مسلمانوں کا راستہ روکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن یہیں پر گزارا اور رات کی تاریکی میں اپنے صحابہ کے ساتھ راستہ بدل کر ایک پہاڑی مغربی راستے کے ذریعے حرم کی حدود حدیبیہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ خالد بن ولید عسفان میں تھے اور جب مسلم لشکر کے جانے کی اسے خبر ہوئی تو بڑی تیزی سے دوسرے مشرکین تک یہ خبر پہنچائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی تھی کہ حدیبیہ کے راستے سیدھا حرم میں داخل ہوکر عمرہ ادا کریں لیکن حدیبیہ کی حدود میں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور آگے جانے سے انکار کیا۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہورہا ہے اور اللہ کو یہ منظور نہیں کہ اسلامی لشکر اس طرح مسلح حالت میں مکہ میں داخل ہو۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ اگر مکہ کے اندر جنگ چھڑ جاتی تو بہت سے ایسے مسلمان بھی مارے جاتے جو خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھے اور مسلمان انہیں پہچانتے نہیں تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی واپس پیچھے کی طرف مڑی ۔ حدیبیہ کے میدان کے آخر میں ایک کنویں کے ساتھ بیٹھ گئی ۔یہیں پر مسلمانوں نے پڑاو ڈالا اور یہی اس لشکر کی قیام گاہ ٹھہری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے آگے جانے سے انکار کیا تو آپ نے فرمایا:
آج میں قریش مکہ کی ہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں جس میں شعائر اللہ [اللہ کے گھر] کا احترام ہو۔[لا

[يسألوني خُطّةً يعظِّمون فيها حرمات الله إلا أعطيتُهم إياها

یہاں پر پڑاو ڈالنے کے بعد کئی دفعہ نمائندوں کے ذریعے رابطے ہوئے اور بالآخر کفار کا وفد سہیل بن عمرو کی سربراہی میں آیا اور صلح حدیبیہ کے نام سے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ جب بات چیت اختتام کو پہنچی تو اس معاہدے کی تحریر کی نوبت آئی ۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو "بسم اللہ الرحمن الرحیم " :حکم دیا کہ سب سے پہلے لکھو

اس پر سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا یہ نام[الرحمن] ہم رسول "نہیں جانتے اس لیے صر ف یہ لکھو " باسمک اللهم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی طرح لکھنے کا حکم دیا۔

پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد :سے کہا کہ اب لکھو رسول اللہ اور سہیل بن عمرو نے اتفاق کیا ہے ۔

یہاں سہیل نے پھر اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو پھر آپ کو کعبہ جانے سے کیوں روکتے۔ رسول اللہ کی جگہ صرف محمد بن عبداللہ لکھا جائے جس طرح آپ پہلے لکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " میں اللہ کا رسول ہوں، اگر چہ آپ میری نبوت کو

نہیں مانتے، لکھو محمد بن عبداللہ " ۔

امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
معاہدے میں مخالفین کی ہر بات کو اس لیے مانتے جارہے
تھے کیوں کہ شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تھا کہ " آج میں قریش مکہ کی ہر اس بات کو ماننے کے
لیے تیار ہوں جس میں شعائر اللہ [اللہ کے گھر] کا احترام ہو
"

اس تمہید کے بعد مندرجہ ذیل مادوں پر اتفاق ہوا اور حضرت
علی رضی اللہ عنہ اسے سپرد قرطاس کرتے رہے:
باسمک اللھم، یہ وہ تحریری ہے جس پر محمد بن عبداللہ اور
سہیل بن عمرو نے اتفاق کیا ہے۔

۱۔
دونوں جانب سے اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ دس سال تک
جنگ بندی رہے گی، لوگ امن سے رہیں گے،چوری اور
خیانت نہیں ہوگی اور ہمارے درمیان دوستانہ تعلقات ہوں گے۔

۲۔
جو لوگ محمد[صلی اللہ علیہ وسلم] کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں
وہ جاسکتے ہیں اور جو قریش کے ساتھ اس معاہدے کے تحت
رہنا چاہتے ہیں وہ بھی آسکتے ہیں۔

۳۔

جو شخص محمد[صلی اللہ علیہ وسلم] کے ساتھ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مل جائے یا ان کے لشکر میں شامل ہوجائے تو ان کا فرض ہے کہ اسے واپس بھیج دے۔ اور جو شخص محمد[صلی اللہ علیہ وسلم] کے لشکر سے نکل کر قریش کے پاس آجائے تو وہ اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔

۴۔

محمد[صلی اللہ علیہ وسلم] اس سال اپنے ساتھیوں سمیت واپس مدینہ جائیں گے اور آئندہ سال مکہ آئیں گے۔ یہاں تین دن قیام کریں گے، مسلح ہوکر نہیں آئیں گے مگر ایک مسافر کی طرح ان کی تلوار میان کے اندر ہوگی۔
سيرة ابن إسحاق(ص 462)(المغازي للواقدي(ص 98) سيرة ابن [هشام(3/238

۵

ہی ذبح کر کے [۔ قربانی کے جانور اس جگہ [حدیبیہ میں یہاں سے روانہ ہوں گے۔
(مصنف ابن أبي شيبة(20/403)برقم(37998

۶

۔مکہ کے لوگوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے اور اگر ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مکہ میں ٹھہرنا چاہتاہو تو اسے [مسلمان] منع نہیں کریں گے۔

.مصنف ابن أبي شيبة(20/402)برقم(37996) عن البراء

ان تمام مادوں میں تیسرا مادہ مسلمانوں کو سخت ناگوار گزرا اور وہ اس پر کچھ افسردہ دکھائی دیے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا تبصرہ فرمایا کہ : جو لوگ ہم میں سے ان کے پاس جائیں گے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کیا، اور جو لوگ قریش کے ہمارے پاس آئیں گے اور ہم انہیں واپس بھیجیں گے تو اللہ ان کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالیں گے۔

برقم(38006) عن المسور (20/410)مصنف ابن أبي شيبة ومروان

:معاہدے کے گواہان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدے سے فارغ ہوئے تو دونوں جانب سے کچھ گواہان کے نام بھی معاہدے میں شامل کر لیے۔

مسلمانوں کی جانب سے (1)أبو بکر بن أبي قحافہ، (2)عمر بن الخطاب، (3)عبد الرحمن بن عوف، (4)سعد بن أبي وقاص، محمد بن (6)(4)عثمان بن عفان، (5)أبو عبيدة بن الجراح اور مسلمہ۔جبکہ مشرکین مکہ کی جانب سے(1)حویطب بن عبد العزی، (2)مکرز بن حفص بن الأخیف کے نام گواہان کے طور پر معاہدے کے اوپر لکھ لیے گئے۔

سيرة ابن إسحاق(ص 463)(المغازي للواقدي(ص 98) سيرة ابن هشام(3/238)

جب معاہدہ تحریر کیا جاچکا تو تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ میرے پاس رہے گا۔آخر میں اصل معاہدے کی متن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی اور اس کی ایک نقل تیار کرکے سہیل کے حوالے کی۔
المغازي للواقدي(ص98

معاہدے کے بعد سورۃ الممتحنہ کی دوسویں آیت نازل ہوئی اور خواتین اس سے مستثناء قرار پائیں۔ خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کا مہر ان کے خاوندوں کے حوالے کیے جائے اور انہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔

تبصرہ:
یہ صلح حدیبیہ کی اصل تصویر تھی۔ اگر ان مادوں اور ان سے ملحقہ باتوں پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح تھی۔قریش جو مسلمانوں کو کبھی برداشت نہیں کر تے تھے اور جزیرۃ العرب میں ان ہی کی سرداری کا سکہ چلتا تھا اس لیے وہ دعوت اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے۔ اب جب وہ صلح پر آمادہ ہوئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ مسلمانوں کی قوت کا اعتراف کر رہے ہیں اور مستقبل میں مقابلے کی سکت نہیں رکھتے۔

دوسرا مادہ اس بات کی دلیل ہے کہ قریش اب اپنی دینی اور دنیاوی زعامت کھوچکے ہیں۔اب انہیں صرف اپنی فکر ہے۔اب اگر تمام لوگ اسلام میں داخل ہو بھی جائیں تو انہیں کوئی پروا نہیں۔ پہلا مادہ بھی اس عظیم فتح کی نشانی تھی، کیوں کہ جنگ مسلمانوں نے شروع نہیں کی تھی بلکہ قریش نے شروع کی تھی۔ جنگ بندی کا معاہدہ اس تکبر اور غرور کی انتہا اور اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ جنہوں نے شروع کی تھی اب وہ کمزور ہوچکے ہیں۔

چوتھے مادے میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ یہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنے کی آخری کوشش تھی۔ اور وہ بھی صرف اسی ایک سال تک۔اس کے بعد پھر قریش میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو بیت اللہ جانے سے روک سکیں۔

قریش تیسرے مادے کو اپنے لیے اہم کامیابی سمجھتے تھے لیکن یہ ایک معمولی بات تھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس میں مسلمانوں کے لیے نقصان ہو۔ کیوں کہ مسلمان جب تک اپنے دین پر قائم ہے وہ دین چھوڑ کر نہیں بھاگتا۔ اور اگر خدانخواستہ وہ مرتد ہوجائے تو پھر مسلمانوں کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں۔اب اسلامی لشکر میں اس کے رہنے سے اس کا علیحدہ ہونا بہتر ہوگا۔

اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. رواه مسلم . جو ہم :نے فرمایا

میں سے ان کے پاس جائے گا اسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر لیا۔اور جو شخص مسلمان ہوا اور اس کے مدینے آنے کے راستے مسدود تھے ، تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ جس وقت مدینہ منورہ میں کوئی مسلمان نہیں تھا کیا اس وقت حبشہ میں مسلمان نہیں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ومن جاء نا منهم سیجعل اللہ فرجا ومخرجا۔ رواہ مسلم۔ جو لوگ ان میں سے ہمارے پاس آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات کا راستہ دکھائیں گے۔

مندرجہ بالا اقدامات اگر چہ قریش کی ظاہری کامیابی کو ظاہر کرتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ ان کی کمزوری اور ان کے کفری اتحاد کے زوال کا آغاز تھا۔جیسے ان کو علم ہوچکا تھا کہ ان کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔

نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کو جو فوقیت معاہدے کے دوسرے مادے میں دی تھی کہ اگر کوئی مدینے سے مشرکین مکہ کے پاس آئے تو وہ اسے واپس نہیں بھیجیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں پر پورا اعتماد تھا۔ اسی لیے اس قسم کی شرائط پر آمادہ ہوئے تھے۔ [الرحیق المختوم۔ ص۔ 353]

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف:

صلح کی شرائط طے ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آگئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق

کیا ہم مسلمان نہیں ؟ "رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا
کیوں نہیں ہم " کیا ہم حق پر نہیں ؟انہوں نے جواب دیا
مسلمان ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں۔پھر پوچھا کہ کیا حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ؟ جواب ملا
کیوں نہیں ، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت
عمررضی اللہ تعالی عنہ نے آخری سوال کیا" پھر ہم کیوں دین
میں ان کے سامنے اتنا انحطاط کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟
دیکھو عمر یہ "ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا
فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت
پوشیدہ ہوگی۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی
لاج ضرور رکھیں گے۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھا حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہی تین سوالات پوچھے جو
ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھے تھے۔ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں اللہ کا رسول ہوں ، اور اللہ میری
بات ضائع نہیں کریں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہوکر روانہ ہوئے۔

جب معاہدہ مکمل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ
کی طرف سفر کرنے لگے ۔ راستے میں ضجنان نامی مقام پر
پہنچے تو سورۃ الفتح نازل ہوئی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایااور ان کے سامنے
سورۃ الفتح کی تلاوت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے دریافت

یارسول اللہ یہ فتح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :کیا
نے جواب دیا: جی ہاں یہ فتح ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سابقہ
موقف کے بارے میں بہت پریشان رہتا تھا کہ اس سے اللہ کی
پکڑ میں نہ آوں اس لیے میں نے بعد میں عبادات ،صدقات
بڑھادیے اور کئی غلام بھی آزاد کیے۔ ہم نہیں جانتے تھے بعد
میں ہم پر یہ راز کھلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
فیصلہ کتنا مفید ثابت ہوا۔

:صلح حدیبیہ کے فوائد

امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حدیبہ سے بڑی
فتح نہیں آئی۔ اس سے پہلے صرف جنگ ہوتی تھی۔
جیسے ہی صلح ہوئی اور جنگ بندی کا اعلان ہوا لوگ امن
وسکون سے رہنے لگے اب ان کو ایک دوسرے سے کوئی
خطرہ نہیں تھا۔ لوگوں کی ایک دوسرے کے علاقوں میں آمد
ورفت شروع ہوئی۔ مسلمانوں کو کئی لوگوں نے قریب سے
دیکھا اور اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ ہر وہ شخص جو
تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا تھا ان سے جب اسلام کے
بارے میں بات چیت ہوتی تو اسلام قبول کرلیتا۔دوسالوں میں
گزشتہ کئی سالوں سے زیادہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل
ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ : زہری کے بات کی دلیل یہ ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک بقول حضرت
جابر رضی اللہ عنہ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے

تھے۔ لیکن صرف دوسال بعد فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار کا لشکر تھا۔

[سیرۃ ابن ہشام۔ج۔3۔ص241]

ابو بصیر کا قصہ

معاہدے کے بعد ابوبصیر رضی اللہ مدینہ آئے تو مشرکین کو خبر ہوئی اور دو افراد کو ان کے پیچھے بھیج دیا کہ انہیں واپس مکہ لائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبصیررضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کیا اورچلنے کو کہا۔ راستے میں وہ آرام کی غرض سے ٹھہر گئے، تو ابوبصیر نے ان میں سے ایک سے کہا کہ آپ کی تلوار بڑی خوبصورت ہے کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں ؟ اس نے تلوار ابوبصیر کے حوالے کی تو ابو بصیر نے تلوار سے اس شخص کو قتل کیا جبکہ دوسرا جو اس مقتول کا غلام تھا بھاگ کھڑا ہوا اور واپس مدینہ آیا ۔ عصر کا وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتھے کہ یہ غلام سیدھا مسجد کے اندر گیا اور مدد کی درخواست کی کہ میرے ساتھی کو قتل کیا گیا اور اب مجھے بھی قتل کرنے کا ارادہ ہے۔

اتنے میں ابو بصیر بھی پہنچ گئے ان کے پاس عامری کی تلوار تھی اور اس کے اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پرنظر پڑی تو فرمایا: یہ تو بڑا آگ لگانے والا شخص ہے ،اگر اس کے پاس کچھ آدمی ہوں۔ ابو

بصیر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو معاہدے کے مطابق اپنا فرض ادا کرلیا لیکن میں خود کو بچانے میں کامیاب رہا۔ یہ رہی اس مشرک سے لی گئی غنیمت اس میں سے خمس الگ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر میں اس غنیمت کو تقسیم کروں گا تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔آپ جہاں چاہیں جاسکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پھر آپ کے پیچھے مشرکین کسی کو بھیج دیں۔

بیہقی کے مطابق ابو بصیر پانچ اور ساتھیوں کے ساتھ جو مکہ سے آئے تھے مدینہ کے مغرب میں واقع ساحل سمندر کے ساتھ العیص نامی مقام پر گئے ۔ یہ شام اور مکے کے راستے میں واقع پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں جنگلات اور آبشاریں بھی ہیں۔یہاں انہوں نے اپنا معسکر بنایا اور کفار کے ان قافلوں پر گھات لگا کر حملے کرنے لگے جو مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے۔ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ کے مسلمانوں کو خط بھیجاکہ مدینہ کی بجائے العیص نامی علاقے آتے رہے اور ابو بصیر کی مدد کریں۔

ابو بصیر کے ساتھ مکہ اور ملحقہ علاقوں کے تقریبا تین سو افراد یکجا ہوئے۔ یہ سب یہاں رہتے اور ابوبصیر کی رہنمائی میں کفار کے قافلوں پر حملے کرتے۔آخر کار مشرکین مکہ ان حملوں سے اتنے تنگ ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ایک وفد بھیجا اور کہا کہ العیص سے مسلمانوں کو مدینہ بلا لیا جائے ہم معاہدے کی اس شرط سے دستبردا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبصیر کو خط لکھا ۔ جب خط ان کے پاس پہنچا تو اس وقت

سخت علیل تھے۔ ساتھیوں نے خط انہیں دیا وہ خط آہستہ آہستہ پڑھتے جارہے تھے کہ اسی اثناء میں ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ساتھیوں نے انہیں وہاں دفن کیا اور ان کی قبر کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کی اور باقی ساتھی مدینہ منورہ تشریف لائے

[۔[دلائل النبوۃ للبیہقی[ج-3-133] المغازی للواقدی/ص/109

معاہدہ دوحہ:

بالآخر 19 سالہ طویل جنگ کے بعد امریکا امارت اسلامیہ کے ساتھ دوحہ میں معاہدہ کرنے پر مجبور ہوا۔امریکا کو پہلے سے ہی اپنی ناکامی کا یقین تھا۔لیکن کوشش ان کی یہ تھی کہ ان کے ہاتھو ں تشکیل پانے والی کابل انتظامیہ کو امارت اسلامیہ سے ایک حکومت کے طور پر تسلیم کروائیں اور پھر ان کے ساتھ ہی امارت اسلامیہ مذاکرات کےلیے بیٹھ جائے۔
لیکن ان کا یہ مشن ناکام ہوا اور بالآخر 29 فروری 2020 ء کو قطر کے دارلحکومت دوحہ شیراٹن ہوٹل میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ جس میں امریکا نے اپنی ناکامی کا اعتراف اور افغانستان سے مکمل انخلاء کی یقین دہانی کروائی۔ اس معاہدے پر مسلمانوں کی جانب سے امارت اسلامیہ کے سیاسی رہبر ملا عبدالغنی برادر جبکہ امریکا کی جانب سے امریکا کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کی موجودگی میں ان کے نمائندے زلمی خلیل زاد نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے اہم مادے یہ ہیں

:

١

۔امریکا سے متعلق: امریکا یہ عہد کرتا ہے کہ ،امریکا اور ان کے اتحادیوں کی تمام مسلح فوجیں،تمام غیر سفارتی

عملہ،انفرادی سیکورٹی کے غیر مسلح افراد، فوجی
ٹرینرز،مشیران اور بنیادی سروسز فراہم کرنے والے عملے
سمیت اس معاہدے کے اعلان کے 14 ماہ کے اندر افغانستان
سے نکل جائیں گے۔
۲

۔قیدیوں کی رہائی سے متعلق: امریکا اعتماد کی فضاء بحال
کرنے کے لیے ایک اقدام کے طور پر تمام جانبین کی ہم
آہنگی اور تائید کے ساتھ ایک ایسے پلان پر کام کرے گا جس
میں جنگی اور سیاسی قیدی جلد از جلد رہا کیے جائیں گے۔5
ہزار امارت اسلامیہ کے قیدی جبکہ 1 ہزار افغان فورسز کے
ء تک رہاکیے جائیں گے۔ تاکہ 10 مارچ 2020مارچ 10قیدی
کو بین الافغانی مذاکرات شروع کیے جاسکیں۔دونوں فریق یہ
عہد کرتے ہیں کہ اس کے بعد تین ماہ کے اندر باقی قیدی بھی
رہا کیے جائیں گے۔ امریکا اس اقدام کی تکمیل کا وعدہ کرتا
ہے۔امارت اسلامیہ یہ عہد کرتی ہے کہ ان کے رہا ہونے والے
قیدی معاہدے کے مطابق امریکا اور اس کے اتحادیوں کی
سیکورٹی کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے۔
۳:

بین :امارت اسلامیہ کے رہنماوں پر بین الاقوامی پابندیاں
الافغانی مذاکرات کے آغاز کے ساتھ ہی امریکا امارت اسلامیہ
کے رہنماوں کے خلاف امریکی پابندیوں، اور ان کے سروں
پر مقرر کردہ انعام کے بارے میں دیے گئے نوٹفکیشن پر
نظرثانی کرے گا اور یہ پابندیاں 16اگست 2020ء تک ہٹالی
جائیں گی۔
بین الافغانی مذاکرات کے آغاز کے ساتھ ہی امریکا ، اقوام

متحدہ کے سیکورٹی کونسل اور اس کے اراکین افغانستان سے
مئی 2020 ء تک 17امارت اسلامیہ کے رہنماوں کے نام
بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے سفارتی کوششیں کریں گے۔
۴
۔ افغانستان پر دوبارہ جارحیت نہ کرنے کی یقین دہانی: امریکا
اور اس کے اتحادی افغانستان کی زمین خودمختاری اور
سیاسی خودمختاری کے خلاف فوجی اور سیاسی مداخلت نہیں
کریں گے۔ اور نہ وہ افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت
کرنے کے مجاز ہوں گے۔
۵
۔امارت اسلامیہ سے متعلق حصہ: امارت اسلامیہ سے متعلق
معاہدے میں چار باتیں ذکر کی گئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے
کہ : طالبان امریکا کے لیے مستقبل میں خطرہ نہیں بنیں گے
اور نہ افغانستان میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت دیں گے
جو امریکا کے لیے خطرہ ہوں۔ متن کے مطابق:
۱
۔ امارت اسلامیہ افغانستان اپنے کسی رکن یا القاعدہ کے کسی
رکن کو اجازت نہیں دے گی کہ افغانستان کی سرزمین امریکا
کے خلاف استعمال کرے۔
۲
۔ امارت اسلامیہ افغانستان ایک واضح پیغام جاری کرے گی
جس میں کہا جائے گا کہ ہر وہ شخص جو امریکا کے خلاف
ہماری سرزمین استعمال کرنا چاہتا ہو اس کے لیے افغانستان
میں کوئی جگہ نہیں۔امارت اسلامیہ اپنے ارکان کو ہدایت دے
گی کہ ان افراد اور تنظیموں سے تعلق نہ رکھیں جو امریکا
اور اس کے اتحادیوں کی سیکورٹی کو چیلنج کرتے ہوں۔

۳
۔ امارت اسلامیہ افغانستان معاہدے میں کیے گئے وعدوں کے مطابق افغانستان میں امریکا اور اس کے اتحادیوں کی سیکورٹی کے لیے خطرہ بننے والے ہر فرد اور تنظیم کی راہ روک لے گی۔ اس کی تربیت اور مالی امداد پر پابندی ہوگی۔

۴
۔ امارت اسلامیہ افغانستان یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ لوگ جو افغانستان میں پناہ لینا یا یہاں مستقل رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مہاجرین کے بین الاقوامی قوانین اور معاہدے میں بیان کیے گیے نکات کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ تاکہ یہ لوگ امریکا اور اس کے اتحادیوں کی سیکورٹی کے لیے خطرہ نہ بنیں۔

امارت اسلامیہ افغانستان، افغانستان آنے کے لیے کسی ایسے فرد کو ویزہ اور پاسپورٹ جاری نہیں کرے گی، جو امریکا اور اس کے اتحادیوں کی سیکورٹی کو چیلنج کرتا ہو۔

اختتام:

امارت اسلامیہ کی بین الاقوامی حیثیت اور مستقبل : ۔ امریکا اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل سے اس معاہدے کی روسے امارت اسلامیہ افغانستان کی بین الاقوامی حیثیت تسلیم کرے گی۔

امریکا اور امارت اسلامیہ ایک دوسرے کے ساتھ مثبت تعقات کے خواہاں ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ بین الافغانی

مذاکرات کے بعد ان کے تعلقات افغانستان کی نئی اسلامی حکومت کے ساتھ بھی مثبت اور برقرار رہیں۔
۲۔ امریکا بین الافغانی مذاکرات کے بعد نئی اسلامی حکومت میں تعمیرنو اور ترقی کے لیے معاشی امداد دے گا۔ اور افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ معاہدے پر دستخط قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ۱۴۴۱ھ بمطابق 29 فروری 2020 ء کو ہوئے۔/۵/رجب

گواہان: اس تقریب میں خطے کے تیس ممالک کے نمائندوں ، بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے ارکان نے شرکت کی جن میں امریکا، پاکستان، ازبکستان، انڈونیشیاء، ترکی اور ناروے کے وزرائے خارجہ ، افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اور یوناما کے سربراہ تادامیچی یاماموتو، افغانستان کے لیے جرمنی کے خصوصی نمائندے مارکس پوٹزل ، برطانیہ کے خصوصی نمائندے گارٹ بائلی، روسی نمائندہ خصوصی ضمیر کابلوف اور قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد عبدالرحمٰن قابل ذکر ہیں۔

تبصرہ:

طالبان نے امریکا سے اپنے پانچ مطالبات منوالیے ۔جن میں ہر ایک کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جن میں امریکی افواج کا انخلا اور قیدیوں کی رہائی سب سے اہم ہیں ۔ پابندیاں ہٹانے والا نکتہ بھی بہت قیمتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پابندیاں ہٹیں گی بلکہ امریکا خود اقوام متحدہ کو اس بات پر راضی کرے گا کہ پابندیاں ہٹا لی جائیں۔ پہلی بات کا منوانا امریکا کی کھلی شکست کے مترادف ہے اور دوسری بات اس کی دلیل ہے کہ

امارت اسلامیہ کے رہنماوں کو اپنی ذات سے زیادہ اپنے قیدی ساتھیوں کی فکر ہے۔ اور ان کی رہائی کے لیے ہر ممکن وسیلہ بروئے کار لارہے ہیں۔

تیسری بات امریکا کی جانب سے ماضی میں اپنی غلطی اکا اعتراف ہےکیوں کہ جن طالبان رہنماوں پر ماضی میں اس نے پابندیاں لگائی تھیں اب ان کو دور کرنے کے لیے تگ ودو میں لگا رہے گا۔ یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اب اس کاغرور خاک میں مل چکا ہے اور مزید جنگ کی سکت نہیں رکھتا۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکا نے اپنی شکست کا اعتراف کیا، اسلامی حکومت کے وجود کو بھی تسلیم کیا،لیکن اسے فکر ہے تو اپنی جان کی ہے کہ اسے یہ باور کرایا جائے کہ یہاں سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکا افغانستان کی آنے والی مستقبل کی اسلامی امارت کو ایک مضبوط حکومت سمجھتا ہے، اس وجہ سے خوفزدہ ہے۔

امارت اسلامیہ سے متعلق ذکر کیے گئے مادوں میں ایک بات تفصیل طلب ہے اور وہ یہ کہ معاہدے میں جہاں بھی امارت اسلامیہ کا نام آیا وہاں اس بات کا بھی اضافہ کیا گیا " امارت اسلامیہ جسے امریکا ریاست تسلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں طالبان کے نام سے جانتا ہے"۔

یہ بالکل صلح حدیبیہ کے اس مادے کا اعادہ ہے جس میں مشرکین مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ " رسول اللہ " لکھنے کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ صرف محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو معاہدے کے محرر تھے اس انحطاط کے لیے راضی نہیں تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ وہ ہمیں نہیں مانتے ۔ لکھو محمد بن عبداللہ ۔

" ایک اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ افغانستان میں ہر شخص کا داخلہ ممنوع ہوگا جو امریکا کے لیے خطرہ ہو"۔

یہ بات اپنوں پر بھاری اور شاید اپنوں کی طرف سے اعتراض کاسبب بنے۔

ہم نے صلح حدیبیہ کے تمام مادوں کا ذکر کرلیا ہے ۔ ان میں سے ایک مادہ تقریبا اسی طرح ہے۔ حتی کہ وہ اس مادے سے بھی زیادہ سخت اور بھاری محسوس ہوتا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ : اگر کفار کی جانب سے کوئی مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان اسے واپس بھیج دیں گے اور اسے اپنے یہاں قیام کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے کفار کے پاس جائے گا تو کفار اسے واپس مسلمانوں کے پاس نہیں بھیجیں گے۔

یہ بات اس وقت بھی مسلمانوں کے لیےباعث تعجب تھی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں مختصر تبصرہ کیا اور فرمایا: جو ہم سے ان کے پاس جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ اور جو شخص ان میں سے ہمارے پاس آئے گا تو اللہ ضرور ان کے لیے کوئی راستہ بنائے گا۔

بعد میں ابوبصیر رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں نے ثابت کیا کہ مدینہ سے باہر بھی مسلمان زندگی گزار سکتے ہیں۔ بلکہ ابو بصیر کا معسکر اتنا مضبوط ہوا کہ بعد میں کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے رہے کہ ابوبصیر اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ بلا لو ہم اس مادے سے دستبردار ہوتے ہیں۔

یہاں بھی تاریخ خود کو دہرائی گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کے مسلمان ، اسلام پسند تحریکوں کے افراد صرف امارت اسلامیہ کی کامیابی پر آرام سے نہیں بیٹھیں گے بلکہ دنیا کے ہر کونے میں جہادی معسکرات کا آغاز ہوگا۔ اور ابوبصیر کی طرح کئی دور دراز علاقے عظیم جہادی معسکرات میں تبدیل ہوجائیں گی۔جہاں سے آزادی اور اسلامی نظام کے نفاذ کی تحریک چلے گی۔جس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلی یہ کہ اسلامی اور جہادی تحریکوں کے نام پر کئی محاذ کھلیں گے۔جس کی وجہ سے کفری اتحاد کی توجہ تقسیم ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ امارت اسلامیہ افغانستان پر بیرونی دنیا کا دباو کم ہوجائے گا۔ اور افغانستان ایک اسلامی ماحول میں جلد ترقی کر جائے گا۔

৪৬.দারুল আমান-আমলী আমান-কিবতি হত্যা ও একটি সংশয়

সালাহউদ্দিন আইয়ূ্যবী ভাই জানতে চেয়েছেন-

[তাকি উসমানী সাহেব ও আরো কয়েকজন উর্দু ফাতওয়ার প্রণেতাগণ নতুন একটি দার আবিষ্কার করেছেন। তা হল: “দারুল আমান”। দারুল হববে যদি মুসলিমরা নিরাপদে থাকতে পারে, তাহলে সেটা দারুল আমান। সেটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। তিনি নবী যুগে এর উদাহরণ দিয়েছেন হাবশাকে দিয়ে। যেহেতু সেখানে মুসলিমগণ নিরাপদে ছিলেন।

আরেকটি ব্যাপার হল: মুফতি শফী সাহেহবের মারিফুল কুরআনে সূরা কাসাসের একটি আয়াতের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি বলেছেন: নিরাপত্তা চুক্তি দুই ধরণের; একটা হল: লিখিত বা ঘোষিত, আরেকটি হল: অঘোষিত বা অলিখিত। সূরা কাসাসের উক্ত আয়াতটি হল:

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ

مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15)
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلِي فَغَفَرَلَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16)

“১৫) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্য জন তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী।
১৬) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।”- কাসাস ১৫-১৬

তিনি এভাবে দলিল দেন যে: মূসা আলাইহিস সালাম যেই কিবতীকে হত্যা করেছিলেন, সে তো হারবীই ছিল। তাকে হত্যা করাতে দোষের কি? তথাপি কেন মূসা আলাইহিস সালাম এটাকে নিজের নফসের উপর জুলুম বিবেচনা করলেন?

এর উত্তরে তিনি বলেন: কিবতীদের সাথে যদিও লিখিত নিরাপত্তা চুক্তি হয়নি কিন্তু একসাথে পরস্পর মিলে মিশে নিরাপদে থাকার কারণে অলিখিত নিরাপত্তা চুক্তি হয়ে গেছে। এ কারণে এই হত্যার মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃতভাবে মূসা আলাইহিস সালাম এই চুক্তিটি ভঙ্গ করেছেন।

এ হিসাবে তো ধরা হবে যে, আমাদের দেশে এবং সকল দেশে বসবাসকারী মুসলিমগণ ঐ দেশের কাফেরদের সাথে অলিখিত অঘোষিত চুক্তি করে ফেলেছে। তাই তাদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে না।
এ দু'টি বিষয়ের সুন্দর উত্তর প্রয়োজন।]

উত্তর:

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

♣ দারুল আমানের ব্যাপারে আপনি নিচের লেখাটা দেখতে পারেন:

দারুল আমানের প্রহসনের কবলে মুসলিম উম্মাহ!

https://my.pcloud.com/publink/show?c...Hy3j5XKS3YvzK7

♣ আর অলিখিত চুক্তি তথা আমলী চুক্তির যে বিষয়টি মুফতি শফি রহ. থানবী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, সেটা আগ্রাসী কাফেরদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। আগ্রাসী কাফেরদের বিধান কা'ব বিন আশরাফের মতো, যাকে সাহাবায়ে কেরাম নিরাপত্তা ও আমান দেয়ার পরও হত্যা করেছেন। এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোয়া আছে। আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের কাফের ও মুরতাদ শাসকগুলো আগ্রাসী ও দখলদার কাফের। আমাদের উপর এরা চেপে বসেছে। যেকোন পন্থায় এদের কবল থেকে আমাদের নিজেদেরকে, নিজেদের ভূমি এবং দ্বীন ধর্মকে রক্ষা ও উদ্ধার করা আমাদের দায়িত্ব। এদের সাথে আমাদের কোন সময় কোন চুক্তি হয়নি। অধিকন্তু তাদের বিরুদ্ধে আমরা অনেক আগে থেকেই জিহাদের ঘোষণা দিয়ে রেখেছি। তারাও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। আমরা যেমন তাদের নিরাপদ মনে করি না, তারাও আমাদের নিরাপদ মনে করে না। তারা সর্বদাই আমাদের তরফ থেকে ভয়ে থাকে। সামান্য থেকে সামান্য কোন সম্পৃক্তি কারো মাঝে দেখলেই তাকে বন্দী করে। জেলে দেয়। অমানবিক নির্যাতন চালায়। তাহলে আমাদের সাথে তাদের কিভাবে আমানের চুক্তি

হল? বরং তারা আমাদের প্রকাশ্য দুশমন, আমরা তাদের প্রকাশ্য দুশমন।

অধিকন্তু যদি আমানের চুক্তি কখনও হয়েও থাকে- যদিও তা হয়নি কখনও- তবুও আমাদের উপর নির্যাতন করার কারণে, আমাদের শত হাজারো ভাই বোনকে বন্দী ও নির্যাতন করার কারণে আমান ভেঙে গেছে। এখন তাদের রক্ত আমাদের জন্য হালাল। থানবী রহ. বা শফি রহ. কেউই আগ্রাসী কাফের ও মুরতাদদের বেলায় এ ধরণের আমলী আমান গ্রহণযোগ্য হবে বলেননি। সেখানে শুধু এতটুকু আছে যে, কিছু কাফের ও কিছু মুসলমান যদি কোন হুকুমতের অধীনে পারস্পরিক আমান ও বিশ্বস্ততার সাথে একত্রে বসবাস করে, তাহলে একে অপরের উপর হামলা করা ও লুটপাট করা জায়েয হবে না। কারণ, এটাও গাদ্দারি। এটা আমরাও অস্বীকার করি না। এদেশের হিন্দুদের বেলায় হয়তো কথাটা কিছুটা প্রযোজ্য হতে পারতো- যদি তারা আমাদের উপর কোন জুলুম বা আমাদের নিয়ে কোন সমালোচনা না করতো। এরপরও একান্ত সাধারণ হিন্দু, যারা আমাদের কোন ধরণের ক্ষতি বা সমালোচনা করছে না এবং এদেশের মুরতাদ হুকুমতের পক্ষে বা ভারতের জুলুমের পক্ষে তাদের কোন সমর্থন নেই- তাদেরকে হত্যা করা আমরা

ভাল মনে করি না। আর না এতে জিহাদের কোন ফায়েদা আছে। পক্ষান্তরে যারা আমাদের দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোন ক্ষতিতে বা সমর্থনে লিপ্ত, তাদের রক্ত হালাল। এ ব্যাপারে আপনি নিচের লেখাটি দেখতে পারেন-

পথভ্রষ্ট রহমানীর ফতোয়া: ভারতের মুসলমানদের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নাজায়েয!!

https://my.pcloud.com/publink/show?c...9RfhUl57XkswI7

***

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

উপরোক্ত আয়াতের যে তাফসীর থানবী রহ. করেছেন, আবুস সাউদ রহ. আয়াতের এক তাফসীরে সেটা উল্লেখ করেছেন। তবে বিভিন্ন কারণে এ তাফসীরের চেয়ে ঐ তাফসির সঠিক মনে হচ্ছে, যা আবুস সাউদ রহ. সহ অন্যান্য মুফাসির করেছেন। সেটা হল, নবুওয়াতের দাওয়াত পৌঁছার আগে কোন কাফের হত্যাযোগ্য নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

“রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দেই না।”- ইসরা ১৫

যেহেতু মূসা আলাইহিস সালাম তখন নবী হননি এবং কিবতিদের কাছে নবুওয়াতের দাওয়াত পৌঁছেনি, তাই তারা হত্যাযোগ্য ছিল না।

দ্বিতীয়ত মূসা আলাইহিস সালাম কিবতিকে হত্যার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন না। কাফেরকে হত্যা করা সব শরীয়তের বিধান নয়। যেমন ধরুন, নূহ আলাইহিস সালাম, হুদ আলাইহিস সালাম বা সালেহ আলাইহিস সালামের শরীয়তে জিহাদের বিধান ছিল না। তাদের হত্যার বিধান ছিল না। এ কারণে সেসকল নবীর কেউই তাদের উম্মতের কাউকে হত্যা করেননি- যদিও উম্মত তাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে।

মোটকথা- কোন কাফেরকে হত্যার জন্য দু’টি বিষয় আবশ্যক:

ক. তার কাছে নবুওয়াতের দাওয়াত পৌঁছা।

খ. উক্ত শরীয়তে ঈমান আনয়নে অস্বীকারকারী কাফেরদের হত্যার বিধান থাকা।

উক্ত কিবতির বেলায় এর কোনটিই পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, কিবতি যেহেতু বনি ইসরাইলের লোকটার উপর জুলুম করছিল তাই তাকে বাধা দেয়া যেত। তবে হত্যা করা উচিৎ হয়নি। ভুলক্রমে হলেও হত্যাটা অনুচিত হয়েছে। মূসা আলাইহিস সালাম বুঝতে পেরেছেন, এ কাজটা শয়তানের তরফ থেকে হয়েছে। তাকে অত্যধিক রাগান্বিত করে কিবতিকে হত্যা করিয়েছে। এজন্য তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চেয়েছেন। ইনশাআল্লাহ এটাই এ আয়াতের সঠিক তাফসির। অধিকন্তু আগের তাফসিরও যদি ধরা হয়, তবুও সেটা আগ্রাসী কাফেরের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

আল্লাহ তাআলার তাওফিক হলে এ বিষয়টি অন্য সময় বিস্তারিত আলোচনা করবো।

৪৭.দারুল হরবে জুমআ

এক ভাই জানতে চেয়েছেন, হানাফি মাযহাব মতে জুমআর নামায সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম বা তার নায়েব থাকা শর্ত। আমাদের উপমহাদেশ তো দারুল হরব। ইমাম নেই, নায়েবও নেই। তাহলে আমরা জুমআ আদায় করছি কোন দলীলের ভিত্তিতে?

উত্তর:

জুমআর জন্য ইমাম বা তার নায়েব থাকা শর্ত- কথাটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এখানে ব্যাখ্যা আছে। মূল কথা হলো, জুমআ আল্লাহ তাআলা সকলের উপর ফরয করেছেন। ইমাম থাকার কোন শর্ত কোথাও নেই। তবে ইমাম থাকলে ইমামের হক হিসেবে তাকে অগ্রগামী রাখতে হবে। ইমাম না থাকলে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে। ফিকহের ইবারত থেকে বিষয়টা ইনশাআল্লাহ পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯হি.) আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য বর্ণনা করেন,

لا تكون جمعة إلا بإمام. اهـ

“ইমাম ছাড়া জুমআ হবে না।”- কিতাবুল আছল: ১/৩৬০

মুহাম্মাদ রহ. আরোও বলেন,

قلت: أرأيت رجلا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين من غير أن يأمره الأمير؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الظهر. قلت فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان خليفة الأمير أو صاحب شرطة أو القاضي؟ قال تجزيهم صلاتهم. اهـ

“আমি আবু হানিফা রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি অভিমত, যদি কোন ব্যক্তি আমীরের আদেশ ছাড়াই লোকদের নিয়ে জুমআর দিন দুই রাকাআত পড়ে নেয়? তিনি জওয়াব দিলেন, ‘তাদের নামায হবে না। তাদেরকে নতুন করে জোহর পড়তে হবে।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি আমীর তাকে নির্দেশ দিয়ে থাকে, কিংবা ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ যে লোকদের নিয়ে জুমআ পড়েছে) সে আমীরের নায়েব, আইনশৃংখলারক্ষীবাহিনীর প্রধান কিংবা কাযি হয়- তাহলে আপনার কি অভিমত? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে তাদের নামায হয়ে যাবে।”- কিতাবুল আছল: ১/৩৬০

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বক্তব্য সুস্পষ্ট যে, জুমআ সহী হওয়ার জন্য হয়তো স্বয়ং ইমাম লাগবে, নতুবা তার আদেশকৃত কিংবা নিয়োগকৃত ব্যক্তি লাগবে।

আরোও দেখুন:

- মুখতাসারুত তহাবী [ইমাম তহাবী রহ. (৩২১হি.): পৃ ৩৪
- মুখতাসারুল কুদূরী [ইমাম কুদূরী রহ. (৪২৮হি.): পৃ. ৫১
- মাবসূতে সারাখসী [শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (৪৯০হি.)]: ২/৪১

এ বিধান হলো, যখন ইমাম থাকবেন। পক্ষান্তরে যদি কোন কারণে ইমাম না থাকেন- যেমন মুসলমানদের পারস্পরিক ফিতনা ও মারামারি কাটাকাটির কারণে কিংবা দেশ কাফেরদের করতলগত হয়ে যাওয়ার কারণে- তাহলে জুমআর দায়িত্ব মুসলমানদের নিজেদের উপর বর্তাবে। তাদের জন্য আবশ্যক, জুমআর জন্য ইমাম নিয়োগ দিয়ে জুমআ আদায় করা। পাশাপাশি ইমাম নির্ধারণের প্রচেষ্টা

চালানো।

তদ্রূপ ইমাম থাকাবস্থায় যদি ইমাম জুমআ আদায় করতে নিষেধ করেন, তাহলে তার কথা মানা যাবে না। জুমআর সময় হয়ে গেলে মুসলমানরা নিজেরা একজনকে ইমাম নির্ধারণ করে জুমআ আদায় করে নেবে।

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,

لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة ولم يوجد أحد ممن له حق إقامة الجمعة نصب العامة لهم خطيبا للضرورة كما سيأتي مع أنه لا أمير ولا قاضي ثمة أصلا وبهذا ظهر جهل من يقول لا تصح الجمعة في أيام الفتنة مع أنها تصح في البلاد التي استولى عليها الكفار. اهـ

“যদি শাসনকর্তা মৃত্যুবরণ করেন অথবা ফিতনার কারণে উপস্থিত না হতে পারেন এবং এমন কাউকে না পাওয়া যায়, যার জুমআ কায়েমের অধিকার রয়েছে, তাহলে জরুরতের কারণে সাধারণ মানুষ নিজেদের জন্য একজন খতীব নির্ধারণ করে নেবে। ... এ থেকে ঐ ব্যক্তির অজ্ঞতা স্পষ্ট হয়ে গেছে, যে বলে, ফেতনার যামানায় জুমআ সহীহ হবে না,

অথচ ঐ সমস্ত দেশেও জুমআ সহীহ, যেগুলো কাফেররা দখল করে নিয়েছে।”- রদ্দুল মুহতার: ২/১৩৮

সামনে গিয়ে বলেন,

فلو الولاة كفارا يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما. اه

“যদি প্রশাসকরা কাফের হয় তাহলেও মুসলমানদের জন্য জুমআ কায়েম করা জায়েয আছে। এক্ষেত্রে মুসলমানদের সন্তুষ্টিক্রমে নিয়োগপ্রাপ্ত কাযী শরঈ কাযী গণ্য হবেন। তবে মুসলমানদের উপর ফরয, একজন মুসলমান প্রশাসক তালাশ করা।” - রদ্দুল মুহতার: ২/১৪৪

আরো বলেন,

لو منع السلطان أهل مصر أن يجمعوا إضرارا وتعنتا فلهم أن يجمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة. اه

“সুলতান যদি কেবল একগুঁয়েমি করে কোন এলাকার লোকজনকে জুমআ আদায়ে বাধা দেন, আর এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য তাদের ক্ষতিসাধন ব্যতীত কিছু নয়, তাহলে তারা

নিজেরা সম্মতিক্রমে একজনকে জুমআর জন্য নির্ধারণ করে নিয়ে তার পেছনে জুমআ পড়তে পারবে।”- রদ্দুল মুহতার: ২/১৪৩

সারকথা দাঁড়াল,

- হানাফি মাযহাব মতে ইমাম থাকলে ইমাম বা নায়েব জুমআ পড়াবেন। কোন কারণে ইমাম না থাকলেও জুমআ বাদ যাবে না। মুসলমানরা নিজেরা একজনকে ইমাম বানিয়ে জুমআ আদায় করবে। যেসব রাষ্ট্র কাফেরদের দখলে সেগুলোতেও জুমআর ইমাম নিয়োগ দিয়ে জুমআ আদায় করতে হবে।

- ইমাম থাকাবস্থায় যদি কোন শরয়ী উজর ব্যতীত তিনি জুমআ আদায় করতে নিষেধ করেন, তাহলে তার আনুগত্য করা যাবে না। সাধারণ জনগণ নিজেরা জুমআর ইমাম নিয়োগ দিয়ে জুমআ আদায় করে নেবে।

বি.দ্র.

জিহাদও জুমআর মতো। যদি ইমাম থাকেন, তাহলে তিনি

*জিহাদের ডাক দেবেন। ইমাম যদি জিহাদের ডাক না দেন বা জিহাদে যেতে বাধা দেন, তাহলে জনসাধারণ নিজেরা জিহাদের আমীর ঠিক করে জিহাদ করবে। আর যখন ইমাম না থাকবে, তখনও জিহাদ মাফ নেই। জিহাদের আমীর ঠিক করে শক্তি অর্জন করত জিহাদ করতে হবে। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।**

৪৮.দুশমনির আসল কারণ- ঈমান!

আসহাবে উখদুদের ঘটনা আমরা শুনেছি। ঈমান আনার কারণে ঐ কাফেররা ঈমানদারদেরকে পুড়িয়ে মেরেছিল। আল্লাহ তাআলা সূরা বুরূজে একে এভাবে চিত্রায়িত করেছেন-

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1 أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا (يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7

"আমি শপথ করছি বিশালাকায় গ্রহ নক্ষত্র (ও তাদের কক্ষপথ) বিশিষ্ট আকাশের। শপথ করছি সেই (কেয়ামত) দিবসের যার আগমনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। শপথ করছি

সেই প্রতিশ্রুত (দিনের অসংখ্য অগণিত) প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের, আরো শপথ করছি (সেই লোমহর্ষক ভয়াবহ দৃশ্যের) যা সেদিন (এই সকল প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে) পেশ করা হবে। আল্লাহর মার গর্তওয়ালাদের উপর। ইন্ধনপূর্ণ আগুনাওয়ালাদের উপর। যখন তারা এর পাশে বসা ছিল এবং মুমিনদের সাথে তারা যা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল।" (সূরা বুরূজ: ১-৭)

তারা কেন তাদেরকে এমন নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারল? তাদের অপরাধ কি ছিল? আল্লাহ তাআলা এর উত্তর দিয়েছেন-

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9)

"(আসলে এই জালেমরা এদের কাছ থেকে ঈমানের প্রতিশোধ নিচ্ছিল মাত্র।) মহাপরাক্রমশালী, স্বীয় স্বত্তায় প্রশংসিত এবং আকাশ ও নভোমণ্ডলীর রাজাধিরাজ সম্রাট আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনা ছাড়া এদের শাস্তি দেয়ার আর কোন কারণই ছিল না। (সর্বোপরি সেই) আল্লাহ (জালেম ও মজলুমসহ) সকলের কার্যাবলী (যথাযথ) অবলোকন করছেন।" (সূরা বুরূজ: ৮-৯)

আল্লাহ তাআলা অমোঘ সত্যটি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের কোন অপরাধ নেই। অপরাধ এটাই যে, তারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল। আল্লাহ তাআলা আর কোন কারণ বর্ণনা করেননি। কারণ একটাই বলেছেন। আর তা হল- ঈমান। মুমিনদের সাথে কাফেরদের দুশমনির আসল কারণ- ঈমান। অতএব, যার মাঝে ঈমান আছে, তার সাথেই কাফেরদের দুশমনি। সে ভাল হোক কি মন্দ, নেককার হোক কি বদকার- সর্বাবস্থায় কাফেররা তাকে দুশমন গণ্য করে। যতক্ষণ তাকে এই ঈমান থেকে সরাতে না পারবে, ততক্ষণ তাকে দুশমনই গণ্য করবে। তার উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাবে। এই চিরাচরিত সত্যটা আল্লাহ তাআলা অন্য দু' খানা আয়াতে তুলে ধরেছেন-

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

"তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে- যদি তারা তা করতে সক্ষম হয়।"(সূরা বাকারা: ২১৭)

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

“ইয়াহুদ-নাসারার কিছুতেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি (তোমার ধর্ম ছেড়ে) তাদের ধর্ম অনুসরণ কর।” (সূরা বাকারা: ১২০)

বাস্তব দুনিয়ায় এর দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই। এই আরাকানের দিকেই তাকান। এই লোকগুলো কি খুব আল্লাহ ওয়ালা? ইসলামের জন্য কি নিবেদিত প্রাণ? কিছুই তো নয়। এরপরও কেন তাদের উপর এই নির্মম নির্যাতন? কারণ একটাই, যা আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

“আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনা ছাড়া এদের শাস্তি দেয়ার আর কোন কারণই ছিল না।”

অতএব, উহে মুসলামন! তোমরা কাফেরদের যতই মান্য করে চল, যতই ছাড় দিয়ে যাও- তাদের দুশমনি বন্ধ হবে না।

অনেক বিশেষজ্ঞ বলে বেড়ায়- ইরাক আক্রমণের কারণ এই, আফগান আক্রমণের কারণ এই... যদি ইরাক এই না করতো তাহলে আক্রমণ হতো না, আফগান এই করলে আক্রমণ হতো না... ইত্যাদি।

এসব কিছুই নয়। আসল কারণ- ঈমান। এই ঈমানের কারণে যুগে যুগে কাফেররা মুমিনদের দুশমনি করে এসেছে।

এই দুশমনকে প্রতিহত করার পদ্ধতি একটাই, যা আল্লাহ তাআলা বাতলিয়েছেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّه لِلَّهِ

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন-আনুগত্য পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” (আনফাল: ৩৯)

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“অত:পর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (তাওবা: ৫)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।” (তাওবা: ২৯)

হে আল্লাহ! আমাদের সহীহ বুঝ দান কর। আমাদের নুসরত কর। তোমার পথে আমাদের অটল অবিচল রাখ। আমীন!

৪৯.দেশ ও ভাষার জন্য জীবনদান নিয়ে এক লেখার প্রেক্ষিতে মন্তব্য

“দেশ ও ভাষার জন্য জীবনদানের মর্যাদা” নামে একটা সংবাদ হয়তো অনেকে দেখেছেন।

লেখকের পরিচয়ে বলা হয়েছে: মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানি। গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।

শিরোনাম থেকেই ঘৃণ্য জাতীয়তাবাদের পঁচা গন্ধ আসছে। আর ভিতরে যা আছে তা আরও পঁচা।

লেখক মদীনা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন। সে হিসেবে ‘আল মাদানি’। সৌদি আরবের এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে এদেশের অনেকজনই পড়াশুনা শেষে দেশে এসে নিজেদের মানসাব ও যশ-খ্যাতি সংরক্ষণের বিনিময়ে তাগুত সরকারের গদি সুরক্ষার পক্ষে দিবানিশি কাজ করে যাচ্ছেন। তাগুতদের

শরয়ী শাসকের লেভেল লাগানো, ওয়াজিবুল ইতাআত সাব্যস্ত করা ইত্যাদি জঘন্য কাজগুলো করে যাচ্ছেন, তাওহিদের স্লোগানবাদি এমন অনেকের কালো চেহারা হয়তো আপনারা চেনেন।

এ ধরনের তাওহিদবাদিদের পক্ষে এ ধরনের বক্তব্য মোটেই আশ্চর্য কিছু ছিল না। কিন্তু আমাদের শিরোনামের লেখক স্বয়ং নিজে 'তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ' নামে কিতাব সংকলন করেছেন। তার থেকে এ ধরনের লেখাতে একটু আশ্চর্য হওয়া যেতো।

অবশ্য কওমি অঙ্গন থেকে ফরিদ মাসউদের উদ্ভব এবং শোকরানা মাহফিলের ঘটনার পর আর কোনো মহল থেকেই কোনো কিছু আশ্চর্যের নয়।

বিশেষত লেখকের উপরোক্ত কিতাবে একটা শিরোনাম আছে,
'জঙ্গিবাদের গোড়ায় আহলে হাদীস কেন?(*)

টীকাতে লেখা আছে, **‘(*) মুসলমানদেরকে জঙ্গিবাদের অশুভ চক্রান্ত থেকে সতর্ক থাকার লক্ষ্যে এই শিরোনামটি ১৯তম সংস্করণে সংযোজন করা হয়েছে।’** পৃষ্ঠা ৩২

তখন আর তেমন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আজকাল সব মহল এবং সব গবেষক থেকেই সব কিছু সম্ভব হচ্ছে। অসম্ভব হলে শুধু সেটাই, যেটা তাগুতদের গদির বিপক্ষে যাবে।

যাহোক, এ গেল শিরোনাম নিয়ে কথা। ভিতরে তিনি যে অপরাধটা করেছেন, কুফরি জাতীয়তাবাদি এসব চেতনা ও আন্দোলনকে শরয়ী লেবাস পরিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

তৎকালীন পাকিস্তান উর্দু ভাষাকে কতটুকু বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছিল এবং সেটা শরীয়তের বিপরীত কি’না, একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের সে অধিকার আছে কি’না- সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। বিশেষত যারা বাধ্যতামূলক করতে

চাচ্ছিল, তারাও তাগুতই ছিল এবং তাদের মধ্যেও জাহিলি জাতীয়তাবাদের চেতনা ছিল; তখন আর সেদিকে যাওয়ার তেমন দরকার নেই।

তবে লক্ষ করার দরকার যেটা, সেটা হলো,

তৎকালীন ভাষা আন্দোলন কি ইসলামের জন্য হয়েছিল? কিংবা অন্তত ইসলাম অনুমোদন দেয় এ দিকটি বিবেচনা রেখে করা হয়েছিল?

প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি বলতে বাধ্য যে, ইসলামের কোনো নাম নিশানাও সেখানে ছিল না। সম্পূর্ণ জাহিলি জাতীয়তাবাদি চেতনা থেকে এ আন্দোলন হয়েছিল।

জিহাদের মতো পবিত্র ও মহান ইবাদতও যদি কোনো ব্যক্তি জাতীয়তাবাদি চেতনা নিয়ে করে বা লোক দেখানোর জন্য করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বর্থ্যহীন সিদ্ধান্ত যে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে; তখন লেখক কি করে বলতে পারলেন,

‘মাতৃভাষা নিয়ে এ আন্দোলনেই পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বীজ বপন হয়েছিল। রচিত হয়েছিল লাল-সবুজের পতাকা। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে তারা শহীদের মর্যাদা পাবেন’।?!

আরও আশ্চর্যের কথা হলো, যারা ভাষা আন্দোলনে নিহতদের শহীদ বলেন – এমনকি হিন্দুদেরকেও তারা এ হুকুমের বাহিরে রেখে কথা বলেন না- তাদের অনেকের কাছে হেফাজতের রাতে মৃত্যুবরণকারী উলামা, তুলাবা ও মুসলিম জনসাধারণ শহীদ নন!

কেন?
কারণ, তারা সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে নিহত হয়েছে। তারা বাগি।

প্রশ্ন হলো, তাহলে ভাষা আন্দোলন করেছিল যারা, তারা কি

বর্তমান বাংলাদেশের চেয়েও পাঁচ/সাতগুণ বড় একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যায়নি, যে রাষ্ট্রটি- নামে হলেও- ইসলামের জন্য হয়েছিল?

জাহিলি জাতীয়তাবাদি চেতনা নিয়ে একটা দুনিয়াবি বিষয়ে নিহত হলে শহীদ হবে, আর দ্বীনের জন্য মারা গেলে শহীদ হবে না! বড় অবাক কথা।
কিন্তু আগেই বলেছি, আজকালকার গবেষকদের কাছ থেকে কোনো কিছুই আর অপ্রত্যাশিত নয়।

***

প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি কথা বলে রাখি, *স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বপনকে তিনি প্রশংসার দৃষ্টিতে উল্লেখ করেছেন। বলি, আজ যারা জিহাদ করে বাংলাদেশে আযাদির বীজ বপন করতে চাচ্ছেন, সেটা অবৈধ হবে কেন?*

নামে হলেও ইসলামি; সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নতুন

রাষ্ট্র জন্ম দিলে যদি প্রশংসনীয় হয়, তাহলে শতভাগ কুফরি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিহাদ করে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করলে কেন নাজায়েয হবে?

ইসলামের লেবাসধারী যারা ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আড়তি গেয়ে থাকেন, তাদের কাছে প্রশ্নটা রইল।

***

৫০.ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) ও তার অনুসারি (সেকুলার)দের বিধান!!

‘নিরপেক্ষ’ শব্দের অর্থ কোন পক্ষে নয়। **‘ধর্মনিরপেক্ষ’** অর্থ- ‘কোন ধর্মের পক্ষে নয়’। অর্থাৎ, সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত।

“Seculaism" এমন একটি মতবাদ, যার মূলকথা হচ্ছে- রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ- ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ **[লা-দ্বীনী]** ও **[ধর্মহীনতা]**র

সমার্থবোধক। ধর্মনরপেক্ষতাবাদ সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে, যাতে বলা হয়: মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তগুলো- বিশেষত রাজনীতিক সিদ্ধান্তগুলো- কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় জীবনেও হতে পারে, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকও হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা

কোন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ- তার শাসনব্যবস্থা ধর্মের আওতামুক্ত। ধর্মের সাথে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের কোন সম্পর্ক নেই এবং এসবের সাথে ধর্মেরও কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির পারিবারিক জীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে আর রাষ্ট্র পরিচালিত হবে জনগণ ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিব্যক্তির ভিত্তিতে রচিত আইন-কানুন দিয়ে। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় জীবনে টেনে আনা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ। রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কিংবা তার কোন বিধান ইসলাম ধর্মের অনুযায়ী হওয়া ধর্মনিরক্ষতাবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার"

শ্লোগানটি দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মনিরপেক্ষতা

কোন ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ- সে কোন ধর্মের অনুসারী নয়। তার জীবন ধর্মের আওতামুক্ত। সে ইসলাম ধর্মের অনুসারিও নয়, অন্য কোন ধর্মেরও নয়।

উল্লেখ্য, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, রাষ্ট্র ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী চলবে, তবে অন্যান্য ধর্মও তাতে শান্তিতে পালন করা যাবে- যেমনটা কেউ কেউ মনে করে থাকেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবর্তক ও ধারক-বাহকদের নিকট ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ঐটিই যা পূর্বে বলা হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা কুফর

মানব জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে- রাষ্ট্রীয় জীবনে হোক, কি ব্যক্তি জীবনে- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সুস্পষ্ট কুফর। এ হচ্ছে

সাম্প্রতিক সময়ে কাফেরদের আবিস্কৃত নতুন মতবাদসমূহের একটি। দ্বীন ইসলামে এর কোন সুযোগ নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্র: ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন- সর্বত্র অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও শরীয়ত পরিচালকের আসনে থাকতে হবে। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ ইসলামী শরীয়ত। জীবনের কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়ত গ্রহণ না করা, নিজেকে শরীয়তের আওতাবাহির্ভূত ঘোষণা করা সর্বাবস্থায় কুফর- চাই এরপর অন্য কোন আদর্শ-মতবাদ গ্রহণ করুক বা না করুক। উল্লেখ্য, শরীয়তে কাফেরদের যতটুকু অধিকার দেয়া আছে, ততটুকু অধিকার দেয়া আমরা জরুরী মনে করি।

যারা ধর্মনিরপক্ষতাবাদের সমর্থক, প্রচারক, এর জন্য লড়াই করে তারা কাফের। কারণ তারা আল্লাহর দ্বীন প্রত্যাখ্যান করে তার বিপরীতে ভিন্ন মতবাদকে বেছে নিয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত: ইয়াহুদ-নাসারা ও মক্কার মুশরেকরা

ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি, যে নিজেকে ধর্মের আওতাবহির্ভূত ঘোষণা করে- সে হয়তো মক্কার মুশরেকদের মতো, নয়তো ইয়াহুদ-নাসাররা মতো।

ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি যদি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী হয়, তাহলে সে ঐসব ইয়াহুদ-নাসারার মতো, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী জেনেও ইসলাম গ্রহণ করেনি।

আর যদি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী না হয়, তাহলে সে মক্কার মুশরিকদের ন্যায়, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী বলে বিশ্বাসও করতো না, তাঁর প্রতি ঈমানও রাখতো না। অতএব, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী হোক বা না হোক- সর্বাবস্থায় কাফের। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন!

৫১.নাফিরে আম: আরেকটু আলোকপাত

নাফিরে আম সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

সেখানে স্পষ্ট হয়েছে যে, নাফিরে আম ইমামুল মুসলিমিনের আহ্বানের নাম নয়, নাফিরে আম হচ্ছে- যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয় আর তা প্রতিহত করার জন্য ব্যাপকভাবে মুসলমানদের জিহাদে বের হতে হয়। যেমনটা ইবনু আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেছেন,

"وَهَذِهِ الْحَالَةُ تُسَمَّى "النَّفِيرُ الْعَامُّ

“এ অবস্থাকে ‘নাফিরে আম’ বলা হয়।”- রদ্দুল মুহতার ৪/১২৭

এ অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন। ইমামুল মুসলিমিন আহ্বান করুক বা না করুক, ইমাম থাকুক বা না থাকুক- সর্বাবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন। যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে প্রথমত তাদের উপর ফরযে আইন। তারা না পারলে বা না করলে তাদের প্রতিবেশীদের উপর। এভাবে এক সময় তা সমগ্র দুনিয়াব্যাপী ফরয হয়ে যায়।

তবে যফর আহমদ উসমানী রহ. ই’লাউস সুনানে যে আলোচনা করেছেন, তা থেকে অনেকে বুঝে নিতে পারেন

যে, নাফিরে আম হচ্ছে ইমামুল মুসলিমিনের আহ্বানের নাম। ইমামুল মুসলিমিন আহ্বান না করলে নাফিরে আম হয় না। তাই বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার করে দেয়া ভাল মনে হচ্ছে। এজন্য **শরহুস সিয়ার থেকে দু'টি উদ্ধৃতি পেশ করছি ইনশাআল্লাহ-**

এক.

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন,

وعند النفير العام لا بأس له أن يخرج وإن كره ذلك أبواه. وإذا لم يكن النفير عاما، وأمره الإمام بالخروج فليخبره خبر أبويه، فإن أمره بالخروج مع ذلك، فليطعه. اهـ

"নাফিরে আমের সময় পিতা-মাতা নারাজ হলেও জিহাদে যেতে পারবে। আর নাফিরে আম না হলে যদি ইমাম জিহাদে যেতে আদেশ দেন, তাহলে পিতা-মাতার নারাজির বিয়ষটা তাকে অবগত করবে। এরপরও বের হতে আদেশ দিলে, ইমামের কথাই মানবে।"- শরহুস সিয়ারিল কাবির ১৪৫৫

দুই.

সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) বলেন,

إذا وقع النفير عاما كان له أن يجبر الناس على الخروج. اهـ

“নাফিরে আম হলে ইমামুল মুসলিমিন জনগণকে জিহাদে বের হতে বাধ্য করতে পারবেন।”- শরহুস সিয়ারিল কাবির ৫১৭

প্রথম বক্তব্যে বলা হচ্ছে, নাফিরে আম না হলে যদি ইমাম জিহাদে যেতে আদেশ দেন ...। বুঝা গেল, নাফিরে আম আর ইমামের আহ্বান ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। নাফিরে আম ভিন্ন কারণে হয়ে থাকে, ইমামের আহ্বানের উপর নির্ভরশীল নয়। সে ভিন্ন কারণ না পাওয়া গেলেও যদি ইমাম জিহাদে যেতে আদেশ দেন, তাহলেও জিহাদে বের হতে হবে।

দ্বিতীয় বক্তব্যে বলা হচ্ছে, নাফিরে আম হয়ে গেলে ইমাম জনসাধারণকে জিহাদে যেতে বাধ্য করতে পারবেন। বুঝা গেল, নাফিরে আম ভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। সে ভিন্ন কারণে যখন নাফিরে আম হয়ে যাবে, তখন জনগণ জিহাদে বের

হতে না চাইলে ইমামুল মুসলিমিন জনগণকে জিহাদে বের হতে বাধ্য করতে পারবেন। কারণ, মুসলমাননা আক্রান্ত হলে জিহাদ ফরযে আইন। আর কোন মুসলমান কোন ফরয আদায় করতে রাজি না হলে ইমামুল মুসলিমিন তাকে তা আদায় করতে বাধ্য করবেন। যেমন, যাকাত দিতে রাজি না হলে কিতাল করে হলেও যাকাত আদায় করবেন।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দু'টি থেকে আশাকরি পরিষ্কার যে, নাফিরে আম ইমামের আহ্বানের নাম নয়। নাফিরে আম একটা অবস্থা ও পরিস্থিতির নাম, যে পরিস্থিতিতে ব্যাপকভাবে জিহাদে অংশগ্রহণের দরকার পরে।

৫২.নির্যাতিত উম্মাহর প্রতি করণীয়: কয়েকটি ফিকহি মাসআলার আলোকে

অনেক দিন যাবতই কথাটা মাথায় আসছিল। লিখি লিখি করে আর লিখা হচ্ছে না। আজ মনে হলো, লিখেই ফেলি। নয়তো আবার কবে ভুলে যাই বলা যায় না। তাছাড়া যত আগে লিখবো আল্লাহ তাআলা চান তো অনেক ভাইয়ের ফায়েদা হতে থাকবে। দাওয়াতের কাজেও সহায়তা হবে। অনেক সময় ছোটখাট বিষয়ও দাওয়াতের কাজে অনেক বড় কাজে আসে।

আজ মুসলিম উম্মাহর দুঃখ দুর্দশার কথা কারও কাছে অস্পষ্ট নয়। আরাকানি মুসলিম আর হিন্দু মালাউনদের হাতে মার খেতে থাকা ভারতীয় ও কাশ্মিরি মুসলিমদের চিত্রটা সামনে থাকলেও কিছুটা আন্দাজ হবে।

তো প্রশ্ন হলো, এ সময়ে আমার করণীয় কি?

এ প্রশ্নের উত্তরও এখন মোটামুটি সকলের জানাশুনা: জিহাদ ফরযে আইন। দায়ী ভাইদের দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত মেহনতের ফলে মুসলিম উম্মাহর হালত এবং আমাদের করণীয় এখন অনেকটাই সুস্পষ্ট। কিন্তু করছি না কেন, বা কতটুকু করছি? এ প্রশ্ন প্রত্যেকে নিজে নিজেকে করি।

যদিও কুরআন সুন্নাহর আলোকে করণীয়টা স্পষ্ট, তথাপি বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা সামনে এনে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করতে কোনো সমস্যা নেই। বিশেষত যখন শরীয়তের মাসআলা একটার সাথে আরেকটা উৎপ্রোতভাবে জড়িত। একটার দ্বারা আরেকটা বুঝা সহজ হয়। এজন্যই মূলত লিখতে

চাচ্ছি।

এবার মূল কথায় আসি।

মুসলিম ভাইয়ের নুসরত আমার দায়িত্ব

কোনো মুসলিম কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে বা বিপদগ্রস্ত হলে তাকে নুসরত করা এবং বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা আমার দায়িত্ব। কারণ, প্রতিটি মুসলিম আমার ভাই। আমার বন্ধু। আমার দেহের অংশ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"মুমিন নর-নারীরা একে অপরের বন্ধু।" -তাওবা ৭১

আরো ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই।" -হুজরাত ১০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

"পরস্পর ভালবাসা, রহমত ও সাহায্যের বেলায় মুমিনদের অবস্থা একটি দেহের মতো। তার কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।" -সহীহ বুখারি ৫৬৬৫, সহীহ মুসলিম ৬৭৫১

এখানে আমি এ বিষয়ে কয়েকটি ফিকহি মাসআলা তুলে ধরছি। সচরাচর মাসআলাগুলো সবার নজরে আসে না বা আসলেও সেভাবে চিন্তা করি না।

মাসআলা- ১

মরুভূমি বা এমন কোনো স্থান যেখানে পানির ব্যবস্থা নেই, একটি কাফেলা সেখানে সফরে আছে। তাদের সাথে থাকা

পানি ফুরিয়ে গিয়ে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, পানির তেষ্টায় জীবন যাবার উপক্রম। কাফেলার একজনের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু পানি আছে, যা সে অজুর জন্য রেখেছিল। এখন তার জন্য জরুরী হলো, ঐ পানি পিপাসার্তদের দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করা আর নিজে অজুর বদলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করা। -রদ্দুল মুহতার: ১/২৩৫, বাব: তায়াম্মুম

যদি বিনা মূল্যে দিয়ে দেয় তাহলে তো সবচে ভাল। আর যদি বিনামূল্যে না দিয়ে তাদের কাছে উক্ত পানি বিক্রি করতে চায় তাহলেও করতে পারবে। তবে তাদের কাছে পানি কেনার মতো মূল্য না থাকলে বিনা মূল্যে দেয়াই আবশ্যক। অর্থাৎ পিপাসার্তদের যদি সামর্থ্য থাকে, তাহলে বিনা মূল্যে না দিলে নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য তারা পানি কিনে নেবে। আর সামর্থ্য না থাকলে পানির মালিকের জন্য আবশ্যক হলো, বিনা মূল্যে পানি দিয়ে তাদের জীবন বাঁচানো। -প্রাগুক্ত

সামনের মাসআলাটাও এমন-

মাসআলা- ২

কোনো মুসলিমের কোনো একটা জিনিসের এমনই জরুরত দেখা দিয়েছে যে, সেটা না হলে তার বা তার পরিবার পরিজনের জান-মাল ইজ্জত আব্রু বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে না। তখন যার কাছে ঐ জিনিসটা আছে, বিনা মূল্যে না দিলেও অন্তত এতটুকু অবশ্যই আবশ্যক যে, তার কাছে সেটা বিক্রি করবে। -রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল বুয়ু: ৪/৫০৬

মাসআলা- ৩

কোনো মুসলিম খাদ্যাভাবে এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, উঠতেই পারছে না এবং ফরয সালাত সাওমও আদায় করতে পারছে না। তখন অন্য মুসলিমদের দায়িত্ব হলো, তার খাদ্য পানির ব্যবস্থা করা যার দ্বারা তার প্রাণ রক্ষা হয় এবং ফরয ইবাদাতগুলো আদায়ে সক্ষম হয়ে উঠে। নিজের কাছে কিছু না থাকলে অন্যের কাছে চেয়ে হলেও ব্যবস্থা

করতে হবে। যদি ব্যবস্থা না করা হয় আর এভাবেই মুসলিম লোকটি মারা যায় তাহলে তার অবস্থা জানতো এমন সকলে গোনাহগার হবে। -কিতাবুল কাসব, ইমাম মুহাম্মাদ: ৮৮-৮৯ ; ফাতাওয়া হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়া: ৫/৩৩৮

শরীয়তের বিধান পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ

উপরোক্ত তৃতীয় মাসআলাটি বলার পর ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯হি.) বলেন,

وَهُوَ نَظِير فدَاء الْأَسير فَإِن من وَقع أَسِيرًا فِي يَد أهل الْحَرْب من الْمُؤمنِينَ فقصدوا قَتله يفترض على كل مُسلم يعلم بِحَالِهِ أَن يفْدِيه بِمَالِه إِن قدر على ذَلِك وَإِلَّا أخبر بِهِ غَيره مِمَّن يقدر عَلَيْهِ وَإِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن البَاقِينَ لحُصُول الْمَقْصُود وَلَا فرق بَينهمَا فِي الْمَعْنى فَإِن الْجُوع الَّذِي هاج من طبعه عَدو يخَاف الْهَلَاك مِنْهُ بِمَنْزِلَة الْعَدو من الْمُشْركين.-الكسب للإمام محمد (ص: 89)

এ মাসআলাটি মুক্তিপণ দিয়ে বন্দী মুক্তির মাসআলার অনুরূপ। কেননা, কোনো মুসলিম যদি হরবিদের হাতে বন্দী হয় আর তারা তাকে হত্যা করে ফেলার ইরাদা করে, তাহলে যে মুসলিমই তার এ অবস্থার কথা জানতে পারবে, তার

উপর ফরয: সম্ভব হলে নিজের সম্পদ ব্যয় করে তাকে মুক্ত করা। তার এ সামর্থ্য না থাকলে সামর্থ্যবানদের অবগত করবে। কেউ মুক্ত করে ফেললে বাকিদের দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। কেননা, মূল উদ্দেশ্য (তথা মুসলিমকে মুক্ত করা) অর্জন হয়ে গেছে। এ উভয় মাসআলায় মর্মগতভাবে কোনো ব্যবধান নেই। কেননা, যে ক্ষুধা তাকে কাতর করেছে তা মুশরিক দুশমনের মতোই ভয়ঙ্কর দুশমন, যা তাকে ধ্বংস করে দেবে বলে আশঙ্কা আছে। -কিতাবুল কাসব: ৮৯

অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই মূল বিষয় হলো, দুশমনের হাত থেকে মুসলিমকে উদ্ধার করতে হবে। এভাবে শরীয়তের সব মাসআলাই একটার সাথে আরেকটা সামঞ্জস্যশীল।

জিহাদের হাকিকত: ইসলাম ও মুসলিমের নুসরত

উপরে আমরা তিনটি মাসআলা দেখলাম। মাসআলাগুলোর সারকথা এটাই যে, কোনো মুসলিম বিপদে পড়লে তাকে

নুসরত করা ও উদ্ধার করার চেষ্টা করা আমার দায়িত্ব। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের যতটুকু সামর্থ্য আছে ব্যয় করবে। অর্থ থাকলে ব্যয় করবে। অন্যথায় দায়িত্ব অন্য দশজন মুসলিমের উপর বর্তাবে।

জিহাদের হাকিকতও এটিই। আমার মুসলিম ভাইকে উদ্ধার করা। তার জান, মাল, ইজ্জত আব্রু ও দ্বীন দুনিয়া রক্ষা করা। সাথে রয়েছে মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা আর মিল্লাতে ইসলামের সম্মান রক্ষা। এজন্যই মুসলিম উম্মাহর সকল ইমামের সর্বসম্মত মাসআলা যে, মুসলিম ভূমিতে আগ্রাসন হলে প্রথমে যাদের উপর আগ্রাসন হয়েছে তাদের উপর ফরয: দিফা তথা শত্রু প্রতিহত করা। তারা না পারলে অন্য মুসলিমদের দায়িত্ব জান মাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। তারা অলসতা করে না করলেও অন্য মুসলিমের দায়িত্ব রহিত হবে না। তারা না করার কারণে গোনাহগার হবে। তবে অন্য মুসলিমের দায়িত্ব থেকেই যাবে, যতক্ষণ না শত্রু প্রতিহত হয় এবং মুসলিম ভূমি উদ্ধার হয়।

রোহিঙ্গা ইস্যু এবং একটি না বলা কথা

আরাকানিরা যখন নির্যাতিত-বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আসলো তখন সারা দেশ থেকে, এমনকি বিদেশ থেকেও তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের নুসরত আসতে থাকলো। সবাই বুঝতে পারছে, আমার মুসলিম ভাইকে নুসরত করা আমার দায়িত্ব। যে যেভাবে পেরেছে- অর্থ দিয়ে, কাপড় দিয়ে- নুসরত করেছে। এটি অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এখানে একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন রয়ে গেছে, দু'চারজন ব্যতিক্রম বাদে আলেম সমাজ যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেও নারাজ। সেটি হলো,

রোহিঙ্গারা যখন বিতাড়িত হয়ে এ দেশে আসলো তখনই কি তাদের নুসরত করা আমদের জন্য ফরয হলো? না'কি তারা যখন নিজ দেশে নির্যাতিত হচ্ছিল তখনও ফরয ছিল?

প্রশ্নটি শুনে কি আপনি স্তম্ভিত হলেন? একেবারেই তো স্বাভাবিক প্রশ্ন। এর উত্তর বের করার জন্য দেশ বিদেশের

উলামারা বসে গবেষণার দরকার পড়ে না। কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য নুসুস থেকে উলামায়ে উম্মাহর ইজমা যে, আগ্রাসনের শিকার মুসলিমদের পক্ষে কিতাল করা ফরযে আইন। কিন্তু আমরা সেটা করলাম না কেন বা এখনও করছি না কেন?

কয়েকটি অযৌক্তিক বাহানা

বাহানা এক.

রোহিঙ্গারা বড়ই নাফরমান। নামায নেই, রোযা নেই, হজ্ব নেই, যাকাত নেই, পর্দা নেই-পুষিদা নেই। এদের উপর আল্লাহর গযব পড়েছে। আমাদের তাতে কি যায় আসে!!

নাউযুবিল্লাহ! এটি অত্যন্ত দাম্ভিকতার কথা। মনে হয় যেন আমি কত বড় আল্লাহর অলি হয়ে গেছি।
রোহিঙ্গারা তো আগেও নাফরমান এদেশেও নাফরমান। গযবের উপযুক্ত নাফরমানিগুলো তো তারা এখনও করে যাচ্ছে। তাহলে এখন কেন নুসরত ফরয হচ্ছে??

অধিকন্তু কুরআন সুন্নাহয় তো এমন কোনো কথা নেই যে, নাফরমানদের উপর আগ্রাসন হলে দিফা ফরয নয়।

ফুকাহায়ে কেরামও তো এমন কোন শর্তের কথা বলেননি। তাহলে কোত্থেকে এ শর্ত করছেন আপনি?

একটি উদাহরণ

আচ্ছা আপনার কোন নাফরমান, বে-নামাজি, বেপর্দা মেয়েকে যদি কয়েকটা বৌদ্ধ হিন্দু মিলে মানহানি করতে চায়, তাহলে কি আপনি বলতে পারবেন: এর উপর আল্লাহর গযব পড়ছে, আমি কেন বাঁচাতে যাব?!!

বাহানা দুই.

রোহিঙ্গারা নিজেরা দাঁড়ায়নি। আমরা কেন যাব?

এটিও শরীয়তবিরোধী কথা। কুরআন সুন্নাহয় এমন কোনো কথা নেই যে, তারা না দাঁড়ালে আমাদের উপর ফরয নয়। এটি ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নয়, মুসলিম উম্মাহ ও মিল্লাতে

ইসলামের সুরক্ষার বিষয়।

অধিকন্তু ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্টই বলে গেছেন, তারা না দাঁড়ালেও (أو تكاسلوا) আমাদের উপর ফরয। -ফাতহুল কাদির: ৫/৪৩৯, আলবাহরুর রায়িক: ১৩/২৮৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ২/১৮৮, রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৪

তাছাড়া এখন পর্যন্ত তো কত ভূমিই এমন আছে যে, দীর্ঘ দিনের জিহাদের পরও আমরা সেটা ধরে রাখতে সক্ষম হলাম না। কই! আমরা তো গেলাম না সেখানে।

বাহানা তিন.

সরকার যেতে দিচ্ছে না।

এ বাহানার সারকথা, সুবিধাবাদ যিন্দাবাদ। সরকার সাহায্যের অনুমতি দিচ্ছে তাই করছি, কিতালের অনুমতি দিচ্ছে না তাই করছি না। তাহলে আমরা দ্বীনের শুধু ততটুকুই পালন করবো যতটুকু তাগুত সরকারের অনুমোদিত। এর বাহিরে করবো না। কত সুন্দর দ্বীনদারি আমার।

বাহানা চার.

কেউ কেউ ‘সরকার যেতে দিচ্ছে না’ বাহানাটিকে এক ডিগ্রি এগিয়ে নিয়ে বলেন, **সরকারের অনুমতি হচ্ছে না তাই ফরয নয়।**

এ বিষয়টি এর আগেও অনেকবার আলোচিত হয়েছে যে, নাফিরে আমের সময় তথা আগ্রাসনের সময় যখন জিহাদ ফরযে আইন, তখন আমীরুল মু’মিনিন বাধা দিলেও জিহাদ ছাড়া যাবে না। তাহলে তাগুত সরকারের বাধার কি মূল্য আছে?! এসব সরকার তো তাদেরই লোক। এসব সরকারের কারণেই তো কাফেররা মুসলিমদের ঘাড়ে সওয়ার হতে পেরেছে।

দ্বিতীয়ত এসব সরকারের অবস্থা সেসব ডাকাতের মতো যারা রাস্তায় অস্ত্রপাতি নিয়ে বসে থাকে আর সুযোগ পেলেই ডাকাতি করে। এসব ডাকাতের ভয়ে জিহাদ রহিত হয় না।

হাসকাফি রহ. (১০৮৮হি.) বলেন,

وفي السراج: وشرط لوجوبه: القدرة على السلاح، لا أمن الطريق. -الدر المختار (ص: 330)

আসসিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে বলা হয়েছে, জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য অস্ত্র ধারণ পরিমাণ শারীরিক শক্তি থাকা শর্ত। রাস্তা নিরাপদ থাকা শর্ত নয়। -আদদুররুল মুখতার: ৩৩০

তাহতাবি রহ. (১২৩১হি.) বলেন,

لأنه إنما خرج إلى المخاوف، لا إلى المأمن. -حاشية الطحطاوي على الدر المختار: 6\227

কেননা, সে তো নিরাপদ কোথাও বের হয়নি, ভীতিসংকুল পথেই পা বাড়িয়েছে। -হাশিয়াতুত তাহতাবি আলাদদুররিল মুখতার: ৬/২২৭

হাঁ, এটা বলতে পারেন, এরা অত্যন্ত শক্তিশালী ও জবরদস্ত ডাকাত। কিন্তু এ কারণে জিহাদের ফরজিয়্যাত তো রহিত

হবে না। বরং এসব ডাকাতের কবল থেকে মুসলিমদের উদ্ধারের জন্য এদের বিরুদ্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ জিহাদ ফরয হবে। তখন উলামাদের ঘাড়ে অতিরিক্ত এ ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব বর্তাবে যে, এসব সরকারের বিরুদ্ধেও জিহাদ ফরয; যেমনটা করেছেন পাকিস্তানের স্বনামধন্য মুফতি শহীদ নেজামুদ্দিন শামযাই রহ.। এ কারণেই পাকিস্তানের নাপাক বাহিনি শায়খকে শহীদ করে।

এগুলো নিছক মনগড়া সুবিধাবাদি কিছু বাহানা। এসব বাহানার বলে পার পাওয়া যাবে না।

উল্লেখ্য, এখানে রোহিঙ্গা ইস্যুটা আনা হয়েছে শুধু বুঝানোর স্বার্থে। নতুবা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মাসআলা একই।

ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

৫৩.ন্যাটোভুক্ত দেশের অমুসলিম নাগরিকদের হত্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর

লোন উলফ ম্যাগাজিন পড়ার পর এক ভাইয়ের প্রশ্ন ছিল:

১. “তুরস্ক ছাড়া ন্যাটোভুক্ত অন্য দেশগুলোর যে কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করা জায়েয” কথাটি কোরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক কি’না?

২. তুরস্ক ছাড়া কেন?

৩. অমুসলিম ও তাগুতের অনুসারীদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেওয়া জায়েয কি’না? হলে কিভাবে জায়েয?

উত্তর:

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রহীম

তুরস্ককে বাদ দেয়ার বিষয়টাতে মুহতারাম মডারেটর ভাই সংক্ষেপে জওয়াব দিয়েছেন। **[কিছু আলোচিত সংশয়ের জবাবে “গণতন্ত্র, হামাস, জিহাদ, শাসক বাহিনী এবং ভিসা ও আমান” নিয়ে বিশেষ আর্কাইভ]** শিরোনামে ফোরামে যে আর্কাইভ দেয়া হয়েছে, সেখানে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত জওয়াব পেয়ে যাবেন।

আমি ইনশাআল্লাহ মাঝামাঝি একটা জওয়াব দেয়ার চেষ্টা করছি।

এক.

প্রথমে তুরস্কের বিষয়টাতে যাই। লোন উলফের উদ্দেশ্য এমনসব সুস্পষ্ট কাফের, যাদের কুফরির ব্যাপারে সাধারণত কারো সংশয় নেই এবং যাদেরকে হত্যা করলে সাধারণত আপত্তি হবে না বা কম হবে। এ ধরণের কাফের-মুরতাদ লোন উলফের টার্গেট। কোন মুসলমান কোনক্রমেই টার্গেট নয়। এজন্য আপনি হয়তো ম্যাগাজিনে লক্ষ করেছেন যে, বার বার সতর্ক করা হয়েছে: যেন মুসলমানদের কোন ক্ষতি না হয়। আক্রমণ যে রাষ্ট্রেই হোক, কোন মুসলমান যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমেরিকা-ইসরাঈলে হামলা হলেও মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সম্ভবত ন্যাটো-জোটভুক্ত সবগুলো রাষ্ট্রই কাফের রাষ্ট্র। একমাত্র তুরস্কই ব্যতিক্রম যে, মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব-কুফরি-সামরিকজোট ন্যাটোতে যোগ দিয়েছে। তুরস্ক মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ায় এবং তার নাগরিকরা মুসলমান হওয়ায় তাকে বাদ দেয়া হয়েছে। যদি অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্র ন্যাটোতে থাকতো, তাহলে ম্যাগাজিনে তাকেও বাদ দেয়া হতো। শুধু তুরস্ক নিয়েই

কথা না।

তবে বাদ দেয়ার দ্বারা আসলে অন্য কাফের রাষ্ট্র থেকে তুরস্কে আগত কিংবা তুরস্কে বসবাসরত কাফেরদের বাদ দেয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং মুসলিম নাগরিকদের বাদ দেয়া উদ্দেশ্য। নতুবা আপনি লক্ষ করেছেন যে, ম্যাগাজিনে আমাদের দেশেরও গুরুত্বপূর্ণ কাফেরদের টার্গেট করতে বলা হয়েছে। তুরস্ককে বাদ দেয়ার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, সাধারণ মুসলিমদের কোন ক্ষতি করা যাবে না; তবে যে কোন দেশের মতো সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ কাফেরদের টার্গেট করা যাবে। তবে সংক্ষেপ করতে গিয়ে ম্যাগাজিনে বিষয়টা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। অন্যথায় সামগ্রিক ম্যাগাজিন থেকে বিষয়টা স্পষ্ট।

দুই.

সকল হরবি কাফেরের জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। একমাত্র দারুল ইসলামে জিযিয়া দিয়ে মুসলমানদের জিম্মি হয়ে যারা থাকে কিংবা অস্থায়ীভাবে মুসলমানদের থেকে যারা আমান নিয়েছে, তারাই এর ব্যতিক্রম। এ ছাড়া সকল হরবি

কাফেরের জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। যেখানে পাওয়া যাবে হত্যা করা যাবে। লুণ্টন করা যাবে। স্পষ্ট যে, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সকল কাফের হরবি কাফের। তাদের সাথে আমাদের কোন আমানের চুক্তি নেই। তাই তাদের জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। এ ব্যাপারে আপনি নিচের লেখাটা দেখতে পারেন-

আমানবিহীন সকল কাফেরের জান-মাল হালাল

লিংক:

https://archive.org/download/AmanbihinKafer/Amanbihin%20kafer.pdf

তিন.

হরবি কাফেরদের জান-মাল যেহেতু মুসলমানদের জন্য হালাল, তাই তাদের যে কোন প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেয়া যাবে। তবে যথাসম্ভব মুসলমানদের যেন ক্ষতি না হয়, সে বিষয়টা লক্ষ রাখতে হবে। মুসলিম নামধারী তাগুতরাও হরবি কাফের। তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, যেগুলোতে সাধারণ মুসলিমদের অংশ

নেই, সেগুলোর ব্যাপারেও একই কথা। এগুলো জ্বালিয়ে দিতে কোন সমস্যা নেই। আর যেগুলোতে সাধারণ মুসলিমদের অংশ আছে, সেগুলোর কথা ভিন্ন। তবে যেকোন হামলার ক্ষেত্রেই তাতে মাসলাহাত কতটুকু তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

মুহতারাম ভাই, আশাকরি বুঝতে পেরেছেন। আরেকটু পরিষ্কার হওয়ার জন্য আপনি মিম্বারুত তাওহিদের নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর দুটি দেখুন-

♣ প্রশ্ন নং- ১৫৪৫: আমাদের মুসলিম ভাইদের প্রতিশোধরূপে নাইজেরিয়ান খৃস্টানদের উপর আক্রমণের কি বিধান?

লিংক:

https://82.221.139.217/showthread.ph...2453;&%23 2495;

♣ প্রশ্ন নং- ৩১৯০: মিশরের যেসব খ্রিস্টান আমাদের মুসলিম বোনদের অপহরণ করে, তাদের কি কোন ধরণের আমান-অঙ্গীকার বহাল থাকবে?

লিংক:

https://82.221.139.217/showthread.ph...2453;&%23 2495;

৫৪.পথভ্রষ্ট রহমানীর ফতোয়া: ভারতের মুসলমানদের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নাজায়েয!!

পথভ্রষ্ট খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী ভারতের মুসলমানদের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে নাজায়েয সাব্যস্ত করেছে। তার মতে ভারত দারুল আমান। ভারতের মুসলমানদের সাথে ভারত সরকারের চুক্তি হয়ে গেছে। এখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে গাদ্দারী হবে। বরং মুসলমানদের দায়িত্ব হল নিজ দেশ মনে করে ভারতের সার্বিক উন্নয়নের চেষ্টা করা। এমনকি ভারতের সেনাবাহিনিতে যোগ দিয়ে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা।

এখানে একটা আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ভারতে তো মুসলমানরা হিন্দু কতৃক নির্যাতিত। তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রূ প্রতিনিয়তই হিন্দুদের হাতে দলিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় তো চুক্তি বহাল রয়েছে বলে ধর্তব্য হবে না। কারণ, চুক্তি তো হয়েছিলই জান-মাল, ইজ্জত-আব্রূর নিরাপত্তার জন্য। এখন যখন আর নিরাপদ নেই তখন তো চুক্তির কোন ফায়েদা রইল

না। কাজেই চুক্তি ভেঙ্গে গেছে বলে গণ্য হবে। ফলে হিন্দুদের জান-মাল অন্য সকল হরবীদের মতই মুসলমানদের জন্য হালাল বলে গণ্য হবে।

ভ্রষ্ট রহমানী এর উত্তর দিয়েছে, নির্যাতন যা হচ্ছে তা সরকারিভাবে হচ্ছে না। সাধারণ হিন্দুরা নির্যাতন করছে। সরকারি আইনে তো নির্যাতন নিষেধ। যেহেতু সরকারি আইনে নির্যাতন নিষিদ্ধ, তাই জনগণ কতৃক নির্যাতন সরকার কতৃক নির্যাতন বলে গণ্য হবে না। ফলে সরকারের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল তা আপন তবিয়তেই বহাল আছে। কাজেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয হবে না বরং গাদ্দারী বলে গণ্য হবে।

এই হল পথভ্রষ্টের বক্তব্য। *'জাদীদ ফিকহি মাসায়েল'* নামক কিতাবে দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের আলোচনায় সে এই মন্তব্য করেছে।

বাস্তবতা কি?

প্রথমত কথা হল, ভারত সরকারের সাথে মুসলমানদের কোন চুক্তি নেই। বরং ভারত মুসলমানদের ছিল। হিন্দুরা ইংরেজদের

সহায়তায় তা জবরদখল করে নিয়েছে। এখন মুসলমানদের উপর ফরয হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের হিন্দুস্তান আবার ফিরিয়ে আনা এবং তাতে নববী আদলে খেলাফত কায়েম করা।

(চুক্তি কাকে বলে? কার সাথে কে চুক্তি করবে? কি কি শর্তে করবে? কি কি কারণে চুক্তি ভেঙ্গে যায়? ... ইত্যাদী বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। আমি সেদিকে যাচ্ছি না।)

দ্বিতীয়ত যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তাদের সাথে এক সময় চুক্তি ছিল তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের জান-মাল হরণ করা জায়েয। কেননা, মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর উপর আঘাত হানার দ্বারা হিন্দুরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

প্রশ্ন হল- রহমানী যে বলেছে, হামলা সরকারিভাবে হচ্ছে না, বেসরকারিভাবে হচ্ছে- সেটার কি জওয়াব?

জওয়াব:

হামলা কি শুধু বেসরকারিভাবেই হচ্ছে, না'কি সরকারের

ছত্রছায়ায়ও হচ্ছে তা দুনিয়ার সামান্য খবর রাখেন মত ব্যক্তির কাছেও অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

দ্বিতীয়ত:

চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার জন্য সরকারিভাবে হামলা হওয়া তো শর্ত নয়। সরকারের সম্মতি থাকাই যথেষ্ট। এমনকি হামলার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও যদি সরকার হামলাকারীকে প্রতিহত করে চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর সুরক্ষার ব্যবস্থা না করে তাহলে এতটুকু চুপ থাকাই সরকারের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গ বলে গণ্য হবে এবং মুসলমানদের জন্য তাদেরকে হত্যা করা এবং তাদের মাল লুন্টন করা বৈধ বলে গণ্য হবে। সরকারিভাবে হামলাও শর্ত নয়, সরকারের সম্মতিতে হামলা হওয়াও শর্ত নয়।

শরহুস সিয়ারিল কাবীরে বলা হয়েছে,

إلا أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدا ثم فعلوا ذلك، فحينئذ يكون هذا منهم نقضا للعهد. فلا بأس بأن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد ... فإن فعل ذلك جماعتهم، أو أميرهم، أو واحد منهم على وجه المحاربة وهم يعلمون بذلك فلا يغيرونه، فحينئذ يكون نقضا للعهد منهم، لأن فعل أميرهم يشتهر لا محالة، والواحد منهم إذا فعله

مجاهرة فلم يغيروا عليه فكأنهم أمروه بذلك ... ومباشرة ذلك الفعل على سبيل المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا وبينهم .اهـ

"তবে যদি তাদের থেকে খিয়ানত প্রকাশ পায় (তাহলে চুক্তি ভঙ্গ বলে গণ্য হবে এবং তাদেরকে কতল ও বন্দী করা বৈধ হয়ে হবে।) যেমন- তাদের সাথে শর্ত ছিল যে, তারা আমাদের কাউকে হত্যা বা বন্দী করবে না। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তা করে (অর্থাৎ আমাদের কাউকে হত্যা বা বন্দী করে)। তাহলে তাদের উক্ত কর্ম চুক্তি ভঙ্গ বলে সাব্যস্ত হবে। তখন তাদেরকে হত্যা বা বন্দী করতে আমাদের জন্য কোন বাধা-নিষেধ নেই, যেমন চুক্তির আগে তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করা আমাদের জন্য বৈধ ছিল। ... যদি উক্ত কর্ম তারা তাদের জামাআত নিয়ে করে থাকে কিংবা তাদের আমীর তা করে থাকে কিংবা প্রকাশ্যভাবে তাদের কোন একজন তা করেছে অথচ তারা জানা থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রতিহত করেনি, তাহলে তাদের চুক্তি ভেঙ্গে গেছে বলে গণ্য হবে। কেননা, তাদের আমীরের কর্মটি প্রকাশ্যে হবে অবশ্যই। আর তাদের কোন একজন যখন উক্ত কর্মটি প্রকাশ্যে করেছে অথচ তারা তাকে প্রতিহত করেনি তাহলে ধরা হবে যেন তারা তাকে তা করতে আদেশ দিয়েছে। আর প্রকাশ্যে এমন কর্মে লিপ্ত হওয়া আমাদের ও তাদের

মাঝে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গেরই নামান্তর।” [শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/১৬৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

أن المستأمنين لو غدر بهم ملك أهل الحرب، فأخذ أموالهم وحبسهم ثم انفلتوا:
حل لهم قتل أهل الحرب وأخذ أموالهم، باعتبار أن ذلك نقض للعهد من ملكهم
وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه، أو بعلمه ولم يمنعه من ذلك.اه .

“দারুল হরবের রাষ্ট্রপ্রধান যদি চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথে গাদ্দারী করে তাদের মাল হরণ করে নেয় এবং তাদেরকে বন্দী করে ফেলে এরপর কোনভাবে তারা ছুটে যেতে সক্ষম হয়, তাহলে উক্ত হরবীদের কতল করা এবং তাদের মাল লুট করা তাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। কেননা, উক্ত কর্ম তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গ বলে গণ্য। তদ্রূপ হরবীদের কোন এক ব্যক্তিও যদি রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতিক্রমে তা করে থাকে কিংবা তার এ কাজ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধান তাকে বাধা না দেয় তাহলেও (তা চুক্তি ভঙ্গ বলে গণ্য হবে এবং তাদের জন্য হরবীদেরকে কতল করা এবং তাদের মাল

লুট করা বৈধ হয়ে হবে।)" [শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৫১]

দেখুন! আবার দেখুন! ভাল করে দেখুন! কত পরিষ্কার কথা-

"কিংবা প্রকাশ্যভাবে তাদের কোন একজন তা করেছে অথচ তারা জানা থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রতিহত করেনি, তাহলে তাদের চুক্তি ভেঙ্গে গেছে বলে গণ্য হবে। কেননা ... তাদের কোন একজন যখন উক্ত কর্মটি প্রকাশ্যে করেছে অথচ তারা তাকে প্রতিহত করেনি তাহলে ধরা হবে যেন তারা তাকে তা করতে আদেশ দিয়েছে।"

"তদ্রূপ হরবীদের কোন এক ব্যক্তিও যদি রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতিক্রমে তা করে থাকে কিংবা তার এ কাজ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধান তাকে বাধা না দেয় তাহলেও (তা চুক্তি ভঙ্গ বলে গণ্য হবে এবং তাদের জন্য হরবীদেরকে কতল করা এবং তাদের মাল লুট করা বৈধ হয়ে হবে।)"

এমন পরিষ্কার বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও কিভাবে হিন্দুদের সাথে

মুসলমানদের চুক্তি বহাল আছে বলে মন্তব্য করা সম্ভব!? যেখানে একজন হামলা করলেই চুক্তি ভেঙ্গে যায়, তাদের জান-মাল বৈধ হয়ে যায়, সেখানে আজ যুগ যুগ ধরে সমগ্র ভারতে সরকারি বেসরকারি সকল পন্থায় গোটা হিন্দু জাতীর দ্বারা মুসলমানরা যেখানে নির্মম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, হাজারো নয় লাখো কোটি মুসলমান নির্মমভাবে নিহত হচ্ছে, হাজারো হাজার মা বোন পাশবিকতার শিকার হচ্ছে, সহায় সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে ভিটেমাটিহীন করা হচ্ছে- সেখানে কোন বিবেকবান বলতে পারে এখনও তাদের সাথে চুক্তি বহাল আছে আর মুসলমানদের উপর ফরয উক্ত চুক্তি রক্ষা করা এবং ভারতের মালাউনেদের জান মালের উপর কোনরূপ আঘাত না হানা??!! একমাত্র রহমানীর মত পথভ্রষ্টরাই এমন ফতোয়াবাজি করতে পারে। শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞরাই কেবল এমন মূর্খতাসুলভ মন্তব্য করতে পারে। কিংবা তারাই করতে পারে যারা দুনিয়ার সামান্য সুখ-সুবিধা আর সুনাম-সুখ্যাতীর লোভে দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি মুসলিম উম্মাহকে এসব অজ্ঞ-মূর্খ-পথভ্রষ্ট নামধারী আলেম থেকে হিফাযত কর। আমীন।

৫৫.পলায়নরত মুজাহিদকে ধরার চেষ্টা করলে বা বাধা দিলে

প্রশ্ন:

কোন মুজাহিদ ভাই কোন কাফের বা মুরতাদকে হত্যা করে পালানোর সময় যদি কোন (সরকারি বা সাধারণ) লোক তাকে ধরার চেষ্টা করে, তাহলে মুজাহিদ ভাইয়ের জন্য তাকে আঘাত করা বা হত্যা করা বৈধ হবে কি?

উত্তর:

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد …

পলায়নরত মুজাহিদকে পালাতে বাধা দেয়া বা ধরার চেষ্টা করা তার উপর সুস্পষ্ট জুলুম ও অন্যায়। বরং তাকে হত্যা করার নামান্তর। এই জালেমের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে তাকে আঘাত বা হত্যা করতে পারবে।

বাধাদানকারী যদি সরকারি বাহিনির কেউ হয়, বা কাফের হয়, তাহলে হত্যা করতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, সরকারি

বাহিনির লোককে এমনতিই হত্যা করা জায়েয। আর এদেশের কাফেররা মূলত হরবি। মাসলাহাতের খাতিরে বা সংশয়-সন্দেহের কারণে তাদের উপর হামলা করা হচ্ছে না। কিন্তু মুসলমানদের উপর সীমালঙ্গন করলে তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

আর বাধাদানকারী যদি সাধারণ মুসলামন হয় তখন আঘাতের দ্বারা ক্ষান্ত হয়ে গেলে হত্যা করবে না। জখম হয়েও ক্ষান্ত না হলে বা ক্ষান্ত হবে না বলে প্রবল ধারণা হলে হত্যা করে দেবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}

"অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।"- হুজুরাত: ৯

আয়াতে দল দ্বারা শুধু দল উদ্দেশ্য নয়। একক ব্যক্তিও যদি অন্যের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আয়াত যুদ্ধ ও মারামারির অনুমতি দিচ্ছে। পলায়নরত মুজাহিদকে বাধাদানকারী অন্যায়ভাবে আক্রমণকারীর অন্তর্ভুক্ত। তার সাথে মারামারি-জখম-আঘাত সব করা যাবে। যতক্ষণ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। অর্থাৎ মুজাহিদকে নিরাপদে পালাতে দেয়। হত্যা করা ছাড়া বিরত না হলে হত্যা করতেও কোন অসুবিধা নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان))

“তোমাদের যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন স্বহস্তে (শক্তিবলে) তা প্রতিহত করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেন তার যবান দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে যেন অন্তর দিয়ে প্রতিহত করে। আর এ (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) হল দুর্বলতম ঈমান।”- সহীহ মুসলিম: ১৮৬

যে অন্যায় অস্ত্র প্রয়োগ ছাড়া দমন করা যায় না, তা অস্ত্র প্রয়োগে দমন করাই হাদিসের নির্দেশ।

ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন-

عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى قال « فلا تعطه مالك ». قال أرأيت إن قاتلنى قال « قاتله ». قال أرأيت إن قتلنى قال « فأنت شهيد ». قال أرأيت إن قتلته قال « هو فى النار ».

“হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করল- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আমার মাল কেড়ে নিতে আসে? তিনি জওয়াব দিলেন- তাকে তোমার মাল দেবে না। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি সে আমার সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়? তিনি জওয়াব দিলেন, তুমিও তার সাথে মারামারি কর। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে তুমি শহীদ হবে। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে সে জাহান্নামী হবে।”- সহীহ মুসলিম: ৩৭৭

যেখানে নিজের মাল রক্ষার জন্য মারামারি ও হত্যার অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেখানে জান রক্ষার জন্য তো এর আগেই অনুমতি হবে।

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

(من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد)

"যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে- সে শহীদ। যে তার পরিবার, তার নিজ প্রাণ বা দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হবে- সেও শহীদ।"- আবু দাউদ: ৪৭৭২

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل، فإن زال بدون القتل لم يجز القتل، وهذا تلقي من قول الله تعالى:" فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله". وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع

الصائل على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شي عليه. اهـ

“যদি যবান দ্বারা অন্যায় প্রতিহত করতে পারে, তাহলে তাই করবে। **আর যদি শাস্তি বা হত্যা ছাড়া সম্ভব না হয়, তাহলে তাই করবে। হত্যা ছাড়া প্রতিহত হয়ে গেলে হত্যা জায়েয হবে না।** এই মাসআলা গৃহীত হয়েছে আল্লাহ তাআলার এ বাণী থেকে-

" فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله"

‘অতঃপর যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।’

এর ভিত্তিতেই উলামায়ে কেরাম বলেন, কোন ব্যক্তির নিজের জান-মালের উপর বা অন্য কারো জান-মালের উপর কেউ আক্রমণ করলে, সে উক্ত আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে পারবে এবং এর বিপরীতে তার উপর কোন জরিমানা বর্তাবে না।”- তাফসীরে কুরতুবী: ৪/৪৯

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন (ইমাম সারাখসীর ব্যাখ্যাসহ),

ولو خلوا سبيل الأسير وأعطوه الأمان على أن يكون في بلادهم فلا بأس للأسير)
أن يغتالهم ويقتل من قوي عليه سراً أو يأخذ ما شاء من أموالهم، لأنه ما
أعطاهم الأمان وإنما هم أعطوه الأمان، وذلك لا يمنعه من أن يفعل بهم ما
يقدر عليهم، إلا أن يكون أعطاهم الأمان، فحينئذ ينبغي لنا ألا نتعرض لهم
بشيء من ذلك) لأن ذلك يكون غدراً منه، والغدر حرام. (ولكنه إن قدر على أن
يخرج سراً إلى دار الإسلام فلا بأس بأن يخرج، وإن كان أعطاهم الأمان من أن
يفعل ذلك) لأن حبسهم إياه في دارهم ظلم منهم له، فله أن يمتنع من الظلم.

فإن منعه إنسان من ذلك فلا بأس بأن يقاتله ويقتله))

لأنه ظالم له في هذا المنع. اهـ شرح السير الكبير 2\7، باب من الفداء

"হরবিরা যদি কোন মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দিয়ে দেয় এবং তাকে এই শর্তে আমান দেয় যে, তাকে তাদের (হরবিদের) দেশেই থাকতে হবে, তাহলে উক্ত বন্দীর জন্য হরবিদের যাকে পারে গোপনে হত্যা করে দিতে কিংবা তাদের যে কোন সম্পদ নিয়ে নিতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, তারা তাকে আমান দিলেও সে তো তাদেরকে আমান দেয়নি। তাদের পক্ষ থেকে দেয়া আমান তার জন্য তাদের মাঝে (হত্যা-লুণ্টন) যা পারে করার পথে বাধা হবে না। হ্যাঁ, সে যদি তাদেরকে আমান দিয়ে থাকে, তাহলে কথা ভিন্ন। তখন আমাদের জন্য উচিৎ হলো, তাদের মাঝে (হত্যা-লুণ্টন) এর কোন কিছুই না করা। কেননা, এটা গাদ্দারি হবে। আর গাদ্দারি হারাম। তবে সে যদি গোপনে

দারুল ইসলামে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তাহলে পালিয়ে আসতে কোন সমস্যা নেই- যদিও সে তাদেরকে এটি না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কেননা, তাদের দেশে তাকে আটকে রাখা জুলুম। আর জুলুম প্রতিহত করার অধিকার তার আছে। **যদি পালিয়ে আসার পথে কোন ব্যক্তি তাকে বাধা দেয়, তাহলে তার সাথে মারামারি করতে বা তাকে হত্যা করে দিতে কোন সমস্যা নেই। কেননা, বাধা দেয়ার দ্বারা সে তার উপর জুলুম করছে।** [আর নিজের উপর থেকে জুলুম প্রতিহত করার অধিকার তার আছে।]"- শরহুস সিয়ারিল কাবির ২/৭

والله سبحانه وتعالى أعلم

৫৬.পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কিভাবে কায়েম হবে? [তাকী উসমানী সাহেবের বয়ান।]

পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম হবে কিভাবে – এ প্রসঙ্গে তাকী উসমানী সাহেব বলেন,

বক্তব্যের ভিডিও লিংক:

https://www.youpak.com/watch?v=SqkR3bF3KA0

“পাকিস্তানের বাইরে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইসলামী রাষ্ট্র রয়েছে। কিন্তু এই সৌভাগ্য পাকিস্তান এবং একমাত্র পাকিস্তানেরই রয়েছে যে,

(১). তার এবং তার বুনিয়াদি যে সংবিধান রয়েছে তাতে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু’র হাকিমিয়্যাহকে ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিষয়টি আপনি অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রে পাবেন না। এমনকি সৌদি আরবেও যেহেতু ঐরকম কোন সংবিধান নেই তাই তাতেও এত সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান নেই যে, হাকিমিয়্যাতে আ’লা আল্লাহ তাআলার জন্য সোপর্দ এবং এই রাষ্ট্রে যে হুকুমত কায়েম হবে তাতে হাকিমিয়্যাহ আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলার জন্য সাব্যস্ত থাকবে এবং তারই প্রদত্ত আইনের উপর তা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সৌভাগ্য আর কোন রাষ্ট্রের নেই। এতই (নিয়ামত) আল্লাহ তাআলা তাবারাকা ওয়া তাআলা এই পাকিস্তানকে দান করেছেন।

(২). তদ্রূপ এই সৌভাগ্যও আর কোনও রাষ্ট্রের নেই যে, পাকিস্তানের সংবিধানে পরিষ্কার বলা আছে, পাকিস্তানে কুরআন

ও সুন্নাহর বিপরিত কোনও আইন বানানো যাবে না এবং বর্তমানে বিদ্যমান আইনকে পরিবর্তন করে কুরআন সুন্নাহর ধাঁচে রূপ দেয়া হবে। অন্য কোনও রাষ্ট্রে এত সুস্পষ্টভাবে এই দফা বিদ্যমান নেই।

(৩). শুধু এতটুকুই নয়, এই সংবিধানে এও সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে যে, প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার আছে, যদি কেউ কুরআন সুন্নাহ বিরোধি কোন আইন দেখতে পায় তাহলে এই আইনকে রহিত করে তদস্থলে ইসলামী আইন প্রবর্তন করার দাবি আদালতে পেশ করতে পারবে। আদালত যদি তার দাবি গ্রহণ করে তাহলে আদালতের এই অধিকার রয়েছে যে, এই আইনকে রহিত করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার আদেশ জারি করতে পারবে। আফসোস! এই মহান দফা তো পাকিস্তানের সংবিধানে বিদ্যমান আছে কিন্তু হুকুমত, হুকুমতের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আমি বলবো যে, আফসোস! দ্বীনদার সমাজের অনুভূতিহীনতার কারণে এই দফা বেকার পড়ে রয়েছে। এর থেকে তেমন কোন ফায়েদা লাভ করা যাচ্ছে না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এই দফা বিদ্যমান আছে। আজও যদি আমরা দাবি করি, আমরা এই দফাকে বাস্তবায়িত করবো তো আলহামদুলিল্লাহ এর রাস্তা খোলা রয়েছে। কাজেই যেসব লোক এই প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, পাকিস্তানে ইসলামী শাসন

কায়েমের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই তাদের এই প্রোপাগান্ডা সম্পূর্ণ গলদ এবং ধোঁকাবাজি। শান্তিপূর্ণ পন্থায় ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আলহামদুলিল্লাহ রাস্তা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই অনুভূতিহীনতা খতম করে অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। অনুভূতি সৃষ্টি করে এই দফাকে বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। আমি সতের বছর শরয়ী আদালতে কাজ করেছি। এই সময়ে আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুইশতেরও বেশি আইন আদালতের মাধ্যমে ইসলামী ধাঁচে বানানোর হুকুম জারি করেছি এবং হুকুমত ঐসব আইন বদলিয়েছে । কিন্তু আফসোস! এই দফা থেকে ফায়েদা লাভের নিমিত্তে আমাদের দ্বীনদার সমাজের পক্ষ থেকে কোনও দরখাস্ত দায়ের করা হয়নি। আমি হাত জোড় করে বলেছি, মিনতি করে বলেছি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই দফা থেকে ফায়েদা লাভের নিমিত্তে আপনারা দরখাস্ত পেশ করুন। কিন্তু আফসোস! আমাদের পক্ষ থেকে কোনও দরখাস্ত দায়ের করা হয়নি। বেদ্বীনদের তরফ থেকে দরখাস্ত এসেছে, মুলহিদদের তরফ থেকে এসেছে এবং এর উপর যাচাই বাছাই হয়েছে। আমরা তখন দুইশতেরও বেশি আইন বদলিয়ে ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ সারা দুনিয়াতে শুধু পাকিস্তানেরই এই সৌভাগ্য যে, তাতে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার রয়েছে

কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে কোন আইনকে চ্যালেঞ্জ করে তা পরিবর্তন করাতে পারে।”

এ হলো তাকী উসমানী সাহেবের বক্তব্য। উল্লেখ্য যে, ১-২-৩ নাম্বার তিনটি বুঝার সুবিধার্থে আমার নিজের থেকে লাগানো।

তাকী উসমানী সাহেবের এ বক্তব্যের উপর আমাদের কিছু পর্যালোচনা:

১. তাকী উসমানী সাহেবের বক্তব্যে একটি বাস্তব সত্য উঠে এসেছে যে, একমাত্র পাকিস্তান ব্যতীত মুসলিম নামধারী পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রের সংবিধান হাকিমিয়্যাহ’র উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এমনকি সৌদি আরবও সুস্পষ্টরূপে হাকিমিয়্যা’র উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তদ্রূপ পৃথিবীর কোন মুসলিম নামধারী রাষ্ট্রের সংবিধানে স্পষ্টভাবে এ কথা নেই যে, সে দেশের শাসন ব্যবস্থা ইসলামী আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এমনকি সৌদি আরবেও না। অর্থাৎ পাকিস্তান ব্যতীত বাকি সকল মুসলিম রাষ্ট্র কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আফসোস এমন ধ্রুব সত্যটি স্বীকার করে নেয়ার পরও মুফতী সাহেব মুসলিম নামধারী পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবি করেছেন এবং

ফুকাহায়ে কেরামের কতক বক্তব্যের তাহরীফ-অপব্যাখ্যা করে দলীল পেশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। ঐসব কুফরী রাষ্ট্রের শাসকদেরকে ইমামুল মুসলিমীন দাবি করে তাদের আনুগত্যকে ফরয সাব্যস্ত করেছেন। হায়! কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও দারুল কুফর হল না, হয়ে গেল দারুল ইসলাম। মুসলামনদের দ্বীনের দুশমনরা হয়ে গেল তাদের ধর্মীয় ইমাম। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!!

২. তিনি দাবি করেছেন, পাকিস্তান হাকিমিয়্যা'র উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার এ দাবি কতটুকু সত্য তা পাকিস্তানের সংবিধান দেখলেই বুঝা যাবে। হাকিমুল উম্মাহ শায়খ আইমান আযযাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ অনেকের কাছ থেকে শুনছিলেন যে, পাকিস্তানের সংবিধান ইসলামী। সেখানকার হুকুমত হাকিমিয়্যাহ'র উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, পশ্চিমা আদলে গড়ে উঠা আমেরিকার দালাল, চরম ইসলাম বিদ্বেষী যে পাকিস্তান তা হাকিমিয়্যাহ'র উপর প্রতিষ্ঠিত হয় কিভাবে? কিভাবে তা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়? পরে তিনি পাকিস্তানের সংবিধান মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করে দেখেন, তা মূলত হাকিমিয়্যা'র উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত পাকিস্তানের

হাকিমিয়্যাহ’র মালিকও জনগণ বা অন্য কথায় সংসদ সদস্যরা। পাকিস্তানের সংবিধানেই তা স্পষ্ট বলা আছে। পাকিস্তানের সংবিধান যে কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রমাণকল্পে তিনি **‘আস-সুবহু ওয়াল কিনদীল’** নামে একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটি ১২৬ পৃষ্ঠার। আরবী বুঝেন এমন সকল ভাইকে আমি উপদেশ দেব কিতাবটি পড়ে নেয়ার জন্য। তাহলে পাকিস্তান সংবিধানে ইসলামের বাস্তবতা বুঝা যাবে ইনশাআল্লাহ।

৩. তাকী উসমানী সাহেব বার বার বড় গলায় বুলি আউড়ান যে, পাকিস্তান ইসলামের নামে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কথা হল, শুধু নাম দিয়ে কাম কি? যে পাকিস্তান ইসলামের নামে সৃষ্টি হয়েছিল জন্মের পরমূহুর্ত থেকে আজ পর্যন্ত কি তাতে ইসলাম কায়েম হয়েছে? পাকিস্তান তো বানানো হয়েছিল ইসলামের নামে। বানানো তো হয়েছিল এই কথার উপর যে, তা চলবে কুরআন অনুযায়ী। কিন্তু কই! জন্মের পর পাকিস্তানে কি ইসলামী সংবিধান জারি করা হল নাকি কুফরী সংবিধান? আল্লাহর শরীয়তের সংবিধান নাকি ব্রিটিশদের কুফরী সংবিধান? উলামায়ে কেরামের সংবিধান না’কি ব্রিটিশ দালালদের সংবিধান? তাকী উসমানী সাহেবও এই ধ্রুব সত্যটি

স্বীকার করে নিয়েছেন। দেখুন তার বক্তব্য,

“পাকিস্তানের সংবিধানে পরিষ্কার বলা আছে, পাকিস্তানে কুরআন ও সুন্নাহর বিপরিত কোনও আইন বানানো যাবে না এবং বর্তমানে বিদ্যমান আইনকে পরিবর্তন করে কুরআন সুন্নাহর ধাঁচে রূপ দেয়া হবে।”

অর্থাৎ বর্তমানে পাকিস্তান ব্রিটিশদের কুফরী সংবিধান দিয়েই চলবে। তবে ভবিষ্যতে কোন আইন ইসলাম পরিপন্থি বানানো যাবে না। আর বর্তমানে বিদ্যমান কুফরী আইনগুলো আস্তে আস্তে শরয়ী আদালতের মাধ্যমে ইসলামী আইনে রূপান্তর করা হবে।

এখানে তিনিটি প্রশ্ন,

ক. জন্মের পর পাকিস্তানের ভিত্তি কি ইসলামের উপর হল না'কি কুফরের উপর হল? অস্বীকার করার জু নেই যে, কুফরের উপর হল। কুফরী সংবিধানই জারি হল। ইসলামী সংবিধান হল না। ইসলামী শাসনও কায়েম হল না। তবে শাসকরা ওয়াদা করল, ভবিষ্যতে পাকিস্তান ইসলামী করা হবে।

মোটকথা, পাকিস্তানের ভিত্তি কুফরের উপর। আর ইসলামী

হবে কি'না সেটা ভবিষ্যতের বিষয় ছিল। জন্মের মূহুর্তে পাকিস্তান ইসলামী ছিল না। পরবর্তীতে ইসলামী হয়েছে কি'না সেটা পরের দুই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর শীল।

খ. পরবর্তীতে কি পাকিস্তানে কুরআন সুন্নাহ বিরোধি আইন করা হয়নি? উত্তর হবে নি:সন্দেহে হয়েছে। ব্রিটিশ সংবিধানে মুসলিম পারিবারিক আইনের অনেক ধারা ইসলামী শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এ আইন দিয়েই ইংরেজরা হিন্দুস্তান শাসন করত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্নে এই আইনগুলো আগের মতোই পাকিস্তানের সংবিধানে ছিল। কিন্তু পরে এ কয়টা আইনও পরিবর্তন করে তদস্থলে কুফরী আইন চাল করা হয় যা এখনো চালু আছে। এ ছাড়াও হয়তো আরো অনেক কুফরী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ. শেষের প্রশ্নটি হল, শাসকরা যে ওয়াদা করেছিল প্রচলিত কুফরী আইনগুলোকে পরিবর্তন করে তদস্থলে ইসলামী আইন চালু করা হবে- আদৌ সেটা কি হয়েছে? সবাই জানে যে, তা আর হয়নি।

যখন শাসন শুরু হল কুফরী আইন দিয়ে, পরবর্তীতে আরোও

নতুন নতুন কুফরী আইন প্রণয়ন করা হল আর আগের কুফরী আইনগুলো পরিবর্তন না করে আপন অবস্থায় বহাল রাখা হল – তখন কি পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হল না'কি আগের তুলনায় আরোও শক্ত কাফের রাষ্ট্র হল?? এরপরও পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবি করা হয় কিভাবে??

৪. সংবিধানে যে বলা ছিল,

"প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার আছে যে, যদি কেউ কুরআন সুন্নাহ বিরোধি কোন আইন দেখতে পায় তাহলে এই আইনকে রহিত করে তদস্থলে ইসলামী আইন প্রবর্তন করার দাবি আদালতে পেশ করতে পারবে। আদালত যদি তার দাবি গ্রহণ করে তাহলে আদালতের এই অধিকার রয়েছে যে, এই আইনকে রহিত করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার আদেশ জারি করতে পারবে।"

এখানে প্রশ্ন হল,

ক. *"আদালত যদি তার দাবি গ্রহণ করে তাহলে আদালতের এই অধিকার রয়েছে যে, এই আইনকে রহিত করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার আদেশ জারি করতে পারবে।"*

এখানে তো একথা নেই যে, আদালত অবশ্যই দাবি কবুল করবে। বরং যদি কবুল করে তবে করতে পারে। তাহলে আইন পরিবর্তনটা আদালতের দয়ার উপর রয়ে গেল।

দ্বিতীয়ত আদালত কুফরী আইন রহিত করে ইসলামী আইন চালু করবে- তা তো বলা হয়নি। বরং চালু করার আদেশ জারি করবে। কিন্তু আদেশ পার্লামেন্ট সদস্যরা যে অবশ্যই মানবে এবং অবশ্যই ইসলামী আইন চালু করবে তা তো বলা হয়নি। যদি তারা ইসলামী আইন জারি করতে রাজি না হয় তাহলে অস্ত্র ও শক্তি প্রয়োগে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা হবে তা তো বলা হয়নি। তাহলে সংবিধানের এই দফা – যাকে তাকী সাহেব ‘মহান দফা’ বলে গর্ববোধ করছেন, আশার বাঁধ যার উপর বাঁধছেন – তার মাধ্যমে কুফরী আইন রহিত করে ইসলামী আইন চালু করা তো নিশ্চিত হল না।

খ. ইসলামের নামে যদি পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তো শুরুতেই কুফরী সংবিধান কেন চালু করা হল? দ্বিতীয়ত জনগণ কি এই কুফরী সংবিধানকেই ইসলামী পাকিস্তানের (!!) ইসলামী সংবিধানরূপে মেনে নিয়েছিল? না’কি তারা এর বিরোধিতা করেছিল? সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তানের আলেম উলামা,

মুসলিম জনতা এই কুফরী সংবিধান মেনে নেয়নি। তারা একে প্রত্যাখান করেছিল। ইসলামী শরীয়তের জন্য মাঠে নেমেছিল। মিটিং মিছিল, দাবি দাওয়া সবই করেছিল। রক্তও ঝরিয়েছিল। উলামায়ে কেরাম ইসলামী সংবিধানের রূপরেখা তৈয়ার করে শাসকদের কাছ পেশও করেছিলেন। এক নয় দুই নয়, বছরের পর বছর তারা এর জন্য আন্দোলন করেছে। এখনও পর্যন্ত আন্দোলন চলছে। বাধ্য হয়ে তালেবানে ইসলামরা প্রসাশনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছে। যুদ্ধও চলছে। কিন্তু কই! ইসলাম কি কায়েম হয়েছে? এরপরও পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র? কুফরের উপর ভিত্তি হয়েও ইসলামী রাষ্ট্র? কুফরের উপর অটল থেকেও ইসলামী রাষ্ট্র? ইসলাম পরিত্যাগ করেও ইসলামী রাষ্ট্র? ইসলাম প্রত্যাশীদের ইসলাম প্রত্যাশার কারণে হত্যার পরও ইসলামী রাষ্ট্র? ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থেকেও ইসলামী রাষ্ট্র? হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বুঝ দাও! আমীন! আমীন!

৫. ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ সত্তর বছরের মাথায়ও পাকিস্তান থেকে কুফরী সংবিধান সরানো গেল না। ইসলামী শাসন কায়েম করা গেল না। কেন গেল না? তাকী সাহেব বড়ই অদ্ভূত কারণ বাতলিয়েছেন। দেখুন উনার বক্তব্য,

“আফসোস! এই মহান দফা তো পাকিস্তানের সংবিধানে বিদ্যমান আছে কিন্তু হুকুমত, হুকুমতের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আমি বলবো যে, আফসোস! দ্বীনদার সমাজের অনুভূতিহীনতার কারণে এই দফা বেকার পড়ে রয়েছে । এর থেকে তেমন কোন ফায়েদা লাভ করা যাচ্ছে না।”

আহা! যুগ যুগের বাস্তবতাকে তাকী সাহেব এক বক্তৃতার মঞ্চেই অস্বীকার করে ফেললেন। পাকিস্তানের মুসলামনদের কি কোন অনুভূতি ছিল না? এই সত্তর বছরেও তাদের কোন অনুভূতি জাগেনি না? কিভাবে তাকী সাহেব অস্বীকার করলেন এতবড় বাস্তবতাকে! উলামায়ে কেরাম কি ইসলামের দাবি জানাননি? কুফরকে কি প্রত্যাখান করেননি। সাধারণ মুসলমান কি শত হাজারো আন্দোলন করেনি? ইসলামের দাবিতে শত হাজারো মুসলমানের লাশ কি পড়েনি? আজও কি দাবি হচ্ছে না? আজও রক্ত ঝরছে না? এত কিছুর পরও কি করে বলতে পারলেন, ‘আবেদনের অভাবে, অনুভূতির অভাবে ইসলাম কায়েম হচ্ছে না?’

অনুভূতিহীনতা আর গাফলতের অভিযোগ শাসকদের ব্যাপারেও

করেছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও করেছেন। তাদের গাফলতের কারণে ইসলাম কায়েম হচ্ছে না। এটা যে কত বড় বাস্তবতার অস্বীকার কোন চক্ষুষ্মানের কাছে তা অস্পষ্ট নয়। গাফলত দু'চার দিন হতে পারে। কেউ স্মরণ করানোর অভাবে হতে পারে। সত্তর বছর ধরেই কি গাফলত চলছে? যে রাষ্ট্র ইসলামের নামেই জন্মেছিল তা থেকে ইসলাম প্রত্যাহার করে কুফর চালু করা কি গাফলত? যুগ যুগ ধরে হাজারো আন্দোলনের পরও, হাজারো হাজার লাশ পড়ার পরও ইসলাম কায়েম না করা কি গাফলত? ইসলাম প্রত্যাশীদেরকে হত্যা করা কি গাফলত? ক্রুসেডারদের সাথে জোট বেঁধে ইসলামী ইমারতকে ধ্বংস করাও কি গাফলত? এটা কোন ধরণের গাফলত? কোন ধরণের গাফলতের কথা বলছেন তাকী সাহেব? এটা গাফলত না ইসলাম বিদ্বেষ? আপনি কি শিখাতে চাচ্ছেন আমাদেরকে? কি বুঝাতে চাচ্ছেন আমাদেরকে? মুসলিম উম্মাহকে আপনি একেবারেই অন্ধ মনে করেন? একেবারেই জ্ঞানহীন মূর্খ মনে করেন? আপনি কি মনে করেন আপনার চালবাজি তারা বুঝে না? আপনি কি মনে করেন আপনার ধোঁকাবাজি তারা বুঝে না? হ্যাঁ, যারা তাদের দ্বীন তাকী সাহেবের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে তারা একে গাফলত মনে করতে পারে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা

আপনার চালবাজি বুঝে নিয়েছি। আপনার প্রতারণার ফাঁদে আমরা ইনশাআল্লাহ পড়বো না। হে আল্লাহ! দাজ্জালদের দাজ্জালী থেকে তুমি তোমার বান্দাদেরকে বাঁচাও! হে আল্লাহ তুমি বাঁচাও! হে আল্লাহ তুমি বাঁচাও!

৬. তাকী সাহেব বলেন,

“যেসব লোক এই প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই তাদের এই প্রোপাগান্ডা সম্পূর্ণ গলদ এবং ধোঁকাবাজি। শান্তিপূর্ণ পন্থায় ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আলহামদুলিল্লাহ রাস্তা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই অনুভূতিহীনতা খতম করে অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। অনুভূতি সৃষ্টি করে এই দফাকে বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।”

আমরা দেখেছি যে, সত্তর বছরের মাথায়ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় কোন কাজ হয়নি? এমনকি হাজারো হাজারো লাশ পড়েও কোন লাভ হয়নি। পাকিস্তানী তাগুতরা যারা একসময় হিন্দুস্তানী জনসাধারণের সাথে গাদ্দারী করে ইংরেজদের গোলামী করেছে, যারা ক্রুসেডারদে পক্ষ হয়ে উসমানী

খেলাফতকে ধ্বসং করেছে সেই গাদ্দাররা, সেই তাগুতরাই সত্তর বছর ধরে পাকিস্তানে কুফর টিকিয়ে রাখছে। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। কোন শরীয়তে এখনোও এদের বিরুদ্ধে কিতাল করাকে ফরয ঘোষণা দেয় না? কোন সেই শরীয়ত? শরীয়তে মুহাম্মাদী – আলা সাহিবিহা সালাওয়াতু রাব্বি ওয়া সালামুহু – তে তো ইসলামী পন্হায় নির্বাচিত ইসলামী শাসক নামায কায়েম না করলেই, কিংবা নিজে নামায ছেড়ে দিলেই কিংবা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেই কিংবা দ্বীনের অন্যকোন অকাট্য বিধান বর্জন করায় অটল থাকলেই তার বিরুদ্ধে কিতালকে ফরয করা হয়েছে। তাহলে এইসব তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলাকে কোন শরীয়তের আলোকে তাকী সাহেব প্রোপাগান্ডা সাবস্ত করছেন? নিশ্চয় এটা শরীয়তে মুহাম্মাদী নয়। এটা আব্রাহাম লিংকনের শরীয়ত। এটা পারভেজ মোশাররফের শরীয়ত। এটা জারদারির শরীয়ত। এটা ভুট্টোর শরীয়ত। হতে পারে এটা তাকী সাহেবের শরীয়ত। কিন্তু এটা শরীয়তে মুহাম্মাদী নয়। এটা মুসলিম উম্মাহর শরীয়ত নয়। মুসলিম উম্মাহ তাকী সাহেবের শরীয়ত থেকে মুক্ত। এর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه

৫৭.ফরযে কিফায়ার হাকিকত ও স্বরূপ

জিহাদ ফরযে কিফায়া বলতে কেউ কেউ মনে করেন, কিছু মানুষের উপর ফরয, সকলের উপর ফরয নয়। এরপর এর ফলাফল বের করেন, যে কিছু সংখ্যকের উপর ফরয আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। তাই আমার উপর ফরয নয়।

আর কেউ কেউ হয়তো আরেকটু উদারতা দেখান যে, কিছু মানুষ তো করছে। আমি না করলেও চলবে। আলেম হওয়া যেমন সকলের উপর ফরয নয়, জিহাদ করারও সকলের উপর ফরয নয়।

এখানে উভয় শ্রেণী বিভ্রান্তির শিকার।

প্রথম শ্রেণীর বিভ্রান্তি, কারণ: ফরযে কিফায়ার অর্থ এই নয় যে, কিছু সংখ্যকের উপর ফরয, বাকিদের উপর ফরয নয়। বরং ফরযে কিফায়ার অর্থ সকলের উপর ফরয, তবে সকলের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক মিলে যথাযথভাবে আঞ্জাম

দিয়ে দিলে বাকিদের দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে, তাদের উপর আর ফরয থাকবে না। আর ফরযটি আদায় না হলে সক্ষম সকলে গুনাহগার হবে, কেউ গুনাহ থেকে রেহাই পাবে না।

ফরযে আইনের সাথে এখানেই পার্থক্য। ফরযে আইনে একজনের আদায়ের দ্বারা আরেকজনের দায়িত্ব রহিত হবে না। প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব আলাদা আলাদা আঞ্জাম দিতে হবে। যেমন, নামায। প্রত্যেকের নামায প্রত্যেককে আদায় করতে হবে। একজনের আদায়ের দ্বারা আরেকজনের দায়িত্ব রহিত হবে না।

মোটকথা, ফরযে কিফায়া শুরুতে ফরযে আইনের মতোই সকলের উপর ফরয। তবে এখানে তা অন্যের মাধ্যমে আদায় করানোর সুযোগ আছে। কিছু লোক মিলে আদায় করলে বাকিদের দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। আর কেউই আদায় না করলে সকলে ফরয তরকের গুনাহগার হবে।

যেমন, মৃত ব্যক্তির কাফন দাফন। কোনো এলাকায় কোনো মুসলমান মারা গেলে উক্ত এলাকার বাকি মুসলমানদের দায়িত্ব তার কাফন দাফন করা। এটা সকলের দায়িত্ব। তবে

কিছু সংখ্যক লোক স্বেচ্ছায় তা করে ফেললে বাকিরা ফরয থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। কেউ করতে না চাইলে হয়তো নিজে করতে হবে, নয়তো বলে কয়ে অন্যকে দিয়ে করাতে হবে। এটা সকলের দায়িত্ব। যদি কেউই না করে আর মুসলমানের লাশ এভাবে পড়ে থাকে তাহলে সকলে গুনাহগার হবে।

জিহাদ ফরযে কিফায়ার অর্থ এটাই। হয় নিজে আদায় করতে হবে, নয়তো অন্যকে উৎসাহ দিয়ে আদায় করাতে হবে। যদি কেউই আদায় না করে আর এভাবেই বছর চলে যায়, তাহলে সকলে ফরয তরকের গুনাহগার হবে। এমনকি যারা মা'জূর তারাও মাফ পাবে না। কারণ, তাদের দায়িত্ব ছিল সক্ষমদেরকে বলে কয়ে উৎসাহ দিয়ে জিহাদে পাঠানো। তারা যখন তা করেনি, তারাও গুনাহগার হবে। সক্ষমরা জিহাদ না করায় এবং অন্যকে উৎসাহিত না করায়, আর মা'জূররা সক্ষমদের উৎসাহিত না করায় গুনাহগার হবে।

এ গেল প্রথম শ্রেণীর কথা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভ্রান্তি, কারণ: কিছু লোক করলেই বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে তা নয়। দায়িত্ব মুক্তির জন্য ফরযটি আদায় হওয়া শর্ত। কিছু লোকে করলো কিন্তু ফরযটি আদায় হলো না, তাহলে বাকিরা মাফ পাবে না। মাফ পাওয়ার জন্য ফরযটি আদায় হতে হবে।

যেমন, এক এলাকায় একশ লোক মারা গেল। মাত্র দু'জন লোক গিয়ে কয়েক জনের দাফন কাফন করে চলে আসলো। কেউ কি বলবে যে, দু'জনের করার দ্বারা বাকিদের দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে? না! কেউ বলবে না। একশ জনের কাফন দাফন যতক্ষণ সম্পন্ন না হবে ততক্ষণ কেউই মুক্তি পাবে না। হ্যাঁ, ১০/২০জনে মিলে যদি সকলের কাফন দাফন করে ফেলে তাহলে বাকিরা মাফ পেয়ে যাবে।

সারকথা দাঁড়ালো:

- ফরযে কিফায়া অর্থ সকলের উপর ফরয। তবে কিছু সংখ্যকে মিলে ফরযটি আদায় করে ফেললে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

- শুধু কিছু লোক নেমে পড়লেই সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে না। দায়িত্ব আদায় হওয়ার জন্য ফরযটি আদায় হওয়া শর্ত। ফরয আদায় না হলে কেউই মুক্তি পাবে না। অতএব, খোঁজ খবর নিতে হবে এবং তৎপর থাকতে হবে যে, ফরযটি যথাযথ আদায় হচ্ছে কি'না।

বিষয়টি বুঝার জন্য কয়েকজন আহলে ইলমের উদ্ধৃতি দিচ্ছি,

কাসানি রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

فإن لم يكن النفير عاما فهو فرض كفاية ، ومعناه : أن يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد ، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين. اهـ

"নাফিরে আম না হলে জিহাদ ফরযে কিফায়া। এর অর্থ, জিহাদে সক্ষম সকলের উপর ফরয। তবে কিছু সংখ্যক আদায় করে ফেললে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।" - বাদায়িউস সানায়ি ১৫/২৭০

মারগিনানি রহ. (৫৯৩হি.) বলেন,

الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط " عن الباقين " ... فإن لم يقم به " كصلاة الجنازة ورد السلام " أحد أثم جميع الناس بتركه " لأن الوجوب على الكل. اهـ

“জিহাদ ফরযে কিফায়া। একদল মিলে আদায় করে ফেললে বাকিদের থেকে রহিত হয়ে যাবে। ... যেমনটা জানাযার নামায ও সালামের উত্তর দেয়ার বিধান। যদি কেউই তা আদায় না করে তাহলে তরক করার কারণে সকলেই গুনাহগার হবে। কেননা, ফরয মূলত সকলের উপরই।” - হিদায়া ২/৩৭৮

ইবনে কুদামা রহ. (৬২০হি.) বলেন,

معنى فرض الكفاية، الذي إن لم يقم به من يكفي، أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي، سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره. اهـ

“ফরযে কিফায়ার অর্থ- প্রয়োজন পরিমাণ লোকে যদি তা আদায় না করে তাহলে সকলে গুনাহগার হবে, আর প্রয়োজন পরিমাণ লোকে আদায় করে ফেলল বাকিদের থেকে রহিত হয়ে যাবে। অতএব, শুরুতে ফরযে আইনের

মতো দায়িত্ব সকলেরই। ব্যবধান এখানে যে, ফরযে কিফায়া কিছু সংখ্যক লোকের আদায় করার দ্বারা রহিত হয়ে যাবে, আর ফরযে আইন অন্যের করার দ্বারা রহিত হবে না।" – মুগনি ৯/১৯৬

খতিব শারবিনি রহ. (৯৭৭হি.) বলেন,

ويأثم بتعطيل فرض الكفاية كل من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بعد عن المحل، وكذا يأثم قريب منه لم يعلم به لتقصيره في البحث عنه، ويختلف هذا بكبر البلد وصغره. اهـ

"ফরযে কেফায়া আদায় না হলে প্রত্যেক এমন ব্যক্তি গুনাহগার হবে, যে জানে যে, তা আদায় হয়নি এবং সে তা আদায়ে সক্ষম; যদিও (ঘটনাস্থল থেকে) তার অবস্থান দূরবর্তী হয়। আর নিকটস্থ ব্যক্তি যদি না জেনে থাকে, তাহলে যথাযথ অনুসন্ধান না করার কারণে সেও গুনাহগার হবে। এলাকা ছোট-বড় হওয়ার ভিত্তিতে গুনাহতে ব্যবধান হবে।" –মুগনিল মুহতাজ ৬/১৬

বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের অজানা নয় যে, তার দেশে

ইসলামি শাসন বিদ্যমান নেই এবং বিশ্বের কোনো না কোনো প্রান্তে তার মুসলিম ভাই-বোনেরা নির্যাতনের শিকার। কাজেই কেউ মাফ পাবে না। যদি কেউ না জেনে থাকে তাহলে শত শত বৎসর যাবৎ এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ কুফর ও নির্যাতনের সংবাদ না জানার কারণে সেও গুনাহগার হবে। ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে এমন অবহেলা আর উদাসীনতায় যে বিভোর সে কিভাবে মাফ পাবে? অধিকন্তু আমাদের আলোচনা ফরযে কিফায়া নিয়ে, ফরযে আইন তো আরো ভয়াবহ।

ফরযে কিফায়া নিয়ে শায়খ আব্দুল কারীম যায়দানের সুন্দর বক্তব্য আছে। সেটার একাংশ তুলে ধরা সমীচিন মনে করছি। তিনি বলেন,

وإنما يأثم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائي لأنه مطلوب من مجموع الأمة، فالقادر على الفعل عليه أن يفعله، والعاجز عنه عليه أن يحث القادر ويحمله على فعله. فإذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيرا من الجميع: من القادر لأنه لم يفعله، ومن العاجز لأنه لم يحمل القادر على فعله ويحثه عليه. اهـ

“ফরযে কিফায়া আদায় না হলে সকলেই গুনাহগার হওয়ার কারণ হচ্ছে, তা সমষ্টিগতভাবে উম্মাহ থেকে আদায় হওয়া উদ্দেশ্য। সক্ষম ব্যক্তির জন্য আবশ্যক তা আদায় করা আর অক্ষমের দায়িত্ব হলো তাকে উৎসাহ দেয়া ও উদ্বুদ্ধ করা। ফরযটি যখন আদায় হয়নি, তখন সকলেরই অবহেলা হয়েছে। সক্ষম ব্যক্তি না করার কারণে আর অক্ষম ব্যক্তি সক্ষমকে উৎসাহ না দেয়া ও উদ্বুদ্ধ না করার কারণে।” – আলওয়াজিয ফি উসূলিল ফিকহ ৩৬

জিহাদ প্রত্যেক বছর ফরয। ফরযে কিফায়া। কোনো বছর জিহাদ না হলে অবহেলাকারী সক্ষম অক্ষম সকলে গুনাহগার হবে। তাহলে ফরযে আইনের কি হবে তা বলাই বাহুল্য।

***

৫৮.ফিতনার হাকিকত: জিহাদ কি ফিতনা?

জিহাদের কথা বলতে গেলেই চতুর্দিক থেকে সুর উঠে, ‘না-না-না! ফিতনা হবে। তোমরা ফিতনা বাঁধাতে যেও না’।

কিন্তু ফিতনা জিনিসটা আসলে কি?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

“তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাক, যতক্ষণ না (যাবতীয়) ফিতনার (চূড়ান্ত) অবসান হয় এবং আল্লাহর (যমিনে আল্লাহর দেয়া) জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে ক্ষমতাসীন হয়।”- আনফাল: ৩৯

ফিতনার অবসানের জন্য আল্লাহ তাআলা জিহাদ করতে বলছেন। বুঝা গেল, ফিতনা এক জিনিস আর জিহাদ আরেক জিনিস। একটা আরেকটার বিপরীত। জিহাদ ফিতনা নির্মূলের মহৌষধ।

কুরআনে কারীমের এ নির্দেশ আমাদের পরিষ্কার করে দিচ্ছে, জিহাদ ফিতনা নয়, ফিতনা নির্মূলের ঔষধ। তাহলে আমরা

জিহাদকে ফিতনা কেন বানিয়ে ফেললাম?

এর কারণ, আমরা ফিতনার হাকিকত বুঝতে পারিনি। আমরা মনে করে নিচ্ছি:

- জিহাদ করতে গেলে মারামারি হবে। এটাই ফিতনা।
- জিহাদ করতে গেলে অনেককে মরতে হবে। এটাই ফিতনা।
- অনেকে বন্দী হবে, নির্যাতনের শিকার হবে। এটাই ফিতনা।
- অনেকে উদ্বাস্তু হবে, ভিটেমাটি হারাবে। এটাই ফিতনা।
- অনেক মা সন্তান হারাবে, অনেক স্ত্রী স্বামী হারাবে। এটাই ফিতনা।
- সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে। আরাম আয়েশের জীবন নষ্ট হবে। এটাই ফিতনা।

ফিতনার হাকিকত আমাদের সামনে এমনই ধরা পড়েছে।

এখানে অস্বীকার করার জু নেই যে, জিহাদ করতে গেলে

এগুলো হবেই। এগুলো ছাড়া জিহাদ হবে না। তবে এগুলো তো আজ নতুন না। সব যামানার জিহাদের চিত্রই এমন। হত্যা, শাহাদাত, বন্দী, নির্যাতন, দেশান্তর। এগুলো সব যামানার চিত্র। মক্কায় রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের নির্যাতিত হওয়ার করুণ কাহিনি তো আমাদের দিল কাঁদায়। স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও ভিটেমাটি ত্যাগ করে প্রিয় মক্কা থেকে হিজরতের সে দৃশ্য আমাদের অশ্রুসিক্ত করে। আমরা গর্বভরে এগুলো আলোচনা করি। মঞ্চ কাঁপাই। কাঁদি, কাঁদাই।

বদর, উহুদ, খন্দক, ফাতহে মক্কা, তাবুক এগুলো আমাদের প্রেরণার উৎস বলে আমরা দাবি করি। কিন্তু রাসূল ﷺ -এর দন্ত মুবারক শহীদ হয়। রক্তে চেহারা ও দেহ মুবারক রঞ্জিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম শাহাদত বরণ করেন। কেউ বন্দী হয়ে নির্যাতনের শিকার হন। কেউ বাবা হারান। কেউ স্বামী হারান। এটাই বদর উহুদের চিত্র। এগুলো আজ নতুন নয়। এগুলো সব পুরাতন। সকল নবি ও তাদের অনুসারিদের সুন্নত।

এগুলো যদি ফিতনা হয়, তাহলে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের জিহাদ জায়েয হলো কিভাবে?

আমরা তাদের অনুসরণের আদিষ্ট। সিয়াম সালাত অনুসরণে যদি ফিতনা না হয় তাহলে জিহাদের অনুসরণ ফিতনা হবে কেন? না'কি তাগুতিশক্তি যতটুকুর অনুমতি দেয় ততটুকু ঠিক আছে আর বাকিটা ফিতনা?
আসল কথা হলো আমরা ফিতনার হাকিকত বুঝতে প্যাঁচ লাগিয়ে ফেলেছি। ফিতনা আসলে কি জিনিস আমরা বুঝতেই পারিনি।

ফিতনা কি?

আল্লাহ তাআলা ফিতনা দূর করতে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন। আর জিহাদ মানেই মারামারি, কাটাকাটি, হত্যা, শাহাদাত, বন্দী, নির্যাতন, স্বজন হারানোর হাহাকার। অতএব, এগুলো ফিতনা নয়। ফিতনা এক ভিন্ন জিনিস।

ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত আয়াতের ফিতনার স্বরূপ সম্পর্কে বলেন,

كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه: إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة.

"(প্রথম যামানায়) ইসলামের অনুসারি (ও শক্তি) ছিল কম। মুমিনদেরকে দ্বীনের কারণে ফিতনায় নিপতিত করা হতো: হয়তো হত্যা করতো, নয়তো শাস্তি দিত। অবশেষে ইসলামের অনুসারি (ও শক্তি) বৃদ্ধি পেল। তখন আর ফিতনা ছিল না।"- সহীহ বুখারি ৪২৪৩

অন্য বর্ণনায় আছে,

كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة.

"ইসলামের অনুসারি (ও শক্তি ছিল) কম। মুমিনদেরকে দ্বীনের কারণে ফিতনায় নিপতিত করা হতো। হয়তো হত্যা করতো, নয়তো (শাস্তি দেয়ার জন্য) শিকলে বেঁধে রাখতো। অবশেষে ইসলামের অনুসারি ও (শক্তি) বৃদ্ধি পেল। তখন আর ফিতনা ছিল না।"- সহীহ বুখারি ৪৩৭৩

বুঝা গেল, কাফেররা মুমিনদের উপর যে নির্যাতন করে, হত্যা করে, বন্দী করে, শাস্তি দেয়, দ্বীন থেকে ফিরিয়ে ফেলতে চায়, কুফরি বিধি বিধান মানতে বাধ্য করে, চাপ প্রয়োগ করে- এসব হচ্ছে ফিতনা। এ ফিতনা দূর করতে আল্লাহ তাআলা জিহাদের আদেশ দিয়েছেন। জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন এমন একটা সমাজ কায়েম করতে যেখানে মুসলিমদের দ্বীন পালনে কোনো বাধা থাকবে না। আল্লাহর বিধান মেনে চলতে কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হবে না। নিষ্কণ্টকভাবে শরীয়ত মেনে চলা যাবে। অতএব, এ কাফের ও জালেম শাসন ফিতনা। এটি ধ্বংসের জন্য হত্যা, বন্দী, নির্যাতন ভোগ, মরা ও মারা জিহাদ।

আরেকটু খোলে বললে, ফিতনা হচ্ছে ঐ জিনিস যা মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, দ্বীনদারির ক্ষতি করে, দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

ইবনে মানজুর রহ. (৭১১ হি.) বলেন,

والفتنة: الضلال والإثم. والفاتن: المضل عن الحق. والفاتن: الشيطان لأنه يضل العباد. اهـ

"ফিতনা অর্থ- গোমরাহি ও গুনাহ। ফিতনাকারী বলা হয়, যে লোকজনকে হক থেকে বিচ্যুত করে। শয়তানকে ফিতনাকারী বলা হয়, কেননা, সে বান্দাদেরকে বিচ্যুত করে থাকে।"- লিসানুল আরব, মাদ্দা- فتن

আরো বলেন,

والفتنة في كلامهم معناه المميلة عن الحق. اهـ

"আরবদের ভাষায় ফিতনা বলে এমন জিনিসকে, যা হক থেকে বিচ্যুত করে।"- লিসানুল আরব, মাদ্দা- فتن

অতএব, বর্তমান সমাজে চলমান কুফরি আইন কানুন ফিতনা। চলমান অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন ফিতনা। চলমান যিনা, ব্যভিচার, বে-পর্দা, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়াসহ সব ধরনের হারাম ও গুনাহগুলো ফিতনা। এগুলো দূর করতে আল্লাহ তাআলা জিহাদের আদেশ দিয়েছেন। লড়াইয়ের

আদেশ দিয়েছেন। মারতে ও মরতে আদেশ দিয়েছেন।

ফিতনা: দু'টি সহজবোধ্য উদাহরণ

এক.

একজন মুমিন খুব কষ্টে পড়েছে। এক কাফের তাকে প্রলোভন দিচ্ছে, যদি কাফের হয়ে যাও তাহলে তোমার কষ্ট দূর করে দেবো। যা চাইবে তাই দেব। বাড়ি গাড়ি যা লাগে সব।

এখানে ফিতনা কোনটা?

সবাই বলবে, কাফের হয়ে যাওয়া ফিতনা। না খেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।

দুই.

এক কাফের একজন মুসলিমকে হুমকি দিচ্ছে, তুই কাফের হয়ে যা, নইলে তোকে হত্যা করে দেবো।

এখন মুমিনের সামনে দু'টি পথ: ক. কাফের হয়ে যাওয়া; খ. মারামারি করে কাফেরকে মেরে ফেলা বা নিজে মরে যাওয়া।

এখানে ফিতনা কোনটা??

সবাই বলবে, কাফের হয়ে যাওয়া ফিতনা। এটা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। কাফেরকে মেরে ফেলা বা নিজে মরে যাওয়া ফিতনা নয়, জিহাদ। কাফেরকে মেরে ফেললেও আল্লাহ সন্তুষ্ট। নিজে মরে গেলেও আল্লাহ সন্তুষ্ট। শাহাদাতের মর্যাদায় পুরস্কৃত করবেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"(জেনে রেখো) ফিতনা হত্যার চেয়েও ভয়াবহ।" -বাকারা ১৯১

ইমাম কুরতুবি রহ. (৬৭১হি.) বলেন,

قوله تعالى:" والفتنة أشد من القتل" أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. قال مجاهد: أي من أن يقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة. وقال غيره: أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم جرما وأشد من القتل. اهـ

"আল্লাহ তাআলার বাণী, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও ভয়াবহ।' অর্থাৎ যে ফিতনা তারা তোমাদের উপর চাপাচ্ছে, যার মাধ্যমে তারা তোমাদেরকে কুফরে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে, তা হত্যার চেয়েও ভয়াবহ।

মুজাহিদ রহ. বলেন, অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি নিহত হওয়ার চেয়েও ফিতনা ভয়াবহ। অতএব, ফিতনাগ্রস্ত হওয়ার চেয়ে নিহত হওয়া তার জন্য সহজ।

অন্যরা বলেন, কাফেরদের কুফর ও শিরক (তাদেরকে) হত্যা করে দেয়ার চেয়েও জঘন্য।"- তাফসীরে কুরতুবি ২/৩৫১

মুহতারাম ভাই, এভাবেই বুঝতে হবে। তাগুতি শাসন ফিতনা। চলমান হারামের স্রোত ফিতনা। এগুলো দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে এগুলো দূর করার জন্য লড়াই,

বন্দী, মরা ও মারা জিহাদ। এগুলো আল্লাহর নির্দেশ। মরলেও লাভ বাঁচলেও লাভ।

ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

৫৯.বর্তমান জিহাদ এবং কিছু সন্দেহ সংশয়- ০১

বর্তমান জিহাদ নিয়ে এমন কিছু সংশয় আছে যেগুলো অনেকের মনেই ঘুরপাক খায়। এমনকি যারা জিহাদের কাজে জড়িত আছেন, তাদেরও অনেকের। অনেকে হয়তো কারো কাছে জিজ্ঞেস করেন, অনেকে করেন না। অনেকে করলেও সঠিক উত্তর পান না। আবার অনেকে হয়তো ভাবেন, আমরা হক্কের উপর আছি; অতকিছু বুঝার দরকার নেই!! যাহোক, এমন কয়েকটি সংশয়ের নিরসনের জন্যই এ লেখা। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন যথাযথ পেশ করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

সংশয়-১: জিহাদ বলা হয় কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করাকে;

যেমনট ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, কাফের আক্রমণ করলে যুদ্ধে বেড়িয়ে পড়া ফরয। আমরা বর্তমানে যা করছি- যেমন, দাওয়াত, তাসনিফ, মিডিয়া, অর্থ সংগ্রহ বা কিছু সামরিক ই'দাদ- এগুলো কি জিহাদ? এসবের দ্বারা কি জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় হবে? এগুলোর দ্বারা কি জিহাদের সওয়াব পাওয়া যাবে?

সংশয়-২: ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, কোন মুসলিম ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে শত্রু প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে বেরিয়ে পড়া ফরয। কিন্তু কাফেররা কোন ভূখণ্ড দখল করে নিলে তা পুনঃরুদ্ধার করা ফরয- এমন কথা কি কেউ বলেছেন? কাজেই, ভারতে যখন ইংরেজরা আক্রমণ করেছিল তখন প্রতিহত করার জন্য জিহাদ ফরয ছিল। কিন্তু যখন তারা দখল করে নিয়ে গেছে তখন থেকে আর জিহাদ ফরয নয়। অন্যান্য ভূখণ্ডের বেলায়ও একই কথা।

সংশয়-৩: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি ময়দানে নেমে কাফেরদের সাথে জিহাদ করেছেন। সাহাবায়ে

কেরামও এমনই করেছেন। আমাদের আকাবিরগণও এমনই করেছেন। আমরা বর্তমানে যে লুকিয়ে লুকিয়ে – গেরিলা – জিহাদ করি, এটা কি জায়েয? ইসলাম তো যা করে প্রকাশ্যে করে। এভাবে লুকিয়ে কেন? এটা কি জিহাদ?

সংশয়-৪: ফুকাহায়ে কেরম লিখেছেন, যুদ্ধে যাওয়ার সামর্থ্য যাদের নেই, তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। বর্তমানে যেহেতু জালেম সরকার বা কাফেরদের বাধার কারণে আমরা জিহাদের ময়দানে যেতে সক্ষম নই, তাই আমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। তদ্রূপ শাম-ইরাকের মতো দূর ময়দানে যাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্যও সকলের নেই। তাই তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।

***

নিরসন

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد

জিহাদ বললে সাধারণত যুদ্ধ-কিতাল বুঝে আসে। তবে এমনটা মনে করা সঙ্গত নয় যে, জিহাদ শুধু যুদ্ধেরই নাম; যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু জিহাদ নয়। আসলে কুফরি শক্তি পরাস্ত করে ইসলামী খেলাফত কায়েমের জন্য কিতালসহ সংশ্লিষ্ট আরো যা কিছু আঞ্জাম দিতে হবে, সবগুলোই জিহাদ। জিহাদ শুধু কিতালে সীমাবদ্ধ নয়। জিহাদের সওয়াবও শুধু কিতালে সীমাবদ্ধ নয়। হ্যাঁ, কিতাল জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর। তবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজও জিহাদ।

জিহাদকে শুধু কিতালে সীমাবদ্ধ মনে করার অন্যতম একটা কারণ হতে পারে আমাদের ফিকহের কিতাবাদি। সাধারণ দৃষ্টিতে ফিকহের কিতাবাদি পড়লে মনে হবে, জিহাদ মানেই কিতাল। যেন কিতাল ছাড়া অন্য কিছু জিহাদ নয়। অবশ্য গভীর ও তাহকিকি দৃষ্টিতে পড়লে এমনটা মনে হওয়ার কথা না।

***

সালাফের যামানার জিহাদের সাথে আমাদের যামানার জিহাদের বেশ ব্যবধান আছে। সালাফের যামানায় ইসলামী বিশ্বের সবখানে ইসলামী শাসন ছিল। ইসলামী সীমানার অভ্যন্তরে কোথাও কোন কাফের আমান-নিরাপত্তা নেয়া ছাড়া প্রবেশ করারও সাহস পেত না। সালাফের যামানায় সাধারণত ইকদামি তথা আক্রমণাত্মক জিহাদ হতো। কাফেরদের ভূমিতে গিয়ে তাদেরকে ইসলাম বা জিযিয়া কবুলের দাওয়াত দেয়া হত। গ্রহণ না করলে কিতাল করা হতো। এটাই ছিল জিহাদ। কোন কাফের রাষ্ট্র সাধারণত ইসলামী ভূমির কোথাও হামলা করার সাহস পেত না। একান্ত যদি কোথাও করতোও, তাহলে করতে হতো সীমান্ত দিয়ে। তখনকার বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি ইসলামী শাসনের অধীনে ছিল। গোটা ইসলামী বিশ্বের উপর একসাথে হামলা করা তো কাফেরদের কল্পনাতেও আসতো না। বেশির চেয়ে বেশি দুর্বলতা বা উদাসীনতার সুযোগে সীমান্তের কোন অংশে হামলা করতে পারতো। তখনকার যুগে বিমান ছিল না। উপর দিয়ে মাঝখানে কোথাও হামলার সুযোগ ছিল না। হামলা করলে কোন সীমান্ত দিয়েই করতে হতো। আর এ হামলা প্রতিহত করতে হলে সীমান্তে গিয়েই করতে হতো। এ কারণে সাধারণত ফিকহের কিতাবাদিতে লিখা হয়েছে, কাফেররা মুসলিমদের কোন ভূখণ্ডে বা সীমান্তে হামলা

করলে উক্ত হামলা প্রতিহত করতে পারে পরিমাণ মুসলমান যুদ্ধে বের হয়ে পড়া ফরয। যেহেতু হামলা সীমান্ত দিয়েই হতো আর প্রতিহত করতে হলে সীমান্তেই যেতে হতো এবং তা যুদ্ধের মাধ্যমেই করতে হতো, এ কারণে তখন জিহাদ বলতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ বের হয়ে পড়াকেই বুঝাতো।

স্পষ্ট যে, অর্ধ পৃথিবীব্যাপী এই ইসলামী বিশ্বের এক কোণে হামলা হলে দূরের মুসলমানদের এ ব্যাপারে কোন খবরই থাকতো না। তখনকার যুগে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। মূহুর্তের খবর মূহুর্তে পৌঁছানো যেত না। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য ইলম তথা জানা শর্ত যে, অমুক অংশে হামলা হয়েছে এবং সেখানকার মুসলমানরা তা প্রতিহত করতে পারছে না। যাদের কাছে খবর পৌঁছবে না, তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। আর এটা তো সঙ্গত কথাই যে, যাদের জানাই নেই যে, হামলা হয়েছে, তাদের উপর জিহাদ আমরা কিভাবে ফরয বলতে পারি?!

দ্বিতীয়ত, শত মাইল পাড়ি দিয়ে সীমান্তে পৌঁছে যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য সকলের থাকতো না। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, রাহ খরচ ও যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য যাদের নেই, তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। যেমনটা কুরআনে কারীমেও বলা হয়েছে। আর এটা তো যৌক্তিক কথাই যে, এত শত মাইল পাড়ি দেয়ার এবং সীমান্তে পৌঁছে নিজের যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য যাদের নেই, তাদের উপর আমরা জিহাদ ফরয বলতে পারি না। এ কারণে যারা জিহাদে যাওয়ার সামর্থ্য রাখতো না, তারা মুজাহিদদের পরিবার দেখাশুনা করতো। সামর্থ্যবানদের উদ্বুদ্ধ করতো। শারীরিকভাবে অক্ষম যারা, তারা সম্পদ থাকলে অন্যকে ঘোড়া, অস্ত্র, অর্থ ও সামানা-পত্র দিয়ে সহায়তা করতো। তাদের জন্য জিহাদে শরীক হওয়ার এটাই ছিল পথ।

***

সালাফের যমানায় এটা অসম্ভব ছিল যে, কাফেররা মুসলমানদের কোন ভূমি দখল করে রাজত্ব করবে। মুসলমানদের যেখানে বিশ্বজয়ের জয়গান, সেখানে মুসলমানদের ভূমি দখলে নেবে কাফেররা- এটা তো প্রায়

অসম্ভব ছিল। বেশির চেয়ে বেশি দুর্বলতার সুযোগে হামলা করতে পারতো। ততক্ষণেই মুসলমানরা এদের প্রতিহত করতে বেড়িয়ে পড়বে। এখনকার মতো নির্লজ্জ হয়ে বসে থাকার মেজাজ ছিল না। কাফেররা দখলদারিত্ব বসাবার আগেই আযাদ হয়ে যাবে। এ কারণে ফিকহের কিতাবাদিতে সাধারণত এ কথা লিখেছে যে, কোন ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে জিহাদ ফরযে আইন। এ কথা সাধারণত স্পষ্ট পাওয়া যায় না যে, কোন ভূখণ্ড কাফেররা দখল করে নিয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধার ফরয। অধিকন্তু মুসলমানদের শান নয় যে, কোন কাফেরকে নিজেদের ভূমিতে দখলদারিত্ব কায়েম করতে দেবে আর তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে। আক্রমণ হতেই দেবে না। কখনোও হয়ে গেলে সাথে সাথে প্রতিহত করবে। ব্যস এ পর্যন্তই। এ কারণে ফিকহের কিতাবাদিতে দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করা ফরয- এ কথাটা সাধারণত স্পষ্ট পাওয়া যায় না। তাছাড়া যেহেতু আক্রমণ হলেই জিহাদ ফরয, তখন দখল করে নিয়ে গেলে যে পুনরুদ্ধার করা ফরয হবে- এটা সহজেই অনুমেয়। সামান্য বুঝসম্পন্ন ব্যক্তিই এটি বুঝতে পারবে। এ কারণে আর স্পষ্ট করে বলার দরকার পড়ে না। কিন্তু এ থেকেও কেউ কেউ ধোঁকায় পড়েছে যে, আক্রমণ হলে প্রতিহত করা ফরয, কিন্তু দখল করে নিয়ে গেলে পুনরুদ্ধার ফরয না।

আসলে এটা তাদের বুঝের কমতি। যেখানে কাফেরকে কাফেরের রাষ্ট্রে রাজত্ব করতে দেয়াও জায়েয নয়, আক্রমণাত্মক জিহাদ করে তার শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ইসলাম গ্রহণে বা জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করা অত্যাবশ্যক- সেখানে মুসলিম ভূমিতে কিভাবে রাজত্ব করতে দেয়া জায়েয হবে? কিভাবে কোন মুসলিম ভূমি কাফেরের হাতে থাকতে দেয়া জায়েয হবে? বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। এরপরও যারা বুঝে না, তাদের আসলে বুঝ নেই। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

***

যাহোক, সালাফের যামানায় আক্রমণ হতো সীমান্ত দিয়ে। আক্রমণ প্রতিহত করতে সীমান্তে যেতে হতো। এ কারণে তখন জিহাদ (তথা সীমান্তে গিয়ে শত্রু প্রতিহত করা) ফরয হওয়ার জন্য কয়েকটা বিষয়ের জরুরত পড়তো-

ক. আক্রমণের সংবাদ পৌঁছা।

খ. সীমান্তে গিয়ে কিতাল করার মতো পর্যাপ্ত শারীরিক শক্তি ও সক্ষমতা থাকা।

গ. রাহ খরচ ও যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের সক্ষমতা থাকা।

পর্যাপ্ত শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে জিহাদ ফরয বলা যেতো না। উভয় প্রকার সামর্থ্য থাকার পর জিহাদ যেটা হতো সেটা হল- সীমান্তে গিয়ে কিতাল। অধিকন্তু কাফেরদের দমনের কাজটা মূলত কিতালের মাধ্যমেই হয়। অন্য সব কিছু কিতালের প্রস্তুতি বা কিতালের সংশ্লিষ্ট বিষয়। এসব কারণে, জিহাদ বলতে সাধারণত কিতাল বুঝায়। ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদ বলতে সাধারণত কিতালই বুঝিয়ে থাকেন। 'আর জিহাদ ফরয নয়' দ্বারা 'কিতাল ও যুদ্ধ করা ফরয নয়' উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। এটা উদ্দেশ্য নয় যে- কিতাল ছাড়া আর কিছু জিহাদ নয়, কিংবা শারীরিক বা আর্থিক সামর্থ্য না থাকার কারণে যাদের উপর কিতালে বের হওয়া ফরয নয়, তাদের আর কোন দায়িত্ব নেই। এমনটা বুঝা ভুল। বরং বাস্তব হল:

- জিহাদ শুধু কিতালে সীমাবদ্ধ নয়। কিতালের প্রস্তুতিমূলক ও কিতালের সাথে সম্পৃক্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজও জিহাদ।
- শক্তি সামর্থ্য না থাকার কারণে যাদের উপর কিতাল ও যুদ্ধ ফরয নয়, তাদেরও আরো অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সেগুলো যথাযথ আদায় করলে তারাও জিহাদের সওয়াব পাবে। আদায় না করলে গুনাহগার হবে।

এ হল সংক্ষেপ কথা। সামনের পর্ব থেকে ইনশাআল্লাহ দলীলভিত্তিক আলোচনায় যাব।

***

৬০.ব্যথিত হৃদয়ের আহাজারি- শুনার কেউ আছে কি?

অনেক দিন ধরেই কথাটা মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বলার সুযোগ আসছিল না। আজ মনে হলো, বলে দিই। যদি কেউ শুনে তো কাজে আসবে। অন্তত আমার দায়িত্ব কিছুটা তো আদায় হলো।

আমরা জানি, আল্লাহ তাআলার শরীয়ত গ্রহণ করে নেয়া এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে শরীয়ত অনুযায়ী বিচার ফায়াসালা করা ও করানো ঈমানের অঙ্গ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"কিন্তু না (হে নবী!), আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের বিষয়ে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করবে এবং পরিপূর্ণরূপে শিরধার্য করে নিবে।" -নিসা ৬৫

আল্লাহ তাআলার শরীয়ত থেকে মুখ ফিরানো মুনাফিকের সিফাত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا • وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا •

“(হে নবী) আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবী করে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার উপর তারা ঈমান এনেছে; অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন তাকে বর্জন করে। বস্তুত শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে। যখন ওদের বলা হয়, ‘আস সে বিধানের দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং আস রাসূলের দিকে’, তখন আপনি মুনাফিকদের দেখবেন, ওরা আপনার থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।” -নিসা ৬০-৬১

মুমিনের জীবনের প্রতিটি বিষয় কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়াসালা করা অত্যাবশ্যক।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও- যদি তোমরা আল্লাহ

ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক। এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণতিও সর্বাপেক্ষা শুভ।” -নিসা ৫৯

আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়েছেন, কোনো বিষয়ে যেন আমরা শরীয়তের বিধান ছেড়ে কাফেরদের বানানো আইন-কানুনের দ্বারস্থ না হয়ে পড়ি।

ইরশাদ হচ্ছে,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“আপনার উপর আল্লাহ তাআলা যে আইন কানুন নাযিল করেছেন আপনি তাদের মাঝে তা দিয়ে বিচার ফায়াসালা করুন এবং কখনো তাদের প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরণ করবেন না। সতর্ক থাকবেন, যে আইন কানুন আল্লাহ তাআলা আপনার উপর নাযিল করেছেন, তার কোনো কিছু থেকে যেন তারা আপনাকে ফিরিয়ে ফেলতে না পারে।” -মায়েদা ৪৯

কিন্তু কালের পরিক্রমায় আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত প্রত্যাখ্যিত। এর বিপরীতে চলছে মানবরচিত কুফরি আইন কানুন। কিন্তু মুসলমান তো এ কুফরি আইন কানুনের দ্বারস্থ হতে পারে না। এসব কুফরি আইন দিয়ে বিচার করাতে যাওয়া একজন মুমিনের জন্য হারাম। এমনকি ক্ষেত্রে বিশেষে কুফরও।

তাহলে মুমিনরা এখন কি করবে? তাদের সমস্যাবলীর সমাধান কোন্ আইনে করাবে?

এ প্রশ্নটি প্রতিটি মুমিনকে পেরেশান করে রাখার কথা ছিল। বিশেষত সমাজের রাহবার উলামায়ে কেরামকে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এ নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যাথা নেই। যেন কুফরি কানুনই আমাদের জীবন বিধান। আল্লাহ তাআলার শরীয়ত যেন আমাদের দরকার নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

আমাদের আইম্মায়ে কেরাম পরিষ্কার বলে গেছেন, এ ধরনের

কুফরি বিধান দিয়ে বিচার করাতে যাওয়া ঈমান পরিপন্থী।

ইবনে কাসির রহ. (৭৭৪হি.) এর ফতোয়া তো আমাদের সকলের জানা-

فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. اهـ

"যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ সুদৃঢ় শরীয়ত ছেড়ে অন্য কোনো রহিত শরীয়তের নিকট বিচারপ্রার্থী হবে সে কাফের হয়ে যাবে; তাহলে ঐ ব্যক্তির কি বিধান হতে পারে যে ইয়াসিকের নিকট বিচারপ্রার্থী হয় এবং তাকে শরীয়তের উপর অগ্রগণ্য রাখে? যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে সকল মুসলমানের ঐক্যমতে কাফের হয়ে যাবে।" -আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১৩/১৩৯

অতএব, মুসলমানদের ফরয দায়িত্ব- আপন শরীয়ত অনুযায়ী বিচারাচারের ব্যবস্থা করা। আইম্মায়ে কেরাম এ জন্য

নিম্নোক্ত দু’টি ব্যবস্থাপনা বাতলিয়েছেন:

প্রথমত: কাফের-মুরতাদদের থেকে বলে কয়ে হলেও মুসলমানরা নিজেদের জন্য পারস্পরিক সম্মতিতে একজন মুসলিম প্রশাসক নিয়োগ দেবে। তিনি মুসলমানদের বিচারাচারের জন্য কাযি নিযুক্ত করবেন, কিংবা নিজেই শরীয়ত অনুযায়ী বিচারাচার করে দেবেন।

দ্বিতীয়ত: প্রশাসক নিয়োগ সম্ভব না হলে মুসলমানরা দখলদার কাফের-মুরতাদদের থেকে নিজেদের বিচারাচারের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে একজন কাযি নিয়োগের অনুমতি নেবে। এরপর তাদের পারস্পরিক সম্মতিতে একজনকে কাযি নিযুক্ত করবে। কাযি সাহেব তাদের মাঝে শরীয়ত অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে দেবেন।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৫২হি.) বলেন,

وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الآن وبلنسية وبلاد الحبشة وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى

قاضيا أو يكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا لهم إماما يصلي بهم الجمعة. اهـ

“যদি সুলতানও না থাকে এবং এমন কেউও না থাকে যার পক্ষ থেকে কাযি নিযুক্তি বৈধ- যেমনটা বর্তমানে কিছু মুসলিম ভূমিতে বিরাজ করছে, যেগুলোতে কাফেররা দখলদারিত্ব বসিয়েছে এবং মালের বিনিময়ে মুসলিমদের থাকতে দিচ্ছে। যেমন, বর্তমান মাগরিবের করডোবা, ভ্যালেন্সিয়া এবং (আফ্রিকার) হাবশা ভূমি- তাহলে সেখানকার মুসলমানদের ফরয দায়িত্ব হলো, সকলে মিলে একজনকে তাদের প্রশাসক বানিয়ে নেবে। এরপর তিনি একজনকে কাজি নিয়োগ দেবেন, কিংবা তিনি নিজেই তাদের বিচারাচার মীমাংসা করে দেবেন। তদ্রূপ (তাদের আরেকটা ফরয দায়িত্ব হলো) জুমআর জন্য একজন ইমাম নিয়োগ করে নেবে, যিনি তাদের নিয়ে জুমআ আদায় করবেন।” -ফাতহুল কাদির ৭/২৬৪

ইবনুল হুমাম রহ. তিনটি মুসলিম ভূমির উদাহরণ দিয়েছেন:

ক. করডোবা খ. ভ্যালেন্সিয়া গ. হাবশা।

এগুলো নাসারাদের করতলগত হয়ে গিয়েছিল ততদিনে। তখন মুসলমানদের করণীয় বলেছেন,

- সকলে মিলে একজন মুসলিমকে তাদের শাসক বানিয়ে নেবে। কারণ শাসক ছাড়া মুসলমানরা চলতে পারবে না। এরপর উক্ত শাসক কাউকে কাযি নিয়োগ দেবেন, কিংবা নিজেই শরীয়ত মতে বিচারাচার করে দেবেন।

- জুমআর জন্য একজন ইমাম নিয়োগ দেবে।

কিন্তু যদি এমন হয় যে, মুসলিম শাসক নিয়োগ দেয়ার অনুমতি কাফেররা দিচ্ছে না, তাহলে কি করণীয়?

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২হি.) ফাতাওয়া তাতারখানিয়া থেকে বর্ণনা করেন,

وأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين، فيجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما منهم اهـ

“কাফেরদের করতলগত ঐসব ভূমি যেগুলোর শাসক স্বয়ং কাফেররাই, সেগুলোতেও মুসলিমদের জুমআ ও ঈদ আদায় সহীহ হবে। (কাফেররা যাকে কাযি নিয়োগ দেবে) মুসলমানদের পরস্পরের সম্মতি হলে (উক্ত) কাযি শরয়ী কাযিতে পরিণত হবেন। তবে মুসলমানদের ফরয দায়িত্ব হলো, তাদের থেকে একজন মুসলিম শাসক নিয়োগের প্রচেষ্টা করা।” –রদ্দুর মুহতার ৫/৩৬৯

অর্থাৎ মুসলিম শাসক নিয়োগের অনুমতি না হলে অন্তত কাফেরদের কাছে একজন মুসলিম কাযি নিয়োগের আবেদন করবে। কাফেররা নিয়োগ দিলে সে নিয়োগ সহীহ নয়। তাদের নিয়োগের দ্বারা কেউ কাযি হবে না। তবে তারা নিয়োগ দেয়ার পর মুসলমানরা যখন তাকে মেনে নেবে, তখন তাদের পরস্পরের সম্মতি থাকার কারণে উক্ত নিয়োগকৃত কাযি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কাযি হয়ে যাবেন। তার বিচার ফায়াসালা সব সহীহ হবে এবং মানতে হবে। পাশাপাশি মুসলমানদের ফরয দায়িত্ব থেকে যাবে একজন মুসলিম শাসক নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

মুহতারাম পাঠক! কুফরি আইনের দ্বারস্থ হওয়ার অনুমতি কোন অবস্থাতেই নেই। কাফেরদের থেকে বলে কয়ে হলেও একজন মুসলিম কাযি নিয়োগ দেয়া জরুরী, যিনি শরীয়ত মতে মুসলমানদের সকল সমস্যা ও বাদানুবাদের সমাধান দেবেন। নিকাহ, তালাক, মুআমালা, লেন-দেন সব কিছু শরীয়ত মতে পরিচালনা করবেন।

তৃতীয় ব্যবস্থা সালিশ

কাফের পক্ষ যদি কোনো কাযি নিযুক্তির অনুমতিও না দেয়, তাহলে সর্বশেষ শরীয়ত আরেকটি দরজা খোলা রেখেছে, যাকে ফিকহের ভাষায় বলে التحكيم তথা সালিশি ব্যবস্থা। মুসলমানদের কোনো সমস্যা বা বাদানুবাদ দেখা দিলে বাদি বিবাদি উভয় পক্ষ মিলে একজন মুসলিমকে সালিশ তথা বিচারক নির্ধারণ করবে। তিনি তাদের মাঝে শরীয়ত মতে বিচার ফায়াসালা করে দেবেন। এ সালিশি ব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রেও সহীহ আছে। যোগ্য বড় আলেম না পাওয়া গেলে অন্তত তালিবুল ইলম দিয়েও কাজ চালানো যাবে। যে বিষয়ে ফায়াসালা দেবে সে বিষয়ের ইলম থাকলেই যথেষ্ট।

সাহাবায়ে কেরামও এ পদ্ধতিতে নিজেদের অনেক বিষয় মীমাংসা করে নিতেন, কাযির দরবারে যেতেন না। অপারগতার সময়ে সর্বশষ এ অবলম্বনটি গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নেই।

নাসাফি রহ. (৭১০হি.) বলেন,

حكّما رجلًا ليحكم بينهما فحكم ببيّنةٍ أو إقرارٍ أو نكولٍ ... صحّ لو صلح المحكّم قاضيًا ولكلّ واحدٍ من المحكّمين أن يرجع قبل حكمه، فإن حكم لزمهما. اهـ

"দু'জনে মিলে তৃতীয় একজনকে সালিশ নির্ধারণ করলো যেন তিনি তাদের উভয়ের মাঝে ফায়সালা করে দেন। যদি তিনি কাযি হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হন এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ, স্বীকারোক্তি বা কসম করতে অস্বীকৃতির ভিত্তিতে ফায়সালা দেন: তাহলে তা সহীহ আছে। সালিশ ফায়সালা দেয়ার আগ পর্যন্ত সালিশ নির্ধারণকারী দু'জনের প্রত্যেকেরই ফিরে যাওয়ার অধিকার থাকবে। কিন্তু যখন তিনি ফায়সালা দিয়ে দেবেন, তখন তা তাদের উপর অবশ্যম্ভাবীভাবে বর্তিয়ে যাবে।" -কানযুদ দাকায়িক ৪৬৫

অর্থাৎ তখন আর না মানার কোন সুযোগ থাকবে না। না মানলে গুনাহগার হবে। সালিশের ক্ষমতা থাকলে জোর করে মানাতে বাধ্য করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, কাযি হওয়ার যোগ্যতা দ্বারা উদ্দেশ্য- সুস্থমস্তিষ্কবিশিষ্ট স্বাধীন ও বালেগ মুসলমান হওয়া।

মুহতারাম পাঠক! যেকোনো ভাবেই হোক, মুসলমানদের নিজেদের বিচারাচার শরীয়ত মতেই করতে হবে। এতে কোন ছাড় নেই। কুফরি বিধান দিয়ে কুফরি আদালতে বিচার করানোর কোনো বৈধতা নেই। এজন্য মুসলিমদের অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব- তাগুত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হলেও নিজেদের বিচারাচারের জন্য শরয়ী কাযি নিয়োগ দেয়া। সম্ভব না হলে অন্তত মুসলিম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বা সালিশের মাধ্যমে নিজেদের বিষয়াশয় শরীয়ত মতে ফায়াসালা করিয়ে নেয়া। তাগুতের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কোনো বৈধতা নেই। এ দায়িত্ব সর্বপ্রথম বর্তাবে সমাজের উলামা শ্রেণীর উপর। তারা জনগণকে এ ফরয সম্পর্কে

অবগত করবে। কাযির মাধ্যমেই হোক বা পঞ্চায়েত বা সালিশের মাধ্যমেই হোক শরয়ী বিচারের ব্যবস্থা করবে। কোনো অবস্থায়ই তাগুতের আদালতে যাবে না। আবার মুসলমানদের বিচারব্যবস্থাহীনও ছেড়ে রাখবে না।

আফসোস! আমাদের উলামা সমাজ উদাসীনতার ঘুমে বিভোর। এখন পর্যন্ত উলামাদেরকে এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখিনি। মনে হয় যেন এটি আমাদের দায়িত্বের আওতায়ই পড়ে না। এটি যে একটি ফরয- বরং ঈমানের অংশ- এ কথাটি যেন আলেম সমাজ জানেও না। নিজ নিজ মাদ্রাসা, খানকাহ আর মসজিদ নিয়ে সবাই পড়ে আছে। আল্লাহ তাআলার শরীয়ত নিয়ে কোনো ফিকিরই দেখা যাচ্ছে না। তাগুতের কুফরি আদালতে মুসলিমদের জনস্রোত। উলামাদের নীরবতা দেখে মনে হচ্ছে, এতে কোনো সমস্যা নেই। এভাবে হাজারো লাখো মুসলমান হারামে লিপ্ত হচ্ছে। আর উলামায়ে কেরাম নীরব ভঙ্গিতে এর অনুমোদন দিচ্ছেন। যদি হলফ করে বলি, আল্লাহ তাআলা অন্তত এ কারণে হলেও উলামাদের পাকড়াও করবেন, আশাকরি আমার হলফ মিথ্যে হবে না। আহ! আমার কথাগুলো যদি উলামাদের কানে একটু আঘাত হানতো।

ভাইদের কাছে আবেদন থাকবে, আমার এ কথাগুলো আপনারা উলামাদের কানে পৌঁছে দিন। অন্তত প্রশ্ন রাখুন, আল্লাহ তাআলার শরীয়ত মতে বিচার ফায়সালার ব্যবস্থা করা আমাদের ফরয কি ফরয না? সম্ভব না হলে অন্তত পঞ্চায়েত সালিশের মাধ্যমে হলেও ফরয কি'না? আশাকরি কিছু না কিছু মানুষের ঘুম ভাঙবে। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দিন। আমীন। ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

৬১.ব্রাহ্মণের মুখে কালিমার বুলি: দোহা চুক্তি নয়, কুরআন সুন্নাহ মতে কথা বলুন

সংবাদটা পড়ে না হেসে পারলাম না। কাতারে বেশ কিছু দিন যাবত আন্তঃআফগান আলোচনা চলছে, যেটা হয়তো আপনারা সকলে জানেন। আমেরিকার গোলাম মুরতাদ আশরাফ গণির প্রতিনিধিরা না'কি ইদানিং মিডিয়াতে সুর তুলছে, **দোহা চুক্তি নয়, তালেবানরা আমাদের সাথে কুরআন সুন্নাহ মতে কথা বলুক।**

কত সুন্দর প্রস্তাব: ‘কুরআন সুন্নাহ মতে কথা বলুক।’ চোরের মুখে ধর্মের বুলি।

যারা উনিশ বছর যাবত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে, কুফরের পক্ষে দালালী করে আসছে, তারা আজ হঠাৎ এত বড় সুফি কিভাবে হয়ে গেল? কেন আজ দাদাবাবুর মাথায় টুপি?

কারণ, তারা যে আজ বড় বিপাকে। চোখে যে শুধু সর্ষে ফুল। পায়ের নিচে যে নেই মাটি।

আন্তর্জাতিক আগ্রাসন থেকে আজাদির জন্য তালেবানরা আমেরিকার সাথে গত উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি দোহায় এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। তালেবানদের ভাষায়:

جس کا ہر لفظ اسلام کے مقدس دین کے مطابق ہے اور جس کا منبع قرآن و حدیث ہے، اور جو غیر ملکی قبضے کو ختم کرتا ہے۔

“যে চুক্তির প্রতিটি শব্দ পবিত্র ধর্ম ইসলাম সমর্থিত। যার উৎস কুরআন ও হাদিস এবং যার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের পরিসমাপ্তি ঘটছে।” - http://alemarahurdu.net/?p=40141

এ দোহা চুক্তির একটি ধারা ছিল, অচিরেই আফগানরা নিজেরা আলোচনায় বসে আন্তঃআফগান সমস্যার সমধান করবে। সে হিসেবে তালেবানরা আফগানিস্তানের বড় বড় নেতৃবৃন্দ, যাদের উপর আফগান জনগণের আস্থা আছে, তাদের নিয়ে দোহায় আলোচনায় বসেছে। সে আলোচনায় একটা পক্ষ হিসেবে কাবুল সরকারের প্রতিনিধিরাও আছে।

যেহেতু এ আলোচনা মূলত আমেরিকার সাথে কৃত দোহা চুক্তিরই অংশ, তাই দোহা চুক্তিকে সামনে রেখেই আলোচনা সামনে আগানো হচ্ছে। কিন্তু আশরাফ গণিরা যখন দেখছে, দোহা চুক্তি অনুযায়ী প্রভু আমেরিকারা আফগান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য, তাদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আমেরিকা চলে গেলে তো তাদের ভরসার কেউ থাকবে না। সামনে নির্ঘাত মৃত্যু। গত উনিশ বছরের হিসাব নিকাশ জাতি

পাই পাই করে বুঝে নেবে।

এই ফাঁটা বাশের চিপায় পড়ে এখন শোরগুল উঠাচ্ছে: কিসের দোহা চুক্তি! দোহা চুক্তি বাদ দিন। কুরআন সুন্নাহ মতে কথা বলুন।

কথায় আছে, বিড়াল কি আর কম ঠেলায় গাছে উঠে!!

মূল আর্টিক্যাল (http://alemarahurdu.net/?p=40141):

امارت اسلامیہ قرآن و سنت کو ایک نعرہ نہیں بلکہ اس پر عمل درآمد چاہتی ہے

Date: 2020-10-12

آج کی بات

حال ہی میں کابل کی بکھری ہوئی شرمندہ انتظامیہ کے کارکنوں نے میڈیا میں ہلچل مچا دی ہے، جس میں انہوں

نے طالبان سے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان سے بات چیت شروع کرنے کی تجویز دی ہے، دوحہ معاہدے کے تحت نہیں۔

کابل انتظامیہ کے اسلام دشمن اور افغان دشمن حکام قرآن و سنت پر اس وجہ سے اصرار نہیں کرتے ہیں کہ وہ واقعی بھی الہی احکامات اور نبوی ہدایات سے دلی محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ دوحہ معاہدے کو خراب اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ہر لفظ اسلام کے مقدس دین کے مطابق ہے اور جس کا منبع قرآن و حدیث ہے، اور جو غیر ملکی قبضے کو ختم کرتا ہے۔ اور جارحیت کی کھوکھ سے جنم لینے والی کرپٹ اور بدعنوان حکومت کو مزید کچھ دن مہلت ملے۔
اگر اسلام ، قرآن و حدیث اشرف غنی اور ان کے حکام کے لئے اتنے اہم ہوتے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک حقیقی اسلامی نظام نافذ کرتے، شرعی حدود اور الہی احکامات کو عملی جامہ پہناتے، ریاستی اداروں اور محکموں کو بدعنوانی سے پاک کرتے، اس وقت افغان عوام اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ وہ قرآن اور سنت کو نہ صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر بھی اس کا نفاذ چاہتے ہیں۔
!! لیکن ایسا نہیں ہے
کیونکہ اشرف غنی خود ہی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ نیویارک ، واشنگٹن اور یورپ کے مفادات کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں۔
کابل انتظامیہ کے حکام نے پہلے بھی قابض افواج کے انخلا کی مخالفت کی تھی اور اب بھی کررہے ہیں اور وہ کوشش

کررہے ہیں کہ امریکی اور نیٹو فورسز کو افغانستان سے نہ نکلیں۔
یہی واحد وجہ ہے کہ امارت اسلامیہ دوحہ معاہدے پر اصرار کرتی ہے، کیونکہ اس میں افغانستان کے جاری بحران کی دو بڑی جہتیں ہیں، ایک بیرونی اور دوسری داخلی ، جن کو حل کرنے کے مناسب طریقے کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس طرح بیرونی جہت کو معقول انداز سے حل کر دیا، اسی طرح ملکی جہت جو بین الافغان مذاکرات ہیں، کو باوقار اور معقول طریقے سے حل کیا جائے گا۔
لہذا اگر امارت اسلامیہ دوحہ معاہدے کے علاوہ کوئی اور جرگہ یا فریم ورک قبول کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امارت اسلامیہ "غیر ملکی قبضہ کاروں" کے ساتھ طے پانے والے معاہدے سے دستبردار ہو رہی ہے اور یہ اقدام بلا شبہ افغانستان کے مسائل حل کرنے کے بجائے مزید مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور افغان عوام کی تاریخی فتح کو صدمہ پہنچاتا ہے۔
امارت اسلامیہ نے تمام افغان جماعتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات کا یہ سنہری موقع ضائع نہ کریں، دوحہ معاہدے کو کمزور کرنے اور رکاوٹ بنانے کے بجائے اس کو مزید مضبوط بنائیں۔

৬২.ভাই-চাচার বদলে মামা- আমরা এমন নির্লজ্জ কেন?

ড্রাইভার হেল্পারদেরকে এখন মামা বলা হয়। আগে ভাই/চাচা বলা হতো। এখন মামা বলা হচ্ছে। এ এক শয়তানি। মামার মধ্যে নারীর গন্ধ আছে। এ জন্য কৌশলে এর প্রচলন ঘটানো হয়েছে। ভাই/চাচার মধ্যে এমনটি নেই, তাই বাদ দেয়া হচ্ছে।

কুরআন হাদিসের ভাষায় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের এমনটিই শিখিয়েছেন। কুরআন ও হাদিসে অসংখ্যবার এ ভাই ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি এসেছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই।" -হুজরাত ১০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

المسلم أخو المسلم

“এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই।” -সহীহ বুখারি ২৩১০, সহীহ মুসলিম ৬৭৪৩

তাই সমবয়সী হলে ভাই বলে সম্বোধন করবে। বাবার বয়সী হলে চাচা বলে সম্বোধন করবে। এটা শুধু ইসলামেরই শিক্ষা নয়, জাহিলি যামানাতেও মানুষ এভাবেই সম্বোধন করতো। কিন্তু আজ নব্য জাহিলিয়্যাত সকল জাহিলিয়্যাতকে হার মানিয়েছে।

কুরআনে কারীমে মহিলাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের নির্দেশ এসেছে। হাদিসে এসেছে, মহিলারা গোপন থাকার বস্তু, প্রকাশ হওয়ার বস্তু নয়। এজন্য একান্ত দরকার না পড়লে কুরআনে কারীমে মহিলাদের সম্বোধন করে কিছু বলা হয়নি, তাদের নামও নেয়া হয়নি। একান্ত যেখানে না নিলে হয় না সেখানেই কেবল মহিলাদের নাম নেয়া হয়েছে বা আলোচনা এসেছে। এমনই সতর্কতা শরীয়ত অবলম্বন করেছে। কিন্তু

আমরা মুসলমানরা আজ আমাদের মা-বোনদের হাটে-ঘাটে বিকিয়ে দিয়েছি। শেষ একটু হায়া-শরম যা ছিল তাও শেষ করে দেয়া হলো। এখন আর ভাই/চাচা নয়, মামা। কারণ, মামা হতে হয় মায়ের মধ্যস্থতায় আর ভাই/চাচা হতো বাপের মধ্যস্থতায়। এজন্যই ইসলামী শব্দ আর ইসলামী ত্বরিকাটা তুলে দেয়া হচ্ছে। আর আমরাও লুফে নিচ্ছি সাগ্রহে। কোথায় গেল আমাদের লজ্জা-শরম!

৬৩.ভাইয়ের দুঃখে দিল কাঁদে না- আমি কেমন ঈমানদার

জিহাদের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু জিহাদ মানে কি আমরা ফিকির করেছি কি? ফিকির করলে বুঝবো, জিহাদ মানে আমার ভাইয়ের জন্য জীবন দেয়া। আমার মুসলিম ভাইয়ের জন্য। চিন্তা করুন, দুনিয়ার এক প্রান্তে আমার কিছু মুসলিম ভাই বোন নির্যাতিত। আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্ধারের জন্য আমার উপর জিহাদ ফরয করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না আল্লাহর রাস্তায় এবং ঐ সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য? যারা (ফরিয়াদ করে) বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে নিন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং নিযুক্ত করে দিন আপনার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যকারী।" -নিসা ৭৫

আয়াতে কারীমাটিতে আবারও ফিকির করুন। নির্যাতিত কে? আমিও নই, আমার পরিবারও নয়, আমার বংশও নয়। এমনকি আমার অধিবাস ভূমিরও কেউ নয়। এমন কিছু লোক যাদেরকে আমি কখনও দেখিনি। শুধু এতটুকু জানি যে, তারা মুসলিম। আর এতটুকু যে, তারা নির্যাতিত। আল্লাহ তাআলা কি বলছেন? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তাদের উদ্ধারের জন্য কিতাল কর। আর আমি কেন করছি না এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে তিরস্কার করছেন। আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করছেন। জবাবদিহি চাচ্ছেন কেন করছি না।

আল্লাহ তাআলা কি শব্দটি ব্যবহার করেছেন দেখেছেন তো? وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ- তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না?

কিতাল মানে কি? আমি তাকে কতল করতে চাই, সে আমাকে কতল করতে চায়। এর নাম কিতাল। জীবন দেয়া নেয়ার খেলা। আল্লাহ তাআলা আমাকে ধমক দিচ্ছেন, কেন আমি আমার মুসলিম ভাইয়ের জন্য আমার প্রাণটা দিয়ে দেয়ার খেলায় নামছি না। দেখুন! শুধু বয়ান বক্তৃতা না কিন্তু। জীবন দেয়া নেয়ার খেলা। কাদের জন্য? কিছু মুসলিম ভাই বোনের জন্য। যাদেরকে আমি কখনও দেখিনি। যাদেরকে আমি চিনি না। আমার রব তাদের চেনেন। আমার রবের উপর তাদের ঈমান আছে। আমার রবের সাথে তাদের বন্ধুত্ব আছে। তারা আমার রবকে ভালবাসেন। আমার রবও তাদের ভালবাসেন। আমার রবের সেই প্রিয় বন্ধুদের উদ্ধারের জন্য তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন। শুধু বয়ান বক্তৃতা নয়। শুধু পোস্ট কলম নয়। জীবন দেয়া আর জীবন নেয়ার।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

“আল্লাহ তাআলা যারা ঈমান এনেছে তাদের বন্ধু।” –বাকারা ২৫৭

এবার আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি আল্লাহকে ভালবাসি? যদি ভালবেসে থাকি তাহলে তার বন্ধুদেরকেও ভালবাসতে হবে। নয়তো আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব থাকবে না। আমার বন্ধুদের যে ভালবাসে না, তাদের বিপদে যে এগিয়ে আসে না, সে আমার বন্ধু হতে পারে না। যদি আমি ঈমানের দাবিতে সত্য হয়ে থাকি তাহলে আল্লাহর বন্ধুদের ভালবাসতে হবে। তাদের বিপদে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর সাথে যেমন বন্ধুত্ব তাদের সাথেও বন্ধুত্ব। তারাও আমার বন্ধু। তাই সকল মুমিন আমার বন্ধু। আমি তাদের চিনি আর না চিনি তারা আমার বন্ধু। এ বন্ধুত্ব আল্লাহ তাআলার জন্য। এ বন্ধুত্ব আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"মুমিন নর-নারীরা একে অপরের বন্ধু।" -তাওবা ৭১

আরো ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই।" -হুজরাত ১০

কেমন বন্ধু আর কেমন ভাই? তাদের সুখ আমার সুখ। তাদের দুঃখ আমার দুঃখ। তাদের পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার কলিজায় আঘাত লাগে। তাদের গায়ে জ্বর আসলে আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চিত্রটিই তুলে ধরেছেন,

مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

"পরস্পর ভালবাসা, রহমত ও সাহায্যের বেলায় মুমিনদের অবস্থা একটি দেহের মতো। তার কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা

দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।” -সহীহ বুখারি ৫৬৬৫, সহীহ মুসলিম ৬৭৫১

গোটা মুসলিম জাতি এক দেহ। আমার নিজের দেহ নিজের প্রাণ আমার কাছে যেমন প্রিয় তারাও আমার কাছে এমনই প্রিয়। আমার চোখে ব্যথা হলে যেমন ঘুম আসে না, কোনো মুমিনের গায়ে আঘাত আসলেও তেমনি আমার ঘুম আসে না। যেন তারাই আমি আমিই তারা। তারা ভিন্ন কেউ নয় আমি ভিন্ন কেউ নই। এক দেহ এক প্রাণ।

আশ্চর্যের বিষয়, দুনিয়ার কোথাও একটা কাফেরের উপর আঘাত আসলে সারা দুনিয়ার কুফফার গোষ্ঠীর হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। কুফরের বাঁধন তাদেরকে এক ডোরে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু আমি মুমিন, আমার মুমিন ভাইয়ের ব্যথায় আমার ব্যথা নেই। এই আমার ঈমানের হাল।

আল্লাহর কসম! আমার ভাইয়ের পায়ের কাঁটা আমার গায়ে

ব্যথা না দিলে আমি মুমিন হতে পারবো না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পরিষ্কার,

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا.

“যতক্ষণ তোমরা মুমিন না হবে, জান্নাতে যেতে পারবে না। আর মুমিন ততক্ষণ হতে পারবে না, যতক্ষণ একে অপরকে ভাল না বাসবে।” –সহীহ মুসলিম ২০৩

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

“ঐ জাতে পাকের কসম যার হাতে আমার জান, কোনো বান্দা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা তার নিজের জন্য করে।” –সহীহ মুসলিম ১৮০

আমি ঈমানের দাবিদার, কিন্তু আমার ভাইয়ের দুঃখে আমার দিল কাঁদে না, বুঝতে হবে আমার ঈমানে যথেষ্ট কমতি আছে।

আজ যদি আমি বন্দি হতাম? আমার ভাইকে যদি ধরে নেয়া হতো? কিংবা আমার বোনকে যদি তুলে নেয়া হতো? তাহলে আমার কি হাল হতো? আজ আরাকান-কাশ্মির-হিন্দের ভাই বোনদের জন্য আমার দিল কাঁদে না। বুঝতে হবে আমার ঈমান দুর্বল হয়ে আছে। যতটুকু আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ততটুকু ঈমান আমার হাসিল হয়নি। আল্লাহ তাআলার মহব্বতের দাবিতে আমি এখনও পূর্ণ সত্যবাদি নই।

আমি অনেক বড় কেউ হতে পারি, কিন্তু আল্লাহ তাআলার দরবারে আমি এখনও অপরাধী। এ অপরাধের খাতা থেকে নাম কাটাবার একটাই পথ, ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানো। আমার জান নিয়ে। আমার মাল নিয়ে। প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে। পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনকে বিদায় জানিয়ে হিজরত করে। অন্যথায় রাব্বুল আলামিনের সেই ওয়াদার অপেক্ষায় থাকি, যে ওয়াদা তিনি করেছেন- আর আল্লাহ তার ওয়াদায় ব্যতিক্রম করেন না-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“বলুন (হে নবী!) তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ- যদি (এগুলো) তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাআলার (আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।” -তাওবা ২৪

***

كيف القرار وكيف يهدأ مسلم ... والمسلمات مع العدو المعتدي

الضاربات خدودهن برنة ... الداعيات نبيهن محمد

القائلات إذا خشين فضيحة ... جهد المقالة ليتنا لم نولد

ما تستطيع وما لها من حيلة ... إلا التستر من أخيها باليد

কিভাবে স্থির থাকা যায়? কিভাবে কোনো মুসলিম শান্তিতে থাকতে পারে? যেখানে মুসলিম নারীরা সীমালঙ্ঘনকারী শত্রুদের হাতে বন্দী?!

তারা তাদের নবী মুহাম্মাদকে ডেকে ডেকে মুখ চাপড়িয়ে রোনাজারি করে কাঁদছে।

সম্ভ্রমহানির ভয়ে যখন তারা শঙ্কিত, শত আফসোস করে বলছে, হায়! যদি আমাদের জন্মই না হত!

নেই তার কোন শক্তি, নেই কোন উপায়। হাত ঠেকিয়ে ভাই থেকে মুখ লুকানো ছাড়া কিছুই নেই করার।

***

৬৪.ভাস্কর্য ইস্যু এবং ইস্তিহলালের সেই সংশয়টি

আপনারা সবাই হয়তো শুনে আসছেন এতোদিন যে, শরীয়তের বিধানকে অপছন্দ বা অস্বীকার না করলে কাফের হবে না। শাসকরা এটা করে না। তারা শরীয়তের বিধানকে স্বীকার করে, পছন্দও করে। কিন্তু প্রায়োগিক জীবনে আমল করে না। ভিন্ন আইন দিয়ে রাষ্ট্র চালায়।

কথাটা হয়তো সবাই শুনে থাকবেন। এটা মূলত ইরজায়ি আকিদা। কুফরকে সব সময় ইস্তিহলালের সাথে শর্তযুক্ত করা ইরজা ও জাহমিয়াত।

কুফরি কানুন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা স্বয়ং কুফর। এর জন্য ইস্তিহলাল শর্ত নয়। তবুও আপনারা ইস্তিহলালের শর্তটা শুনে আসছেন আজীবন। কিন্তু এবারের ভাস্কর্য ইস্যু হয়তো ইস্তিহলালের চেহারা কিছুটা প্রকাশ করেছে। বরং বলতে গেলে ভয়ানক চেহারা প্রকাশ করেছে। সারা দেশের আলেম উলামারা ঐক্যবদ্ধভাবে ফতোয়া দিয়ে, আন্দোলন করেও সরকার আর সরকারের অনুসারীদের বুঝাতে সক্ষম হলো না যে, ভাস্কর্য হারাম। যতই বুঝাচ্ছেন শুধু উল্টো দিকেই গড়াচ্ছে।

এখন আপনারা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন যে, সরকারপক্ষ ভাস্কর্য হালাল মনে করে?

জোচ্চুর না হলে কেউ পারবেন না। সকলের কাছেই পরিষ্কার, তারা ভাস্কর্য হালাল মনে করে। বরং আলেম উলামারা ভাস্কর্যকে হারাম বলায় তারা উলামাদের কি পরিমাণ অপমান

আর ভয়ানক রকমের গালিগালাজ করছে তা সবার নিকট স্পষ্ট।

এখন সরকারপক্ষের অবস্থান হলো, ভাস্কর্য হালাল। ভাস্কর্য হারাম এ কথা কুরআন সুন্নাহয় কোথাও নেই। যারা বলছে হারাম তারা মূর্খ। এরা ইসলামের দুশমন। এরা স্বার্থবাজ। স্বার্থের লোভে ঘুরিয়ে ফতোয়া দিচ্ছে। এরা সরকারকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করতে চায়।

আসলে ভাস্কর্য যে হারাম এটা তারা নিজেরাও জানে। তবে যদি বলে, ইসলামে হারাম হলেও আমরা সেটা মানি না- তাহলে সকলে স্পষ্ট বুঝে নেবে যে, এরা ইসলাম মানে না। এরা ইসলামদ্রোহী। তাই ঘুরিয়ে বলছে যে, ইসলামে হারামের কথা নেই। এটাই আসলে হাকিকত।

ভাস্কর্য থেকে কুফরি সংবিধান

আপনি কুফরি সংবিধানের শরীয়তবিরোধী বিধানের ক্ষেত্রেও

এ কথাটা বলতে পারেন যে, তারা জানে শরীয়তে চোরের হাত কাটতে হয়, যিনায় দোররা লাগাতে বা রজম করতে হয়। জানে ইসলামে মদ সুদ হারাম। কিন্তু এগুলো তারা অপছন্দ করে। তাই এগুলো পাল্টে কুফরি বিধান প্রতিস্থাপন করেছে। কেউ কেউ তো পরিষ্কারই বলছে, এগুলো সব মানবতাবিরোধী বিধান। এরা তো স্পষ্টই মুরতাদ।

আর অনেকে ঘুরিয়ে বলছে, সংবিধানে শরীয়ত বিরোধী কিছু নেই।

তার মানে, তারা শরীয়তের স্থলে যেসব কুফরি বিধান প্রতিস্থাপন করেছে সেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এগুলো শরীয়তবিরোধী নয়। আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে এগুলো দিয়ে রাষ্ট্রচালনাও শরীয়তে হালাল। এভাবে স্পষ্টই তারা শরীয়তের হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল জ্ঞান করছে। কিন্তু এরপরও আমরা বলে বেড়াচ্ছি, তাদের মধ্যে ইস্তিহলাল নেই।

আসলে প্রথম গ্রুপের মতো এরাও ইসলামের বিধান অপছন্দ করে। যুগের অনুপোযোগী মনে করে। কিন্তু পরিষ্কার বললে আবার জনসাধারণ ক্ষেপে যায় কি’না। সেই ভয়ে ঘুরিয়ে

বলছে। কিন্তু শেষমেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা কিন্তু একটাই, শরীয়তের বিধানকে অস্বীকার করা হচ্ছে। হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম মনে করা হচ্ছে। আর আমরা শুধু তাদের পক্ষে হুসনে জনের ভিত্তিতে উজরখাহি করেই যাচ্ছি: তাদের মধ্যে ইস্তিহলাল নেই।

ইস্তিহলাল নেই- কিভাবে সম্ভব?

ইস্তিহলাল তাদের কথা বার্তা থেকেই স্পষ্ট। এরপরও আপনি একটু চিন্তা করুন, একটা লোক আজীবন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। কোনোভাবেই ইসলাম কায়েম হতে দেবে না। যারা কায়েম করতে চাইবে তারা দুনিয়ার সবচে জঘন্য অপরাধী বলে গণ্য। আপনি কি এরপরও বলতে পারছেন, লোকটা ইসলাম বিদ্বেষী নয়? তাহলে দুশমনির আর কি মাত্রা দেখালে সে ইসলামবিদ্বেষী হবে?

আমি আপনাদের একটা মাসআলা শুনাই। হাসকাফি রহ. (১০৮৮হি.) বলেন,

وَلَوْ أَكَلَ عَمْدًا شُهْرَةً بِلَا عُذْرٍ يُقْتَلُ. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 413)

যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃত সুপ্রকাশ্যে আহার করবে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। -আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে মূদ্রিত): ২/৪১৩, কিতাবুস সাওম

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন,

قال الشرنبلالي صورتها: تعمد من لا عذر له الأكل جهارا يقتل؛ لأنه مستهزئ بالدين أو منكر لما ثبت منه بالضرورة ولا خلاف في حل قتله. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 414)

কোনো প্রকার উজর নেই এমন কোনো ব্যক্তি যদি সবার সামনে সুপ্রকাশ্যে ইচ্ছাকৃত আহার করে, তাহলে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। কারণ, সে হয়তো দ্বীন নিয়ে উপহাস করেছে, আর না হয় (ভিতরে ভিতরে) (সাওমের মতো) জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিধানকে অস্বীকার করে থাকে (যদিও মুখ ফুটে বলে না)। আর এমন লোককে হত্যা করা বৈধ হওয়ার

ব্যাপারে কোনোই দ্বিমত নেই। -রদ্দুল মুহতার: ২/৪১৩

সিন্ধি রহ. (১২৫৭হি.) যাহিদি রহ. (৬৫৮হি.) থেকে বর্ণনা করে বলেন,

الظاهر أن المراد القتل بالسيف. -طوالع الأنوار، كتاب الصوم، ص: 273، ت: عبد الغفار نور محمد، جامعة كراتشي

স্পষ্ট এটাই যে, (হুমকি ধমকি উদ্দেশ্য নয়, সরাসরি) তরবারি দ্বারা কতল করে দেয়া উদ্দেশ্য। -তাওয়ালিউল আনওয়ার, কিতাবুস সাওম: ২৭৩

অর্থাৎ কোনো প্রকার উজর না থাকা সত্ত্বেও রমযানের দিনের বেলায় এভাবে সবার সামনে প্রকাশ্যে দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে বসাকে আইম্মায়ে কেরাম কুফর গণ্য করেছেন। কারণ,

- হয়তো সে আসলে সাওম যে ফরয এটাকেই অস্বীকার করছে;
- কিংবা অস্বীকার না করলেও এভাবে খেয়ে দ্বীনের সাথে উপহাস করেছে।

স্পষ্ট যে, এ দু'টোর উভয়টিই কুফর। দ্বীনের বিধান অস্বীকার করা যেমন কুফর, স্বীকার করার পর তার যথাযথ তা'জিম না করে বরং উপহাস করা বা অবমাননা করাও কুফর। বরং এটি আরও জঘন্য কুফর।

মুহতারাম পাঠক, একটু চিন্তা করুন। এভাবে আহার করাই যদি আল্লাহর বিধান অস্বীকার বা উপহাস বলে গণ্য হয়, ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়, তাকে হত্যা করে দিতে হয়: তাহলে আপনারাই চিন্তা করুন, যারা আজীবন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, তারা কত ভয়ানক রকমের অবমাননাই না করছে! আর কত ভয়ানক রকমের কুফরিই না করছে!

এজন্য বিন বায ও ইবনে উসাইমিনের মতো আলেম, যারা ইস্তিহলাল ব্যতীত হুকুম বি গাইরি মা আনযালাল্লাহকে ইরতিদাদ মনে করেন না, তারাও বলেন, যদি ইসলামী শাসনের বিপরীতে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন শাসনব্যবস্থা চালু করে

–যেমনটা তাগুতরা করেছে- তাহলে তাদের মতে এটা ইস্তিহলাল বলে গণ্য। শাসক মুরতাদ হয়ে যাবে।

যেমন ইবনে উসাইমিন রহ. (১৪২১হি.) বলেন,

من لم يحكم بما انزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. -شرح ثلاثة الأصول للعثيمين ((ص: 158

যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞাবশত, আল্লাহর বিধানকে হেয় জ্ঞান করে, কিংবা ভিন্ন বিধানকে অধিক উপযোগী, অধিক উপকারী কিংবা শরয়ী বিধানের সমান সমান মনে করে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করা তরক করবে, সে দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত কাফের। এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত সেসব লোক, যারা ইসলামী আহকামের বিপরীত বিধি বিধান প্রণয়ন করে সেগুলোকে জীবনব্যবস্থারূপে গ্রহণ করে। কারণ, ইসলামী আহকামের বিপরীত ঐসব বিধি বিধান তারা তখনই প্রণয়ন করতে পেরেছে, যখন তাদের বিশ্বাস যে, এগুলো

অধিক উপকারী। কারণ, প্রতিটি মানুষের বিবেক কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া অবলিলায়ই বলবে যে, কোনো ব্যক্তি একটি জীবনব্যবস্থা ছেড়ে অন্য একটি জীবনব্যবস্থা তখনই গ্রহণ করতে পারে, যখন তার বিশ্বাস যে, এটি আগেরটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং আগেরটি অপূর্ণ ছিল। -শরহু সালাসাতিল উসূল: ১৫৮

মোটকথা, কওল ও ফেল থেকে শাসকরা স্পষ্ট মুরতাদ। কিন্তু আমরা শত বাহানা তুলে হাজারো উজর দাঁড় করিয়ে মুসলমান প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। যেখানে তারা নিজেরাই দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেছে বলছে, শুধু একান্ত ব্যক্তি জীবনের কয়েকটি ইস্যু ছাড়া বাকি কোথাও তারা ধর্মীয় আইন মানে না বলছে এবং মানাকে ফিতনা ও সম্প্রীতি নষ্টের কারণ বলে দিবারাত্রি ই’লান দিচ্ছে, তারপরও আমরা কতবড় সতর্কতা অবলম্বনকারী আর কতবড় বুযুর্গ যে, এমন কট্টর কাফেরদেরকেও মুসলিম বানিয়ে ফেলছি। আল্লাহ আমাদের মাফ করেন। সহীহ বুঝ দান করেন। আমীন।

৬৫.মক্কী যিন্দেগী এবং আমাদের বর্তমান দুর্বল অবস্থার মধ্যকার একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যবধান!

মক্কী যিন্দেগী এবং আমাদের বর্তমান দুর্বল অবস্থার মধ্যকার একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যবধান!

মক্কী যিন্দেগী নিয়ে ব্যাপক ফেতনা ছড়ানো হচ্ছে। বিশেষত তাবলীগ জামাতের মাঝে এ ফেতনা বেশি। তারা বলে থাকে, *'আমরা মক্কী যিন্দেগিতে অবস্থান করছি। মক্কী যিন্দেগিতে মুসলমানরা দুর্বল ছিল, তাই তাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়নি। তদ্রূপ, আজ আমরা দুর্বল। তাই আমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।'*

এই ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণই গলদ। মক্কী যিন্দেগী আর আমাদের বর্তমান অবস্থার মাঝে অনেক বড় ব্যবধান। মক্কী যিন্দেগিতে জিহাদ ফরয করা হয়নি, বরং এর অনুমতিও দেয়া হয়নি। তাই তখন জিহাদ নিয়ে ভাবার দরকার ছিল না। কিন্তু নামায ফরয ছিল, তাই নামায নিয়ে ভাবতে হত। প্রকাশ্যে নামায পড়লে কাফেরদের নজরে পড়বে আশঙ্কা থাকলে গোপনে হলেও পড়তে হতো। নামায ছাড়ার অবকাশ ছিল না। কিন্তু মদীনায় যখন জিহাদ ফরয করা হল, তখন থেকে নামাযের

ন্যায় জিহাদ নিয়েও ভাবতে হবে। আপাতত জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে, সামর্থ্য অর্জনের ফিকির করতে হবে। এখানেই ব্যবধানটা।

মক্কী যিন্দেগিতে জিহাদ যেহেতু ফরয ছিল না, তাই জিহাদের সামর্থ্য অর্জন ও ই'দাদের ফিকির সাহাবায়ে কেরামকে করতে হতো না। কিন্তু মদীনায় আসার পর যখন জিহাদ ফরয হল, তখন সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে- আমার উপর জিহাদ ফরয। যদি সামর্থ্যের অভাবে আপাতত জিহাদ করতে না পারি, তাহলে ফিকির করতে হবে- কিভাবে সামর্থ্য অর্জন করা যায়। অতএব, তখন থেকে ই'দাদের চিন্তা ও ফরজিয়্যাতের আকীদা সর্বাবস্থায় রাখতে হবে।

যেমন- একজন লোক দারুল হরবে মুসলমান হল। সে জানে, নামায ফরয। কিন্তু দারুল হরবে চতুর্দিকে কাফের। নামায পড়তে দেখলে জীবনের রক্ষা নাই। তখন সে আপাতত নামায ছেড়ে দিতে পারবে। কিন্তু তাকে মনে রাখতে হবে- তার উপর নামায ফরয। এই ফরয আদায়ের ফিকির করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে। কিভাবে, কোথায় গেলে বা কোন সময়ে কাফেরদের চক্ষু ফাঁকি দিয়ে নামায আদায় করা যায়- সে চেষ্টা

তাকে করতে হবে। আপাতত সুযোগ নেই বলে বসে থাকার অনুমতি নেই। জিহাদের অবস্থাও তেমনি। সর্বাবস্থায় তার ফরজিয়্যাতের আকীদা রাখতে হবে। সামর্থ্য না থাকলে ই'দাদ যে ফরয তা স্মরণ রাখতে হবে। ই'দাদের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হবে। বসে থাকার সুযোগ নেই। কিন্তু মক্কী যিন্দেগিতে যখন জিহাদ ফরয ছিল না, তখনকার অবস্থা সম্পূর্ণই ভিন্ন। কাজেই, মক্কী যিন্দেগির বাহানা ধরে জিহাদ তরক করার সুযোগ নেই। অতএব, হে ভাই! সাবধান! ধোঁকায় যেন না পড়ি।

৬৬.মজলিসে শূরায় মহিলা সদস্য থাকতে পারবে কি?- তাকি উসমানী সাহেবের বিভ্রান্তি

ইমামুল মুসলিমীনের একটি বড় দায়িত্ব হল, পরামর্শ করে কাজ করা। এ ব্যাপারে কুরআন হাদিসে অনেক তারগীব এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় পরামর্শ করে কাজ করতেন। ছোট-খাট বিষয়েও পরামর্শ করতেন। সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্যও এমনই ছিল। এটিই মুমিনদের সিফাত।

অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বা খুলাফায়ে রাশেদার নির্দিষ্ট সদস্যবিশিষ্ট নির্ধারিত কোন বোর্ড ছিল না। যখন দরকার পড়তো বড় বড় সাহাবায়ে কেরামকে একত্র করে পরামর্শ করতেন। নির্দিষ্ট কোন মজলিসে শূরা ছিল না। যাহোক, এখন যদি আমীরুল মু'মিন পরামর্শের জন্য কোনো বোর্ড তথা মজলিসে শূরা গঠন করেন, তাহলে মহিলাদেরকে সে বোর্ডের নিয়মতান্ত্রিক সদস্য রাখা যাবে কি'না যে: শূরার তারিখে মহিলারাও উপস্থিত হবে, তাদের কাছেও পরামর্শ চাওয়া হবে এবং তাদের পরামর্শ মোতাবেক কাজও করা হবে?

যদি আমরা শরীয়তের উসূল ও মূলনীতির দিকে তাকাই, তাহলে এটার বৈধতা পাওয়ার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। যেমন,

এক.

মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশ হল,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

“তোমরা তোমাদের নিজ গৃহে অবস্থান করবে।”- আহযাব ৩৩

মজলিসে শূরায় শরীক হওয়ার জন্য মহিলারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানী, জেলা শহর বা যেখানে মজলিসে শূরা বসবে সেখানে উপস্থিত হতে যাওয়া বিনা দরকারে এ আয়াতের বিরুদ্ধাচরণ। অধিকন্তু ফিতনার আশঙ্কায় যেখানে মসজিদে যেতেও মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে দূর-দূরান্ত থেকে পুরুষদের সাথে এসে এক মজলিসে শরীক হওয়ার অনুমতি কিভাবে হবে? বরং মহিলারা ঘরে থাকবে, ঘরেই প্রতিপালিত হবে- এটাই শরীয়তের কাম্য। বাহিরের কাজে অংশ নেয়া শরীয়তের কাম্য নয়। মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হল,

مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

“যারা অলংকার মণ্ডিত হয়ে প্রতিপালিত হয় আর তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্য প্রদানে অসমর্থ্য।”- যুখরুফ ১৮

দুই.

সাধারণত মহিলাদের শারীরিক শক্তি, স্বরণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা সব কিছুই পুরুষের তুলনায় কম। পুরুষের তুলনায় তাদের দ্বীনও অপূর্ণাঙ্গ, বিবেক-বুদ্ধিও অপূর্ণাঙ্গ। হাদিসে তাদেরকে বলা হয়েছে,

ناقصات عقل ودين

“যাদের আকল ও দ্বীন উভয়ই অপূর্ণ।”- সহীহ বুখারী ৩০৪, সহীহ মুসলিম ২৫০

এ কারণে শরীয়ত মহিলাদের একক সাক্ষ্য গ্রহণ করে না। সাথে পুরুষ থাকলেই কেবল গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নয়। তখনও আবার দুই মহিলা মিলে এক পুরুষের সমান। অর্থাৎ এক মহিলা এক পুরুষের অর্ধেক। **আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,**

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“যেসকল সাক্ষীর প্রতি তোমরা রাজি-খুশি তাদের মধ্য থেকে দু’জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। যদি দু’জন পুরুষ না থাকে, তাহলে একজন পুরুষ ও দু’জন মহিলা; যাতে এক মহিলা ভুলে গেলে একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।”- বাকারা ২৮২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين ».

“তাদের আকল অপূর্ণ হওয়ার দলীল এই যে, দুই মহিলার সাক্ষ্য এক পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। এটি আকলের অপূর্ণতার কারণে। আর (হায়েযের দিনগুলোতে) তারা অনেক দিন পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করে যে, তাদের নামায পড়তে হয় না এবং রমযানের দিনে রোযাও রাখতে হয় না। এটিই তাদের দ্বীনের অপূর্ণতা।”- সহীহ মুসলিম ২৫০

সৃষ্টিগতভাবেই যারা দুর্বল এবং অপূর্ণাঙ্গ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতেও যারা অপূর্ণাঙ্গ, তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর স্পর্শকাতর বিষয়াশয়ে শরীক করা, তাদের থেকে পরামর্শ

নেয়া, সে অনুযায়ী কাজ করা নিশ্চয়ই উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামিতা না হয়ে তাদের সাথে খিয়ানত হবে। পুরুষ তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়নি যে, তাদের বাদ দিয়ে অপূর্ণাঙ্গ মহিলাদেরকে মজলিসে শুরায় শরীক করতে হবে। নিশ্চয়ই এটা আমানতদারি নয়। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ তাআলার এ আদেশের পরিপন্থী,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা অবশ্যই আমানতসমূহ উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবে।"- নিসা ৫৮

তিন.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো, তারা কখনও মহিলাদেরকে পরামর্শের মজলিসে আরো দশ পুরুষের সামনে উপস্থিত করে পরামর্শ নিতেন না। আর নিয়মিত মহিলাদেরকে মজলিসে শূরার সদস্য বানানোর তো কোন প্রশ্নই আসে না।

***

উপরোক্ত মূলনীতিগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি, মহিলাদেরকে মজলিসে শূরার সদস্য করে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক বিষয়াশয়ে তাদের থেকে পরামর্শ নেয়া শরীয়তের নির্দেশও নয়, কাম্যও নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের ত্বরীকাও নয়। এটি সম্পূর্ণই একটি নব আবিষ্কৃত বিদআতি বিষয়। শরীয়তের উসূল-মূলনীতি ও মেজাজ পরিপন্থী একটি কাজ। আর ফিতনার আশঙ্কার কথা তো বলাই বাহুল্য।

***

এ গেল আম দলীল। আর যদি খাস দলীলের দিকে যাই, তাহলে দেখতে পাবো **হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাণী,**

كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله، رأينا " لهن بذلك علينا حقا، من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا". (صحيح

البخاري 5843، كتاب اللباس، باب ما كان [ص:152] النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط).

“জাহিলি যামানায় আমরা মহিলাদের কোন পজিশন আছে বলেই মনে করতাম না। এরপর যখন ইসলাম আসল, আল্লাহ তাআলা মহিলাদের কথা আলোচনায় আনলেন, তখন মনে হল যে, আমাদের কাছে তাদের কিছু হক পাওনা আছে। **কিন্তু আমাদের (রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক) বিষয়াশয়ের কোনো কিছুতেই আমরা তাদেরকে শরীক করতে পারি না।**”- সহীহ বুখারি ৫৮৪৩, কিতাবুল লিবাস।

বর্ণনার শুরুর অংশটি অন্য রিওয়াতে এভাবে এসেছে,

والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، " وقسم لهن ما قسم". (صحيح البخاري 4913، كتاب التفسير، باب {تبتغي مرضاة أزواجك}).

“আল্লাহর কসম! জাহিলি যামানায় আমরা মহিলাদের কোনো অবস্থান আছে বলেই মনে করতাম না। (এভাবেই চলছিল) অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের (সাথে সদাচরণের) ব্যাপারে যা নাযিল করার তা নাযিল করলেন এবং যে হক

তাদেরকে দেয়ার তা দিলেন।”- সহীহ বুখারি ৪৯১৩, কিতাবুত তাফসীর।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে ভাল আচরণের আদেশ দিলেন এবং তারা নাফাকা ও মিরাস পাবে বলে বিধান দিলেন। তবে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক বিষয়াশয় তেমনই রয়ে গেল যেমন আগে ছিল। আগেও যেমন সেখানে তাদের কোন অধিকার ও অংশগ্রহণ ছিল না, ইসলাম আসার পরেও তাদের কোন অধিকার নেই। অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই।

আল্লামা কিরমানী রহ. (৭৮৬হি.) উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

(أمراً) أي شأناً بحيث يدخلن في المشورة؛ وأنزل الله فيهن مثل «وعاشروهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضراراً فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» وقسم ولهن الربع مما تركتم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن». اهـ (الكواكب «مثل الدراري في شرح صحيح البخاري: 18\156-157، كتاب التفسير، بَاب {تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ})

“অর্থাৎ **মহিলারা পরামর্শে শরীক হতে পারে মতো কোনো অবস্থান রাখে বলে মনে করতাম না।** এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে এ ধরণের আয়াত নাযিল করেন,

‘তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাবন করবে’। ‘ক্ষতির উদ্দেশ্যে তোমরা তাদেরকে আটকে রাখবে না’। ‘অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না’।

এবং তাদেরকে এ ধরণের হক দিলেন,
‘(তোমাদের সন্তানাদি না থাকলে) তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ তাদের’। ‘মায়েদের ভরণ-পোষণ পিতাদের দায়িত্বে’।”- আলকাওয়াকিবুদ দারারি ১৮/১৫৬-১৫৭

মোটকথা, শারীরিক দুর্বলতা ও বুদ্ধিমত্তার কমতির কারণে জাহিলি যামানাতেও মহিলারা অপূর্ণ বিবেচিত হতো। প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয়ে অংশ নেয়ার অনুপযুক্ত বিবেচিত হতো। এমনকি তাদের কোন হক আছে বলেই মনে করা হতো না। পুরুষরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাদের ব্যবহার করতো। ইসলাম এসে পুরুষদেরকে আদেশ দিল

নারীদের সাথে সদাচরণ করতে। তাদের দেখাশুনা করতে। তাদের ভরণ-পোষণ দিতে। মৃত আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তাদেরকেও একটা অংশ দিতে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিষয়াশয় আগের মতোই রয়ে গেল। সেখানে তাদের কোন অংশ নেই। শারীরিক দুর্বলতা ও আকল-বুদ্ধির কমতির কারণে সেখানে অংশ নেয়ার কোন যোগ্যতা তাদের নেই। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বিষয়টিই পরিষ্কার করে বলেছেন,

من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا – **‘কিন্তু আমাদের (রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক) বিষয়াশয়ের কোনো কিছুতেই আমরা তাদেরকে শরীক করতে পারি না।’**

বড়ই আফসোসের বিষয়! সাহাবায়ে কেরাম যেখানে নববী ও সাহাবি যামানাতেও মহিলাদেরকে রাষ্ট্রীয় সামান্য থেকে সামান্য বিষয়ে অংশ গ্রহণের যোগ্য মনে করতেন না, সেখানে আজকের সমাজের রাহবারগণ এ ফিতনা ফাসাদের যামানাতেও না’কি মহিলাদেরকে রাষ্ট্রীয় মজলিসে শূরার নিয়মিত সদস্য রাখাতে এবং তাদের থেকে পরামর্শ নিয়ে

কাজ করাতে শরীয়তের বিপরীত কিছু দেখেন না। **বড়ই আফসোস তাকি সাহেবের উপর**, যিনি সাহাবায়ে কেরামের বিপরীতে এমন কথা বলতেও কোন দ্বিধা করলেন না,

كوئي ايسي واضح نص بهي موجود نہيں ہے، جس كي بنا
پر كہا جائے كہ انہيں شورى ميں شامل نہيں كيا جا سكتا-

“এমন কোন সুস্পষ্ট দলীলও অবশ্য বিদ্যমান নেই, যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মহিলাদেরকে শূরাতে শামিল করা যাবে না।”- ইসলাম আউর সিয়াসি নজরিয়্যাত ২৬৯

বড়ই আফসোস যে, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুস্পষ্ট বক্তব্যটি তার কেন নজরে পড়লো না! কেনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের পাতাগুলো তার নজরে আসলো না! যামানার বাতিল মতবাদের চাপে ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে গেলে এভাবেই মানুষ চক্ষুষ্মান হয়েও চোখে দেখে না। হে আল্লাহ তোমার কাছে এ থেকে পানাহ চাই। অহীর নূর থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত করো না। আমীন।

৬৭.মসজিদ-মাদ্রাসা-দ্বীনের উপর আঘাত: একেই বলে দারুল হারব

হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ. বলেছেন,

"এখানে নাসারা কাফেরদের বিধান কী পরিমাণ জোর এবং দাপটের সাথে চলছে!! যদি সাধারণ কোন কালেক্টরও হুকুম জারি করে যে, 'মসজিদে জামাত করতে পারবে না' তাহলে বিশিষ্ট-সাধারণ কারোই এ সামর্থ্য নেই যে, জামাত আদায় করবে। আর জুমআ, ঈদ এবং শরীয়তের আরো কিছু বুনিয়াদী বিষয়ের উপর আমল যা এখানে হচ্ছে, তা কেবল তাদের এই আইনের কারণে যে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। এ ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই'।"

আমাদের এ দেশে এর কোন কারণটা নেই?

আমরা দ্বীনের যতটুকু পালন করতে পারছি, তা মূলত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; এ হিসেবে যে, সরকার নিজেকে

ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করে এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে আপন ধর্মের এমন কিছু রীতিনীতি পালনের সুযোগ দিয়ে রেখেছে, যেগুলো রাষ্ট্রের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এ হিসেবেই মূলত আমরা কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারছি একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে।

অন্যথায়, তারা ক'দিন পর পর মসজিদ ভেঙে দিচ্ছে। কই, আমরা তো মসজিদ রক্ষা করতে পারছি না।

মাদ্রাসায় তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে। আমরা তো রক্ষা করতে পারছি না।

করোনার অজুহাতে মসজিদে জুমা জামাত প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা তো ফেরাতে পারলাম না।

এভাবে তারা যখন চাইছে মসজিদ বন্ধ করছে, ভাঙছে; মাদ্রাসা বন্ধ করছে, ভাঙছে; মাহফিলগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে, আলেম উলামাদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কোণঠাসা করছে; দ্বীন বিরোধী নতুন নতুন ইস্যু গ্রহণ করছে। কিন্তু কই, আমরা

তো ফেরাতে পারছি না।

আমাদের দশা ইংরেজ আমলের চেয়েও শোচনীয়। তখন তো ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু এখন কিছুই নেই। একেই বলে দারুল হারব।

আর দ্বীনেরই বা কতটুকু পালন করতে পারছি? একটু লক্ষ করুন-

১. নামায ফরয। অস্বীকারকারী কাফের। না পড়লে ফাসেক। শাস্তি দিতে হবে। নামাযে বাধ্য করতে হবে। -কিন্তু হচ্ছে কি?

২. যাকাত ফরয। অস্বীকারকারী কাফের। না দিলে ফাসেক। জোর করে হলেও আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে। -কিন্তু হচ্ছে কি?

৩. সাওম ফরয। অস্বীকারকারী কাফের। না রাখলে ফাসেক।

জোর করে হলেও রাখাতে হবে। প্রয়োজনে যুদ্ধ করে হলেও। -কিন্তু হচ্ছে কি?

৪. জিহাদ ফরয। অস্বীকারকারী কাফের। জিহাদ-ই'দাদ সর্বদা জারি রাখতে হবে। -কিন্তু হচ্ছে কি?

৫. মদ হারাম। অস্বীকারকারী কাফের। পানকারীর উপর হদ আরোপ করতে হবে। -কিন্তু হচ্ছে কি?

৬. যিনা হারাম। অস্বীকারকারী কাফের। যিনাকারের উপর হদ (দোররা বা রজম) কায়েম করতে হবে। -কিন্তু হচ্ছে কি?

৭. পর্দা ফরয। অস্বীকারকারী কাফের। বেপর্দায় চলতে পারবে না। চলতে শাস্তি দিয়ে হলেও বিরত রাখতে হবে। -কিন্তু হচ্ছে কি?

৮. সুদ হারাম। অস্বীকারকারী কাফের। যুদ্ধ করে হলেও বন্ধ করতে হবে। -কিন্তু হচ্ছে কি?

৯. কাফেরের জান মাল হালাল। থাকতে হলে যিম্মার চুক্তিতে

থাকতে হবে। জিযিয়া দিতে হবে। -কিন্তু হচ্ছে কি?

১০. কাফেরের আচার-অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে করতে পারবে না। নতুন কোনো গীর্জা মন্দির বানাতে পারবে না। -কিন্তু হচ্ছে কি?

সবগুলোই তো না, না। তাহলে হচ্ছে কি? তাহলে আমরা কি পালন করতে পারছি? এরপরও যারা বলেন, জিহাদের দরকার নেই; একটু ভাবা উচিৎ।

৬৮.মানহাজি ফিতনা এবং কয়েকটি নিবেদন

আলকাউসার জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪২ || জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যায় 'হযরত মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী রাহ.: কিছু কথা কিছু স্মৃতি' প্রবন্ধে মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব লিখেছেন,

“আজকাল কওমী মাদরাসায় অধ্যয়ন সম্পন্নকারী কিছু কিছু ব্যক্তির মাঝে এই রোগ দেখা দিয়েছে যে, তারা কতিপয় কট্টরপন্থী সালাফীর এবং সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনাকারী কিছু লোকের বিচ্ছিন্ন চিন্তা-ভাবনাকে এই বলে প্রচার করছে যে, এটাই কুরআন-সুন্নাহর দাবি এবং এটাই আসল দেওবন্দিয়াত!

অথচ তাদের ‘বিশেষ’ চিন্তা-ভাবনা উলামায়ে দেওবন্দের নীতি-আদর্শ এবং গোটা দুনিয়ার জুমহুর আকাবির উলামায়ে কেরামের নীতি-আদর্শের বিপরীত। জানা নেই, কে তাদেরকে ‘মানহাজী’ নাম দিয়েছে আর কিসের ভিত্তিতে দিয়েছে? হযরত মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী রাহ. এ ধরনের লোকদের চিন্তা-ভাবনার বিরোধী ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে সরাসরি আমাকে বলেছেন এবং আশংকা ব্যক্ত করেছেন। আর বলেছেন, এ বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।”

মানহাজি বলতে কারা উদ্দেশ্য?

অবশ্যই জামাত বা আহলে হাদিস উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তারা একেতো আজকালকার নতুন ফিতনা না, দ্বিতীয়ত তারা

দেওবন্দিয়াতের দাবিদারও না। তাবলিগ বা চরমোনাইয়ও অবশ্যই উদ্দেশ্য না। বাকি রইল শুধু আলকায়েদা আইএস। আইএস যে ভ্রান্ত তা বহু আগেই পরিষ্কার এবং আলকায়েদা তাদের থেকে সম্পর্কও ছিন্ন করেছে বহু আগে। রয়ে গেল শুধু আলকায়েদা। বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু বলা যায়, আলকায়েদা আইএসকে তারা এক পাল্লায় মাপছেন বা আইএসের মতাদর্শ দিয়ে আলকায়েদাকে বিবেচনা করছেন। এটা অবশ্যই উচিৎ না। আইএসের ব্যাপারে আলকায়েদা বহু আগেই তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। উভয়কে এক পাল্লায় বা একই মানহাজে বিবেচনা করা অবশ্যই অনুচিত।

কয়েকটি নিবেদন

ক. মানহাজি কারা যদিও কথার ধরন থেকে পরিষ্কার, তবে স্পষ্ট করে নাম নিয়ে বলে দিলেই ভাল হতো। তা'রিজ, ইশারা ইঙ্গিত স্পষ্ট সমালোচনার চেয়ে অনেক বেশি দিলে বিঁধে।

খ. কট্টরপন্থী সালাফী এবং সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনাকারী কিছু লোক কারা এবং তাদের বিচ্ছিন্ন চিন্তা-ভাবনাগুলো কি, যেগুলো মানহাজিরা অনুসরণ করছে, কিছুই

পরিষ্কার করা হয়নি। পরিষ্কার করে দিলে ভাল হতো। এতে যাদেরকে এ ফিতনা থেকে বাঁচানো উদ্দেশ্য তারা সহজে বাঁচার পথ পাবে। আর মানহাজিরাও দেখতো যে, তাদের দিকে যে চিন্তা ভাবনাগুলোর নিসবত করা হচ্ছে, আসলেই তারা সেগুলো পোষণ করে কি'না। আর করে থাকলে এবং সত্যিই ভুল হয়ে থাকলে শুধরেও নিতে পারতো।

গ. পরিষ্কার করা হয়নি যে, মানহাজিদের সেই 'বিশেষ' চিন্তা-ভাবনাগুলো কিভাবে কুরআন সুন্নাহ এবং জুমহুর উলামা-আকাবিরের আদর্শের খেলাফ হচ্ছে। মারকাজের মতো প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই এভাবে দলীলবিহীন কথা বলা উচিৎ না। মারকায এর আগেও মুজাহিদিনের সমালোচনা করেছে। তবে দুঃখের ব্যাপার তাদের কথায় দলীলভিত্তিক একটা লাইনও কোনো সময় থাকে না। এভাবে দলীলবিহীন সমালোচনা অবশ্যই বড়দের থেকে কাম্য নয়। পক্ষান্তরে মানহাজিরা যা বলে সব সময়ই *কুরআন সুন্নাহর দলীল এবং মু'তামাদ আলাইহি উলামাদের হাওয়ালায় বলে। এর জবাবে মারকায শুধু সমালোচনা বা দিলে বিঁধার মতো তীর্যক কিছু কথাই বলেই ক্ষান্ত; দলীল দেয় না কখনও। জানা কথা যে, দলীলবিহীন সমালোচনা দুর্বলতার পরিচায়ক। অধিকন্তু বর্তমান

দুনিয়ায় নিরেট দাবির চেয়ে দলীলের চাহিদা অনেক বেশি। এটাকে আমরা সূ’য়ে আদব নাম যদিও দিই, কিন্তু বাস্তব কথা এটাই যে, দলীল ছাড়া কথা এখন কেউ নিতে চায় না। আর যেখানে অজু গোসলের সাধারণ মাসআলাতেও আমরা সপ্তাহ দুই সপ্তাহ সময় নিই এবং দশটা-বারোটা হাওয়ালা দিয়ে বলি, সেখানে উম্মাহর এমন এমন ভয়ানক মানহাজি ফিতনার সমালোচনা শুধু মুখে *মুখে করে গেলে কে মানতে রাজি হবে?!

ঘ. মুজাহিদিন, মুসলিম-নামধারী ও অমুসলিম তাগুতগোষ্ঠীর ব্যাপারে মুজাহিদিনের অবস্থান, গ্লোবাল জিহাদ এবং শরীয়ত প্রত্যাখ্যানকারী মুসলিমনামধারী শাসকদের ব্যাপারে মারকায কখনও কোনো পরিষ্কার কথা বলে না। যতদিন অবস্থান পরিষ্কার না করা হবে, অবশ্যই অনুসারিরা সহীহ দিক নির্দেশনা পাবে না। আপনারা বর্তমান তাগুতি দুনিয়ার ব্যাপারে কি মত পোষণ করেন, মুজাহিদিনের সাথে এক্ষেত্রে আপনাদের কোন কোন বিষয়ে দ্বিমত এবং কুরআন সুন্নাহর আলোকে কোনটা সহীহ- এসব কিছু যদি পরিষ্কার না করা হয়, তাহলে যাদের এ মানহাজি ফিতনা থেকে বাঁচানো উদ্দেশ্য, তারা কখনও সহীহ রাস্তা পাবে না। আর মানহাজিদের আচরণ

থেকে তো স্পষ্টই যে, তারা থেমে যাবার মতো লোক নয়। এভাবে ধোঁয়াশায় থেকে গেলে না মানহাজিরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, আর না অনুসারিরা মানহাজি ফিতনা থেকে বাঁচতে পারবে। বরং মানহাজিদের দল দিন দিন ভারীই হচ্ছে। পাক-সাফ অবস্থান না নিলে শুধু ইজমালি কিছু সমালোচনার উপর ভরসা অনেকে করতে পারবে না আর পারছেও না। তখন শুধু আফসোসই করতে হবে যে, বিশ্বস্ত লোকগুলোও ছুটে যাচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হবে না।

ঙ. আপনাদের ভাইদের সাথে রহমের আচরণ করুন। তাগুত শাসকগোষ্ঠী আপনাদের যে পরিমাণ গালিগালাজ করছে, হুমকি ধমকি দিচ্ছে- এরপরও তাদের সাথে আপনাদের আচরণ-কথাবার্তা কেমন হচ্ছে আর মানহাজিদের সাথে কেমন হচ্ছে আপনারা নিজেরাই একটু বিবেচনা করুন। আসলেই ব্যাপকভাবে মানহাজিরা এর উপযুক্ত? না'কি আরও একটু রহম তাদের প্রাপ্য? একটু নির্জনে ফিকির করুন। সবাইকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। আল্লাহ তাআলা সেদিন সবার থেকে সবার হক আদায় করবেন।

চ. আপনারা মানহাজিদেরকে সরাসরি ফিথনা ও ضلالة এর

কাতারে ফেলে দিচ্ছেন। অথচ আপনারা নিজেরাও জানেন, মানহাজিদের পক্ষে যুগের শ্রেষ্ঠ শত হাজারো হকপন্থী আলেম উলামা ছিলেন এবং আছেন। তাদের রায় যদি আপনারা ভুলও মনে করেন, তাহলেও একে ফিতনা বা ضلالة অবশ্যই আখ্যা দিতে পারেন না। আপনারা আবারও একটু ভেবে দেখুন, মানহাজিরা সব সময় কুরআন সুন্নাহ এবং মু'তামাদ আলাইহি উলামাদের হাওয়ালায় কথা বলে। একটা কথাও তারা নিজেদের থেকে দলীলবিহীন বা হাওয়ালাবিহীন বলে না। তাদের আচরণ থেকে স্পষ্ট, তারা হকতলবি। হকের সন্ধানী। যদি ভুল হয়, ইজতিহাদি খাত্বা আখ্যা দিতে পারেন। সে রকম আচরণই তাদের সাথে করুন। এ ধরনের ইখতিলাফকে অবশ্যই ضلالةবলা যায় না। বিশেষত যখন শত হাজারো হকপন্থী এবং যুগশ্রেষ্ঠ আলেম তাদের পক্ষে আছেন এবং ফতোয়া দিয়েছেন। তখন -আপনারাই বিবেচনা করুন, কিভাবে তাদেরকে ضلالة -এর কাতারে গণ্য করছেন?! এ ধরনের ভুলের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রথম দায়িত্ব: দলীলের আলোকে ভুল ধরিয়ে দিয়ে সহীহ রাস্তা দেখিয়ে দেয়া। এরপরও ফিরে না আসলে কথা ভিন্ন। অধিকন্তু ফিরে না আসলেও ضلالة আখ্যা দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, শত হাজারো হকপন্থী যুগশ্রেষ্ঠ আলেম তাদের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের ফতোয়া এবং

কিতাবাদি দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট কিছু নয়। অল্প দু'চারজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন কোনো মতও নয় যে, ضلالة আখ্যা দিয়ে দেয়া যায়।

পরিশেষে সবার প্রতি নিবেদন থাকবে, যেমনটা শায়খ আইমান আযযাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহ জানিয়েছেন,

"# আল-কায়দার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে পূর্বেও বিভিন্ন অপবাদ দেয়া হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে। ... তারা আমাদের তাকফিরি, কট্টরপন্থী, চরমপন্থী, অর্থ ও ক্ষমতা লোভী এবং অথর্ব বলে গালমন্দ করেছে। ... এসকল অপবাদের মুখে ধৈর্য ধারণের প্রতিদান আমরা আল্লাহর কাছে পাব ইনশাআল্লাহ।

তবে আমি এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই তা হল; এই বিভ্রান্তি ও প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা ও উদার দর্শকদের সতর্ক করা। আপনারা কোন সংশয়ের সম্মুখীন হলে

প্রথমে আল-কায়দার বার্তাগুলো দেখবেন। এই বার্তাগুলো আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এগুলো জাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার পর, এটিকে মুসলিম উম্মাহ গ্রহণ করলে সেটাই আমাদের সত্যিকারের বিজয়। যদি কেউ এই বার্তাগুলোতে ভাল এবং সত্য বিষয় খুঁজে পান তবে তার উচিত হবে সে বিষয়গুলো মেনে নিয়ে আমল করা। আর যদি এর মধ্যে সত্য ছাড়া অন্য কিছু থাকে তবে সে যেন তা পরিত্যাগ করে এবং আমাদেরকে সে বিষয়টি সম্পর্কে উত্তম পরামর্শ দেয়।

আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে এবং অনেকেই দাবি করেন যে, তারা আমাদের ব্যাপারে অনেক ভাল জানেন। অথচ যা বলা হয় তার অনেক কিছুই সত্য নয়। অনেকক্ষেত্রে সেটা সত্য ও কল্পনার সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আমি সম্মানিত দর্শকের (পাঠকের) কাছে - আমরা যা ঘোষণা করি সেগুলি ছাড়া ভিন্ন কিছুর সাথে আমাদের সম্পৃক্ত না করার অনুরোধ করছি। যদি কেউ এসে বলে: আমি আল-কায়দার সদস্য, বা কোন গোয়েন্দা সংস্থা যদি কোন ব্যক্তিকে আল-কায়দার সদস্য বলে দাবি করে তবে তার জন্য আমরা দায়ী নই। একইভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন দলের

সাথে যুক্ত থাকে এবং সে দল আল-কায়দার সাথে যুক্ত থাকার দাবি করে, এবং সে ব্যক্তি দলের সাথে থাকার কারণে নিজেকে আল-কায়দার সদস্য বলে দাবি করে অথচ আমরা সে ব্যাপারে কোন ঘোষণা জানাইনি, এমন দল বা ব্যক্তিদের ব্যাপারেও আমরা দায়ী থাকব না। হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি পৌঁছে দিয়েছি।"

৬৯.মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচন কি শরীয়ত বিরোধী নয়?

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

অনেক আলেমকে বলতে শুনা যায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শরীয়ত বিরোধী নয়।

এখন প্রশ্ন, **সে চেতনাটা কি?**

সে চেতনা যদি হয় সেটা, যা আওয়ামীলীগ বলে থাকে; অর্থাৎ **সাম্প্রদায়িক শরয়ী শাসন বাদ দিয়ে চারটি কুফরি মতবাদের আলোকে দেশ শাসন**; যদি এ চেতনা হয় তাহলে তা যে কুফর তা তো কারও কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা না।

কিন্তু সেসব আলেম বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল **জুলুম থেকে নিষ্কৃতি।**

যদি এ দ্বিতীয়টিকেই ধরি, তাহলে তা কি শরীয়ত বিরোধী নয়?

এখানে কিন্তু হিসেব করে কথা বলতে হবে। কারণ, আইম্মায়ে কেরামের রাজেহ মত এটাই যে, জুলুমের কারণে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জুলুম থেকে নিষ্কৃতি হয় তাহলে রাজেহ কওল মতে এ চেতনা হারাম ছিল।

এরপরও যদি বলতে চান, না হারাম ছিল না: তাহলে বুঝা গেল, আপনাদের মতে জালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে অপসারণ করা জায়েয। তাহলে আমরা আজ যারা তাগুতি শাসনের জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা বলছি, আমাদের দোষ কোথায়? আমরা কেনো হারাম করছি? আমরা কেন সন্ত্রাসী আখ্যা পাচ্ছি?

সদুত্তর কামনা করছি।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন

ইসলামের নামে যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন করেন তারা বলেন, তারা জিহাদ করছেন।

এখন প্রশ্ন: জিহাদ তো কাফেরের বিরুদ্ধে হয়। তাহলে আপনারা কি **শাসকদের কাফের মনে করেন**?

এ প্রশ্ন শুনার সাথে সাথেই তারা হাজার বার না ... না ...না

বলতে থাকবেন।

যদি মুসলিম মনে করেন, তাহলে অপসারণ করতে চাচ্ছেন কেন? জুলুমের কারণে অপসারণ করার জন্য মাঠে নেমে মুসলিমদের দলে দলে বিভক্ত করা কি জায়েয?

যদি বলেন, জায়েয; তাহলে আমরা জিহাদ করলে কেন নাজায়েয?

হয়তো বলবেন, শান্তিপূর্ণভাবে অপসারণ করা জায়েয, সংঘাতে যাওয়া হারাম।

তাহলে সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমস্যাটা এসে যাবে। তাহলে মুক্তিযুদ্ধ কি হারাম ছিল? সেটা তো শান্তিপূর্ণ ছিল না। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, ত্রিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে .... দাবি করা হচ্ছে। **তাহলে মুক্তিযুদ্ধ হারাম বলছেন আপনারা?**

এটার উত্তরেও হাজার বার না ... না ... না... বলবেন।

তখন সেই আগের কথা এসে যাবে, আমরা অস্ত্র ধরলে হারাম হবে কেন?

সদুত্তর প্রত্যাশী।

৭০.মুজাহিদদের সহায়তার উদ্দেশ্যে জাল নোট তৈরির বিধান

প্রশ্ন: জিহাদের সহায়তার জন্য জাল নোট তৈয়ার করা কি জায়েয?

উত্তর: নোট জাল করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়- চাই তা জিহাদের সহায়তার জন্য হোক বা অন্য কোন কিছুর জন্য হোক; আর্থিক লেনদেন কাফেরদের সাথে হোক বা

মুসলমানদের সাথে হোক। কেননা, মুআমালায় প্রতারণা না করা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।" (মায়েদা: ১)

এ নির্দেশ কাফের-মুসলিম সকলের ব্যাপারেই এসেছে।

এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীও সকলের বেলায় প্রযোজ্য,

من غش فليس منا

"যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কবুল করেন না। বরং এসব জাল নোট যার হাতে যাবে, তার জন্য দ্বিতীয় বার তা কোন মুআমালায় লাগানো বা দান-সদকা করা হালাল হবে না। কেননা, এর মাধ্যমে মুসলমানদের ধোঁকা দেয়া হবে এবং তাদের ক্ষতি করা হবে। বরং এসব নোট থেকে বাজার মুক্ত করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি

ভেজাল মুদ্রা ভেঙে ফেলতেন। তখন তিন বাইতুল মালের দায়িত্বে ছিলেন।

জাল নোট তৈরির দ্বারা ভেজাল লেনদেনের সৃষ্টি হবে, যার কারণে মুসলমানদের বাজার ও তাদের মুদ্রামান ক্ষতির শিকার হবে। বরং এসব মুদ্রা অন্যদের কাছে থেকে মুজাহিদদের হাতে পড়লে অনেক সময় স্বয়ং মুজাহিদরাই ক্ষতির শিকার হবে। তাছাড়া মুজাহিদরা যখন মুসলমানদের সাথে এসব মুদ্রার লেনদেন করবে, তখন মুসলমানদের নিকট মুজাহিদদের যে বদনাম হবে, তা তো আছেই। যাহোক, এই হল কথা। আর আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।

উত্তর প্রদানে: আবুল ওয়ালিদ আলমাকদিসি

সদস্য: মিম্বারুত তাওহিদ

২৪/১২/২০০৯ ইং

৭১.মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সাহেব দা.বা. এর যবানিতে কয়েকটি সত্য

মাসিক আলকাউসার, যিলকদ ১৪৪১ || জুলাই ২০২০ সংখ্যায় **‘হজ্ব নিয়ে স্বেচ্ছাচার এবং সৌদি সরকারের অধিকার’** শিরনামে মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সাহেব দা.বা. একটি লিখা দিয়েছেন। করোনা পরিস্থিতির বাহানা তুলে স্বেচ্চাচারি সৌদি সরকার হজ্ব-উমরা বন্ধ করে দেয়ায় বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ে যে আঘাত লেগেছে, সে বেদনা কিঞ্চিত তুলে ধরেছেন তিনি এ লেখাতে। আলহামদুলিল্লাহ লেখাটিতে তিনি বেশ কয়েকটি সত্য কথা তুলে ধরেছেন। সবার জন্য এগুলো জেনে রাখা ভালই নয় বরং জরুরীই বলা যায়।

এক.

ব্রিটিশদের সাথে আঁতাত করে সৌদি শাসনের গোড়াপত্তন

হুজুর বলেন,

“প্রসঙ্গত এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার যে, সৌদি

আরবের উত্থান অথবা অন্য শব্দে বললে, জাযীরাতুল আরবে সৌদি শাসকদের দখল ও বিজয়ের পর্বটিকে সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম মনীষীরা দুঃখ ও বেদনা নিয়েই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম মনীষীরা গভীর মর্মবেদনা অনুভব করেছিলেন এজন্য যে, বর্তমান সৌদি শাসকদের পূর্ব-পুরুষেরা উসমানী সালতানাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিদ্রোহ করে, বৃটিশ শক্তির সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। আর এদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের আলেম নেতৃত্ব ও মুসলিম মনীষীরা বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিলেন। তারা চাচ্ছিলেন, তুরস্কভিত্তিক ইসলামী খেলাফত টিকে থাকুক। সেসময় খেলাফতের প্রতিনিধিদের সরিয়ে সৌদি আরব প্রতিষ্ঠাতাদের ক্ষমতা দখলের ঘটনাটিকে ভালো চোখে দেখার সুযোগ ছিল না। এসব কারণে সৌদি আরবের প্রতি মুসলিম বিশ্বের মনীষীদের বিরূপ ধারণা ও মূল্যায়ন বহাল ছিল”।

হুজুর এখানে বড় সত্যটি তুলে ধরেছেন যে, সৌদি রাষ্ট্র মূলত ব্রিটিশদের সহায়তায় ব্রিটিশদের সাথে আঁতাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য অর্থে বললে, ব্রিটিশদের

দালালীর মাধ্যমে এ রাষ্ট্রটির উৎপত্তি।

এর পরের অবস্থার দিকে হুজুর সামান্য ঈঙ্গিত করেছেন। বিস্তারিত বলেননি। তবে চক্ষুষ্মান কারো কাছেই এদের দালালীর বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। উসমানী সালতানাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তথা মুসলিমদের রক্তের উপর দিয়ে এ রাষ্ট্রের উৎপত্তি। এরপর থেকে তারা তাদের প্রভুদের দালালী যথাযথভাবেই করে আসছে। এ দালালীর বড় অংশ ইজরাইলের নিরাপত্তা দেয়া। ইজরাইলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। এদের কারণেই আজ পর্যন্ত ফিলিস্তিনিরা নির্যাতিত।

ব্রিটিশদের দিন শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন আমেরিকা মঞ্চে আসে, তখন তারা আমেরিকাকে প্রভু বলে গ্রহণ করে নেয়। এরপর ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার সৈনিক হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে অদ্যাবধি তারা তাদের গোলামির দায়িত্ব পালন করে আসছে ওয়াফাদারির সাথে। বলা যায়, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সৌদি আরব ও পাকিস্তান।

দুই.

এরা আমেরিকাকে জাজিরাতুল আরবে দখলদারিত্বের সুযোগ করে দিয়েছে

হুজুর বলেন,

“বিভিন্ন দেশের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে বা যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে বিজাতি সুপার পাওয়ার রাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীকে তো আগেই অনেকটা স্থায়ী জায়গা করে দেয়া হয়েছে সৌদি আরবে।”

বর্তমান সৌদি আরব মূলত আমেরকার দখলে। হাজার হাজার আমেরিকান সৈন্যের বিশাল বিশাল ঘাঁটি সৌদি আরবে। ইরাক যুদ্ধের প্রাক্কালে নিরাপত্তা বজায় রাখার অজুহাতে তারা আমেরিকানদের দাওয়াত দিয়ে সৌদি আরবে নিয়ে আসে। আমেরিকা যদি যুদ্ধের মাধ্যমে জাজিরাতুল আরব দখল করতো তাহলে মুসলিম বিশ্ব অবশ্যই তা প্রতিরোধ করতো। কিন্তু তারা ভিন্ন চাল চেলেছে। নিজেদের নিরাপত্তার বাহানা তুলে জাজিরাতুল আরব কাফেরদের হাতে তুলে দিয়েছে। অথচ একবার ঘোষণা করে দিলে সারা দুনিয়ার মুসলিম যুবকরা হারামাইন রক্ষার জন্য জীবন বাজি রেখে ময়দানে নেমে পড়তো। এক সাদ্দাম কেন, হাজারো

সাদ্দামও হারামাইনের সীমায় পা দিতে পারতো না। কিন্তু কিসের হারামাইনের নিরাপত্তা?? আসল উদ্দেশ্য ছিল, প্রভুদের নির্দেশ অনুযায়ী হারামাইনকে কাফেরদের হাতে তুলে দেয়া। সেটিই তারা করেছে। এজন্য অবশ্য পোষা দরবারি আলেমদের থেকে তারা ফতোয়াও তৈরি করিয়ে নিয়েছিল।

তিন.

এরা পবিত্র হিজায ভূমিকে ইউরোপ বানানো হচ্ছে

হুজুর বলেন,

“রিয়াদের সেই গভর্নর সালমানই এখন সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান। অথচ তিনি আর তার ছেলে এমবিএস মিলে এখন তাদের বর্ণিত সেই সৌদি আরবকেই কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন! আধুনিকতা আনয়নের নামে সৌদি আরবের দ্বীনী বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বলতাকে কীভাবে তারা ম্লান করে দিচ্ছেন! বিভিন্ন দেশের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে বা যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে বিজাতি সুপার পাওয়ার রাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীকে তো আগেই অনেকটা স্থায়ী জায়গা করে দেয়া হয়েছে সৌদি আরবে। তার সাথে এখন ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং তাহযীব-তামাদ্দুনের সর্বনাশ ঘটানো হচ্ছে।”

আরও বলেন,

“শুরু হল সৌদি আরবের দ্বীনী সংস্কৃতি ও জীবনাচারে পাশ্চাত্যায়নের খোলামেলা মহড়া। এর আগে বাদশাহ আবদুল্লাহ্র আমলেই লোহিত সাগরের পাড়ে ইউরোপীয় ধাঁচে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সহশিক্ষার পরিবেশপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে সফর হয়েছে আমার। সে যেন পুরোপুরি পশ্চিমা সংস্কৃতির একটি অঙ্গন পবিত্র হারামাইনের মাঝামাঝি ভ‚মিতে। আর বর্তমান বাদশাহ ও তার পুত্রের এসব কর্মকাÐ দেখে অনুমান করা যাচ্ছিল, সৌদি আরবের দ্বীনী সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে বদলে যেতে পারে। আশংকা করা হচ্ছিল, ওই পবিত্র ভূমি থেকে রূহানিয়াতপূর্ণ পরিবেশ ধীরেধীরে সরে যেতে থাকবে। সেটারই প্রকাশ এখন ঘটছে।”

হুজুর ভদ্র ভাষায় একটু ঈঙ্গিত করেছেন মাত্র। সৌদি যুবরাজগুলো যে কত বড় বড় মদখোর ও যিনাকার সে অশ্লীলতার ইতিহাস তো সুপ্রসিদ্ধ। আর এখন গোটা হিজায ভূমিকে একটা বেশ্বালয়ে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চলছে। অনেক দূর এগিয়েও গেছে তারা। নারীর ক্ষমতায়নের নামে যিনার পরিবেশ সুলভ ও সরগরম করার এবং পবিত্র ভূমিকে

অপবিত্র করার চক্রান্ত এখন বিশ্ব মুসলিমকে সৌদি শাসন নিয়ে ভাবাতে শুরু করেছে।

চার.

এরা খাদেমুল হারামাইন হওয়ার অযোগ্য

হুজুর বলেন,

“এই যে দ্বীন এবং দ্বীনী চেতনা-বিশ্বাস ও অবস্থান থেকে সৌদি শাসকদের এত দূরে সরে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে এবং ঘটেছে, এরপর তাদের ‘খাদেমুল হারামাইন আশশারীফাইন’ পরিচিতি বহন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ... হারামাইন শারীফাইনের ব্যবস্থাপনায় তাদের এই ভীতিকাতরতা ও দুর্বলচিত্ততা এ প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছে যে, হারামাইনের খাদেম হওয়ার যোগ্যতা তাদের আছে কি না! এ পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার অধিকার তাদের আছে কি না!”

আরও বলেন,

“আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنْ أَوْلِيَآؤُهٗٓ إِلَّا الْمُتَّقُوْنَ.

শুধু মুত্তাকীগণই এর (মসজিদে হারামের) তত্ত্বাবধায়ক। -সূরা আনফাল (৮) ৩৪

আমরা দুআ করি, হারামাইন শরীফাইনের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের হাতে দিন, যারা মুত্তাকী। যারা নেককার, সদাচারী এবং যারা অন্য কাউকে খুশি করার জন্য নয়; শুধু আল্লাহ তাআলাকে রাজি-খুশি করার জন্য কাজ করবেন। অথবা এখন যারা হারামাইন শরীফাইনের দায়িত্বে আছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে যোগ্যতা দান করুন। তাদেরকে নেককার বানিয়ে দিন।"

অর্থাৎ এরা মুত্তাকিও নয়, নেককারও নয়, খাদেমুল হারামাইন হওয়ার যোগ্যও নয়।

পাঁচ.

সৌদি শাসন ইসলামী খেলাফত নয়

হুজুর বলেন,

"মক্কা-মদীনা হিজাযে মুকাদ্দাসের এলাকা। এই অঞ্চল ইসলামী খেলাফত ছাড়া অন্য কোনো একক রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে পারে না। বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফত থাকলে তার অধীনে থাকত হারামাইন।"

আরও বলেন,

“অনেকেই মনে করেন, সৌদি আরবের রাজ্য সৌদিদের কাছেই থাকুক। কিন্তু মক্কা-মদীনা এই দুটি পবিত্র ভূমিকে হজ্ব-ওমরাহ ও যিয়ারতকারীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক। সৌদি শাসকদের পরিবর্তে খোদ জাযীরাতুল আরব কোনো ইসলামী খেলাফতের অধীনে এলে তখন অবশ্য ভিন্ন বিষয়। চিরকাল তো এই অবস্থা থাকবে না। ইনশাআল্লাহ একদিন মুসলমানদের পবিত্র ভূমিগুলো কোনো ইসলামী খেলাফতের আওতায় আসবে। তখন সেই সরকারের সিদ্ধান্ত হবে মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতির অনুকূল, ইবাদত-আমলের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।”

আরও বলেন,

“একটা ভূখD দখল বা আশপাশের এলাকা নিয়ন্ত্রণ করার কর্তৃত্ব থাকার কারণে হারামাইন শরীফাইনও ওই ভূখণ্ডের ভেতরে থাকায় তাদের একক কর্তৃত্বে থাকতে হবে- এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না।

হারামাইন বিশ্ব মুসলিমের মর্যাদাপূর্ণ সম্পদ। মুসলমানদের কোনো খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে হারামাইন তাদের ব্যবস্থাপনার আওতায় যেতে পারে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকা বা ভূখDকে নিয়ন্ত্রণকারী কোনো রাজা-বাদশাহ্র আওতায় থাকতে বাধ্য নয়।”

অর্থাৎ সৌদি শাসন ইসলামী খেলাফত নয়। তারা জাজিরাতুল আরবের দখলদার মাত্র। আর হারামাইন গোটা মুসলিম উম্মাহর অধিকার। দখলদার বলে সৌদি সেখানে একক কতৃত্ব খাটানোর অধিকার রাখে না।

ছয়.

হারামাইনেও রয়েছে দরবারি মুফতি

একটি অমোঘ সত্য তুলে ধরে হুজুর বলেন,

“দরবারি কথা নয়, প্রকৃত জনমত শুনুন

.... স্বেচ্ছাচারের পক্ষে অনেক সময় অনুগত লোকজনের সমর্থন পাওয়া যায়; রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক দেশে কিছু লোককে অনুগত বানিয়ে নেওয়া যায় অথবা কিছু লোকের কাছ থেকে শাসকদের মন-মর্জিমতো ‘ফতোয়া’ আদায় করেও নেওয়া যায়; কিন্তু এতে সঠিক মতামত ও জনমতের প্রতিফলন ঘটে না। দেশে দেশেই বিদ্যমান দরবারি শায়েখ, দরবারি ‘ফতোয়া’। অনেক সময় সরকারের মনোভাব আন্দাজ করে দরবারি লোকেরা অগ্রিম ফতোয়া কিংবা

অগ্রিম সাফাই বক্তব্য প্রস্তুত করে রাখে।”

হুজুর যে সত্যটি তুলে ধরেছেন: হারামাইনসহ প্রতিটি দেশেই রয়েছে দরবারি মুফতি। অতএব, সৌদিসহ বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় মুফতিদের থেকে প্রদত্ত ফতোয়াগুলোকে আমরা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারি না। বিশেষত যখন বর্তমানে অনেক মুফতি নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় শাসকদের অনুকূলে অগ্রিম অগ্রিম ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে, সেখানে আমরা কিভাবে এসব রাষ্ট্রীয় ফতোয়া বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারি?!

ফাঁকে ফাঁকে হুজুর অনেকগুলো সত্য তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাআলা হুজুরকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন।

বি.দ্র.

যেসব সত্য হুজুর সৌদির ব্যাপারে তুলে

ধরেছেন, সেগুলো যে বাংলাদেশ পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের বেলায় প্রযোজ্য তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষত যখন এসব রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিই সুস্পষ্ট কুফরের উপর। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতিই তার চাক্ষুষ সাক্ষি।

৭২.মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা. –এর বক্তব্য প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

চাটগামী হুজুর দা.বা. –এর বক্তব্যটি নিয়ে বিভিন্ন কথা বার্তা চলছে। কেউ কেউ একে জিহাদ ও মুজাহিদিনের বিপরীতে দাঁড় করানোরও চেষ্টা করছেন। তাই কিছু কথা আরজ করতে চাচ্ছি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

হুজুর হিন্দ ও কাশ্মীরে জিহাদের কথা বলছেন

ইকদামী-দিফায়ী উভয় প্রকার জিহাদ হুজুর ফরয বলেছেন।

কাশ্মীর, আফগান ও হিন্দুস্তানের জিহাদকেও হুজুর সমর্থন করেছেন। তবে আফসোস জাহির করেছেন যে, আফগান জিহাদ নেযামমতো হওয়ায় সফল হয়েছে, কিন্তু কাশ্মীর ও হিন্দুস্তানের অন্যান্য জিহাদ নেযামমতো হচ্ছে না বিধায় সফল হচ্ছে না। হুজুরের বক্তব্য লক্ষ করুন-

"দিফায়ী জিহাদ ও ইকদামী জিহাদ। ইসলামে উভয়টার বিধান রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম উভয় প্রকার জিহাদে শরীক হয়েছেন।" –মুঈনুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩১

"হিন্দুস্তানে বিচ্ছিন্নভাবে জিহাদ হচ্ছে। কিন্তু সেখানে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। প্রত্যেক দলের পৃথক পৃথক আমীর রয়েছে। প্রত্যেক দল তার আমীরের নির্দেশনায় চলে। প্রত্যেক দল যার যার চিন্তা ও মর্জি অনুযায়ী কাজ করছে। এটা সহীহ নেযাম নয়। তাই সেখানে কামিয়াবী আসছে না। একই কারণে কাশ্মীরের জিহাদেও কামিয়াবী আসছে না। আফগানিস্তানের মুজাহিদরা সফল হয়েছে। কারণ তারা এক আমীরের নেতৃত্বে জিহাদ করেছে। তাদের কাছে তরবিয়তপ্রাপ্ত জনশক্তি রয়েছে। যুদ্ধের সরঞ্জাম রয়েছে। সম্পদ রয়েছে।" –মুঈনুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩২

অতএব, যারা হুজুরের বক্তব্যটি প্রচার করবেন, তারা যেন আমানতদারীর সাথে এ বিষয়টি লক্ষ রেখে প্রচার করেন।

হুজুর বাংলাদেশে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে বলছেন

এ দেশের ব্যাপারে হুজুর বলেন,

“আমাদের এখানে জায়গা (state) প্রস্তুত নেই। কোনো এলাকাকে জিহাদের জন্য নির্ধারণ করলে দ্বিতীয় দিন সেটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তরবিয়তপ্রাপ্ত সদস্য নেই। আমরা নিজেরা প্রস্তুত করিনি। আমাদের আকাবিরের যামানায় আলেম-উলামার সংখ্যা ছিলো কম। কিন্তু তাদের মুরীদ ও অনুসারী থাকতো বেশুমার। আর আমাদের যামানায় পুরোপুরি এর বিপরীত। পীর-মাশায়েখ অনেক। কিন্তু নিবেদিত প্রাণ তাবেদার কম।” -মুঈনুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩২

বুঝা গেল, এদেশে জিহাদ হোক হুজুর চাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের উদাসীনতায় হুজুর দুঃখবোধ করছেন যে, আমরা জিহাদের

ক্ষেত্র প্রস্তুত করিনি। লোকজনকে বুঝিয়ে এবং তরবিয়ত দিয়ে জিহাদের জন্য ফিদা ও উপযোগী করিনি। এটা আমাদের গাফলতি। এজন্য সামনে বলেছেন,

"আপনা জায়গায় গিয়ে ولینذروا قومهم এর উপর আমল করুন। আপনার নিজ এলাকায় গিয়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করুন। দশ-বিশজন লোক তৈরি করুন। দুই হাজার তালিবুল ইলম ফারেগ হয়ে প্রত্যেকে দশজন করে লোক তৈরি করলে কত হাজার হবে?! এভাবে কাজ করুন এবং লোক তৈরি করুন ....।" -মুঈনুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৮

হুজুর এদেশে জিহাদের জন্য লোক তৈরি করতে বলছেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আড়ালে বড় একটা লক্ষ্য থাকবে, জিহাদের জন্য লোক তৈরি করা। যারা হুজুরের বক্তব্যটি প্রচার করবেন, আমানতদারীর সাথে এ কথাটিও যেন প্রচার করেন।

হুজুরের কামনাই মুজাহিদদের মানহাজ

আপনি যদি আলকায়েদার মানহাজ জেনে থাকেন, তাহলে

আশাকরি আপনার কাছে স্পষ্ট যে, হুজুর যে পদ্ধতিতে বাংলাদেশসহ গোটা হিন্দুস্তানে জিহাদের কাজে এগিয়ে যেতে বলছেন, ঠিক সে মানহাজেই আলকায়েদা এগুচ্ছে। এদেশে আলকায়েদা অনেকদিন যাবত কাজ করছে। তাদের এতদিনের কাজের মূল ফোকাস, মুসলিম জনসাধারণের মাঝে জিহাদসহ দিনের সহীহ ইলম পুনর্জীবিত করা। দ্বীন ও জিহাদের সহীহ বুঝ পয়দা করা। এজন্য মুনাসিবমতো অল্প দু'চারটা সামরিক অভিযান ব্যতীত আলকায়েদার সামরিক কোনো অভিযান এ দেশে নেই। এতে অনেক ভাই যদিও নারাজ যে, শুধু দাওয়াত আর দাওয়াত! দাওয়াত কত দিন চলবে? কাজ হবে কোন দিন?? –কিন্তু মুজাহিদিনে কেরাম সবরের সাথে সে দাওয়াতের কাজই করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি যতটুকু সম্ভব হচ্ছে আস্কারি ই'দাদ করে যাচ্ছেন। ঠিক এ মানহাজটির কথাই হুজুর বলেছেন।

পক্ষান্তরে যারা জিহাদের কোনো কাজই করেন না কিন্তু নাম দিয়ে বসেন মুজাহিদ, কিংবা এমনি এমনি বসে বসে অনর্থক লাফালাফি করেন, হুজুর তাদের বিরোধীতা করেছেন। বলছেন, এসব ছেড়ে যেন কাজের কাজে হাত দেয়া হয়। জনবল তৈরি

করা হয়। জিহাদের অন্যান্য প্রস্তুতি যেন নেয়া হয়; ঠিক যে কাজটি মুজাহিদিন করে যাচ্ছেন।

অতএব, হুজুরের বক্তব্যকে যারা জিহাদ ও মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চান, দয়া করে আমানতদারীর সাথে যেন সঠিকভাবে প্রচার করেন। নিজের বুঝ মতো বা নিজের মতলব হাসিলের মতো করে যেন প্রচার না করেন।

হাঁ, মাসআলাগত কিছু বিষয় আছে, যেগুলোতে হুজুরের সাথে দ্বিমত হতে পারে। তদ্রূপ বর্তমান আলকায়েদার কাজের সঠিক মানহাজ ও রূপরেখাও হয়তো হুজুরের সামনে নেই। থাকলে হয়তো কথাগুলো আরও একটু ভিন্নরূপে বলতেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৭৩.মুরতাদ বাহিনীর সদস্যদেরকে কি মুরতাদ বলা যাবে? তাদের মধ্যে যারা সরাসরি যুদ্ধে নামে না তাদের বিধান কি?

প্রশ্ন-১: পাকিস্তানী, আফগানী, ইরাকী এবং এ জাতীয় অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদেরকে কি মুরতাদ বলা যাবে, যখন তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা মুরতাদ নয়? যদি বলা জায়েয হয় তাহলে এর দলীল কি?

প্রশ্ন-২: পাকিস্তানী বাহিনীর যে অফিসার কিংবা সৈনিক সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয় না, এমনকি বাহিনীকে যুদ্ধে সহায়তা করা থেকেও বিরত থাকে তার কি বিধান? শুধু বাহিনীকে চাকরিরত কিংবা সম্পৃক্ত থাকাটাই কি রিদ্দাহ্ বলে গণ্য হবে?

==

উত্তর: যেসব বাহিনীর কথা আপনি উল্লেখ করেছেন সেগুলো

মুরতাদ তাগুত হুকুমতের অধিনস্থ। **মূলত এদের বিধান কুফর ও রিদ্দাহই।** কেননা, এরাই তাগুতদেরকে সহায়তা করে, সমর্থন দেয়। তাদের শাসনের ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। মানব রচিত আইন কানুন এবং কুফরী সংবিধানকে বুলেট বোমার জোরে বাস্তবায়িত করে। মুজাহিদ, দাঈ এবং তাওহীদপন্থীদেরকে কতল করে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন সুস্পষ্ট কুফরীতে তারা লিপ্ত হয়। অতএব, যে কেউ এসব বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবে সেই কাফের, মুরতাদ; তার কাজ তাতে যাই হোক না কেন। তাকে মুরতাদ বলা যাবে।

এদেরকে মুরতাদ বলা জায়েয হওয়ার দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী- {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (আপনি বলুন, হে কাফেররা!) (কাফিরূন-১)।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাফেরদেরকে যে নাম দিয়েছেন সে নামেই তাদেরকে সম্বোধন করার জন্য তিনি তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন। আর মুরতাদ তো হচ্ছে যে মুসলমান হওয়ার পর কাফের হয়ে যায়। কাজেই এ সম্বোধনে সেও অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতএব, এসব বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের উপর এই বিধান বর্তাবে। তাগুত বাহিনীর সৈনিকের মূল যে বিধান যুদ্ধ না করার কারণে কেউ তার আওতাবহির্ভূত হবে না। কেননা, উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত- মুহারিব [যোদ্ধা] দলগুলোতে সরাসরি অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তি আর তাতে সহযোগীতাকারীর বিধান একই।

আর যা বলা হয় যে, এসব বাহিনীর মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিও রয়েছে যারা হুকুমতকে সহায়তা করে না, তার সাথে বন্ধুত্ব করে না, মানব রচিত কানুনের সহায়তা করে না... ইত্যাদী ইত্যাদী যা বলা হয় তা মূলত খেয়াল-কল্পনাপ্রসূত কথা এবং বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। এর কোনও প্রমাণ নেই। বাস্তবতা বরং এর বিপরীত। আর যদি ধরে নেয়াও হয় যে, এমন কিছু লোক রয়েছে, তবুও এতটুকু তো অবশ্যই বলতে হবে যে, তাগুতরা যে নাফরমানী করছে এসব লোক ইচ্ছাকৃতভাবে সেক্ষেত্রে তাগুতদের দল ভারী করছে। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের দল ভারী করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ইমাম নববী রহ. বলেন, **“যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের দল ভারী করে, বাহ্যিক দুনিয়াবী শাস্তির বেলায় তার উপর**

তাদেরই বিধান প্রযোজ্য হবে।”

তাছাড়া যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এসব বাহিনীর মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা যুদ্ধে অংশও নেয় না এবং বাহিনীকে যুদ্ধে কোনরূপ সহায়তাও করে না, আর তাদের মাঝে গ্রহণযোগ্য মাওয়ানেয়ে তাকফীরের কোন একটা বিদ্যমান রয়েছে এবং আমরা সেটা তাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে বলে নিশ্চিত হতে পারি- তাহলে আমরা তাদেরকে তাকফীর করবো না। **তবে যদি মানেয়ে তাকফীর দূর হয়ে যায় আর এরপরও তারা বাহিনীতে থাকে তাহলে সুনিশ্চিতভাবে কাফের হয়ে যাবে।** আর যদি বাহিনী থেকে বের হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে নাজাত দিয়ে দিলেন। আমাদের কাছে এটাই পছন্দনীয়। **আর যদি তাদের মাঝে কোন মানেয়ে তাকফীর রয়েছে বলে আমরা জানতে না পারি তাহলে তাদের ক্ষেত্রে মূল এটাই যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরী কাজে তাগুতদের সহযোগী। কাজেই তাগুত বাহিনীর হুকুম তাদের উপর বর্তাবে।**

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

(الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا)

(যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়। আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। কাজেই তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।)

এ বিষয়ে যদি আরো দলীল প্রমাণ সহ বিস্তারিত দেখতে চান তবে আমি আপনাকে শায়খ সুলায়মান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. লিখিত **'আদ-দালায়িল ফী হুকমি মুআলাতি আহলিল ইশরাক'** কিতাবখানা চিন্তা-ফিকিরের সাথে পড়ার উপদেশ দেব। আপনার অনুরূপ প্রশ্নের জওয়াবেই তিনি কিতাবখানা লিখেছিলেন। লিখক তাতে মাজার এবং মানব রচিত কানুনের সংরক্ষকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে এবং তাদের বাহিনীতে যোগ দেয় তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে দলীল প্রমাণ জমা করেছেন। ওয়া বিল্লাহি তাআলাত্ তাওফীক!

উত্তর প্রদানে: শায়খ আবুল ওয়ালীদ আল-মাকদিসি

শরয়ী বিভাগ, মিম্বারুত তাওহীদ।

৭৪.মুসলিম খলিফার অপসারণের বিধান!

এক ভাই প্রশ্ন করেছেন, যার খোলাসা:

(মুসলিম খলিফা বা আমীর যদি এমন কোন সিদ্ধান্ত নেন, যা উম্মাহর জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে, ফিতনার রাস্তা খুলে দেবে- তাহলে আহলে হল ওয়াল আকদ ও ক্ষমতাশীল নেতৃবৃন্দ তাকে অপসারণ করতে পারবেন কি'না?)

ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদানকল্পেই আমার এ লেখা।

প্রথমে এখানে কয়েকটি মূলনীতি বুঝে নেয়া চাই-

- আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীতে কারোও আনুগত্য বৈধ নয়। কাজেই ইমাম যদি এমন কোন কাজের আদেশ দেন, যা শরীয়ত বিরোধি- তাহলে তা মান্য করা জায়েয হবে না, বরং শরীয়তের আদেশের উপরই অটল অবিচল থাকতে হবে।

- ইমাম নিয়োগ দেয়া হয় উম্মাহর দ্বীনি ও দুনিয়াবি মাসলাহাত দেখাশুনার জন্য। কাজেই ইমামের দ্বারা যদি মুসলিম উম্মাহর দ্বীন ও দুনিয়ার মাসলাহাত অর্জন ও সংরক্ষিত হওয়ার পরিবর্তে বরং তা নষ্ট হয়, তাহলে সেই ইমাম আর ইমামের আসনে থাকার যোগ্য থাকে না।

উম্মাহর মাসলাহাত নষ্ট হতে পারে কয়েক কারণে-

ইমামের ফিসক ও জুলুমের কারণে।

ইমামের অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতার কারণে (যদিও ইমাম পরহেযগার ও মুত্তাকী ব্যক্তি হয়।)
ইমামের অক্ষমতা ও ক্ষমতাহীনতার কারণে (যদিও ইমাম পরহেযগার ও মুত্তাকী ব্যক্তি হয়।)

এ সকল ক্ষেত্রেই ইমাম আর ইমামতের আসনে থাকার যোগ্য থাকে না, বরং বরখাস্ত করার করার উপযুক্ত হয়ে পড়ে।

- বরখাস্তের উপযুক্ত হয়ে পড়া আর তার বিরোদ্ধে স্বশস্ত্র বিদ্রোহ করে তাকে বরখাস্ত করে ফেলা এক জিনিস নয়। বরখাস্তের উপযুক্ত হয়ে পড়ার অর্থ- তিনি এখনও মুসলমানদের ইমাম হিসেবেই বহাল আছেন, তবে মুসলমানদের উচিৎ হল তাকে বরখাস্ত করে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেয়া।

- ইমাম যত দিন ইমাম হিসেবে বহাল আছেন (যদিও ফাসেক ও জালেম হয়; কাফের, মুরতাদ বা তাগুত না হয়) তত দিন তার জন্য দোয়া করতে হবে। শরীয়তসম্মত সকল কাজে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। (তবে শরীয়ত বিরোধি কোন কাজে তাকে সহযোগিতা করা যাবে না, তার শরীয়ত বিরোধি

কোন আদেশ পালন করা যাবে না।) তাকে সুপরামর্শ দিতে হবে। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

- প্রজাসাধারণের উপর জুলুম করলেও খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে বরং জুলুম অত্যাচার সহ্য করে যাওয়ার প্রতি হাদিসে তা'কিদ ও উৎসাহ এসেছে। তবে তা তত দিন, যত দিন তিনি শরীয়ত কায়েম রাখেন; শরীয়তের বুনিয়াদি ও মৌলিক বিধানে কোন পরিবর্তন না আনেন।

- ক্ষমতাধর কোন জালেম ও ফাসেক মুসলিম ইমামকে বরখাস্ত করতে গেলে রক্তপাত অবধারিত। ইসলাম যথাসম্ভব মুসলমানদের পারস্পরিক রক্তপাত এড়িয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেয়।

- যেখানে লাভ-ক্ষতি উভয়টারই সম্ভবনা আছে, ইসলাম সেখানে লাভ যেটাতে তুলনামূলক বেশি সেটা করার আদেশ দেয়, অপরটা বর্জন করার আদেশ দেয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বুঝার পর এবার আসুন প্রশ্নের জওয়াবে-

ইমাম যদি এমন কোন কাজের আদেশ দেন যা শরীয়তে নিষিদ্ধ, কিংবা এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য নিশ্চিত ক্ষতিকর- তাহলে মুসলমানদের প্রথম কাজ হল- দলীল প্রমাণ দিয়ে ইমামকে বুঝানো যে, উক্ত কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ কিংবা উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর। বুঝানোও পর যদি ইমাম তার আদেশ ও সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেন, তাহলে তো আলহামদু লিল্লাহ। কিন্তু দলীল প্রমাণ দিয়ে স্পষ্টরূপে বুঝানোও পরও যদি তিনি তার সিদ্ধানে অটল থাকেন কিংবা জোরপূর্বক উম্মাহকে উক্ত নাজায়েয ও ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করেন, তাহলে উক্ত ইমাম বরখাস্তের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে (তবে এখনও বরখাস্ত হননি।) এমতাবস্থায় মুসলমানদের করণীয় হল-

প্রথমত: উক্ত নাজায়েয ও ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। ইমামকে এ কাজে কোন ধরণের সহায়তা না

করা।

দ্বিতীয়ত: যদি রক্তপাত ছাড়াই তাকে বরখাস্ত করে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেয়া যায়, তাহলে বরখাস্ত করে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেয়া।

তৃতীয়ত: যদি রক্তপাত ছাড়া বরখাস্ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে দেখতে হবে- তাকে বরখাস্ত করাতে মাসলাহাত বেশি, না'কি তাকে বহাল রেখে তার জুলুম অত্যাচার সহ্য করে যাওয়াতে মাসলাহাত বেশি। যদি বরখাস্তের মধ্যে মাসলাহাত বেশি হয়, তাহলে তাকে বরখাস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বরখাস্ত করতে গেলে আরোও বেশি ফেতনা ফাসাদের সম্মুখিন হওয়ার আশঙ্খা থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা, বরং জুলুম অত্যাচার সহ্য করে যাওয়া। যথাসম্ভব আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে সমাজ ও খলিফাকে সংশোধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

বি.দ্র-১:

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস স্বাক্ষী- এ পর্যন্ত যত জালেম মুসলিম শাসককে অপসারণ করতে বিদ্রোহ করা হয়েছে, সবগুলোতেই লাভের বদলে ক্ষতি হয়েছে। তাই আহলে হল ওয়াল আকদকে বিষয়টি অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে বিবেচনা করে দেখতে হবে। যদি বিদ্রোহের মধ্যে লাভটা নিশ্চিত না হয়, তাহলে বিদ্রোহ না করা চাই। তবে ইতিহাসের আলোকে বলা যায়- সাধারণত এসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহের দ্বারা ফায়েদা হবে না। তাই বিদ্রোহ না করে অন্য উপায়ে (যেমন- মজলিসে শূরার মাধ্যমে) বরখাস্ত করার চেষ্টা করা উচিৎ। যদি বরখাস্ত সম্ভব না হয়, তাহলে ইসলাহের চেষ্টা করে যাওয়া উচিৎ। এতেই ইনশাআল্লাহ মাসলাহাত।

বি.দ্র-২:

উপরোক্ত বিধান মুসলিম খলিফার ব্যাপারে। পক্ষান্তরে খলিফা যদি মুরতাদ হয়ে যায় (যেমন- বর্তমান শাসকগোষ্ঠী) তাহলে উক্ত বিধান নয়। বরং মুরতাদ হওয়ার সাথে সাথে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যাবে। তাকে আর ক্ষমতায় বহাল রাখা যাবে না। যতই রক্তপাত হোক, তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কখন, কিভাবে করা হবে- সেটা উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভেবে দেখবেন। তাদের

নির্দেশনা অনুযায়ী তখন কাজ করে যেতে হবে। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আ'লাম!

[যদি আমার লেখায় কোন ভুল হয়ে থাকে, তাহলে কোন ভাই শুধরিয়ে দিলে আমি বড়ই কৃতজ্ঞ থাকবো।]

৭৫.মুসলিম গণহত্যা: জিহাদ ত্যাগের ভয়াবহ পরিণতি!

কয়েক দিন পূর্বে এক ভাই (গণহত্যা) শিরোনামে একটা পোস্ট দিয়েছেন। তাতে তিনি কয়েকটা আয়াত ও হাদিস এনে দেখাতে চেষ্টা করেছেন- আরাকান, কাশ্মির সহ অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে চলমান গণহত্যার মূল কারণ- জিহাদ ছেড়ে দেয়া। আমরাও যদি জিহাদ ছেড়ে বসে থাকি, তাহলে আমাদের উপরও এই গণহত্যা আপতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

আরেক ভাই এ লেখাটাকে একটু তাহকীক ও পরিমার্জন করে দেয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। এর ভিত্তিতেই আমার এ লেখা। মূল কথা ভাইয়ের লেখায় এসে গেছে। আমি আরেকটু

তাহকীকের সাথে বিষয়টা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে কবুল করুন।

কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট বিধৃত হয়েছে যে, জিহাদ ছেড়ে দিলে মুসলমানদের উপর আযাব-গজব, শাস্তি-অপমান আর লাঞ্ছনা নেমে আসবে। আখেরাতের আযাব তো আছেই, দুনিয়াতেই তাদের উপর এগুলো আপতিত হবে। তাদের শত্রুরা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে। আর কাফেররা যদি কখনো মুসলমানদের বাগে পায়, তাহলে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাবে। তাদেরকে অপদস্ত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)}

“কিভাবে (তোমরা তাদের বিশ্বাস করবে)? এরা যদি কখনো তোমাদের উপর জয় লাভ করতে পারে, তাহলে তারা (যেমনি) আত্মীয়তার বন্ধনের তোয়াক্কা করবে না, (তেমনি) চুক্তির মর্যাদাও তারা দেবে না। তারা (শুধু) মুখ দিয়ে তোমাদের খুশি রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের অন্তরগুলো সেসব কথা

(কিছুতেই) মেনে নেয় না। মূলত এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অবাধ্য। এরা আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ সামান্য (বৈষয়িক) মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে এবং মানুষকে তাঁর পথ থেকে দূরে রেখেছে। তারা যা করছে, নিশ্চয়ই তা বড় জঘন্য কাজ। (কোনো) ঈমানদার লোকের ব্যাপারে এরা (যেমন) আত্মীয়তার ধার ধারে না, (তেমনি) কোন অঙ্গীকারের মর্যাদাও এরা রক্ষা করে না। মূলত এরাই সীমালঙ্গনকারী।” (তাওবা: ৮-১০)

অন্যত্র ইরশাদ করেন-

{إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ}

“(তাদের চরিত্র হচ্ছে এই যে) যদি এরা তোমাদের কাবু করতে পারে, তাহলে এরা তোমাদের মারাত্মক শত্রুতে পরিণত হবে। (শুধু তাই নয়) নিজেদের হাত ও কথা দিয়ে তোমাদের তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে। (আসলে) এরা এটাই চায় যে, তোমরাও তাদের মতো কাফের হয়ে যাও।” (মুমতাহিনা: ২)

এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের এ হীন চরিত্রের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

এই সীমালঙ্গনকারী, অবাধ্য, পাপাচারি ও হীন চরিত্রের কাফেরদের দমানোর জন্য আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন-আনুগত্য পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” (আনফাল: ৩৯)

{فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

“অত:পর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়: তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (তাওবা: ৫)

{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}

“তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।” (তাওবা: ২৯)

এখন যদি মুসলমানরা আল্লাহর আদেশের মূল্য না দিয়ে জিহাদ ছেড়ে দুনিয়ার সুখ-শান্তি আর আরাম-আয়েশে লিপ্ত হয়, তাহলেই দেখা দেবে বিপত্তি। তাদের দুশমনরা তাদের উপর চেপে বসবে। তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাবে। তাদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করবে। তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করবে। এ ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদিসে সতর্কবাণী এসেছে। এখানে আমি কয়েকটা আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করছি:

আয়াত

আয়াত-১:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তাহলে তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওম আনয়ন করবেন। তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

(তাওবা: ৩৮-৩৯)

এ আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যদি তোমরা প্রয়োজনের সময় জিহাদে বের না হও, তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। এ শাস্তি

আখেরাতে যেমন আসবে, দুনিয়াতেও আসবে।

আল্লামা সা'দী রহ. (মৃত্যু: ১৩৭৬হি.) বলেন,

{ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} في الدنيا والآخرة. اهـ

"যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তাহলে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন।" (তাফসীরে সা'দী: ৩৩৭)

আল্লামা নাসাফী রহ. (মৃত্যু: ৭১০হি.) বলেন,

أوعدهم بعذاب أليم مطلق يتناول عذاب الدارين وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قوما آخرين خير منهم وأطوع. اهـ

"আল্লাহ তাআলা (দুনিয়া বা আখেরাত- এর কোন একটার মাঝে সীমাবদ্ধ করণ ব্যতীত) নিঃশর্ত আযাবের ধমকি দিয়েছেন, যার মাঝে দুনিয়া-আখেরাত উভয় আযাবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি (এও জানিয়েছেন যে, তিনি) তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। তাদের স্থলে অন্য জাতি আনয়ন করবেন, যারা তাদের চেয়ে উত্তম এবং তাদের চেয়ে আল্লাহ তাআলার অধিক আনুগত্যশীল হবে।" (তাফসীরে নাসাফী: ১/৬৮০)

ইবনে আশূর রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) মত ব্যক্ত করেছেন, এ আয়াতে বিশেষভাবে দুনিয়াবি শাস্তির কথাই বলা হয়েছে। কারণ, এ আয়াতে জিহাদ ছেড়ে দেয়ার দুটি পরিণতির কথা বলেছেন-

১. আল্লাহর আযাব আপতিত হবে।

২. তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন।

এ দুটি পরিণতির কথা একই আয়াতে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আর অন্য জাতি সৃষ্টি যেহেতু দুনিয়াতেই হবে, তাই তার সাথে উল্লেখিত আযাবও দুনিয়াতেই আসবে। আর এ আযাব হবে- কাফেরদের বিজয় এবং মুসলমানদের গণহত্যা।

ইবনে আশূর রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন,

وقيل: المراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا كقوله: أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا [التوبة: 52] ... وقد يرجح هذا الوجه بأنه قرن بعواقب دنيوية في قوله: ويستبدل قوما غيركم ... فالمقصود تهديدهم بأنهم إن تقاعدوا عن النفير هاجمهم العدو في ديارهم فاستأصلوهم وأتى الله بقوم غيرهم. اه

“বলা হয়, আয়াতে ‘যন্ত্রণাদায়ক আযাব’ দ্বারা উদ্দেশ্য- দুনিয়াতেই শাস্তি আপতিত হবে, যেমন- আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে দুনিয়াবি শাস্তি উদ্দেশ্য:

{أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا}

‘তোমাদের ব্যাপারে আমরা প্রতিক্ষায় আছি: আল্লাহ তাআলা হয়তো নিজ হাতে তোমাদের শাস্তি দেবেন, নতুবা আমাদের হাত দিয়ে (তোমাদের উপর শাস্তি পৌঁছাবেন)। (তাওবা: ৫২)

এ ব্যাখ্যাটি এ দিক থেকে অগ্রাধিকার পায় যে, আল্লাহ তাআলার বাণী- ‘তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওম আনয়ন করবেন’ এর মাধ্যমে দুনিয়াবি যে শাস্তির কথা বিধৃত

করেছেন, এরই সাথে একে উল্লেখ করেছেন। ... উদ্দেশ্য- যদি তারা জিহাদে বের না হয়ে বসে থাকে, তাহলে তাদের শত্রুরা তাদের দেশে আক্রমণ করে তাদেরকে সমূলে হত্যা করবে। তখন আল্লাহ তাআলা (দ্বীনের নুসরত ও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) অন্য এক জাতি আনয়ন করেবেন।” (আত-তাহরিরু ওয়াত-তানভীর: ১০/১৯৯)

আয়াত-২:

{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}

“বলুন (হে নবী!) তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ- যদি (এগুলো) তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা

অপেক্ষা কর আল্লাহ তাআলার (পক্ষ থেকে তাঁর আযাবের) ঘোষণা আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।” (তাওবা: ২৪)

এসব জিনিস জিহাদের চেয়ে প্রিয় হওয়ার অর্থ- এগুলোর কারণে জিহাদ ছেড়ে দেয়া। আর যখন জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখনই আল্লাহ তাআলার আযাব আপতিত হবে। আযাব বিভিন্নভাবে আসতে পারে: আসমানী মুসিবতও হতে পারে, আবার কাফেরদের হাতে নিষ্পেষিত হওয়ার মাধ্যমেও হতে পারে, যেমনটা ১ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

আল্লামা আলূসি রহ. (মৃত্যু: ১২৭০হি.) বলেন,

فَتَرَبَّصُوا أي انتظروا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ أي بعقوبته سبحانه لكم عاجلا أو آجلا على ما روي عن الحسن. اهـ آ:2\409

“হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত (আয়াতের অর্থ): তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাআলার শাস্তির, দুনিয়াতে কিংবা আখিরাতে।” (রুহুল মাআনী: ২/৪০৯)

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন,

أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله ... أي: إن كانت هذه الأشياء (أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ...في سبيله فتربصوا) أي: فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛

وروى الإمام أحمد، وأبو داود –واللفظ له –من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني، عن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". اهـ

“যারা নিজেদের পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদের উপর অগ্রাধিকার দেবে, তাদেরকে শাস্তির হুঁশিয়ারি শুনাতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আদেশ দিয়েছেন। ... অর্থাৎ যদি এ সকল বিষয় তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর ঐ মর্মন্তুদ আযাব ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির, যা তোমাদের উপর আপতিত হবে। ...

ইমাম আহমদ রহ. এবং আবু দাউদ রহ. হযরত ইবনে উমার রাদি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- ‘যখন তোমরা সুদি কারবারে লিপ্ত হবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, কৃষি কাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে- তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন লাঞ্চনা। যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ তোমাদের থেকে তা দূর করবেন না।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১২৪)

আয়াত-৩:

{ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

“তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর। (অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না। আর ইহসান (সুকর্ম) কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিন(সুকর্মশীল)দেরকে ভালোবাসেন।” (বাক্বারা: ১৯৫)

অর্থাৎ তোমরা যদি অর্থ-সম্পদ অর্জনের দিকে মনোনিবেশ কর, সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখ, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে তা ব্যয় না কর, তাহলে কাফেররা তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। কাজেই জিহাদ ছেড়ে অর্থ-সম্পদের দিকে মনোনিবেশ করে নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযি রহ. বর্ণনা করেন-

عن أبي عمران التجيبي قال: "غزونا من المدينة نريد القسطنطينية , وعلى أهل مصر عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأخرج الروم إلينا صفا عظيما منهم وألصقوا ظهورهم بحائط المدينة

فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر , فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم , فصاح الناس وقالوا: مه , مه؟ , لا إله إلا الله , يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس , إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل , وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار , لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه , قال بعضنا لبعض - سرا دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أموالنا قد ضاعت , وإن الله قد أعز الإسلام , وكثر ناصروه , فلو أقمنا في أموالنا , فأصلحنا ما ضاع منها , فأنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - يرد علينا ما قلنا: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فكانت التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها , وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب شاخصا يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية" [جامع الترمذي: 2972]

“আবু ইমরান আত-তুজিবি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুসতুনতুনিয়ার জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। তখন মিশরের গভর্নর ছিলেন হযরত উকবা ইবনে আমের রাদি.। আমাদের জামাতের আমির ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রহ.। রোমবাসী আমাদের বিরুদ্ধে তাদের বিশাল এক বাহিনী পাঠাল। তারা তাদের শহরের দেয়ালের দিকে পশ্চাত করে তাদের সারি সাজালো। তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের থেকে তেমনই কিংবা তার চেয়েও বড় এক বাহিনী বের হল। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি রোমানদের বিশাল সারিতে একাই হামলা করে বসল

এবং তাদের সারির একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে গেল (যার ফলে তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল)। তখন লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগলো- '(কি কর?) থাম! থাম! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এ ব্যক্তি নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছে।' তখন আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'ওহে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতের এই ব্যাখ্যা করছো। (তোমাদের ব্যাখ্যা সঠিক নয়।) এ আয়াত তো আমরা আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন ইসলামকে শক্তিশালী করলেন, তার সাহায্যকারীও অনেক হয়ে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগোচরে আমাদের একে অপরকে বললো- আমাদের ধন-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীও তৈয়ার হয়েছে অনেক। কাজেই আমরা যদি (কিছু দিন জিহাদ বন্ধ রেখে) আমাদের ধন-সম্পদের কাছে অবস্থান করে সেগুলোর পরিচর্যা করতাম! তখন আমাদের এই মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাআলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ আয়াত নাযিল করলেন-

{وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}

"তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর।

(অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না।”

অতএব, ধ্বংসে নিক্ষেপ করার অর্থ- জিহাদ ছেড়ে আমাদের ধন-সম্পদের পরিচর্যায় লিপ্ত হওয়া।’

আবু ইমরান রহ. বলেন, এরপর থেকে আবু আইয়ূব আনসারি রাদি. সর্বদা জিহাদেই লিপ্ত থাকেন। অবশেষে যখন শহীদ হলেন, তখন কুসতুনতুনিয়াতে তাকে দাফন করা হয়।” (জামে তিরমিযি: হাদিস নং ২৯৭২)

হাদিস

হাদিস-১:

عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ترك قوم الجهاد , إلا عمهم الله بالعذاب" [المعجم الأوسط للطبراني: 3839؛ الترغيب والترهيب: 2158، قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن]

“হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে জাতিই জিহাদ ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন।” (মু’জামে

ত্ববরানী: ৩৮৩৯)

এই ব্যাপক আযাব গণহত্যার সূরতেও হতে পারে।

হাদিস-২:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عيه وسلم قال: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" [ابو داوود: 3464]

"হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে বর্ণিত যে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 'যখন তোমরা সুদি কারবারে লিপ্ত হবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, কৃষি কাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে- তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন লাঞ্চনা। যতক্ষণ তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ তোমাদের থেকে তা দূর করবেন না।" (সুনানে আবু দাউদ: ৩৪৬৪)

কৃষি কাজে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ- কৃষি কাজসহ অন্যান্য দুনিয়াবি কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে জিহাদ ছেড়ে দেয়া। তখনই তা লাঞ্চনার কারণ হবে। যেমন, বুখারী শরীফের হাদিসে এসেছে-

হাদিস-৩:

عن أبي أمامة الباهلي – رضي الله عنه – قال – ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: " لا يدخل هذا بيت قوم – إلا أدخله الله الذل " [صحيح البخاري: 2321]

“হযরত আবু উমামা বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একদা একটা লাঙ্গলের ফলা এবং আরো কয়েকটা কৃষি-যন্ত্র দেখে বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এগুলো যে ঘরেই প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা সেখানেই লাঞ্ছনা ঢুকিয়ে দেবেন।” (সহীহ বুখারী: ২৩২১)

২ নং হাদিসে দ্বীনে ফিরে আসার দ্বারা উদ্দেশ্য- সুদি কারবার বর্জন করা এবং জিহাদের পথে বাধা এমন সব দুনিয়াবি পেশা-কর্ম বাদ দিয়ে আবার জিহাদে ফিরে আসা। যেমন, মুসনাদে আহমদের এক হাদিসে এসেছে-

হাদিস-৪:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه" [المسند للإمام أحمد: 5007]

“যদি তোমরা জিহাদ ছেড়ে দিয়ে গরুর লেজ ধরে পড়ে থাক এবং সুদি কারবারে লিপ্ত হও, তাহলে আল্লাহ তাআলা

তোমাদের ঘাড়ে এমন এক লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, যা তোমাদের থেকে দূর হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আস।" (মুসনাদে আহমদ: ৫০০৭)

হাদিস-৫:

عن أبي أمامة الباهلي – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " من لم يغز , أو يجهز غازيا , أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة " [ابو داود: 2505، ابن ماجه: 2762]

"হযরত আবু উমামা বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজেও যুদ্ধ করেনি, কোন যুদ্ধাকে জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করেও দেয়নি এবং উত্তমভাবে কোন মুজাহিদের পরিবারের দেখাশুনাও করেনি, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের পূর্বেই তাকে কোন ধ্বংসাত্মক বিপদে নিপতিত করবেন। (আবু দাউদ: ২৫০৫)

হাদিস-৬:

عن أبي عمران التجيبي قال: "غزونا من المدينة نريد القسطنطينية , وعلى أهل مصر عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأخرج الروم إلينا صفا عظيما منهم وألصقوا ظهورهم بحائط المدينة

فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر , فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم , فصاح الناس وقالوا: مه , مه؟ , لا إله إلا الله , يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس , إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل , وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار , لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه , قال بعضنا لبعض - سرا دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أموالنا قد ضاعت , وإن الله قد أعز الإسلام , وكثر ناصروه , فأنزل الله على نبيه - صلى الله , فلو أقمنا في أموالنا , فأصلحنا ما ضاع منها عليه وسلم - يرد علينا ما قلنا: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فكانت التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها , وندع الجهاد قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب شاخصا يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية" [جامع الترمذي: 2972]

“আবু ইমরান আত-তুজিবি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুসতুনতুনিয়ার জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। তখন মিশরের গভর্নর ছিলেন হযরত উকবা ইবনে আমের রাদি.। আমাদের জামাতের আমির ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রহ.। রোমবাসী আমাদের বিরুদ্ধে তাদের বিশাল এক বাহিনী পাঠাল। তারা তাদের শহরের দেয়ালের দিকে পশ্চাত করে তাদের সারি সাজালো। তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের থেকে তেমনই কিংবা তার চেয়েও বড় এক বাহিনী বের হল। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি রোমানদের বিশাল সারিতে একাই হামলা করে বসল

এবং তাদের সারির একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে গেল (যার ফলে তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল)। তখন লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগলো- '(কি কর?) থাম! থাম! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এ ব্যক্তি নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছে।' তখন আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'ওহে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতের এই ব্যাখ্যা করছো। (তোমাদের ব্যাখ্যা সঠিক নয়।) এ আয়াত তো আমরা আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন ইসলামকে শক্তিশালী করলেন, তার সাহায্যকারীও অনেক হয়ে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগোচরে আমাদের একে অপরকে বললো- আমাদের ধন-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীও তৈয়ার হয়েছে অনেক। কাজেই আমরা যদি (কিছু দিন জিহাদ বন্ধ রেখে) আমাদের ধন-সম্পদের কাছে অবস্থান করে সেগুলোর পরিচর্যা করতাম! তখন আমাদের এই মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাআলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ আয়াত নাযিল করলেন-

{وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}

"তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর।

(অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না।”

অতএব, ধ্বংসে নিক্ষেপ করার অর্থ- জিহাদ ছেড়ে আমাদের ধন-সম্পদের পরিচর্যায় লিপ্ত হওয়া।’

আবু ইমরান রহ. বলেন, এরপর থেকে আবু আইয়ূব আনসারি রাদি. সর্বদা জিহাদেই লিপ্ত থাকেন। অবশেষে যখন শহীদ হলেন, তখন কুসতুনতুনিয়াতে তাকে দাফন করা হয়।” (জামে তিরমিযি: হাদিস নং ২৯৭২)

হাদিস-৭:

عن ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت" [ابو داود: 4299]

“হযরত সাওবান রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন অন্য জাতি-গোষ্ঠীগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে আহ্বান করবে, যেমন খাবার পাত্র সামনে নিয়ে

একে অপরকে ডাকাডাকি করতে থাকে। এক জন জিজ্ঞেস করল, তখন আমাদের সংখ্যার স্বল্পতার কারণে কি এমনটা হবে? তিনি উত্তর দিলেন, (না) বরং তোমরা তখন সংখ্যায় থাকবে অনেক। কিন্তু তোমরা তখন স্রোতে ভাসমান খর-কুটার মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন। আর তোমাদের অন্তরে আল্লাহ ঢেলে দেবেন 'ওয়াহান'। এক জন জিজ্ঞেস করল, 'ওয়াহান' কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি *উত্তর দিলেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং মরণের ভয়।" (আবু দাউদ: ৪২৯৯)

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

[يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق" [المسند للامام أحمد: 22397"

"অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে অন্য জাতি-গোষ্ঠীগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে আহ্বান করবে।" (মুসনাদে আহমদ: ২২৩৯৭)

মরণের ভয় দ্বারা যুদ্ধ-জিহাদে অনিহা এবং শহীদি মরণের ভীতি উদ্দেশ্য। যেমন, মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় এসেছে-

قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال" [المسند " للامام أحمد: 8713]

“সাহাবগণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘ওয়াহান’ কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি *উত্তর দিলেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং যুদ্ধের প্রতি অনিহা।” (মুসনাদে আহমদ: ৮৭১৩)

اللهم احفظنا من كلّ بلاء في الدنيا وعذاب في الآخرة، وجنِّبنا مكائد الشيطان والظلم والخيانة والكيد والحسد وغيرها من الآفات برحمتك يا أرحم الراحمين.

৭৬.যুদ্ধের ময়দানে উচ্চস্বরে তাকবিরের বিধান

এক ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন, যার সারমর্ম- মুজাহিদ ভাইয়েরা অপারেশন চলাকালে আল্লাহু আকবার তাকবির দিয়ে থাকেন বা জিকির করে থাকেন বা অনান্য কথাবার্তা বলে থাকেন। অথচ কোনো কোনো হাদিসে যুদ্ধের ময়দানে চুপ থাকার নির্দেশ এসেছে এবং উচ্চস্বরে আওয়াজ অপছন্দ

করা হয়েছে। তাহলে মুজাহিদগণের এ আমলের কি জওয়াব হবে?

উত্তর

যেসব হাদিস বা আসারে জিহাদের ময়দানে আওয়াজ করাকে অপছন্দনীয় বলা হয়েছে, সেগুলোতে বে-ফায়েদা হৈ-হুল্লোর উদ্দেশ্য। তাকবির, তাহলিল, আল্লাহ তাআলার যিকির বা প্রয়োজনীয় আওয়াজ নিষিদ্ধ নয়। বরং জিহাদের ময়দানে আল্লাহ তাআলার যিকির করতে আল্লাহ তাআলা নিজেই আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

“হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনির সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করতে থাক, যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে

কৃতকার্য হতে পার।” (আনফাল: ৪৫)

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন,

وقوله تعالى: { واذكروا الله كثيرا} يحتمل وجهين: أحدهما: ذكر الله تعالى باللسان، والآخر: الذكر بالقلب، وذلك على وجهين: أحدهما: ذكر ثواب الصبر على الثبات لجهاد أعداء الله المشركين وذكر عقاب الفرار؛ والثاني: ذكر دلائله ونعمه على عباده وما يستحقه عليهم من القيام بفرضه في جهاد أعدائه. وضروب هذه الأذكار كلها تعين على الصبر والثبات ويستدعى بها النصر من الله والجرأة على العدو والاستهانة بهم. وجائز أن يكون المراد بالآية جميع الأذكار لشمول الاسم لجميعها. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী- ‘এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করতে থাক’ এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে:
এক. মুখে আল্লাহ তাআলার যিকির করা।
দুই. অন্তরের যিকির। ...
এই সব ধরণের যিকির অটল অবিচল থাকতে সহায়ক হবে। আল্লাহ তাআলার নুসরত লাভ এবং শত্রুর উপর দুঃসাহসিকতা দেখানো ও তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মাধ্যম

হবে।

আয়াতের দ্বারা সব ধরণের যিকিরই উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, যিকির শব্দ সব ধরণের যিকিরকেই বুঝায়।" (আহকামুল কুরআন: ৩/৮৬)

অতএব, মনে মনে যেমন আল্লাহ তাআলাকে স্বরণ করবে, মুখে মুখেও আল্লাহ তাআলার যিকির করবে। এর দ্বারা দৃঢ়তা পয়দা হবে। ময়দানে টিকে থাকা সহজ হবে। অন্য মুমিনদের অন্তর শক্তিশালী হবে।

খায়বারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাকবীর ধ্বনি দিয়েছেন- الله أكبر خربت خيبر 'আল্লাহু আকবার! খায়বারের ধ্বংস সুনিশ্চিত'। -সহীহ বুখারি ২৮২৯

ইমাম বুখারি রহ. এ হাদিসের উপর এ বাব কায়েম করেছেন-

باب التكبير عند الحرب

"যুদ্ধে তাকবির প্রদান সংক্রান্ত বাব।"

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২হি.) এর ব্যাখ্যা বলেন,

أي جوازه أو مشروعيته
“অর্থাৎ তাকবির বৈধ হওয়া ও বিধিসম্মত হওয়ার আলোচনা সংক্রান্ত বাব।” -ফাতহুল বারি ৬/১৩৪

হাদিসে এসেছে, শেষ যামানায় কুস্তুনতুনিয়া বিজয় হবে তাকবির ধ্বনির মাধ্যমে। সাহাবায়ে কেরাম থেকেও তাকবির প্রমাণিত।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯হি.) বলেন (সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যাসহ),

ولا يستحب رفع الصوت في الحرب من غير أن يكون ذلك مكروها من وجه الدين. ولكنه فشل، فإن كان فيه تحريض ومنفعة للمسلمين فلا بأس به. يعني أن المبارزين يزدادون نشاطا برفع الصوت، وربما يكون فيه إرهاب للعدو على ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صوت أبي دجانة في الحرب فئة». اهـ

“যুদ্ধের ময়দানে উচ্চস্বরে আওয়াজ করা মুস্তাহাব নয়। অবশ্য শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তা মাকরূহও নয়। তবে তা হীনমন্যতার পরিচায়ক। তবে এর দ্বারা যদি অন্যরা উৎসাহিত হয় বা মুসলিমদের অন্য কোন ফায়েদা হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ উচ্চ আওয়াজের ফলে যোদ্ধাদের মধ্যে স্পৃহা তৈয়ার হবে। এর দ্বারা শত্রুদের মনে ভীতিও তৈয়ার হতে পারে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যুদ্ধে আবু দুজানার আওয়াজ মুজাহিদের এক বাহিনির সমতুল্য।”- শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/৮৯

আপনি এ ব্যাপারে মিম্বারুত তাওহিদের নিচের ফতোয়াটি দেখতে পারেন-

ما حكم رفع الصوت بالذكر والتكبير في المعارك؟ ... رقم السؤال: 618

السلام عليكم ورحمة الله،، ... هل يستحب في ساحات القتال عندما يحمى الوطيس رفع الصوت بالتكبير والتهليل لإرعاب الأعداء أم أنه يكره ذلك؟ ... لأنني وجدت آثاراً أن السلف كانوا يكرهون رفع الصوت في ثلاث مواضع منها القتال ..

السائل: أبو الهيثم الأثري

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ... قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء ... إن عبدي كل الذي) :وفي الحديث المرفوع يقول الله تعالى يذكرني وهو مناجز قرنه) أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي .. وعن قتادة في هذه الآية قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات وذكر الله عند الزحف ثم تلا هذه الآية قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم .. فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم. اهـ[تفسير ابن كثير بتصرف يسير] ... وبوب البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه: "باب التكبير عند الحرب",

وأخرج فيه بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس محمد والخميس فلجؤوا إلى

الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: (الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله:"باب التكبير عند الحرب" أي جوازه أو مشروعيته. اهـ[فتح الباري 6/ 163] ... وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة أصوات يباهي الله عز وجل بهن الملائكة: الأذان والتكبير في سبيل الله, ورفع الصوت بالتلبية) [رواه ابن عساكر] ... وأما مسألة رفع الصوت بالتكبير في القتال فقد رويت في ذلك أحاديث وآثار, وقد جمع بعض أهل العلم شيئاً منها, كالإمام ابن "النحاس الدمياطي رحمه الله في مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق"صفحة 1/ 262 وما بعدها, وأفردها في فصل بعنوان: " فصل في فضل نظر الغازي والمرابط إلى البحر والتكبير في سبيل الله تعالى". ... قال ابن المنذر في كتابه الأوسط: قال أشهب: سألت مالكاً عن رفع الأصوات بالتكبير على الساحل في الرباط بحضرة العدو أو بغير حضرتهم, هل يكره أو يسمع الرجل نفسه؟ فقال: أما بحضرة العدو فلا بأس وذلك حسن, وبغير حضرتهم على الساحل فلا بأس بذلك أيضاً, إلا أن يكون رفعه صوته يؤذي الناس, لا يستطيع أحد أن يقرأ ولا يصلي: فلا أرى ذلك. اهـ ... وقال الليث بن سعد كان من مضى يكبرون في محاربهم يتقوون به على الحرس وسهر الليل, ولم

نر أحداً يعيب ذلك حتى كان حديثاً. اهـ ... وقال ابن القاسم: سئل مالك عن القوم يكونون في الرباط يهللون ويكبرون على الساحل ويطربون بأصواتهم. قال: أما التطريب فلا يعجبني, وأما أن يهللون ويكبرون - يريد إذا كان الحرب - فلا أرى بأساً وأراه حسناً. اهـ[مشارع الأشواق 1/ 268] ... ومما يُستأنس به في هذا الباب, ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها, ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا ..) قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري: (فيفرج لهم) أي فيكشف لهم ويفر العدو .. وهذا الفتح المذكور في هذا الحديث إنما يحصل بهتاف التكبير دون القتال .. اهـ[منة المنعم في شرح صحيح مسلم 4/ 365] ... فيستحب للمجاهد التكبير وذكر الله في المعارك ورفع الصوت بذلك, لما في ذلك من مقاصد شرعية؛ كتثبيت قلوب المؤمنين, وإرعاب الكافرين والمرتدين, وهذا أمر مجرب معروف, والقصص فيه كثيرة مشهورة, والله أعلم.

أجابه، عضو اللجنة الشرعية: ... الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري

৭৭.রাষ্ট্রীয় পদে কাফের: শরীয়ত কি বলে?

মুসলিমের উপর কর্তৃত্ব করার কোনো অধিকার কাফেরের নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

‘আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মু’মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না।’- নিসা: ১৪১

আর কোনো কাফেরকে মুসলিমের উপর কর্তৃত্ব দেয়ার অর্থ ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে তাকে পথ করে দেয়া।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

لا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141]. اهـ

"কোন মুসলমানের উপর কোন কাফেরের কোন কর্তৃত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- 'আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মু'মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না'।"- ফাতহুল কাদীর: ৫/২৬৫

এজন্য রাষ্ট্রীয় পদে কাফের নিয়োগ দেয়া হারাম।

অধিকন্তু কাফেরকে বন্ধু ও নৈকট্যভাজনরূপে গ্রহণ করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দীনকে উপহাস ও

খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে, তোমরা তাদেরকে এবং কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মুমিন হয়ে থাক, তাহলে একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই (বন্ধু বানাও এবং তাকেই) ভয় কর।”- মায়েদা ৫৭

কাফেরকে পদ দেয়ার অর্থ তাকে নিকটে টেনে আনা। অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করা। তাকে সম্মান করা।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

وفي هذه الآية دلالة على أن الكافر لا يكون وليا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة; ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم. اهـ

“এ আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফের কোন ক্ষেত্রেই মুসলমানের কর্তৃত্বশীল হতে পারে না। (তার নিজের বা তার মালের উপর) হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রেও না, নুসরতের ক্ষেত্রেও না। এও বুঝাচ্ছে যে, কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদের সাথে দুশমনি পোষণ করা আবশ্যক।”- আহকামুল কুরআন ২/৫৫৫

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১ হি.) বলেন,

ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا . اهـ

“যেহেতু পদে নিয়োগ দেয়া বন্ধুরূপে গ্রহণ করারই সমগোত্রীয়, তাই কাফেরদেরকে কোন পদে নিয়োগ দেয়াও তাদের সাথে এক প্রকার বন্ধুত্ব। আর আল্লাহ তাআলা ফায়সালা দিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হবে না। আর বন্ধুরূপে গ্রহণ করা সম্পর্কচ্ছেদের পরিপন্থী। সম্পর্কচ্ছেদ আর বন্ধুত্ব কখনই একত্র হতে পারে না। বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অর্থই হচ্ছে সম্মান দেয়া। এর সাথে কুফরকে অপদস্তকরণ একত্র হতে পারে না। বন্ধুত্বের অর্থ সম্পর্ক জোড়া। কাফেরের বিরুদ্ধে দুশমনির সাথে এটি কখনই একত্র হতে পারে না।”- আহকামু আহলিযযিম্মাহ ১/২৭৯

ইমাম বায়হাকি রহ. (৪৫৮ হি.) বর্ণনা করেন,

أن أبا موسى رضى الله عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ومعه كاتب نصرانى فأعجب عمر رضى الله عنه ما رأى من حفظه فقال : قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا. قال : إنه نصرانى لا يدخل المسجد. فانتهره عمر رضى الله عنه وهم به وقال : لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل.

"হযরত আবু মূসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আগমন করলেন। তার সাথে তিনি একটা খৃস্টান কেরানী নিয়ে এসেছিলেন। কেরানীটির নিখুঁত হিসাব নিকাশ দেখে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মুগ্ধ হলেন। বললেন, তোমার কেরানীকে বল আমাদেরকে খাতা পড়ে শুনাতে। তিনি জওয়াব দিলেন, সে তো খৃস্টান। মসজিদে প্রবেশ করে না। একথা শুনামাত্র *উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ধমকি দিয়ে উঠলেন; মনে হচ্ছিল যেন তিনি তাকে আঘাতও করবেন; এবং বললেন, 'যখন আল্লাহ তাদের অপমান করেছেন, তখন তোমরা তাদের সম্মান দিয়োও না। যখন আল্লাহ তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, তখন তোমরা তাদের কাছে টেনো না। যখন আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা তাদের খেয়ানতকারী সাব্যস্ত করেছেন, তখন তোমরা তাদের আমানতদার ভেবো না'।"- সুনানে কুবরা বায়হাকি ২০৯১০

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

وذكر في شرح السير الكبير أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين، فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ولا رشوة في دين الله تعالى قال وبه نأخذ فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين {لا تتخذوا بطانة من دونكم} [آل عمران: 118] . اهـ. الدر المختار]

(309 /وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2

শরহুস সিয়ারিল কাবিরে বলা হয়েছে, উমার রাদি. সা'দ বিন আবু ওয়াককাস রাদি.র কাছে ফরমান লিখে পাঠান, 'কোনো মুশরিককে হিসাবরক্ষক পদে নিয়োগ দেবে না। কারণ তারা ঘুষ গ্রহণ করে। আল্লাহর দ্বীনে ঘুষের কোনো স্থান নেই'। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, এটাই আমাদের মাযহাব। কোনো কাফেরকে হিসাবরক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া ইমামুল মুসলিমিনের জন্য নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না'। -রদ্দুল মুহতার: ২/৩০৯

ইবনে নুজাইম রহ. (৯৭০হি.) বলেন,

قال في الغاية: ويشترط في العامل أن يكون حرا مسلما غير هاشمي فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية، ولا يصح أن يكون كافرا؛ لأنه لا يلي على المسلم بالآية، ولا يصح أن يكون مسلما هاشميا لأن فيها شبهة الزكاة اهـ بلفظه

وبه يعلم حكم تولية اليهود في زماننا على بعض الأعمال، ولا شك في حرمة ذلك أيضا. البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 248)

গায়াতুল বায়ান গ্রন্থকার বলেন, উশুর আদায়ের পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য একটা শর্ত হলো মুসলিম হতে হবে। কাজেই কাফের হলে সহীহ হবে না। কারণ, মুসলিমের উপর কাফেরের কোনো কর্তৃত্ব নেই। ... গায়াতুল বায়ান গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে আমাদের যামানায় কোনো কোনো পদে যে ইয়াহুদি নিয়োগ দেয়া হচ্ছে তার হুকুম পরিষ্কার। কোনো সন্দেহ নেই যে, এটাও হারাম। -আলবাহরুর রায়িক: ২/২৪৮

মুহতারাম পাঠক, আশাকরি বুঝতে পেরেছেন, ছোটখাট পদেও কাফের নিয়োগ দেয়া হারাম; বড় বড় পদে কিংবা মন্ত্রী এমপি হয়ে যাওয়া যে আরও আগেই হারাম তা তো স্পষ্টই। আজকাল যেসব মন্ত্রী এমপি ও নেতা নেত্রী মুরতাদ, সেগুলোর

কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু মালউনগুলোর ব্যাপারেও তো কোনো উচ্চবাচ্য শুনি না। প্রশাসনসহ সবগুলো পদ ভরে গেছে মালউন দিয়ে। এরা মুসলিমদের উপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে। কিন্তু আলেম সমাজের দুঃখজনক নীরবতা লক্ষ করছি। কেউ বলছে না, এদেরকে নিয়োগ দেয়া হারাম। কাফের এমপি মন্ত্রী হওয়া হারাম। কেউ বলছে না। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

৭৮.শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল

মুমিনগণ আল্লাহর পথে লড়াই করে। তারা আল্লাহর সৈনিক। তাদের সহায়তা করেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। পক্ষান্তরে কাফেররা লড়াই করে শয়তানের পথে। তারা শয়তানের বাহিনি। তাদের সহায়তা করে শয়তান। আর আল্লাহ তাআলার কৌশলের সামনে শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই বেকার। অতএব, হে মুমিনগণ! ভয় কিসের? আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। শয়তানের বাহিনির বিরুদ্ধে নেমে পড়। আল্লাহ তাআলা শয়তানের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেবেন। তোমাদের সাহায্য করবেন। বিজয় দান করবেন।

***

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)- النساء

“৭৫. তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না আল্লাহর রাস্তায় এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য? যারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে নিন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং নিযুক্ত করে দিন আপনার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যকারী।

৭৬. যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর রাহে

(অতএব, তিনি তাদের বন্ধু এবং তিনি তাদের নুসরত করবেন)। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে (এবং শয়তানের শক্তিতে)। সুতরাং (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে (আল্লাহর শক্তিবলে তোমরাই বিজয়ী হবে)। (আর) শয়তানের চক্রান্ত তো নিতান্তই দুর্বল (আল্লাহর কৌশলের সামনে যার কোনো পাত্তাই নেই)।" -নিসা।

***

৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা জিহাদ আবশ্যক হওয়ার পক্ষে দু'টি কারণ দর্শিয়েছেন:

এক. আল্লাহ তাআলার দ্বীনের বুলন্দি। যেন দুনিয়ার প্রতিটি কাফের হয়তো মুসলমান হয়ে যায়, নয়তো ইসলামী শাসনের অধীনে চলে আসে।

দুই. অসহায়, নির্যাতিত ও বন্দী মুসলমানদের উদ্ধার।

এ দু'টি বিষয়ের প্রত্যেকটিই জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও জিহাদ না করে বসে থাকবে যারা,

আল্লাহ তাআলা তাদের তিরস্কার করেছেন। দুনিয়াবি ও পরকালীন বিভিন্ন আযাব-গজব, শাস্তি ও লাঞ্চনার ঘোষণা দিয়েছেন।

***

৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা একটি বাস্তবতা উন্মোচন করে দিয়ে মুমিনদের হিম্মত যুগিয়েছেন। জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আমরা আয়াতে কারীমাটি আবার লক্ষ করি,

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

“যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর রাহে (অতএব, তিনি তাদের বন্ধু এবং তিনি তাদের নুসরত করবেন)। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে (এবং শয়তানের শক্তিতে)। সুতরাং (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে (আল্লাহর শক্তিবলে তোমরাই বিজয়ী হবে)। (আর) শয়তানের চক্রান্ত

তো নিতান্তই দুর্বল (আল্লাহর কৌশলের সামনে যার কোনো পাত্তাই নেই)।”

প্রথমে বলা হয়েছে, **‘যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর রাহে’।**

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমাদের লড়াই তো হবে আমার দ্বীনের বুলন্দির জন্য। আমার শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য। শয়তানের রাজত্ব খতম করে যমিনে আমার জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য। আর যারা আমার রাস্তায় নিজেদের জান-মাল বিলিয়ে দেবে তারা আমার দোস্ত। আমার বন্ধু। আমার আপনজন।

আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল উৎস্বর্গকারীরা কেনইবা আল্লাহর বন্ধু হবে না, অথচ দুনিয়াতে আমরা তো দেখি কেউ কারো প্রতি আন্তরিক থাকলেই, তার প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ালেই তাকে বন্ধু গণ্য করা হয়। তাহলে যারা আল্লাহর জন্য নিজেদের জান-মাল সব বিলিয়ে দেবে তারা আল্লাহর বন্ধু না

হয়ে পারে কিভাবে? আয়াতের পরের অংশেই এ বাস্তবতাটি তুলে ধরেছেন,

‘যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। সুতরাং (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে’।

যারা তাগুতের পথে তথা শয়তানের পথে লড়াই করে তাদেরকে শয়তানের বন্ধু আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাহলে যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, তারা কেনো আল্লাহর বন্ধু হবে না?!

রাগিব ইস্পাহানি রহ. (৫০২হি.) বলেন,

نبّه أن من قاتل في سبيل الله فهو وليّه. ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو ولي الشيطان. اهـ

“আল্লাহ তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন, যে আল্লাহর পথে কিতাল করে সে আল্লাহর অলী (বন্ধু) আর যে তাগুতের পথে কিতাল করে সে শয়তানের অলী (বন্ধু)।” -তাফসিরে রাগিব

আস্পাহানি ১৩২৬

তাহলে যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহর অলী, আল্লাহর বন্ধু। আর যারা শয়তানের পথে লড়াই করে তারা শয়তানের অলী, শয়তানের বন্ধু। আর বন্ধুর দায়িত্ব বন্ধুকে সহায়তা করা। অতএব, আল্লাহর বাহিনিকে নুসরত করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার আর শয়তানের বাহিনিকে সহায়তা করবে শয়তান।

এবার তাহলে দু'টি পক্ষ হয়ে গেল:

- এক পক্ষে আল্লাহ তাআলা ও তার বাহিনি।
- অপর পক্ষে শয়তান ও তার বাহিনি।

আয়াতে এ বাস্তবতাটিই আল্লাহ তাআলা তার বন্ধুদের সামনে তুলে ধরেছেন। তার বন্ধুদের বলছেন, তোমরা আমার বন্ধু। তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি তোমাদের নুসরত করবো। তোমাদের নুসরত করার

দায়িত্ব স্বয়ং আমার। যেমনটা অন্য একাধিক আয়াতে স্পষ্ট এসেছে,

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

“মুমিনদের নুসরত করা আমার আবশ্যকীয় দায়িত্ব।” -রূম ৪৭

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহবশত নিজের উপর অবশ্য কর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন যে, তিনি তার মুমিন বান্দাদের নুসরত করবেন। আর আল্লাহ তাআলা তার কর্তব্যের বিপরীত করবেন না কিছুতেই।

অন্য আয়াতে বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

“তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের আযাব দেবেন। তাদেরকে অপদস্থ করবেন। তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে নুসরত করবেন এবং মুমিন

কওমের অন্তর জুড়িয়ে দেবেন।” -তাওবা ১৪

আল্লাহ তাআলা তার বন্ধুদের নুসরতে আশ্বস্ত করলেন। আশ্বস্ত করলেন, তিনি তাদের সাথে আছেন। অতএব, ভয়ের কিছু নেই।

***

এবার রয়ে গেল শয়তান। শয়তান তো তার বন্ধুদের নুসরতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। যত রকমের কৌশল করা যায় সবই সে করবে। ভয়ংকর থেকে ভয়ংকর ষড়যন্ত্র পাকাবে। যা দেখে মুমিনের হিম্মতে ভাটা পড়তে পারে। চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মুখে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খেতে পারে। শয়তানের বাহিনি সব সময়ই বড় হয়ে থাকে। বাহ্যিক চাকচিক্য আর সরঞ্জামাদিও থাকে অনেক বেশি। তাদের রয়েছে এমন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যার সামনে গোটা দুনিয়া যেন তুচ্ছ হয়ে পড়েছে। পাহাড়-পর্বতে থাকি: আমরা যেন তাদের হাতের মুটোয়। সমূদ্রের তলদেশও যেন তাদের আওতার বাহিরে নয়। যেমটা আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন,

وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

“আর তাদের চক্রান্ত (ও কৌশল) তো এমন (ভয়ানক) যে, তাতে পাহাড়-পর্বতও টলে যায়।” -ইব্রাহীম ৪৬

এ ভয়ানক পরিস্থিতির মুখে মুমিন কিভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখবে?

আল্লাহ তাআলা অভয় দিচ্ছেন, কোনো ভয় নেই। যত ভয়ানক চক্রান্তই তারা করুক-

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

“কোনো সন্দেহ নেই, (আল্লাহর কৌশলের সামনে) শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল।”

আমার শক্তির সামনে, আমার কৌশলের সামনে তাদের

এসবের কোনোই মূল্য নেই। আমি এদের সব কিছুকে বানচাল করে দেবো। নাস্তানুবাদ করে দেবো। শেষে ফলাফল দাঁড়াবে এমন, যেমনটা আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত সুন্নত-

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

"নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্তের জাল বুনেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের চক্রান্তের প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আঘাত করলেন। এরপর তাদের মাথায় ছাদ ধ্বসে পড়ল তাদের উপর দিক থেকে এবং তাদের উপর আযাব এসে পড়লে এমন স্থান থেকে, যার কল্পনাও তারা করেনি।" - নাহল ২৬

***

এখানে লক্ষণীয় যে, শয়তানের চক্রান্তের অসাড়তা বুঝাতে আল্লাহ তাআলা দু'টি তাকিদ ব্যবহার করেছেন,

এক. إِنَّ

দুই. كَأنَّ

إِنَّ শব্দটি এমন স্থানে ব্যবহার হয়, যেখানে কোনো সন্দেহ-সংশয় হতে পারে। উক্ত সংশয় দূর করে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য إِنَّ ব্যবহার হয়।

আয়াতে إِنَّ ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা বুঝিয়েছেন, শয়তানের চক্রান্ত যে দুর্বল এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর আল্লাহর ভাষায় যাকে সন্দেহাতিত দুর্বল বলা হয়েছে, তাতে সন্দেহ করার কোনোই অবকাশ নেই। অতএব, শয়তানের বাহিনির প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, তাদের দলবল যতই বড় হোক, এমনকি সমূদ্রের তলদেশও যদি তাদের আয়ত্বাধীন থাকে- তথাপি কোনো সন্দেহ নেই এবং সন্দেহের কোনো অবকাশও নেই যে, তাদের কৌশল, তাদের শক্তি, তাদের প্রযুক্তি আল্লাহর শক্তি ও কৌশলের সামনে নিতান্তই দুর্বল, একান্ত তুচ্ছ এবং একেবারেই মূল্যহীন।

আর **كَانَ শব্দটি** ব্যবহার হয় লুযুম ও দাওয়াম বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত ও কৌশলের সাথে দুর্বলতার সিফাতটি এমনভাবে সার্বক্ষণিক জড়িত যে, তা থেকে তা মুক্ত ছিল না কোনো দিন আর হবেও না। অর্থাৎ শয়তানের মাঝে চক্রান্ত নামক সিফাতটি যেদিন থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই তা দুর্বল। দুর্বল অবস্থায়ই তার সৃষ্টি আর দুর্বলতাই তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য, যা থেকে কোনো দিন তা মুক্ত হতে পারবে না। শয়তান যেদিন থেকে বনী আদমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেছে সেদিন থেকে নিয়ে কিয়ামত অবধি তার সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহ তাআলার সামনে নিতান্তই দুর্বল। এর কোনো মূল্যই আল্লাহ তাআলার সামনে নেই। আল্লাহ তাআলা মূহুর্তে তা বানচাল করে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

অতএব, আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে,

‘এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং সন্দেহের কোনো অবকাশও নেই যে, আল্লাহ তাআলার কৌশলের সামনে শয়তানের সকল যামানার সর্বসময়ের সর্বপ্রকার চক্রান্ত,

সর্বপ্রকার কৌশল ও প্রচেষ্টা নিতান্তই নগণ্য ও তুচ্ছ। আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাদের নুসরতে শয়তানের যাবতীয় প্রচেষ্টা মূহুর্তে বেকার ও নাস্তানুবাদ করে দিতে পারেন'।

ইবনে আশূর রহ. (১৩৯৩হি.) বলেন,

أكد الجملة بمؤكدين (إن) (وكان) الزائدة الدالة على تقرر وصف الضعف لكيد الشيطان. اهـ

"জুমলা তথা বাক্যটিকে দু'টি তাকিদ এনে জোরদার করা হয়েছে। একটি হলো إِنَّ। আরেকটি كَانَ, যা বুঝাচ্ছে, দুর্বলতা শয়তানের চক্রান্তের এমনই একটি বৈশিষ্ট্য যা তার মাঝে সার্বক্ষণিক বিদ্যমান।" -আততাহরির ওয়াততানবির ৫/১২৪

ইবনে আতিয়্যাহ রহ. (৫৪২হি.) বলেন,

ودخلت كان دالة على لزوم الصفة. اهـ

"كَانَ ব্যবহার হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, দুর্বলতার

গুণটি শয়তানের চক্রান্তের সাথে আবশ্যকীয়ভাবেই জড়িত (যা থেকে তা কখনও মুক্ত হতে পারে না)।” -তাফসিরে ইবনে আতিয়্যাহ ২/৭৯

আবু হাইয়্যান আন্দালুসি রহ. (৭৪৫হি.) বলেন,

ودخلت كان في قوله: كان ضعيفا إشعارا بأن هذا الوصف سابق لكيد الشيطان، وأنه لم يزل ضعيفا. اهـ

“كَانَ ব্যবহার হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, শয়তানের চক্রান্ত আদিকাল থেকেই দুর্বল আর তা চিরন্তন দুর্বলই চলে আসছে।”- আলবাহরুল মুহিত ৩/৭১২

আবুস সাউদ রহ. (৯৮২হি.) বলেন,

{الذين آمنوا يقاتلون فِى سَبِيلِ الله}

كلامٌ مبتدأٌ سيق لترغيب المؤمنين في القتال وتشجيعِهم ببيان كمالِ قوتِهم بإمداد الله تعالى ونُصرتِه وغايةِ ضعفِ أعدائِهم أي المؤمنون إنما يقاتلون في دين الله الحقِّ الموصِلِ لهم إلى الله عزَّ وجلَّ وفي إعلاء كلمتِه فهو وليُّهم وناصرُهم لا محالة

...

{إِنَّ كَيْدَ الشيطان كَانَ ضَعِيفاً}

أي في حد ذاتِه فكيف بالقياس إلى قُدرةِ الله تعالى ولم يتعرّضْ لبيان قوةِ جنابِه تعالى إيذاناً بظهورها قالوا فائدةُ إدخالِ كان في أمثالِ هذهِ المواقعِ التأكيدُ ببيان أنه منذ كان كان كذلك فالمعنى أن كيدَ الشيطانِ منذ كان موصوفاً بالضعف. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর রাহে’- এ কথাটি বলা হয়েছে মুমিনদেরকে কিতালে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং হিম্মত যুগানোর জন্য। তা এভাবে যে, তাদের বুঝানো হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার মদদ ও নুসরতে তারা পরিপূর্ণ শক্তিমত্তার অধিকারী। পক্ষান্তরে তাদের শত্রুরা নেহায়েত দুর্বল। অর্থাৎ মুমিনরা তো কিতাল করবে আল্লাহ তাআলার হক দ্বীনের জন্য এবং তার কালিমা বুলন্দ করার জন্য, যা তাদেরকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। অতএব, কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি তাদের বন্ধু এবং তিনি তাদের নুসরত করবেন। ...

আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত নিতান্ত

দুর্বল’- অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত তো এমনিতেই দুর্বল। আর আল্লাহ তাআলার কুদরতের সামনে তো তার কোনো পাত্তাই নেই। আর আল্লাহ তাআলার শক্তি যে কেমন (অতুলনীয়) তার বিবরণ এখানে দেওয়া হয়নি। কারণ, তা একেবারেই স্পষ্ট।

মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, এ ধরনের স্থানে كَانَ ব্যবহার করা হয় তাকিদের জন্য। এ কথা বুঝনোর জন্য যে, বিষয়টি তার সূচনালগ্ন থেকে এমনই ছিল। তাহলে অর্থ দাঁড়াবে, ‘শয়তানের চক্রান্ত যেদিন থেকে শুরু, সেদিন থেকেই তা দুর্বল’|” -তাফসিরে আবুস সাউদ ২/২০২-২০৩

সারকথা

যারা আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করবে তারা আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহ তাআলা তার বন্ধুদের নুসরত করবেন। আল্লাহ তাআলার নুসরতে তারা বিজয়ী হবে। পক্ষান্তরে যারা তাগুতের পথে কিতাল করবে তারা শয়তানের বন্ধু। শয়তান তাদের সাহায্য করবে আর মুমিনদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত পাকাবে। তবে তারা যত ভয়ানক চক্রান্তই করুক মুমিনদের

কোনো ভয় নেই। কারণ, শয়তানের চক্রান্ত বাহ্যত যত ভয়ংকরই মনে হোক তা নিতান্তই দুর্বল। আল্লাহ তাআলার শক্তি ও কৌশলের সামনে এর কোনোই *মূল্য নেই। মুমিন বান্দাদের নুসরতে আল্লাহ তাআলা এসব চক্রান্ত ধূলিস্যাৎ করে দেবেন। নাস্তানুবাদ করে দেবেন। অতএব, হে মুমিনগণ! আল্লাহর নুসরত সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করে শয়তানের বাহিনির বিরুদ্ধে তোমরা নেমে পড়। বিইযনিল্লাহ বিজয় তোমাদের নিশ্চিত।

***

৭৯.শয়তানের ধোঁকা, তালিবুল ইলমরা সাবধান!

আমরা মাদ্রাসার অনেক ভাইকে দেখতে পাচ্ছি, তারা জিহাদ বুঝার আগে ভালভাবে পড়াশুনা করতেন, কিন্তু জিহাদ বুঝার পর পড়াশুনায় ঢিলেমি করছেন, কি পড়াশুনা বন্ধই করে দিয়েছেন। এটা শয়তানের অনেক বড় ধোঁকা। অনেক সময় শয়তান নেক সূরতে আমাদের ধোঁকা দিয়ে দেয় অথচ আমরা টের পাই না। ইলম সর্বদা এবং সবক্ষেত্রে প্রয়োজন। আমি যখন জিহাদ বুঝতাম না তখন আমার ইলমের দরকার ছিল,

আর যখন জিহাদ বুঝতে পেরেছি তখন ইলমের প্রয়োজনীয়তা শেষ?? আসলে যেসব ভাই জিহাদ বুঝতে পেরেছেন, শয়তানের তাদের প্রতি সীমাহীন ঈর্ষা জেগেছে। তাই সে অন্য দিক দিয়ে তাদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে এর বদলা নিতে চাইছে। ইলমের দৌলত থেকে মাহরূম করতে পারা তার এ প্রচেষ্টারই সফল বাস্তবায়ন।

জিহাদ বুঝতে পারার পর তো ইলমের পথে নব উদ্যমে মেহনতে লাগার দরকার ছিল। আমাদের সমাজে ইলমী মানুষের যে কত অভাব তা সবাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন আশাকরি। সাধারণ মাসআলা-মাসায়েল বলা বুঝার মতো কিছু লোক থাকলেও ঈমান-কুফর, তাওহীদ-শিরক, জিহাদ-কিতাল ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ তাহকীকের সাথে মাসআলা বলা এবং ফতোয়া-ফারায়েয দেয়ার মতো মানুষ প্রায় নেই বললেই চলে। আর অল্প কিছু লোক থাকলেও তারা বিভিন্ন কারণে হক্ব বলছেন না বা বলতে পারছেন না। এমতাবস্থায় যারা জিহাদ বুঝছেন তারাও যদি ইলম থেকে বিমুখ হয়ে যান, তাহলে দ্বীনের এ কাফেলাকে চালাবে কে? বিশেষত আমাদের দেশগুলোর মতো দেশে সহীহ ইলমের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে

বেশি। যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মুসলিম ভাইদের তাওহীদ দুরস্ত না করা যাবে, দ্বীনের মৌলিক বিষয় ও তাক্বাজা সম্পর্কে তাদের সজাগ না করা যাবে; যতক্ষণ উলামায়ে সূ'দের সকল বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা খণ্ডন করে সংশয়-সন্দেহমুক্ত পরিষ্কার দ্বীন জনসাধারণের সামনে তুলে না ধরা যাবে- ততক্ষণ পর্যন্ত কি তাদেরকে দ্বীনের সৈনিক বানানো সম্ভব? দ্বীন কায়েমের পথে নিজের প্রিয় জান-মাল কুরবান করতে আগ্রহী করা কি সম্ভব? যদি সহীহ দ্বীনী রাহনুমায়ী না থাকে, তাহলে যেসব ভাই জিহাদের জন্য দাঁড়িয়েছেন তারা চলবেন কোন পথে? তারা কিভাবে বুঝবেন কোনটা জিহাদ আর কোনটা সন্ত্রাস? তাই তালিবুল ইলম ভাইদের প্রতি আবেদন, আপনার সাবধান থাকুন। শয়তানের ধোঁকায় পড়বেন না।

অনেক ভাই, যারা জিহাদ বুঝার পর ঠিকমতো পড়াশুনা করেননি, তারা এখন লজ্জিত। তাদেরকে যখন কোন মাসআলা তাহকীক করতে দেয়া হচ্ছে, তখন তারা পেরেশান হয়ে যাচ্ছেন। মাসআলা খুঁজে পাচ্ছেন না, সমাধান দিতে পারছেন না। এখন তারা বড়ই লজ্জিত। তাই প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা ইলমের পথ কুরবানী করুন। জাতি আপনাদের দিকে তাকিয়ে

আছে। এমতাবস্থায় গাফেল ও উদাসীন হয়ে পড়ে থাকা, কি নিজের মনমতো চলা; আপনার, আপনার জাতি- সকলের জন্যই ক্ষতির কারণ। তাই আপনারা নিষ্ঠার সাথে অধ্যয়ন করুন। ব্যাপক-বিস্তৃত অধ্যয়ন ও সুগভীর তাহকীকের মেজাজ গড়ে তুলুন।

তদ্রূপ অন্য সকল ভাই, যারা যে কাজে নিয়োজিত, প্রত্যেকে নিজের সর্বসাধ্য ব্যয় করুন। আপনাদের ছাড়া দ্বীন কায়েমের এ মিশন চলবে কিভাবে? আল্লাহ তাআলা সবাইকে সহীহ বুঝ ও আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন!

৮০.শহীদ টিপু সুলতান- মুহাম্মদ ইলইয়াস নদভী: একটি বিষ মিশ্রিত মিষ্ট ফল

গ্রন্থের নাম: ইতিহাসের মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর শহীদ টিপু সুলতান

মূল: মুহাম্মদ ইলইয়াস নদভী

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল ফারুক

গ্রন্থটি শহীদ টিপু সুলতান রহ. এর জীবনীর উপর একটি

অনবদ্য গ্রন্থ। একটি মিষ্ট ফল। কিন্তু বিষ মিশ্রিত। আমার কাছে এমনই মনে হল। অন্যদের কাছে অন্য রকম মনে হতে পারে।

বিষ মিশ্রিত হওয়ার কারণ অনেক হতে পারে। এর মধ্যে এটাও একটা হতে পারে যে, লেখক একজন ভারতীয় লোক। তাই টিপু সুলতানকে একজন হিন্দুপ্রেমী সুলতান হিসেবে প্রমাণ করতে না পারলে ভারত সরকারের কাছে তিনি অচ্যুত/অস্পৃশ্য গণ্য হতে পারেন। তখন তার নিজে সহ আরো অনেক মুসলমানের উপর অনাকাঙ্খিক নিপীড়ন আপতিত হতে পারে। তাই লেখক এমনভাবেই গ্রন্থটি লিখেছেন- যাতে ঈমান, তাওহীদ ও সুন্নাহ্ বিসর্জন দিয়ে হলেও টিপু সুলতানকে হিন্দু সম্প্রীতির একজন আদর্শ পুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। লেখক যে কারণেই যা করে থাকুক- আমরা তো আর চুপ থাকতে পারি না। কারণ, উম্মাহর কাছে যখন লেখকের লেখাটি পৌঁছবে, তখন তারা তো লেখকের উপর অদৃশ্য কোনো তরবারি যে কোষমুক্ত করে ধরে রাখা ছিল বা আর কি উজরের কারণে, না'কি তার আকিদার বিকৃতির কারণে এমনটা লিখেছেন- সেটা তো আর তাদের কাছে ধরা পড়বে

না। উম্মাহ তো এখান থেকে হিন্দুপ্রীতিই শিখবে। আরো যেসব বিকৃতি তিনি ঘটিয়েছেন, উম্মাহ তো সেগুলোকে হক ও ইসলামের শিক্ষা-উদারতা হিসেবেই নেবে। এমতাবস্থায় আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। লেখক যে ইচ্ছাতেই লিখে থাকুক, আমাদের দায়িত্ব- উম্মাহকে সতর্ক করা।

মূল কথায় যাওয়ার আগে আমাদের জেনে নেয়া দরকার যে, টিপু সুলতান রহ. এর হাতে রাজত্ব এলো কিভাবে? এ বিষয়টা না বুঝলে অনেক বিষয়ই না বুঝা থেকে যাবে। তাই আমি প্রথমে সংক্ষেপে কথাটা একটু বলে নিই।

টিপু সুলতান রহ. এর পিতা হায়দার আলী। তার পূর্বপুরুষ কুরাইশ বংশের মানুষ। মক্কা মুকাররামায় তাদের বসবাস ছিল। সেখান থেকে তারা হিজরত করে হিন্দুস্তানে চলে আসেন। এখানেই হায়দার আলীর জন্ম। হায়দার আলী প্রথমে এক হিন্দু রাজার অধীনে একটি ছোট্ট ফৌজের কমান্ডাররূপে কর্মজীবন শুরু করেন। যোগ্যতাবলে তিনি হিন্দু রাজার সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানে পদোন্নতি করেন। তার ক্রম উন্নতি

দেখে অন্যান্য হিন্দুরা ষড়যন্ত্রের জাল বিছায়। তারা রাজাকে কুমন্ত্রণা দেয় যে, হায়দার আলী আপনার রাজত্ব দখল করতে চাইছে। আগে বাগে তাকে দমন করুন। নতুবা পরে বিপদ হবে। রাজা তাদের কথায় কান দেয়। হায়দার আলীকে সুযোগ বুঝে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহর মহিমায় হায়দার আলী ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত হন। তিনি বসে না থেকে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেন। তার অধীস্ত বিশ্বস্ত সৈন্যদের নিয়ে আগে বাগেই রাজধানীতে হামলা করেন। দখল করে ফেলেন রাজধানী। এভাবে হিন্দু রাজার রাজত্ব হায়দার আলীর হাতে এসে পড়ে।

সুস্পষ্ট যে, হায়দার আলীর হাতে যে রাজত্বটি এলো সেটি কোন ইসলামী রাজত্ব নয়। সেখানকার সেনাবাহিনিও মুসলমান সেনাবাহিনি নয়। হিন্দু, মুসলিম ও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী মিলিয়ে তা গঠিত। কাজেই, এ বাহিনি যারা হায়দার আলীর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তারা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করেনি। পদবী ও রাজত্বের লোভে যুদ্ধ করেছে বললে, কিংবা স্বাভাবিক গতানুগতিক যুদ্ধের মতো যুদ্ধ করেছে বললে বাড়াবাড়ি হবে না। অতএব, হায়দার আলীর রাষ্ট্র কোন ইসলামী রাষ্ট্র নয়।

মুসলমানদের সেখানে একচ্ছত্র ক্ষমতাও ছিল না যে, তারা ইচ্ছা করলে সেটাকে ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারেন।

অধিকন্তু হায়দার আলী ছিলেন নিরক্ষর মানুষ। সামরিক প্রতিভা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা তার পর্যাপ্ত থাকলেও ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান সম্পর্কে তার জানাশুনা ছিল না। আর তখনকার অন্ধকার যুগে সাধারণ মুসলমানদের দ্বীনি অবস্থাও কোন ভাল পর্যায়ে ছিল না। বিধর্মীদের সাথে থাকতে থাকতে নিজ ধর্মের নামটা ছাড়া আর তেমন কিছু তাদের বাকি নেই। অধিকন্তু ছিল শীয়াদের দাপট। বিধায় ইসলামের প্রকৃত রূপ তখনকার সমাজ থেকে যোজন যোজন দূরে ছিল। বর্তমান সময়ে দ্বীনে ইসলামের যে চর্চা ও প্রসার তার হাজার ভাগের এক ভাগও হয়তো তখন ছিল না।

তবে হায়দার আলী মুসলমান ছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের ভালবাসতেন। তাই তিনি যতদূর পেরেছেন ধর্মের কাজ করার চেষ্টা করেছেন। এমতাবস্থায় আমরা তাকে খুব একটা

দোষারূপ করতে পারি না যে, কেন তার রাষ্ট্র জাহিলী রাষ্ট্রের ন্যায় পরিচালিত হতো।

হায়দার আলীর রাজত্বলাভ হিন্দুদের সন্তুষ্ট করেনি। মারাঠাদেরও করেনি। তাই তারা বরাবরই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আসছিল। তিনি সেগুলো দমন করে আসছিলেন। আর ইংরেজরা তখন ভারতবর্ষ গিলে খাওয়ার পায়তারা করছে। তাদের সামনে হায়দার আলী একটা বড় বাধা ছিল। তাই তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তিনিও তাদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসেন। হায়দার আলী এগিয়েই চলছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছু দিন পরই ইন্তেকাল করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তখনও চলছে।

পিতার মৃত্যুর পর রাজত্বের ভার এসে পড়ে তার সন্তান টিপু সুলতানের হাতে। তিনি রাজত্বের ভার গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ৩৩ বৎসরের মতো।

হায়দার আলী নিরক্ষর হলেও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাই তিনি তার সন্তান টিপু সুলতানকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় শিক্ষায়ই

শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। এ সুবাধে টিপু সুলতান রহ. একজন আলেম ছিলেন।

তবে আমরা দেখেছি, হায়দার আলীর রাষ্ট্র কোন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না। এখন পিতার মৃত্যুর পর টিপু সুলতান যে রাষ্ট্রের সুলতান হয়েছেন, সেটাও কোন ইসলামী রাষ্ট্র না। তবে তিনি যথাসম্ভব ইসলাম বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েমের পরিবেশ তখনও ছিল না। কারণ, তার সেনাবাহিনি কোন ইসলামী সেনাবাহিনি নয়। তাছাড়া জনগণও দ্বীনদার নয়।

আমরা জানি যে, হিন্দুস্তানে হাদিসের চর্চা শুরু হয়েছে শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর মাধ্যমে। তাই তখন হিন্দুস্তানে কুরআন-হাদিসের তেমন কোন ইলম ছিল না। হানাফি ফিকহের কিতাবাদি কিছু ছিল। সে অনুযায়ী কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছে ইসলাম কায়েমের। অধিকন্তু টিপু সুলতান রহ. যখন রাজত্ব হাতে নেন, তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলমান। আর হায়দার আলীর মৃত্যুর সুযোগে রাজ্যের বিভিন্ন

অঞ্চলের রাজারা বিদ্রোহ করে বসেছে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে। কাজেই তিনি উভয় দিক থেকে যুদ্ধের সম্মুখীন। তখন থেকে নিয়ে শাহাদাতের আগ পর্যন্ত তিনি শুধু যুদ্ধেই লিপ্ত ছিলেন। একটি মাসও শান্তিতে বসে থাকতে পারেননি।

অতএব, টিপু সুলতানের রাজ্য ইসলামী রাজ্য না হওয়ার কয়েকটি কারণ পেলাম:

- তিনি যে রাষ্ট্রের সুলতান হয়েছেন, সেটা অন্যান্য জাহিলী রাষ্ট্রের মতো গতানুগতিক একটা রাষ্ট্র ছিল। কোন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না।
- রাষ্ট্রের সেনাবাহিনি মুসলিম সেনাবাহিনি ছিল না। প্রশাসনিক পদগুলো একচ্ছত্রভাবে মুসলমানদের হাতে ছিল না। বরং সকলের হাতে সম্মিলিতভাবে ছিল। রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদ ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন হিন্দু, মারাঠা, শীয়া ও অন্যান্য বিধর্মীদের হাতে ছিল।
- ইসলামী ইলমের তেমন কোন প্রচার-প্রসার ছিল না। তাই লোকজন ধর্ম সম্পর্কে খুব কমই জানতো।
- সাধারণ মুসলমানরা হাজারো রকমের শিরিক, কুফর ও বিদআতে লিপ্ত ছিল। এমতাবস্থায় তাদের উপর দ্বীন কায়েম

করা অতিশয় কঠিন ছিল।

- বিভিন্ন দিক থেকে উপর্যুপরি বিদ্রোহ হচ্ছিল। সুলতান তাদের দমনে ব্যস্ত ছিলেন।

- ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ চলমান ছিল।

টিপু সুলতান রহ. ইংরেজদের ইসলামের শত্রু মনে করতেন। তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তিনি কাদের নিয়ে করেছেন? কোন ইসলামী বাহিনি নিয়ে? না, বরং এমন এক বাহিনি নিয়ে যারা শুধু দুনিয়ার জন্য যুদ্ধ করে। ইসলামের স্বার্থে নয়। অধিকন্তু অন্য সকল রাজ-রাজারা সুলতানের বিরুদ্ধে ইংরেজদের একনিষ্ঠ সহযোগী ছিল। এই চতুর্মুখী বিশাল শত্রু বাহিনির বিরুদ্ধে সুলতানকে একা লড়তে হয়েছে। তাই, তার সেনাবাহিনিতে যে সকল বিধর্মী সৈন্য ছিল, তাদের বাদ দিয়ে একচ্ছত্রভাবে মুসলমানদের নিয়ে জিহাদ করা কখনোও সম্ভব ছিল না।

যেহেতু টিপু সুলতানের সেনাবাহিনি ও প্রশাসন ইসলামী ছিল না, তাই তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নিজেদের স্বার্থ বিবেচনা করেছে। অনেকে গোপনে ইংরেজদের সাথে আঁতাত করে নিয়েছে- বিশেষ করে শীয়ারা, আবার অনেকে পলায়ন করেছে, কিংবা স্বয়ং নিজেরাই সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তাই সুলতানের সেনাবাহিনি একটি সুসজ্জিত ও উন্নত সেনাবাহিনি হওয়া সত্বেও সুলতানকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। তবে তার মনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বাসনা ছিল। কিন্তু সে সুযোগ তখন তেমন একটা ছিল না। অধিকন্তু প্রচলিত শিরিক-কুফর ও বিদআতের একটা ছাপ যে স্বয়ং সুলতানের উপর পড়েনি, তাও কিন্তু না। তবে তিনি ইসলাম চাইতেন, ইসলামের জন্যই জীবন দিয়েছেন। তাই তিনি শহীদ।

এ কথাগুলো বললাম, সামনের বিষয়গুলো বুঝানোর জন্য:

১.

সুলতানের বাহিনি ও প্রশাসন যে সব ধর্মের সৈন্য নিয়ে গঠিত, সেটা মূলত ধর্মীয় সম্প্রীতি নয়, বরং উজরের কারণে। আর

যদি ধরা হয় যে, সুলতানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বে তিনি বিধর্মীদের নিয়ে স্বীয় প্রশাসন গঠন করেছেন, তাহলে সেটা গর্বের কিছু নয়। এটা বরং সুস্পষ্ট ইসলামের বিধান লঙ্গন। অতএব, এটাকে আদর্শ হিসেবে পেশ না করে বরং মুসলমানদের কলঙ্ক হিসেবে পেশ করতে হবে।

২.

সুলতানের রাষ্ট্রে যে একচ্ছত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল না, সেটাও কোন গর্বের কথা নয়। যদি সুলতান অক্ষমতার কারণে তেমনটা করে থাকেন, তাহলে তিনি মা'জুর। আর যদি ইসলাম কায়েমে সক্ষম হওয়া সত্বেও সকল ক্ষেত্রে ইসলাম কায়েম না করে থাকেন, সকল বিধান ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা না করে থাকেন, তাহলে সেটাও কোন গর্বের কথা নয় বরং লজ্জার কথা। কাজেই সেটাকে আদর্শ হিসেবে কিংবা ধর্মীয় উদারতা হিসেবে পেশ করার কিছু নেই।

প্রিয় পাঠক, এতক্ষণ যা বললাম, সেটাই বাস্তবতা। কিন্তু গ্রন্থকার এসব বিষয়কে ধর্মীয় সম্প্রীতি, ধর্মীয় উদারতা,

ইসলামের মহানুভবতা, ইসলামের আদর্শ- ইত্যাদি হিসেবে পেশ করেছেন।

সুলতানের মহানুভবতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রমাণরূপে গ্রন্থকার এক জায়গায় গর্ব করে বলেন,
“সুলতানের প্রশাসন বা সেনাবাহিনিতে ধর্ম বা বংশের ভিত্তিতে কোটা ছিলো না। ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সক্ষমতাই চাকরিতে নিয়োগ ও উন্নতির একক মাপকাঠি বিবেচিত হতো।” পৃ. ৪৮৪

অন্যত্র বলেন,
“ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সব ধর্মের সব অনুসারিদের ভালবাসতেন। সবার প্রতি তার আস্থা ছিল বলেই তিনি প্রশাসনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। সব বিধর্মীকে তিনি পূর্ণ উদারতার সঙ্গে নিজস্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধিনতা দিয়েছিলেন।” পৃ. ৪০৭

সামনে গিয়ে লিখেন,
“সুলতান আন্তরিকভাবে হিন্দুদের মন্দির ও সেগুলোর

রক্ষণাবেক্ষণরত স্বামীদের শ্রদ্ধা করতেন।” পৃ. ৪০৭

প্রিয় পাঠক, এখানে আমি সমূদ্র থেকে একটা ফোঁটা মাত্র তুলে ধরলাম। নতুবা সারা কিতাবই এমন সব শিরিক, কুফর আর বিদআতে পরিপূর্ণ।

এবার আপনারাই বলুন, এ কিতাব পড়ে কি কেউ তাহওহিদের শিক্ষা পাবে? ওলা-বারার শিক্ষা পাবে? না'কি নাস্তিকতা পাবে? এ জন্য আমি একে বিষ মিশ্রিত মিষ্ট ফল মনে করি। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এ কিতাব পড়া আমি জায়েয মনে করি না। যারা হক-বাতিল সুস্পষ্ট বুঝেন, তারাই কেবল এ কিতাব পড়তে পারেন।

আরোও দুঃজনক যে, এ কিতাবকে আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অনেকটা তাঁর তত্ত্বাবধানেই এ কিতাব রচিত হয়েছে। আমার মনে হয় না আলী মিয়া নদভী রহ. এমন সব শিরিক কুফরকে

ইসলামের গৌরব বলে প্রচারের অনুমোদন দিয়েছেন। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম! ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ!

৮১.সংশয়: লা তামান্নাও লিকাআল আদুউ

হাদিসে এসেছে, **'লা তামান্নাও লিকাআল আদুউ'- 'তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না।'**

হাদিস থেকে কেউ কেউ সংশয়ে পড়তে পারেন যে, হাদিসে শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর জিহাদ মানেই তো শত্রুর মুখোমুখী হওয়া। অতএব, হাদিসে জিহাদ নিষেধ করা হয়েছে। এক ভাই হাদিসটি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তখন সংক্ষেপে হাদিসের মর্ম বলেছিলাম। ইনশাআল্লাহ এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ!

হাদিসটি বুখারি-মুসলিম উভয়ই রিওআয়াত করেছেন। বুখারি শরীফের রিওয়াতটি এমন,

حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال (أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتوهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف . ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم) –صحيح البخاري، رقم: 2861، ط. دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت

"উমার ইবনু উবায়দুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম আবু নজর সালিম রহ. বর্ণনা করেন, আমি তার (উমার ইবনু উবায়দুল্লাহর) কেরানী ছিলাম। তিনি যখন হারুরিয়্যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হন, আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে একটি পত্র লেখেন। আমি পত্রটি পড়লাম। তাতে লিখা ছিল,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখী হন। সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি (হামলা না করে) অপেক্ষায় থাকলেন। এরপর জনসম্মুখে নসিহতের জন্য দাঁড়ান। বলেন, হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকার দোয়া কর। তবে শত্রুর

মুখোমুখী যখন হয়েই পড়বে, ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে। শুনে রাখো! জান্নাত তরবারির ছায়াতলে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা সঞ্চালনকারী, সম্মিলিত (কাফের) বাহিনিকে পরাভূতকারী! আপনি তাদের পরাভূত করুন। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের নুসরত করুন'!"- সহীহ বুখারি ২৮৬১

বিশ্লেষণ

♣ হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চিরাচরিত সুন্নতের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে যে, **'সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি (হামলা না করে) অপেক্ষায় থাকলেন'।**

এটি রাসূলের যুদ্ধনীতি। দিনের শুরুভাগে যদি আক্রমণ না করতেন, বেলা চড়ে উঠলে আর আক্রমণ করতেন না। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর যখন জোহরের নামাযের সময় শুরু হত তখন আক্রমণ করতেন। **যেমন এক হাদিসে এসেছে,**

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس – مسند الإمام أحمد، رقم: 19141، ط. الرسالة، قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. اهـ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার সময় শত্রুর মোকাবেলায় নামতে পছন্দ করতেন।”- মুসনাদে আহমাদ ১৯১৪১

অন্য হাদিসে এসেছে,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يمهل ثم ينهد إلى عدوه –سنن سعيد بن منصور، رقم: 2518، ط. الدار السلفية – الهند

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। তারপর শত্রুর মোকাবেলায় নামতেন।”- সুনানু সাঈদ ইবনু মানসূর ২৫১৮

অন্য হাদিসে এসেছে,

كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات – صحيح البخاري، رقم: 2989، ط. دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি দিনের শুরু ভাগে কিতাল না করতেন, (নুসরতের) বায়ুপ্রবাহ শুরু হওয়া ও নামাযের সময় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।”- সহীহ বুখারি ২৯৮৯

হাফেয ইবনু হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك. اه

“বুঝা গেল, যুদ্ধ পিছিয়ে দেয়ার ফায়েদা হচ্ছে যে, নামাযের সময় হচ্ছে দোয়া কবুলের সময়। আর জঙ্গে আহযাবে বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বিজয় হয়েছিল। কাজেই বায়ুপ্রবাহও নুসরতের একটা সম্ভাব্য কারণ।”- ফাতহুল বারি ৬/১২১

অধিকন্তু এ সময় বায়ুপ্রবাহের ফলে মন-মেজাজ ভাল থাকে। তাছাড়া এ সময় নামাযের পর মুসলমানরা মুজাহিদদের জন্য দোয়া করে।

অতএব, আলোচ্য হাদিসে 'সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি (হামলা না করে) অপেক্ষায় থাকলেন' দ্বারা উদ্দেশ্য: হামলা করার উদ্দেশ্যে জোহরের ওয়াক্ত আসার অপেক্ষায় থাকলেন।

♣ **'এরপর জনসম্মুখে নসিহতের জন্য দাঁড়ান। বলেন, হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকার দোয়া কর'।**

বুঝা যাচ্ছে, জোহরের ওয়াক্ত আসার পর, নুসরতের বায়ুপ্রবাহ শুরু হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার হামলা করতে যাবেন। তবে হামলার আগে যুদ্ধের একটি আদব শিক্ষা দিচ্ছেন। নিজেদের শক্তির উপর ভরসা না করে আল্লাহ তাআলার নুসরত কামনা করা। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা যেন তিনি আমাদের

বিপদমুক্ত রাখেন। সহীহ সালামতে বিজয় দান করেন। শত্রুর মুখোমুখী না হয়েই যদি বিজয় এসে যায়, তাহলে সেটাই ভাল। এর বিপরীতে এমন দোয়া না করা যে, 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে শত্রুর মুখোমুখী কর। সহীহ সালামতে বিজয় দিয়ো না। তাদের সাথে আমাদের যেন লড়াই হয়। আমরা যেন আমাদের বীরত্ব দেখাতে পারি। আমরা যে তোমার খাঁটি বান্দা এটা যেন প্রমাণ হয়ে যায়'। এ ধরণের কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ,

 # এ ধরণের কামনা নিজের বড়ত্বের আলামত। আল্লাহর নুসরতের বদলে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভরসার নামান্তর।

ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন,

إنما نهى عن تمنى لقاء العدو لما فيه من صورة الاعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة. اهـ

"শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ বাহ্যত এটি আত্মগৌরব মনে হয়। মনে হয় যেন (আল্লাহর পরিবর্তে) নিজেদের উপর ভরসা করা হচ্ছে। যেন

জাগতিক শক্তি-সামর্থ্যকে যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে।”- আলমিনহাজ শরহু মুসলিম, ১২/৪৫

নফস বড় গাদ্দার। এখন যদিও মনে হচ্ছে যে, নামুক যুদ্ধে। দেখিয়ে দেব মজা। কিন্তু ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার পর দিল ঘুরে যেতে পারে। বরং এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

যেমন বক্ষমান হাদিসের কোনো বর্ণনায় এসেছে,

لا تمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك –مسند الإمام أحمد، ، ط. الرسالة، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح بطريقيه 9196 :رقم وشواهده. اهـ

“তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। কারণ, এতে শেষ পরিণতি কি হবে তোমাদের জানা নেই।”- মুসনাদে আহমাদ ৯১৯৬

হাফেয ইবনু হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

وقال بن دقيق العيد لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما

ينبغي فيكره التمني لذلك ولما فيه لو وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة. اهـ

“ইবনু দাকুকুল ঈদ রহ. বলেন, মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া সবচেয়ে কঠিন জিনিস। অধিকন্তু তা অজানা বিষয়, সামনে উপস্থিত নেই। যখন সম্মুখে আসবে, ভালোয় ভালোয় যেমন হওয়া দরকার তেমন হবে বলে কোন নিশ্চয়তা নেই। এ জন্য তা কামনা করা অপছন্দনীয়। তাছাড়া ব্যক্তি মনে মনে যে দৃঢ় অঙ্গীকার করে রেখেছে, পরে তার বিপরীতও হয়ে যেতে পারে। তবে সম্মুখে এসে গেলে সবর করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।”- ফাতহুল বারি ৬/১৫৭

উহুদের যুদ্ধে আমরা এর প্রমাণ দেখেছি। বদর যুদ্ধে যেসকল সাহাবি শরীক হতে পারেননি, তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, একটা যুদ্ধ হলে বদরিদের মতো আমরাও দেখিয়ে দিতাম ...! কিন্তু উহুদের দিন যখন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পেছন দিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করলেন, সাহাবায়ে কেরাম দিশেহারা হয়ে এদিক সেদিক ছুটতে লাগলেন। আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের তিরস্কার করে বলেন,

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

“মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তো তোমরা তা কামনা করতে। এখন তো তোমরা স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করলে।”- আলে ইমরান ১৪৩

অর্থাৎ- কিন্তু তোমাদের সেই অঙ্গীকার কোথায় গেল? এখন কেন পলায়ন করলে?

আবুস সাউদ রহ. (৯৮২ হি.) বলেন,

وهو توبيخٌ لهم على تمنِّيهم الحربَ وتسبُّبِهم لها ثم جُبنِهم وانهزامِهم. اهـ

“আল্লাহ তাআলা তিরস্কার করছেন যে, তারাই তো যুদ্ধ কামনা করেছিল, যুদ্ধ ডেকে এনেছিল। এরপর ভীরুতা প্রদর্শন করে পালিয়ে গেল।”- তাফসিরে আবুস সাউদ ২/৯২

যেখানে সাহাবায়ে কেরামের মতো ব্যক্তিরাও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন দেখাতে পারেননি, সেখানে পরবর্তীদের জন্য কিভাবে সম্ভব? এজন্যই যুদ্ধ কামনা করতে নিষেধ করা

হয়েছে।

 # যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে কোন বিপদের বোঝা মাথায় নেয়, সাধারণত তারা তা রক্ষা করতে পারে না। এ কারণেই রাষ্ট্রীয় কোন পদ চাইতে হাদিসে নিষেধ এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ». –صحيح مسلم، رقم: 4819، ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة. بيروت

“নেতৃত্ব চেয়ে নেবে না। কারণ, চেয়ে নিলে তোমাকে তোমার হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। আর চাওয়া ছাড়াই এসে পড়লে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নুসরত করা হবে।”- সহীহ মুসলিম ৪৮১৯

অথচ ন্যায়পরায়ণ শাসকের মর্যাদার কথা সকলে জানি। যে সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়াতলে স্থান দেয়া হবে, তাদের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। এতদসত্ত্বেও নেতৃত্ব পাওয়ার

কামনা করতে, চেয়ে নিতে নিষেধ এসেছে। কারণ, পরে তার যথাযথ হক আদায় করা সাধারণত সম্ভব হয় না। এ কারণে যারা পদ চায় তাদেরকে পদ দিতে হাদিসে নিষেধ এসেছে।

এমনিভাবে ফিতনা থেকে, দারিদ্রতা থেকে, অসুস্থতা থেকে পানাহ চাওয়ার কথা হাদিসে এসেছে। অথচ হাদিসে এসেছে:

- ফিতনার সময় শরীয়ত যিন্দা করলে শহীদের সওয়াব মিলবে।
- গরীবরা ধনীদের আগে জান্নাতে যাবে।
- মহামারিতে মারা গেলে শহীদের সওয়াব পাবে।

এতদসত্বেও এগুলো থেকে পানাহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোন অঞ্চলে মহামারি দেখা দিলে সেখানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, সম্মুখীন হলে তখন সবর করা অতো সহজ হবে না। হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে হ্যাঁ! যদি এসেই পড়ে, তখন সবর করা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك أو يطلب ولاية أو يقدم على بلد فيه طاعون. كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه نهى عن إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل} وثبت عنه في :النذر؛ وقال الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: {لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها؛ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك} قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا }وثبت عنه في الصحيحين أنه تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه} . وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: {لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف} وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء؛ وكما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت. اهـ

“নিজের উপর বোঝা টেনে আনা অপছন্দনীয়। যেমন অঙ্গীকার, মান্নত বা অন্য কোনভাবে শরীয়ত যা অবধারিত করেনি তা অবধারিত করে নেয়া। কিংবা কোন পদ তলব করা বা এমন অঞ্চলে যাওয়া যেখানে মহামারি চলছে। সহীহাইনে একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান্নত করতে নিষেধ

করেছেন। বলেছেন, ‘মান্নত কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এর দ্বারা কেবল কৃপণ লোকদের থেকে কিছু সম্পদ বের করে নেয়া হয়’।

সহীহাইনে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, ‘নেতৃত্ব চেয়ে নেবে না। কারণ, চেয়ে নিলে তোমাকে তোমার হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। আর চাওয়া ছাড়াই এসে পড়লে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নুসরত করা হবে। আর কোন কসম করার পর যদি এর ভিন্নটাতে কল্যাণ আছে বলে মনে কর, তাহলে ভালোটাই করবে আর কসমের কাফফারা দিয়ে দেবে’।

সহীহাইনে আরো বর্ণিত আছে, মহামারির ব্যাপারে তিনি বলেছেন, ‘কোন এলাকায় মহামারি পতিত হয়েছে শুনলে সেখানে যাবে না। আর কোন ভূমিতে থাকাবস্থায় পতিত হলে সেখান থেকে বের হয়ে পালাবে না’।

সহীহাইনে আরো বর্ণিত আছে, তিনি ইরশাদ করেন, ‘তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকার দোয়া কর। তবে শত্রুর

মুখোমুখী যখন হয়েই পড়বে, ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে। শুনে রাখো! জান্নাত তরবারির ছায়াতলে’।

এ ধরণের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেগুলোর দাবি:

- নিজের উপর বিভিন্ন বিষয় অবধারিত করে নেয়া বা হারাম করে নেয়ায় পা না বাড়ানোই উচিৎ। কারণ, পরে তা রক্ষা করে চলা সম্ভব হবে না। অনেকেই অনেক বিষয়ে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অঙ্গীকার ভঙ্গের সম্মুখীন হয়।

- আরো দাবি: বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করবে। অটল থাকবে।”- মাজমুউল ফাতাওয়া ১০/৩৮

ইবনু বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) বলেন,

نهى الرسول أمته عن تمنى لقاء العدو؛ ولأنه لا يعلم ما يئول أمره إليه ولا كيف ينجو منه، وفى ذلك من الفقه النهى عن تمنى المكروهات، والتصدى للمحذورات، ولذلك سأل السلف العافية من الفتن والمحن؛ لأن الناس مختلفون فى الصبر على البلاء، ألا ترى الذى أحرقته الجراح فى بعض المغازى

مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقتل نفسه، وقال الصديق: (لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر). اهـ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া তার জানা নেই যে, পরিস্থিতি শেষে কোন দিকে গড়াবে। এও জানা নেই যে, কিভাবে তা থেকে নাজাত মিলবে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, অপছন্দনীয় বিষয়াশয়ের আকাঙ্ক্ষা করা বা স্বেচ্ছায় নিজেকে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন করা নিষেধ। এ কারণে সালাফগণ ফিতনা ও শাসকদের বালা থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া করতেন। কেননা, বিপদে সবর করার শক্তি সকলের সমান নয়। ঐ লোকের অবস্থাটা কি দেখনি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক যুদ্ধে যে জখমের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আত্মহত্যা করেছিল?! (আবু বকর) সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘বিপদে পড়ে সবর করার চেয়ে সুস্থ ও নিরাপদ থেকে শুকর করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।”- শরহুল বুখারি লি ইবনি বাত্তাল ৫/১৮৫

 # শরীয়ত প্রথমেই কাফের সাথে যুদ্ধে লেগে যেতে আদেশ দেয়নি। প্রথমে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে বলেছে।

তাতে সম্মত না হলে জিযিয়া কবুলের দাওয়াত দিতে বলেছে। কোনটাতেই সম্মত না হলে তখন যুদ্ধের আদেশ। উদ্দেশ্য- ভালোয় ভালোয় কাজ হয়ে গেলে বিপদে জড়ানোর দরকার নেই। জিহাদের উদ্দেশ্য কাফেরদের মেরে শেষ করে ফেলা নয়। উদ্দেশ্য ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসা। প্রথমে তা সম্ভব না হলে অন্তত ইসলামী শাসনের অধীনে নিয়ে আসা। যাতে এক দিকে তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, অন্যদিকে ইসলামের সৌন্দর্য দেখে আস্তে আস্তে মুসলমান হয়ে যায়। মারামারি-কাটাকাটি ও ধ্বংসাযজ্ঞ চালানো উদ্দেশ্য নয়। এগুলো করা হবে প্রয়োজনের তাগিদে। অতএব, কোন মুমিনের উচিৎ নয় সংঘর্ষে জড়ানোর কামনা করা। সহীহ সালামতে নিরাপদে উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার দোয়া করবে। যদি এভাবে কাজ না হয় তখন যুদ্ধের বিধান।

ইমাম কাসানী রহ. (৫৮৭ হি.) সুন্দর কথাই বলেছেন,

ولأن القتال ما فرض لعينه بل للدعوة إلى الإسلام، والدعوة دعوتان: دعوة بالبنان، وهي القتال ودعوة بالبيان، وهو اللسان، وذلك بالتبليغ والثانية أهون من الأولى؛ لأن في القتال مخاطرة الروح والنفس والمال، وليس في دعوة التبليغ شيء من ذلك، فإذا احتمل حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح بها. اهـ

“যুদ্ধ এ জন্য ফরয করা হয়নি যে, এটি স্বতন্ত্র একটি মাকসাদ। বরং ফরয করা হয়েছে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার লক্ষ্যে। আর **দাওয়াত দুই প্রকার:**

এক. দাওয়াত বিলবানান তথা শক্তিবলে দাওয়াত। এটি হল যুদ্ধ।

দুই. দাওয়াত বিলবায়ান তথা বুঝানোর মাধ্যমে দাওয়াত। এটি হবে যবান দ্বারা তাবলিগ করার মাধ্যমে।

দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে সহজ। কেননা, যুদ্ধে জান-মাল হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তাবলিগের মাধ্যমে দাওয়াতে এর কিছুই নেই। যখন সহজ দাওয়াতের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন এটি দিয়েই শুরু করা আবশ্যক।”- বাদায়িউস সানায়ি ৭/১০০

মোটকথা, মারামারি মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য কুফর বিদূরিত করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। যত সহজে তা সম্ভব হয়, ততই ভাল। তাই নিরাপদে, সহজে ও সহীহ সালামতে কাজ হয়ে যাওয়ার দোয়া করাই কাম্য। মারামারির আকাঙ্ক্ষা

কাম্য নয়।

♣ **হাদিসের পরের অংশ:** **'তবে শত্রুর মুখোমুখী যখন হয়েই পড়বে, ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে। শুনে রাখো! জান্নাত তরবারির ছায়াতলে'।**

দুনিয়ার স্বাভাবিক রীতি এটাই যে, কাফেররা মৌখিক দাওয়াতের দ্বারা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয় না কিংবা জিযিয়া কবুল করতেও সম্মত হয় না। আমরা আমাদের দায়িত্ব হিসেবে আল্লাহ তাআলার কাছে কোনরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই উদ্দেশ্য হাসিলের দোয়া করব। তবে সব সময় সংঘর্ষ ছাড়া সমাধান হবে না। সংঘর্ষে জড়াতেই হবে। তখন শরীয়ত আদেশ দিয়েছে সবরের সাথে মোকাবেলার। অসংখ্য অগণিত নিয়ামত ও মান-মর্যাদার লোভ দেখিয়ে আল্লাহ তাআলা এ সময় টিকে থাকার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। ভীরুতা ও কাপুরুষতা থেকে বারণ করেছে। পলায়ন করা হারাম করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ{

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা`আলা ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"- সুরা আনফাল: ৪৫-৪৬

হাফেয ইবনু হাজার রহ. বলেন,

قال القرطبي وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين وقال بن الجوزي المراد أن الجنة تحصل بالجهاد. اهـ

“কুরতুবি রহ. বলেন ... রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছে। জিহাদের বিনিময়ে যে প্রতিদান মিলবে তারও জানান দিচ্ছে। উৎসাহ দিচ্ছে শত্রুর নিকটবর্তী হতে। তরবারি চালাতে। লড়াইয়ের ময়দানে একে অপরের নিকটে জমায়েত হতে। যেন লড়াইকারীদের মাথার উপর তরবারি ছায়াদানকারী শামিয়ানার মতো হয়ে যায়। ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, উদ্দেশ্য- জান্নাত জিহাদের দ্বারা মিলবে।”- ফাতহুল বারি ৬/৩৩

♣ আশাকরি উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, এ হাদিসে জিহাদ ছাড়তে বলা হয়নি, বরং জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তবে জিহাদের একটি আদব শিখানো হয়েছে যে, নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর কখনও ভরসা করবে না। ভরসা করবে আল্লাহর উপর। আল্লাহর নুসরতের উপর। বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার কামনা করবে না। সহীহ সালামতে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাওয়ার দোয়া করবে। **এজন্য**

ইবনু কুতায়বা রহ. (২৭৬হি.) এ হাদিসকে নিম্নোক্ত শিরোনামের অধীনে এনেছেন,

آداب الحرب ومكائدها

“যুদ্ধের আদব ও কলা-কৌশল।”- উয়ূনুল আখবার **১/১৮৫**

ইবনু হাজার রহ. বলেন,

وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم وتعليمهم بما يحتاجون إليه وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة والحث على سلوك الأدب وغير ذلك. اهـ

“হাদিস থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মুস্তাহাব বুঝা যাচ্ছে:

- শত্রুর মুখোমুখী হলে দোয়া করা।
- আল্লাহর কাছে নুসরত চাওয়া।
- মুজাহিদদের এমনসব বিষয়ে অসীয়ত করা যেগুলো তাদের ইসলাহ করবে।
- এমনসব বিষয় তা’লিম দেয়া যেগুলো তাদের প্রয়োজন পড়বে। ...
- <u>আদব বজায় রেখে চলার প্রতি উৎসাহ দেয়া।</u> এ ছাড়াও আরো বিভিন্ন বিষয়।”- ফাতহুল বারি ৬/১৫৭

উভয় ইমামের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, হাদিসটি যুদ্ধের আদব বয়ান করার জন্য বলা হয়েছে, যুদ্ধ থেকে ফেরানোর জন্য নয়।

অধিকন্তু হাদিসের শুরু-শেষ ও প্রেক্ষাপট থেকে বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট:

- হাদিসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ময়দানে বলেছেন।

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দিনের শুরুভাগে হামলা করেননি, তখন হামলাটি যেন মোবারক সময়ে হয় এ জন্য জোহর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন।

- জোহরের সময় হওয়ার পর যখন হামলা করবেন স্থির করেছেন তখন যুদ্ধের একটি আদব বর্ণনা করেছেন, পাশাপাশি সবরের সাথে টিকে থাকার উৎসাহ দিয়েছেন।

- আমীর উমার ইবনু আব্দুল্লাহ রহ. যখন হারুরিয়্যা তথা

খাওয়ারেজদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাচ্ছেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে এ কথা বলেননি যে, জিহাদে যাওয়া যাবে না, হাদিসে নিষেধ এসেছে। বরং তিনি যুদ্ধের একটি সুন্নত শিখালেন যে, যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন যেন বুঝিয়ে সুজিয়ে দলীল-প্রমাণ পেশ করে খাওয়ারেজদের পথে নিয়ে আসা যায়। সংঘর্ষ ছাড়াই উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করবেন। যেমনটা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন। নিজে গিয়ে এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠিয়ে মুনাযারা করে খাওয়ারেজদের ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করেছেন। এতে অধিকাংশ খাওয়ারেজ ফিরে আসে। বাকি যারা থেকে যায় তাদের সাথে কিতাল করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এটিই শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন।

- কয়েকটি হাদিস থেকে বুঝা যায়, এ হাদিস খায়বারের যুদ্ধের সময়কার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগেও অনেক জিহাদ করেছেন, এর পরেও করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের পতাকা উড্ডীন করে দুনিয়াব্যাপী

ছড়িয়ে পড়েন। রোম-পারস্যসহ অর্ধেকেরও বেশি দুনিয়া বিজয় করেছেন। যদি এ হাদিসে জিহাদ নিষেধ করাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সেদিন জিহাদের ময়দানে থেকে যাওয়া জায়েয হতো না। এর পরে কোন যুদ্ধ করা জায়েয হতো না। সাহাবায়ে কেরামের সকল জিহাদ হারাম হতো। যেহেতু তা হয়নি, বুঝা গেল, জিহাদ নিষেধ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও উদ্দেশ্য নয়, সাহাবায়ে কেরামও এমনটি বুঝেননি। এর বিপরীত যারা বুঝবে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্তির শিকার। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

মোটকথা- জিহাদের ব্যাপারে গোটা শরীয়তে যে শুধু হাদিস একটাই তা তো নয়। সবকিছু বাদ দিয়ে একটা হাদিসের পেছনে পড়ে মনমতো ব্যাখ্যা করে জিহাদের বিরুদ্ধে লেগে পড়া অন্তরের বক্রতার আলামত। **আল্লাহ তাআলা এদের চিত্রটাই তুলে ধরেছেন,**

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

"তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি আপনার উপর এই কিতাব নাযিল করেছেন, (যেখানে রয়েছে দু'ধরণের আয়াত) এর কিছু আয়াত হচ্ছে মুহকাম (সুস্পষ্ট দ্বর্থ্যহীন) এবং এগুলোই হচ্ছে কিতাবের মূল অংশ; আর কিছু আয়াত আছে মুতাশাবিহ (রূপক)। যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা (সমাজে) ফিতনা বিস্তারের এবং আল্লাহর কিতাবের অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কিতারেব মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে থাকে।"- আলে ইমরান ৭

অধিকন্তু হাদিসটিও অস্পষ্ট নয়। হাদিসের শুরু-শেষ ও প্রেক্ষাপট থেকে এবং স্বয়ং হাদিসের শব্দ থেকেই স্পষ্ট যে, জিহাদের আদব বয়ান করা পাশাপাশি জিহাদের প্রতি উৎসাহ দেয়া হাদিসের উদ্দেশ্য। জিহাদের বিপরীত কোন কিছু হাদিসের কোনো একটি শব্দেও নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين

৮২.সংশয়: জিহাদ হাসান লি-গাইরিহি

জিহাদ বিমুখতার আরেক খোঁড়া উজর: জিহাদ হাসান লিগাইরিহি।

এরপর হাসান লিগাইরিহির মনগড়া বিভিন্ন ব্যাখ্যা। যেমন,

- জিহাদ হাসান লিগাইরিহি আর দাওয়াত হাসান লিআইনিহি। কাজেই জিহাদের চেয়ে দাওয়াত উত্তম, বা দাওয়াতের সুযোগ থাকাবস্থায় জিহাদের প্রয়োজন নেই, কিংবা আরেকটু আগে বেড়ে- দাওয়াত ফরয, জিহাদ হারাম। সাধারণত তাবলিগপন্থীদের মাঝে এ ধরণের ধারণা প্রচলিত।

- আবার কেউ কেউ বলেন, হাসান লিগাইরিহি মানে একান্ত জরুরত না হলে জিহাদ করা যাবে না। তবে এ একান্ত

জরুরত কখন দেখা দেয় তার কোনো হদ-সীমা নেই। বরং এ শ্রেণীর উদ্দেশ্য জিহাদ সম্পূর্ণ হারাম করে দেয়া।

মোটকথা, ‘জিহাদের তুলনায় দাওয়াত উত্তম’ বা ‘জিহাদের প্রয়োজন নেই’ থেকে শুরু করে ‘জিহাদ হারাম’ পর্যন্ত বিভিন্ন ধারণা হাসান লিগাইরিহির প্রচলিত আছে। এ সংশয়টি সাধারণত কিছু কিছু আলেম ও তালিবুল ইলমের মাঝে দেখা যায়। তাবলিগি হালকায় এর আলোচনা না উঠলে হয়তো সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এ সংশয় ছড়াতো না।

♣ একটি প্রশ্ন

হাসান লিগাইরিহির যে ব্যাখ্যা জিহাদের বেলায় করা হচ্ছে, এ ব্যাখ্যা কি শুধু জিহাদের বেলায়ই প্রযোজ্য না’কি অন্যান্য যেসব বিধানকে হাসান লিগাইরিহি বলা হয়েছে সেগুলোর বেলায়ও প্রযোজ্য? যেমন অযু এবং জানাযার নামায। এ দু’টোকে হাসান লিগাইরিহি বলা হয়েছে। তাহলে কি বলা যাবে, এগুলো না করলেও চলবে, বা না করা ভাল, বা একান্ত জরুরতের হালতেই কেবল করা যাবে, কিংবা করা হারাম?

যদি না বলা যায় তাহলে জিহাদের বেলায় ব্যতিক্রম কেন?

♣ হাসান লি আইনিহি-গাইরিহির ভিত্তিতে মূল বিধানে কোনো ব্যবধান আসবে না

আইনিহি গাইরিহির সাথে ফরয হওয়া না হওয়া বা উত্তম হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ এমন নয় যে, কোনো জিনিস হাসান লিআইনিহি সাব্যস্ত হলে তাকে ফরয বলা হবে আর গাইরিহি হলে তাকে অনুত্তম বা হারাম বলা হবে। আইনিহি গাইরিহি থেকে কোনো বিধান সাব্যস্ত হবে না। বরং বিষয়টি হলো, যেসব বিষয় আগে থেকেই শরীয়ত ফরয ওয়াজিব করে রেখেছে সেগুলো নিয়ে গবেষণা করে বের করা হয়েছে যে, কোনটি আইনিহি আর কোনটি গাইরিহি। অতএব, কোন বিধান সম্পর্কে আইনিহি গাইরিহির প্রশ্ন তখনই আসবে যখন দলীল প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত হবে যে, শরীয়ত এ বিষয়টি করতে আদেশ দিয়েছে। শরীয়তের আদেশ আসার পর এবং বিধানটি অবশ্যকরণীয় সাব্যস্ত হবার পর আলোচনা আসবে যে, আদেশটা যে দেয়া হয়েছে তা কি আইনিহি হিসেবে না'কি গাইরিহি হিসেবে। এরপর সেটা আইনিহি সাব্যস্ত হোক আর গাইরিহি-ই সাব্যস্ত হোক

তার দ্বারা মূল বিধানে কোন তফাৎ আসবে না। মূল বিধান করণীয় করণীয়-ই থেকে যাবে। আইনিহি গাইরহির কারণে তাতে কোনো তফাৎ আসবে না, তবে বিধানের হিকমত ও রহস্য জানা যাবে।

যেমন ধরুন, অযু। শরীয়ত প্রথমে নামাযের জন্য অযু ফরয করেছে। অযুর আদেশ আসার পর এবং অযু অবশ্যকরণীয় সাব্যস্ত হবার পর উসূলবিদগণ গবেষণা করেছেন যে, অযুর আদেশটা কি আইনিহি হিসেবে না'কি গাইরিহি হিসেবে। দেখা গেল, অযুর আদেশটা গাইরিহি হিসেবে। অর্থাৎ অযুর আদেশটা এসেছে মূলত নামাযের প্রয়োজনে। অন্যথায় অযুর আদেশ দেয়ার দরকার পড়তো না। গাইরিহি হওয়ার অর্থ এটাই। সামনে ইনশাআল্লাহ আমরা এ বিষয়টি একটু স্পষ্ট আলোচনা করবো। অযুর ব্যাপারে যখন বুঝা গেল যে, এটি মূলত হাসান লিগাইরিহি, তখন এর দ্বারা অযুর বিধানে কোনো ব্যবধান আসেনি। অযু ফরয ফরযই রয়ে গেল। তবে অযুর হিকমতটা জানা গেল যে, অযু তথা কয়েকটি অঙ্গ ধৌত ও মাসেহ করা মূলত এমন কোনো কাজ নয় যা ফরয করা দরকার বা এর উপর

সওয়াব-গুনাহর হিসাব নিকাশ হওয়া দরকার। তবে নামাযের জন্য যেহেতু পবিত্রতা জরুরী সে হিসেবে অযুর আদেশ দেয়া হয়েছে এবং এর বিনিময়ে সওয়াব নির্ধারণ করা হয়েছে। এর দ্বারা অযুর হিকমত ও রহস্য জানা গেল, অযুর মূল বিধানে কোনো ব্যবধান আসলো না।

অন্য সকল বিধানের বেলায়ও এমনই। জিহাদের বেলায়ও এমন। আগে শরীয়তের আদেশ দ্বারা জিহাদ ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। করলে সওয়াব না করলে গুনাহ ও শাস্তির ফায়সালা হয়ে গেছে। এরপর উসূলবিদগণ গবেষণা করেছেন যে, জিহাদ তথা মারামারি, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসাযজ্ঞ মূলত ফরয করা হয়েছে কুফরের শক্তি চূর্ণ করার জন্য এবং আল্লাহ তাআলার দ্বীন বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কুফর যদি না থাকতো জিহাদের প্রয়োজন পড়তো না। এ হিসেবে জিহাদ হাসান লিগাইরিহি। তবে আইনিহি হোক গাইরিহি হোক তা ফরয। আইনিহি গাইরিহির গবেষণার দ্বারা জিহাদ ফরয হওয়ার হিকমতটা জানা গেল, কিন্তু জিহাদ ফরয ফরযই রয়ে গেল। গাইরিহি হওয়ার দ্বারা ফরযে কোনো ব্যবধান আসেনি।

***

উপরোক্ত কথাগুলো বুঝার পর বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

উসূলবিদগণ আইনিহি গাইরিহির আলোচনাটা এনেছেন 'আমর' (الأمر) তথা আদেশের আলোচনায়।

প্রথমে আলোচনা করেছেন যে, 'আমর' উজূব (الوجوب)-এর জন্য আসে। অর্থাৎ শরীয়ত যে বিষয়টি করার আদেশ দিয়েছে সেটি করা আবশ্যক। এ আদিষ্ট বিষয়টিকে 'মা'মূর বিহি' (المأمور به) বলে। দলীল প্রমাণের আলোকে কোনো কোনো মামূর বিহি ফরয (যেমন নামায, জিহাদ) আর কোনো কোনোটা ওয়াজিব (যেমন, সাদাকায়ে ফিতর)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করেছেন যে, মামূর বিহি অবশ্যই 'হাসান' (حسن) তথা ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ হয়ে থাকে। অর্থাৎ শরীয়ত যে কাজটি করার আদেশ দিয়েছে সেটি অবশ্যই ভাল, প্রশংসনীয় এবং সওয়াবের কাজ।

কেননা, আল্লাহ তাআলা কোনো মন্দ কাজের আদেশ দেন না। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

"আল্লাহ তাআলা মন্দ কাজের আদেশ দেন না।" -আ'রাফ ২৮

তৃতীয় পর্যায়ে আইনিহি ও গাইরিহির আলোচনা এনেছেন। অর্থাৎ মামূর বিহিটি যে ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ তা কেন? এ আলোচনাটি মূলত মামূর বিহিটি হাসান কেন হল তার হিকমত ও রহস্য নিয়ে আলোচনা।

যেমন ধরুন নামায। আল্লাহ তাআলা এ জাতীয় আয়াতের মাধ্যমে নামাযের আদেশ দিয়েছেন,

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

"নামায কায়েম কর।' -আনআম ৭২

উসূলবিদদের তারতিব অনুযায়ী প্রথমে আলোচনা হবে, নামায হলো মামূর বিহি। আল্লাহ তাআলা এর আদেশ দিয়েছেন। অতএব, নামায ফরয।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা আসবে, নামায যেহেতু মামূর বিহি অতএব, তা অবশ্যই হাসান তথা ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ।

তৃতীয় পর্যায়ে আলোচনা আসবে, নামায যে হাসান তা কেন? অর্থাৎ নামায কেন ভাল, প্রসংশনীয় ও সওয়াবের কাজ। এটি মূলত নামায ভাল কেন তার হিকমত নিয়ে আলোচনা।

জিহাদের বেলায়ও এমনই। উসূলে ফিকহের তারতিব অনুযায়ী প্রথমে আলোচনা আসবে, আল্লাহ তাআলা জিহাদের আদেশ দিয়েছেন বিভিন্ন আয়াতে। অতএব, জিহাদ একটি মামূর বিহি। কাজেই তা ফরয।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা আসবে, যেহেতু জিহাদ মামূর বিহি কাজেই তা অবশ্যই হাসান তথা ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ।

তৃতীয় পর্যায়ে আলোচনা আসবে, জিহাদ যে হাসান তথা ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ তার কারণ ও হিকমত কি?

তাহলে লিআইনিহি বা গাইরিহির আলোচনার আগে আরো দু'টি আলোচনা আছে, যে দু'টি আলোচনার দ্বারা দু'টি হুকুম সাব্যস্ত হয়ে গেছে,

এক. জিহাদ ফরয।

দুই. জিহাদ হাসান তথা ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ।

ইসলামের সকল বিধানের বেলায়ই এ তিন স্তরের আলোচনা প্রযোজ্য। তবে তৃতীয় আলোচনাটি আসলে কোন জরুরী আলোচনা নয়। নামায কেন ভাল, যাকাত কেন ভাল, হজ কেন ভাল, জিহাদ কেন ভাল- এগুলো না জানলেও কোনো সমস্যা নেই। এ হিকমত জানা আবশ্যক নয়। অনেকাংশে এটি একটি আকলি বহস। এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নামায, রোযা, হজ, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি বিধান ফরয করেছেন। কেন ফরয, কি কারণে ফরয, এর হিকমত কি- এসব আকলি বহসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহর গোলাম। আল্লাহ আমাকে করতে আদেশ দিয়েছেন, এখন আমাকে করতে হবে। ব্যস্। এতটুকুই যথেষ্ট। এত বেশি কেনো কোনো-তে যাওয়ার দরকার নেই। এ কারণে দেখা গেছে, এ আইনিহি গাইরিহির মারপ্যাঁচে উসূলবিদদের একটা বিশেষ শ্রেণীই কেবল গিয়েছেন, বাকিরা এসব আলোচনা এড়িয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা সকলের প্রতি রহম করুন।

বুঝার স্বার্থে কয়েকজন উসূলবিদের উদ্ধৃতি

দিচ্ছি-

ইমাম নাসাফি রহ. (৭১০হি.) 'আলমানার' এ বলেন (পৃ. ৫),

ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر حكيم ... وهو أما أن يكون لعينه ... كالتصديق والصلاة والزكاة، أو لغيره ... كالوضوء والجهاد. اهـ

"অবশ্যই অবশ্যই মা'মূর বিহি হাসান হতে হবে। কেননা, আদেশদাতা হচ্ছেন হাকিম তথা সীমাহীন হিকমতের অধিকারী সত্তা (যিনি মন্দের আদেশ দিতে পারেন না)। তবে তা লিআইনিহি হতে পারে। যেমন (যেসব বিষয়ে ঈমান জরুরী সেগুলোতে) আন্তরিক বিশ্বাস এবং নামায ও যাকাত। কিংবা লিগাইরিহি হতে পারে। যেমন অযু ও জিহাদ।"

এখানে ঈমান, নামায, যাকাত, অযু ও জিহাদ এ পাঁচটি মামূর বিহি তথা ফরয। এগুলোর ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, এগুলো অবশ্যই ভাল, প্রশসংনীয় ও সওয়াবের কাজ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ভাল হওয়ার দিক থেকে এগুলোকে দুই

ভাগে ভাগ করা হয়েছে: লিআইনিহি, লিগাইরিহি।

ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

اعلم أن مطلق مقتضى الأمر كون المأمور به حسنا شرعا ...
وبيان كونه ثابتا شرعا أن الله تعالى لم يأمر بالفحشاء كما نص عليه في محكم تنزيله والأمر طلب إيجاد المأمور به بأبلغ الجهات ولهذا كان مطلقه موجبا شرعا والقبيح واجب الإعدام شرعا فما هو واجب الإيجاد شرعا تعرف صفة الحسن فيه شرعا.
ثم هو في صفة الحسن نوعان حسن لمعنى في نفسه وحسن لمعنى في غيره. اهـ

"ভাল করে জেনে রাখো, কোনো বিষয়ে আদেশ দেয়ার দাবি হচ্ছে শরীয়তের দৃষ্টিতে মা'মূর বিহি তথা আদিষ্ট বিষয়টি হাসান। কারণ, আল্লাহ তাআলা কোনো মন্দ কাজের আদেশ দেন না, যেমনটা আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট জানিয়েছেন। ... তবে এক্ষেত্রে তা দু'ভাগে বিভক্ত: হাসান লিআইনিহি ও হাসান লিগাইরিহি।" -উসূলে সারাখসী ১/৬০

এরপর হাসান লিআইনিহির উদাহরণ দেন ঈমান, নামায,

রোযা ও যাকাত দিয়ে। হাসান লিআইনিহি হাসান লিগাইরিহি উভয়ে আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। সে আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না।

তারপর হাসান লিগাইরিহির উদাহরণ দেন জুমআর নামাযে যাওয়ার জন্য চলা, অযু, জানাযার নামায, জিহাদ ও হুদুদ দিয়ে। **কিতাল ও হুদুদ প্রসঙ্গে বলেন,**

القتال مع المشركين حسن لمعنى في غيره وهو كفر الكافر أو قصده إلى محاربة المسلمين وذلك مضاف إلى اختياره
وكذلك القتال مع أهل البغي حسن لدفع فتنتهم ومحاربتهم عن أهل العدل
وكذا إقامة الحدود حسن لمعنى الزجر عن المعاصي وتلك المعاصي تضاف إلى كسب واختيار ممن تقام عليه ولكن لا يتم إلا بحصول ما لأجله كان حسنا.
وحكم هذا النوع أنه يسقط بعد الوجوب بالأداء وبانعدام المعنى الذي لأجله كان يجب حتى إذا تحقق الانزجار عن ارتكاب المعاصي أو تصور إسلام الخلق عن آخرهم لا تبقى فرضيته إلا أنه خلاف للخبر لأنه لا يتحقق انعدام هذا المعنى في الظاهر. اهـ

"মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিতাল হাসান লিগাইরিহি তথা ভিন্ন একটি বিষয়ের কারণে তা হাসান। আর তা হল কাফেরের

কুফরি কিংবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের প্রবণতা। ... তদ্রূপ বাগিদের বিরুদ্ধে কিতাল করা এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান যে, এর দ্বারা আহলে আদলের উপর থেকে বাগিদের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত ফিতনা ও মারামারি প্রতিহত করা যাচ্ছে। তদ্রূপ হুদুদ কায়েম করা এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান যে, এর দ্বারা গুনাহ থেকে বিরত রাখা যাচ্ছে। ...

এ ধরণের মা'মূর বিহির বিধান হল (দুই জিনিসের কোনো একটার দ্বারা এর যিম্মাদারি আদায় হবে),

(এক.) ফরয হওয়ার পর সম্পাদন করে নিলে এর যিম্মাদারি আদায় হয়ে যাবে।

(দুই.) যে কারণে তা ফরয হয়েছিল সে কারণটি না থাকলেও এর দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। অতএব, যদি কেউই গুনাহে লিপ্ত না হয় কিংবা জগতবাসী সকলেই যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে (হুদুদ ও জিহাদ)-এর ফরয দায়িত্ব আর থাকবে না। তবে হাদিসের ভাষ্যমতে এমনটি হবে না। কেননা, যে কারণে তা ফরয সে কারণটি স্বাভাবিক দূরীভূত হয়ে যাবে না।" -উসূলে সারাখসী ১/৬২

অর্থাৎ দারুল ইসলামের অধিবাসীরা কখনও কখনও হলেও হদ-জাতীয় কোনো না কোনো অপরাধ করবেই স্বাভাবিক। যার ফলে তাদের উপর হদ কায়েম করতে হবে। আর কাফেররাও সকলেই যে মুসলমান বা যিম্মা হয়ে যাবে তা নয়। ফলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেই যেতে হবে কিয়ামত অবধি। হাদিসে এমনটাই পরিষ্কার এসেছে।

আব্দুল আজিজ বুখারি রহ. (৭৩০হি.) বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেন,

لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة» وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال» . اهـ

“কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইরশাদ করেন, ‘এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

(কারণ,) কেয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের একটা দল বিজয়ী বেশে (দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে) কিতাল করতে থাকবে'।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের বিরোধীদের উপর হবে প্রতাপশালী। (এ ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) তাদের সর্বশেষ দলটি মাসিহে দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে'।" -কাশফুল আসরার ১/১৯০

প্রথম হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. রিওয়ায়াত করেছেন (সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬২)।

দ্বিতীয় হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. রিওয়ায়াত করেছেন (সুনানে আবু দাউদ, বাবু: ফি দাওয়ামিল জিহাদ, হাদিস নং ২৪৮৬)।

সারকথা

আইনিহি-গাইরিহির আলোচনা দ্বারা ফরয হয়ে থাকা বিধানগুলোর হিকমত জানা যাবে, মূল ফরযে কোন ভিন্নতা আসবে না। নামায লিআইনিহি হয়ে যেমন ফরয; জুমআর নামাযের জন্য গমন, জানাযার নামায, অযু ও জিহাদ গাইরিহি হয়ে তেমনই ফরয। ফরযে কোনো তারতম্য নেই। অধিকন্তু এ আলোচনা আকলি তথা আকল প্রসূত। এর পিছে না পড়াই ভাল।

পাশাপাশি এও জানা গেল, কুফরের যে শক্তি চূর্ণ করার জন্য জিহাদ ফরয করা হয়েছে তা কেয়ামত অবধি বহাল থাকবে বিধায় জিহাদের ফরযও কেয়ামত অবধি বহাল থাকবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৮৩.সংশয় নিরসন- ০১: মুসলিম ভূমি উদ্ধার করা ফরয

সংশয়-১:

ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, কোন মুসলিম ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে শত্রু প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে বেরিয়ে পড়া ফরয। কিন্তু কাফেররা কোন ভূখণ্ড দখল করে নিলে তা পুনঃরুদ্ধার করা ফরয- এমন কথা কি কেউ বলেছেন? ভারতে যখন ইংরেজরা আক্রমণ করেছিল তখন প্রতিহত করার জন্য জিহাদ ফরয ছিল। কিন্তু যখন তারা দখল করে নিয়ে গেছে তখন থেকে আর জিহাদ ফরয নয়। স্পেন, আরাকান ও কাশ্মিরসহ অন্যান্য ভূখণ্ডের বেলায়ও একই কথা।

নিরসন

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد

এক.

আমরা জানি, জিহাদ দুই প্রকার: ইকদামি ও দিফায়ি। কাফেরদের শক্তি চুরমার করে ইসলামী শাসনের অধীনস্ত করার জন্য কাফেরদের দেশে অগ্রে বেড়ে যে হামলা করা হয়, সেটি ইকদামি জিহাদ। আর কাফেররা মুসলমানদের কোন ভূমিতে আক্রমণ করলে প্রতিহত করা দিফায়ি জিহাদ। এ উভয় প্রকার জিহাদ ফরয। প্রথমটি ফরযে কিফায়া, দ্বিতীয়টি ফরযে আইন।

কাফেররা যদি আমাদের উপর কোন আক্রমণ নাও করে, তথাপি তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরয। তাদেরকে তাদের দেশে রাজত্ব করতে দেয়াও আমাদের জন্য জায়েয নেই। তাদের রাজত্ব চুরমার করে ইসলামী শাসনের অধীনস্ত করা আমাদের ফরয দায়িত্ব।

মুহতারাম পাঠক, যখন কাফেরদেরকে কাফেরদের ভূমিতে নিরাপদে থাকতে দেয়াও আমাদের জন্য জায়েয নেই, তখন আমাদের ভূমি দখল করে নিলে তা তাদের হাতে ছেড়ে রাখা কিভাবে জায়েয হতে পারে? এখানে তো এর আগেই জিহাদ

ফরয হবে।

ইমাম তুসূলী রহ. (১২৫৮ হি.) বলেন,

أفلا تتذكرون: أن الله- سبحانه- أمرنا بالذهاب إليهم، وقتالهم في أراضيهم، فكيف: إذا قدموا إلى برّنا هذا بالغيّ والفساد!؟، أم لنا براءة استثنانا الله- تعالى- بسببها من عموم دعوة العباد؟!. اهـ

"তোমাদের কি স্মরণ নেই যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের ভূমিতে গিয়ে আক্রমণ চালানোর আদেশ দিয়েছেন?? তাহলে স্বয়ং তারা ভ্রষ্টতা আর ফাসাদ নিয়ে আমাদের এই ভূমিতে আগ্রাসন চালালে কি বিধান হবে?! না'কি আমাদের এমন কোন ছাড়পত্র আছে, যার কারণে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের দাওয়াতের সার্বজনীন যে দায়িত্ব, তা থেকে আমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন?"- আজবিবাতুত তুসূলী ২৬৩

দুই.

আরাকান, কাশ্মির, ভারত, পূর্ব তুর্কিস্তানসহ কাফেরদের দখলকৃত প্রতিটি মুসলিম ভূমিতে মুসলমানরা আজ সীমাহীন

নির্যাতিত। তাদের হাহাকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা লড়াই করছ না আল্লাহর রাস্তায় এবং ঐসব দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদেরকে উদ্ধার করার জন্য, যারা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে’ যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।”- নিসা: ৭৫

শায়েখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আসসা’দি রহ. (১৩৭৬ হি.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال:

{ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله

أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة.ويدعون الله أن يجعل لهم وليًّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها.

فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء. اهـ

“এ আয়াতে আল্লাহ তা’আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে তার রাস্তায় জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করছেন। আয়াত *বুঝাচ্ছে যে, এ জিহাদ তাদের উপর ফরজে আইন হয়ে গেছে। এ জিহাদ তরকের কারণে তারা চরম ভর্ৎসনার পাত্র হচ্ছে। তিনি বলছেন, ‘কী হলো তোমাদের?! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছ না।’ অথচ অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুরা, যারা কোনো উপায় অবলম্বন পাচ্ছে না, তারা শত্রুদের হাতে চরম অত্যাচারের শিকার হচ্ছে! তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করছে, তিনি যাতে তাদেরকে এই ভূখণ্ড থেকে বের করে নিয়ে যান। যার অধিবাসীরা শিরক ও কুফর করে নিজেদের প্রতি জুলুম করছে এবং অত্যাচার করে ও আল্লাহর

পথে বাধা দিয়ে মুমিনদের উপর জুলুম করছে। দ্বীনের দাওয়াত ও হিজরত থেকে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে মিনতি জানাচ্ছে, তিনি যেন তাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী প্রেরণ করেন, যে তাদেরকে এই জালেমদের ভূমি থেকে উদ্ধার করবে।

সুতরাং এটি তো সে প্রকারের জিহাদ, যা তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও ইজ্জত আব্রু রক্ষার্থে করবে। এটি সেই যুদ্ধ নয়, যা (আগে বেড়ে) কাফেরদের উপর আক্রমণের আগ্রহে করা হয়। যদিও এই প্রকারের জিহাদেও রয়েছে মহাসফলতা এবং তা থেকে পশ্চাৎগামীদের ব্যাপারেও এসেছে চরম ভর্ৎসনা, কিন্তু যে জিহাদের মাধ্যমে তোমাদের দুর্বলদের উদ্ধার করবে, তার প্রতিদান তার চেয়েও আরো অনেক বড় এবং তার উপকারিতাও অনেক বেশি। কারণ এটি শত্রু প্রতিরোধমূলক জিহাদ।"- তাফসীরে সা'দি ১/১৮৭

আল্লাহ তাআলার এমন সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরও কিভাবে মজলুম মুসলমানদের কথা ভুলে গিয়ে আমরা বসে থাকতে

পারি??

তিন.

আক্রান্ত হলে যে কারণে প্রতিহত করা ফরয, সে একই কারণে দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করা ফরয। আক্রান্ত হলে প্রতিহত করা ফরয যাতে মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়ার কোন ক্ষতিসাধন না হয়। মুসলমানদের অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হতে না হয়। কোন মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর উপর কোন সীমালঙ্গন না হয়। কাফেররা যেন মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব না করতে পারে। তাদের উপর চেপে বসতে না পারে। আল্লাহর যমিনে যেন ফিতনা না হয়। শিরক, কুফর ও ফাসাদের রাজত্ব না হয়। আল্লাহর বান্দারা যেন নিরাপদে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে যেতে পারে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّه لِلّٰهِ

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল কর, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন ও আনুগত্য পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।”- আনফাল: ৩৯

কাফেররা আক্রমণ করলে তো এসব ফিতনার সম্ভাবনা থাকে মাত্র। যদি তারা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়ে যেতে পারে, তাহলে ফিতনা চালাবে। আর দখল করে নিলে তো সুনিশ্চিত যে, তারা সব ধরণের ফিতনা ফাসাদ ও জুলুম অত্যাচার চালাবে- যেমনটা আজ আমরা প্রতিটি দখলকৃত মুসলিম ভূমিতে দেখতে পাচ্ছি। যদি আগ্রাসন চালালেই জিহাদ ফরয হয়ে যায়, তাহলে দখল করে নিলে কোন কারণে জিহাদ ফরয হবে না? এখানে তো এর আগেই ফরয হওয়ার কথা।

চার.

ফুকাহায়ে কেরাম যেখানে বলেছেন যে, কাফেররা কোন ভূমিতে আগ্রাসন চালালে তা প্রতিহত করা ফরয, যাতে তারা দখলদারিত্ব বসাতে না পারে, সেখানে আসলে তারা এ কথাটিও বলেছেন যে, কোন ভূখণ্ড কাফেরদের দখলে চলে গেলে তা উদ্ধার করা ফরয। ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করলেই তা বুঝে আসে। আসুন আমরা কয়েকটি বক্তব্য দেখি। ইনশাআল্লাহ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দখলদারিত্ব কায়েম করার পূর্বেই শত্রু প্রতিহত করা ফরয:

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

> ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لاخلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين و سبي ذراريهم. اهـ

“সকল মুসলমানের সুবিদিত আকীদা যে, যখন সীমান্তবর্তী মুসলমানেরা শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা করে; আর তাদের মাঝে শত্রু প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না থাকে; ফলে তারা নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ ও জানের ব্যাপারে শঙ্কাগ্রস্ত হয়, তখন পুরো উম্মাহর উপর ফরজ হয়ে যায়, শত্রুর ক্ষতি থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে পরিমাণ লোক তাদের সাহায্যে জিহাদে বের হওয়া। এ বিষয়ে উম্মাহর মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। এমন কথা কোনো মুসলমানই বলেনি যে, শত্রুরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করবে, তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করবে, আর মুসলমানদের জন্য তাদেরকে সাহায্য না করে বসে থাকা বৈধ হবে।”- আহকামুল কুরআন ৪/৩১২

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ: (৫৮৭ হি.) বলেন-

فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد، فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى {انفروا خفافا وثقالا} قيل: نزلت في النفير. اهـ

“যদি নাফিরে আম হয়ে যায়; অর্থাৎ কোন এলাকায় শত্রুরা আক্রমন চালায়, তাহলে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এই ফরজ প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের উপর বর্তায়। এর প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার বাণী- ‘তোমরা হালকা-ভারী উভয় অবস্থায় জিহাদে বের হও।’ বলা হয়, আয়াতটি নাফিরে আম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।” -বাদায়িউস সানায়ি’: ৭/৯৮

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

يجب الجهاد على الكفاية إلا إذا كان النفير عاماً بأن لا يندفع شر الكفار إذا هجموا ببعض المسلمين ... فيفترض على كل واحد. اهـ

“জিহাদ ফরজে কেফায়া। তবে নাফিরে আম হয়ে গেলে সকলের উপর ফরজ হয়ে যায়। আর নাফিরে আম হল- যখন কাফেররা আক্রমন করে বসে এবং কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা তাদের অনিষ্ট প্রতিহত যায় না।... তখন সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।” –আলবিনায়া:৭/৯৬

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.) বলেন-

ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه. اهـ

“যদি এমন হয় যে, শত্রুরা দারুল ইসলামের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালায়নি, তাহলেও তাদের উপর ফরজ, শত্রু প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া।” -তাফসীরে কুরতুবী: ৮/ ১৫২

এ চার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট- শত্রু আগ্রাসন চালালে বা চালাতে আসলে তাকে প্রতিহত করার জন্য জিহাদ ফরয। দখলদারিত্ব কায়েম করার পূর্বেই তাকে প্রতিহত করে দিতে হবে।

দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করা ফরয:

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন-

> الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم. فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا: فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. اهـ

“যদি শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে (প্রথমত) জিহাদ ফরজে আইন হয় ঐসব মুসলমানের উপর, যারা শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী। আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে, (শত্রু প্রতিহত করতে) যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাদের উপর জিহাদ (ফরজে আইন নয়; বরং) ফরজে কেফায়া। এ অবস্থায় তাদের জিহাদে শরীক না হওয়ার অবকাশ থাকে। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে, তারা যদি শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাদ না করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের

উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে; যেমন নামাজ-রোজা ফরজে আইন। তখন তাদের জন্য জিহাদ না করার কোনো অবকাশ থাকবে না। এভাবে তার পরের এবং তার পরের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হতে থাকবে। পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে।" -রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৪

ইমাম তুসূলী রহ. (১২৫৮ হি.) বলেন,

فالجهاد: فرض عين على من نزل بهم عدوّ الدين، فإن لم تكن فيهم كفاية، أو لم تجتمع لهم كلمة: فعلى الذين يلونهم، (فإن لم تكن في الذين يلونهم كفاية، أو لم تجتمع لهم كلمة: فعلى الذين يلونهم)، وهكذا إلى أن تحصل الكفاية، ولو اتّصل ذلك من مثل "المغرب" لبغداد"، وعمّ ذلك من الآفاق الحاضر والباد. اهـ

"যাদের উপর শত্রুরা আগ্রাসন চালিয়েছে, (সর্বপ্রথম) তাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন। যদি তাদের দ্বারা যথেষ্ট না হয় বা তাদের পরস্পরে ঐক্য না থাকে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের

উপর। যদি তাদের পার্শ্ববর্তীদের দ্বারা যথেষ্ট না হয় বা তাদের পরস্পরে ঐক্য না থাকে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর। এভাবে পর্যায়ক্রমে ফরযে আইন হতে থাকবে, যতক্ষণ না প্রতিহত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের ব্যবস্থা হয়। যদিও এই ফরয মাগরিব থেকে নিয়ে বাগদাদ পর্যন্ত, এমনকি সার্বজনীনভাবে পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের গ্রাম-শহর সকলের উপর বর্তায়।”- আজবিবাতুত তুসূলী ২৬৩

লক্ষ করুন- বলা হয়েছে, যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে সর্বপ্রথম তাদের উপর জিহাদ ফরয। তারা যদি প্রতিহত করতে সক্ষম না হয় বা না করে তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর। এভাবে হতে হতে সারাবিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যাবে।

এই বক্তব্যের দু’টি উদ্দেশ্য হতে পারে-

ক.

কাফেররা কোন এক জায়গায় আক্রমণ করলে আগ্রাসী কাফেরদের প্রতিহত করতে যে পরিমাণ মুসলমানের জিহাদের শরীক হওয়ার দরকার, সে পরিমাণ মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। প্রথমত এ দায়িত্ব যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তাদের উপর বর্তাবে। তারা জিহাদে শরীক হবে। তাদের দ্বারা যথেষ্ট হবে না মনে হলে তাদের পার্শ্ববর্তীরাও শরীক হবে। তাদের দ্বারাও যথেষ্ট হবে না মনে হলে তাদের পার্শ্ববর্তীরাও শরীক হবে। এভাবে যদি এমন হয় যে, সারা বিশ্বের সকল মুসলমান শরীক না হলে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে না, তারা দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলবে, তাহলে সকলের উপরই জিহাদে শরীক হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ কোন ভূখণ্ডে আগ্রাসন হওয়া মাত্রই এমন সংখ্যক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে, যে সংখ্যক মুসলমান দিয়ে দখলদারিত্ব বসানোর আগেই কাফেরদের প্রতিহত করা যায়। এ হল এক উদ্দেশ্য। প্রথমে উল্লিখিত জাসসাস, কাসানী, আইনী ও কুরতুবি- এ চারজনের বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।

খ.

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এটি হতে পারে যে, প্রথমত যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তারা যদি প্রতিহত করতে না পারে বা না করে, ফলে কাফেররা তাদের উপর দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর ফরয হবে তাদের উদ্ধার করা। তারা যদি তাদের উদ্ধারে সক্ষম না হয় বা না করে কিংবা কাফেররা তাদের উপরও দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলে, তাহলে তাদের পরবর্তীদের উপর ফরয হবে তাদের সকলকে উদ্ধার করা। এভাবে আক্রান্ত ভূমিতে কাফেরদের দখলদারিত্ব যদি বহাল থাকে কিংবা তারা ক্রমাগত দখল বাড়াতে থাকে, তাহলে বাকি মুসলমানদের উপর ফরয হবে এসব দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করা। এর জন্য সারাবিশ্বের সকল মুসলমানকে জিহাদে শরীক হওয়ার দরকার পড়লে সকলকেই শরীক হতে হবে। কোন মুসলিম ভূমি কাফেদের দখলে থাকতে দেয়া যাবে না।

আল্লামা তুসূলী রহ. ও আল্লামা ইবনে আবেদীন রহ. সহ আরো যাদের বক্তব্য এমন- তাদের সকলের বক্তব্যেই এ দু'টি বিষয় উদ্দেশ্য হতে পারে।

চিন্তা করে দেখুন, ফুকাহায়ে কেরাম এ কথাগুলো বলেছেন, যখন উট-ঘোড়া ছাড়া যোগাযোগের আর কোন মাধ্যম ছিল না। সুদূর স্পেন বা মরক্কোতে আক্রমণ হলে এ খবর রাতারাতি মাশরিক তথা বাগদাদ বা হিন্দুস্তানে পৌঁছে যাবে না। আর স্পষ্ট যে, এত দিনে কাফেররা দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলবে। বাগদাদবাসী বা হিন্দুস্তানবাসীর তখন দায়িত্ব হবে, এ দখলদারিত্ব হটিয়ে স্পেন ও মরক্কো মুক্ত করা। ফুকাহায়ে কেরামের এমনটিই উদ্দেশ্য।

অধিকন্তু তারা বলেছেন, নিকটবর্তীরা যদি সক্ষমতা সত্ত্বেও জিহাদ না করে বসে থাকে, তাহলে বাকিদের দায়িত্ব জিহাদ করা। আর স্পষ্ট যে, নিকটবর্তীরা বসে থাকলে কাফেররা দখলদারিত্ব কায়েম করবে। পরবর্তী মুসলমানদের দায়িত্ব হবে কাফেরদের দখলদারিত্ব থেকে মুসলিম ভূমি উদ্ধার করা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে কামাল পাশা রহ. (৯৪০ হি.) এর ফতোয়া

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের দ্বিতীয় যে উদ্দেশ্যটির কথা বলেছি- অর্থাৎ কোন মুসলিম ভূমি কাফেরদের দখলে চলে গেলে তা উদ্ধার করা ফরয- ইবনে কামাল পাশা রহ. এর ফতোয়া থেকে বিষয়টি ইনশাআল্লাহ পরিষ্কার হবে। তার ফতোয়াটি ছিল দখলদার শীয়াদের ব্যাপারে।

শীয়ারা মুসলমানদের কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছিল। তখন তৎকালীন উসমানী খেলাফতের শাইখুল ইসলাম ইবনে কামাল পাশা রহ. (৯৪০ হি.) এদের বিরুদ্ধে কিতালের ফতোয়া জারি করেন। মূল ফতোয়াটি তুর্কি ভাষায়। ডক্টর সায়্যিদ বাগজুওয়ান সেটি তাহকিক করে আরবী অনুবাদ করে ছেপেছেন। ফতোয়ায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে কিতালের বিধান বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে ফিকহের বক্তব্য থেকে এর দলীল দিয়েছেন। এখানে প্রয়োজনীয় অংশটুকু উল্লেখ করছি। তিনি বলেন,

قد تواترت الأخبار والآثار في بلاد المؤمنين أن طائفة من الشيعة قد غلبوا على بلاد كثيرة من بلاد السنيين، حتى أظهروا مذاهبهم الباطلة. اهـ

“মুসলমানদের রাষ্ট্রসমূহে মুতাওয়াতির সূত্রে অসংখ্য ব্যক্তির মাধ্যমে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, শীয়াদের একটা দল সুন্নীদের অনেকগুলো এলাকা দখল করে নিয়েছে। এমনকি সেগুলোতে তারা তাদের বাতিল মতবাদ প্রকাশ্যে জারি করেছে।”- খামসু রাসায়িল ফিল ফিরাকি ওয়াল মাযাহিব ১৯৫

সামনে বলেন,

وبالجملة أن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لا يعد ولا يحصى. فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم. وإن دارهم دار حرب. اهـ

“মোটকথা, মুতাওয়াতির সূত্রে অসংখ্য ব্যক্তি মারফত আমাদের নিকট এসব শীয়ার এত অধিক কুফরির কথা পৌঁছেছে যে, তার কোন হিসাব কিতাব নেই। কাজেই, তারা কাফের ও মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আর তাদের দখলকৃত রাষ্ট্র দারুল হরবে পরিণত হয়েছে।”- খামসু রাসায়িল ফিল ফিরাকি ওয়াল মাযাহিব ১৯৬

সামনে বলেন,

ثم أن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين. حتى إنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هى دار الحرب، فيحل للمسلمين أموالهم ونسائهم وأولادهم ... ويجب أن يعلم أيضا أن جهادهم كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم. اهـ

"এদের বিধান মুরতাদদের বিধানের অনুরূপ। তাদের দখলকৃত শহরগুলো দারুল হরব। তাই মুসলমানদের জন্য তাদের মাল গনিমত বানানো এবং তাদের নারী শিশুদের বন্দী করা হালাল। ... আরো জেনে রাখা আবশ্যক যে, সকল সক্ষম মুসলমানের উপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরযে আইন।"- খামসু রাসায়িল ফিল ফিরাকি ওয়াল মাযাহিব ১৯৬

জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার পক্ষে তিনি সদরুশ শরীয়া রহ. (৭৪৭ হি.) এর নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন-

إذا هجمَ الكفارُ على ثغرٍ من الثّغورِ يصيرُ فرضَ عينٍ على مَن كان يقربُ منه، وهم يقدرونَ على الجهاد. وأمَّا على مَن ورائِهم، فإذا بلغَ الخبرُ إليهم يصيرُ فرضَ عينٍ عليهم إذا احتيجَ إليهم، بأن خيفَ على مَن كان يقربُ منهم، بأنَّهم عاجزونَ عن المقاومة، أو بأن لم يعجزوا، ولكن تكاسلوا، ثُمَّ وثُمَّ إلى أن يصيرَ فرضَ عينٍ على جميعِ أهلِ الإسلام شرقاً وغرباً. اهـ

“কাফেররা মুসলমানদের কোন সীমান্তে আক্রমণ করলে সীমান্তের নিকটবর্তী সক্ষম মুসলমানদের উপর (সর্বপ্রথম) জিহাদ ফরযে আইন। তাদের পরবর্তীদের কাছে যদি সংবাদ পৌঁছে এবং প্রয়োজন পড়ে, তাহলে তাদের উপরও ফরযে আইন। প্রয়োজন পড়বে এভাবে যে, সীমান্তবর্তীরা অক্ষম হওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা হচ্ছে (যে, তারা প্রতিহত করতে পারবে না) কিংবা অক্ষম নয় কিন্তু অলসতা করছে। এভাবে হতে হতে (ক্রমানুসারে) পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সকল প্রান্তের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে।”- শরহুল বিকায়া ৬/৮৩-৮৪

ইবনে কামাল পাশা রহ. এর ফতোয়া থেকে দু’টি বিষয় বুঝা গেল-

১. কাফেররা কোন মুসলিম ভূমি দখল করে নিলে তা উদ্ধার করা ফরয। কারণ, তিনি এ ফতোয়া এমন মুসলিম ভূমি উদ্ধারের ব্যাপারে দিয়েছিলেন, যেগুলো ইতিমধ্যে শীয়া কাফেররা দখল করে নিয়েছিল।

২. ফুকাহায়ে কেরাম যেখানে বলেছেন যে, ‘কাফেররা আক্রমণ করলে প্রয়োজন পড়লে পৃথিবীর সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন’- এর দ্বারা পূর্বোক্ত উভয়টি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দখলদারিত্ব কায়েম করার আগেই প্রতিহত করতে হবে। প্রতিহত করা সম্ভব না হলে এবং কাফেররা দখলদারিত্ব কায়েম করে নিলে সেটি উদ্ধার করা ফরয। কেননা, সদরুশ শরীয়ার যে বক্তব্য দিয়ে তিনি দলীল দিয়েছেন যে, শীয়াদের দখলকৃত ভূমিগুলো উদ্ধার করা ফরয, সেখানে এ কথা পরিষ্কার নেই যে, দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করতে হবে। সেখানে শুধু এতটুকুই আছে যে, আক্রমণ হলে ক্রমে ক্রমে সারা বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। এ থেকে বুঝা যায়, ফুকাহায়ে কেরামের এ ধরণের সকল বক্তব্য দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, যেকোনভাবে কাফেরকে দারুল ইসলাম থেকে বের করে দিতে হবে। দখলদারিত্ব কায়েম করার আগে সম্ভব হলে আগেই। সম্ভব না হলে দখলদারিত্ব কায়েম করার পর হলেও যুদ্ধের মাধ্যমে হটিয়ে মুসলিম ভূমি উদ্ধার করতে হবে।

পাঁচ.

দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করতে হবে- এ কথাটি কোন কোন ফকিহ স্পষ্টও বলেছেন।

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.) বলেন-

وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي: الرابعة- وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدو هم كان على من قاربهم وجاور هم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو هم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه، حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو. ولا خلاف في هذا. اهـ

"কোনো কোনো অবস্থায় সকলের উপরই জিহাদে বের হওয়া ফরজ হয়ে যায়। চতুর্থ মাসআলায় এটাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। উক্ত অবস্থা হল- যখন কোনো (মুসলিম) ভূখণ্ডে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলার কারণে বা কোনো ভূখণ্ডে শত্রু ঢুকে পড়ার কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ভূখণ্ডের হালকা-ভারি, যুবক-বৃদ্ধ সকল অধিবাসীর উপর ফরজ- শত্রুর মোকবেলায় জিহাদে বেরিয়ে পড়া। প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শত্রু প্রতিহত করবে। যার পিতা নেই সে তো যাবেই, যার পিতা আছে সেও পিতার অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়বে। যুদ্ধ করতে সক্ষম কিংবা (অন্তত মুজাহিদদের) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম, এমন কেউ বসে থাকবে না। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম হয়, তাহলে উক্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মতো তাদের নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশীদের উপরও আবশ্যক- জিহাদে বের হয়ে পড়া; যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের শত্রু প্রতিহত করার এবং তাদেরকে বিতাড়িত করার সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে। তেমনি যে ব্যক্তিই জানতে পারবে যে, তারা শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম এবং সে বুঝতে পারবে- আমি তাদের কাছে পৌঁছতে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হব; তার উপরই আবশ্যক সাহায্যের উদ্দেশ্যে

বেরিয়ে পড়া। কারণ, সকল মুসলমান তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হস্তের ন্যায়। তবে যে এলাকায় শত্রু আগ্রাসন চালিয়েছে, তারা নিজেরাই যদি শত্রু প্রতিহত করতে পারে, তাহলে অন্যদের উপর থেকে ফরজ রহিত হয়ে যাবে। যদি এমন হয় যে, শত্রুরা দারুল ইসলামের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালায়নি, তাহলেও তাদের উপর ফরজ শত্রু প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। যাতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী থাকে, ইসলামী ভূখণ্ড সংরক্ষিত থাকে এবং শত্রু অপদস্থ ও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।" -তাফসীরে কুরতুবী: ৮/১৫১-১৫২

ইমাম কুরতুবী রহ.-এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, নিম্নোক্ত তিন সূরতের প্রতিটিতেই জিহাদ ফরজে আইন।

১. যখন শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালিয়ে তা দখল করে নেয়। (بغلبة العدو على قطر من الأقطار)

২. যদি শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে, তবে এখনও তা দখলে নিতে সক্ষম হয়নি। (بحلوله بالعقر)

৩. যদি শত্রু আগ্রাসন চালানোর উদ্দেশ্যে দারুল ইসলামের

দিকে আসতে থাকে এবং দারুল ইসলামের কাছাকাছি এসে পড়ে। (لو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها)

কাজি ইয়ায রহ. (৫৪৪ হি.) বলেন-

وقوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) هو على وجهين؛ فأما الاستنفار لعدو صدم أرض قوم، فنفيرهم له واجب فرض متعين عليهم، وكذلك لكل عدو غالب ظاهر حتى يقع، وأما لغير هذين الوجهين فيتكد النفير لطاعة الإمام لذلك، ولا يجب وجوب الأول. اهـ

“হাদিসের বাণী (وإذا استنفرتم فانفروا) ‘যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়।’ -এর দু’টি সূরত:

১. যদি এমন কোনো শত্রু প্রতিহত করতে আহবান করা হয়, যারা মুসলমানদের কোনো ভূখণ্ডে আক্রমণ করেছে, তাহলে তাদেরকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জিহাদে বের হওয়া তাদের উপর ফরজে আইন।

২. একইভাবে যে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলেছে,

তাদের প্রতিহত করার জন্যে জিহাদে বের হওয়াও ফরজে আইন। এ ফরজ বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ না শত্রু পরাজিত হয়।

এই দুই সূরত ছাড়াও ইমাম যদি জিহাদে বের হওয়ার আদেশ দেন, তবুও ইমামের আনুগত্যের ভিত্তিতে জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক। তবে এটি পূর্বোক্ত দু'টির মতো জোরদার ফরজ নয়।" -ইকমালুল মু'লিম: ৬/২৭৫

ইমাম কুরতুবী রহ. ও কাজি ইয়ায রহ. এর বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, শত্রু কোন মুসলিম ভূখণ্ড দখল করে নিলে, তার বিরুদ্ধে কিতাল ফরয; যতক্ষণ না শত্রু পরাজিত হয় এবং মুসলিম ভূমি উদ্ধার হয়। যেমন শত্রু আসতে থাকলে বা আগ্রাসন চালালে তা প্রতিহত করার জন্য কিতাল ফরয।

সারকথা-

উপরোক্ত আলোচনার সারকথা দাঁড়াল: নিম্নোক্ত তিন সূরতের প্রত্যেকটিতেই জিহাদ ফরয-

♣ কাফেররা কোন মুসলিম ভূমি আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসতে থাকলে।

♣ কোন মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ চালালে।

♣ কোন মুসলিম ভূমি দখল করে নিলে।

প্রথম দুই সূরতে দখলদারিত্ব বসাবার পূর্বেই আক্রমণ প্রতিহত করে দিতে হবে। তৃতীয় সূরতে দখলকৃত ভূমি উদ্ধার করতে হবে। অতএব, বর্তমান ফিলিস্তিন, কাশ্মির, ভারত, মায়ানমার, পূর্বতুর্কিস্তানসহ সকল গণতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক মুসলিম ভূমি, যেগুলো কাফের মুরতাদদের দখলে আছে, সেগুলো উদ্ধারের জন্য জিহাদ ফরযে আইন। কোন না কোনভাবে জান, মাল বা যবান দিয়ে জিহাদে সক্ষম এমন কোন মুসলমানই এই ফরয থেকে মুক্ত নয়।

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

৮৪.সংশয় নিরসন ০২, ক. সামরিক কাজে গোপনীয়তা

সামরিক কাজে গোপনীয়তা

সংশয়-২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি ময়দানে নেমে কাফেরদের সাথে জিহাদ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও এমনই করেছেন। আমাদের আকাবিরগণও এমনই করেছেন। আমরা বর্তমানে যে লুকিয়ে লুকিয়ে – গুপ্ত হত্যা বা গেরিলা – জিহাদ করি, এটা কি জায়েয? ইসলাম তো যা করে প্রকাশ্যে করে। এভাবে লুকিয়ে কেন? এটা কি জিহাদ?

নিরসন

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد

ইসলামে গোপনীয়তা

[ইসলাম যা করে প্রকাশ্যে করে]- কথাটা ঢালাওভাবে সহীহ নয়। সহীহ হচ্ছে, ইসলাম যা প্রকাশ্যে করা ভাল মনে করে সেটা প্রকাশ্যে করে, আর যা গোপনে করা ভাল মনে করে সেটা গোপনে করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের দিকে তাকালেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়।

♣ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর গোপনে গোপনে দাওয়াত দিতেন।

♣ মক্কায় কেউ মুসলমান হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঈমান গোপন রাখতে পরামর্শ দিতেন। হযরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ।

♣ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম মক্কা থেকে হাবশা বা মদীনায় গোপনে গোপনে হিজরত করতেন।

♣ মদীনার আনসারদের সাথে বাইআতে আকাবা গোপনে গোপনে হয়েছে।

♣ গোপনীয়তার অনুপম নমুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ঘটনা। এমন সঙ্গোপনে ও কৌশলে তিনি হিজরত করেছেন যে, মুশরিকরা তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরও সন্ধান পায়নি।

আগের শরীয়তে গোপনীয়তা

♣ ফিরআন বংশের এক লোক মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত কবুল করে ঈমানদার হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার ঈমান গোপন রেখেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ

“ফিরআউন বংশীয় এক ব্যক্তি যে মু’মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখতো- সে বললো ...।”- আলমু’মিন ২৮

♣ আসহাবে কাহফ গোপনে পলায়ন করেছিল। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তারা যখন তাদের একজনকে খাবার কিনতে পাঠাচ্ছিল, তখন তাকে সাবধান করে দিচ্ছিল- যেন অতি সঙ্গোপনে কাজ করে,

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কিছুতেই যেন কাউকে তোমাদের ব্যাপারে জানতে না দেয়।”- কাহফ ১৯

সামরিক কাজে গোপনীয়তা কাম্য

♣ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী কুরাইজার ইয়াহুদিদের ব্যাপারে হত্যার ফায়সালা করেছিলেন। হযরত আবু লুবাবা ইবনুল মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনাক্রমে তা ইয়াহুদিদের নিকট প্রকাশ করে দেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতনসমূহেরও খিয়ানত করো না।”- আনফাল ২৭

আল্লাহ তাআলা সামরিক গোপনীয়তাকে আমানত আখ্যা দিয়েছেন এবং তা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন।

♣ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের অভিযান গোপন রেখেছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পত্র মারফত তা মুশরিকদের অবগত করতে চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার দুশমন ও তোমাদের দুশমনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।”- মুমতাহিনা ১

মুসলমানদের সামরিক বিষয়াদি কাফেরদের অবগত করানোকে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের নামান্তর আখ্যা দিয়েছেন।

♣ হযরত কা’ব বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,
لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধাভিযানের ইচ্ছা করলে (সেটি গোপন রেখে) অন্য দিকে ঈঙ্গিত করতেন।”- সহীহ বুখারি ২৭৮৭

এটি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজীবনের সুন্নত যে, তিনি কোন যুদ্ধে বের হলে সাহাবায়ে কেরামকে স্পষ্ট জানাতেন না যে, কোন দিকে যাচ্ছেন। অন্য কোন দিকের ঈঙ্গিত করতেন। সাহাবায়ে কেরাম মনে করতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন দিকে যাচ্ছেন। অথচ রাসূলের উদ্দেশ্য থাকতো ভিন্ন। সামরিক বিষয়ে তিনি এতটাই গোপনীয়তা বজায় রাখতেন।

♣ এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الحرب خدعة

"যুদ্ধ কৌশলের নাম।"- সহীহ বুখারি ২৮৬৬

অর্থাৎ যুদ্ধের মূল বুনিয়াদ হল, কৌশল। যুদ্ধের জয়-পরাজয় কৌশলের উপর নির্ভরশীল, সামরিক শক্তির উপর নয়।

পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই তাদের সামরিক বিষয়াদি ও প্ল্যান-পরিকল্পনা তাদের দুশমনদের সামনে প্রকাশ করে না। এটাই

যুদ্ধের স্বাভাবিক নিয়ম। ইসলাম এ নিয়ম মেনে চলে। এর ব্যতিক্রম করাকে খিয়ানত আখ্যায়িত করেছে।

♣ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ
“হে মুমিনগণ, তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর।”- নিসা ৭১

গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়া সতর্কতার পরিপন্থী- এটা সর্বস্বীকৃত।

♣ দায়িত্বশীলদের নির্দেশনা ব্যতীত কোন সংবাদ ছড়াতেও আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। একে মুনাফিকদের কাজ আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
“তাদের (মুনাফিকদের) নিকট যখন কোন সংবাদ আসে, তা শান্তির হোক বা ভীতির হোক- তারা তা ছড়িয়ে দেয়। যদি তারা তা রাসূল ও দায়িত্বশীলদের নিকট সমর্পন করে দিত,

তবে সংবাদ অনুসন্ধানকারীরা তাদের থেকে সেটা জেনে নিতে পারতো (যে, তা ছড়ানোর উপযোগী কি'না)। তোমাদের উপর যদি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও রহমত না হত, তবে অল্প সংখ্যক ছাড়া বাকি সকলে শয়তানের অনুগামী হয়ে পড়তে।”- সূরা নিসা: ৮৩

কুরআন, হাদিস ও সীরাতের আলোকে স্পষ্ট যে, গোপনীয়তা ইসলামের চিরন্তন নীতি। আল্লাহ, রাসূল ও মুসলামানদের আমানত। গোপনীয়তা প্রকাশ করা অপরিপক্কতা, ঈমানের দুর্বলতা, নিফাক ও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের আলামত। এরপরও যারা গোপনে জিহাদের কাজ করার কারণে মুজাহিদদের সমালোচনা করে, তাদের দ্বীনের বুঝ কতটুকু আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। দুঃখের বিষয়, আজীবন বুখারি শরীফ পড়িয়ে আসছেন এমনসব মহিউস সুন্নাহরাই এমনসব মন্তব্য করছেন। হে আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান কর।

৮৫.সবাই উল্টো: তাহলে কি আমি ভুল করছি?

সবাই বলছে, আমি জঙ্গি। আমি সন্ত্রাসী। আমি উগ্রবাদি। আমি জযবাতি। আমি ভাসাভাসা দৃষ্টির অধিকারী। আমি স্বল্পজ্ঞানী। আমি খারিজি।

তাহলে কি আমার ভুল হয়ে গেল?

এত মানুষ আমার বিপক্ষে। আমি হকের উপর আর তারা ভুল- এটা কি সম্ভব?

হুজুরদেরও তো অধিকাংশ আমার বিরুদ্ধে। এত হুজুর কি ভুল করছেন? তারা কি বুঝেন না? না'কি আমারই ভুল হচ্ছে? ভুল পথে হাঁটছি না তো আমি?

প্রশ্নটা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত আমরা এমন এক সমাজে

বড় হয়েছি, জন্মের পর থেকেই যেখানে শিরক কুফর আর ফিসক ফুজুর। বিভ্রান্তি আর ফিতনা। ঈমানি পরিবেশে আমরা বড় হইনি। হয়তো যখন থেকে আমি বুঝি তখন থেকেই শুনে আসছি, বোমা মেরে ইসলাম কায়েম করা যায় না। প্রধান বক্তা অনেক জোর গলায় কথাটা বলে গেছেন। সবাই গিলেছেও। কথাটা কয়েক যুগ ধরে আমার হৃদয়ে লেগে আছে। আজ আমি বলছি, বোমা মারা ছাড়া ইসলাম কায়েম হয় না। সন্দেহ হতেই পারে, আমার ভুল হয়ে গেল কি'না?

কিন্তু যদি আপনার জন্ম হতো আফগানে, চোখ খুলেই দেখতেন আকাশ থেকে বোমার বর্ষণ। ট্যাংক। কামান। মেশিন গান। আপনার বাবার হাতে। ভাইয়ের কাঁধে। দেয়ালে টানানো। বিছানার পাশে।

দেখতেন আজ বাবা লাশ হয়ে এসেছেন। কাল ভাই। পর দিন চাচা।

যদি এমন সমাজে আপনি বেড়ে উঠতেন, আপনাকে বুঝাতে হতো না যে, বোমা মারা ছাড়া ইসলাম কায়েম হয় কি'না।

জন্ম থেকেই আমি ফিতনায় ডুবা। বিভ্রান্তিতে ভরা। আজ হঠাৎ যদি বলে বসি, খানকায় বসে ইসলাম কায়েম হবে না, তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে, আমি ভুল করছি কি'না।

আমি এখানে একেবারে সাদামাটা কয়েকটা কথা বলবো।
প্রিয় ভাই, প্রতিটি আদম সন্তানের পিছে আল্লাহ তাআলা নিযুক্ত করেছেন একটা করে শয়তান। সে তাকে বিভ্রান্তির পথে ডাকে। এ হল জিন শয়তান। আর আমার মতোই দেখতে রয়েছে হাজারো মানুষ শয়তান। এরাও আমাকে বিভ্রান্ত করে। সাথে সাথে আমার বুকের ভেতর আছে একটা নফস। নফসে আম্মারা। সেও আমাকে ডাকে বিভ্রান্তির দিকে। এভাবে জিন শয়তান, মানুষ শয়তান আর নফসে আম্মারার দ্বারা প্রতিটি আদম সন্তান বেষ্টিত। এ বেষ্টনি ভেদ করে হকের কাছে পৌঁছা

এত সহজ নয়। এজন্যই আপনি দেখছেন, দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ সেই আল্লাহতেই বিশ্বাসী নয়, যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন আর যার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

প্রতিটি আদম সন্তানকে আল্লাহ তাআলা ঈমান দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান। আর তাকে দুনিয়াতে পাঠানোর হাজারো হাজার বছর আগে সকল বনি আদমকে একত্র করে আল্লাহ তাআলা সবার থেকে ঈমানের স্বীকৃতি নিয়েছেন। সবাই স্বীকার করেছে, হে আল্লাহ, আপনিই আমাদের রব। আমরা আপনাকে মেনে নিলাম।

এক দিকে আল্লাহ তাআলা সবার থেকে ঈমানের স্বীকৃতি নিলেন। যখন ভূমিষ্ট হয়, তাকে ঈমান দিয়ে জন্ম দেন। ঈমান তার রগে রেশায় মিশে থাকে। এরপর আবার স্বরণ করিয়ে দেয়ার জন্য রাসূলদের পাঠান। সাথে নিজের বাণী সম্বলিত কিতাবও দিয়ে দেন। রাসূলগণ এসে আল্লাহর দিকে ডাকেন, যে আল্লাহকে তারা দুনিয়াতে আসার আগেই মেনে নিয়েছিল। যার উপর ঈমান নিয়েই সে দুনিয়াতে এসেছে। কিন্তু এতদসত্বেও অধিকাংশ বনি আদম কাফের হয়ে যায়। কেন? তার পিতা মাতা, তার সমাজ তাকে বিভ্রান্ত করে। শয়তানের

ধোঁকায় পড়ে। নফসে আম্মারার তাড়নায় পড়ে। যেমনটা হাদিসে বলা হয়েছে।

এ চতুর্মুখী বিভ্রান্তিতে পড়ে যখন একটা মানুষ বিচ্যুত হয়ে যায়, তখন আর তার কথা কাজ হকের মানদণ্ড বিবেচিত হয় না। এ কারণে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ কাফের হয়ে গেলেও আমরা সংশয়ে পড়ি না যে, তাহলে কি দ্বীনে ইসলাম বাতিল?

মুহতারাম ভাই, এ চতুর্মুখী ফিতনায় পড়ে মানুষের দু'টি হালত হয়: কেউ কেউ হক বাতিল বুঝার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। হককে বাতিল বাতিলকে হক মনে করে। আজ আপনি কোটি কোটি বনি আদমকে দেখছেন, গরুর মূত্র পান করাকে ইবাদাত মনে করে। অথচ ধর্মে তো পরের কথা, সাধারণ বিবেক বুদ্ধিও তা সমর্থন করে না। বিশেষত এই আধুনিকতার যুগে। কেন? এরা হক বাতিল বুঝার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

আরেকদল হক বুঝার পরও স্বার্থের চিন্তায় হক প্রত্যাখ্যান করে। নয়তো আবু তালেবের ঈমান না আনার কি কারণ ছিল? সে কি জানতো না, মুহাম্মাদ –আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন- হক?
রোম সম্রাট হিরাকলা (হিরাক্লিয়াস) এর কথা হয়তো জানেন। সে আকাঙ্খা করেছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেলে কদম মোবারকের ধুলি ধুয়ে দিয়ে ধন্য হবে। কিন্তু রাজত্বের লোভ তাকেও কাবু করেছে।

এভাবে কেউ বুঝে আর কেউ না বুঝে বিভ্রান্ত। আর যখন বিভ্রান্ত তখন আমরা তার কথা কাজকে হকের মানদণ্ড মানতে পারি না।

মুহতারাম ভাই, আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত যে, অতীত যামানার এক উলামাগোষ্ঠীর ইতিহাস আমাদের সামনে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। নতুবা আমরা হয়তো চিন্তা করতেও

ভয় পেতাম যে, উলামা শ্রেণী গোমরা হতে পারে। তারাও স্বার্থের সামনে দ্বীন বিসর্জন দিতে পারে। প্রিয় ভাই, সে শ্রেণীটি হলো ইয়াহুদ। আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন অন্তত দশবার যাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থন ফরয করেছেন (পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সূরা ফাতিহায় গাইরিল মাগদুবি আ'লাইহিম- এ)।

প্রিয় ভাই, এ জাতিটির উপর আল্লাহ তাআলা সবচে বেশি ইহসান করেছেন। এরা সরাসরি নবিদের সন্তান। এদের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর অধিকাংশ নবি রাসূল পাঠিয়েছেন। আসমানি খানা তাদের খাইয়েছেন। পাথর ভেদ করে ঝর্ণা সৃষ্টি করে পানির ব্যবস্থা করেছেন। মেঘমালা দিয়ে ধু ধু মরুময়দানে ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে এরাই সবচে নাফরমান। অসংখ্য নবি রাসূলকে এরা হত্যা করেছে। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য আল্লাহর কিতাব বিকৃত করেছে। অথচ আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান এদেরই সবচে বেশি ছিল। এরাই ছিল সবচে বড় আলেম। কিন্তু দুনিয়ার মোহ ইলমের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

এরা আল্লাহর কাছে সবচে নিকৃষ্ট জাতি। ইসলামের সবচে বড় দুশমন। অথচ এরা সবই জানে। এরা বুঝে শয়তান। এরা খৃস্ট ধর্মকে বিকৃত করেছে। খৃস্টানদের বিভ্রান্ত করেছে। এরা না বুঝে শয়তান। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম অনেক আছে। আল্লাহ তাআলা এ উভয় জাতি থেকে তার সবচে প্রিয় ইবাদাত সালাতে প্রতিদিন দশবার আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নয়তো একজন মুসলিমের সালাতই সহীহ নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বীনে হক নিয়ে আবির্ভুত হন, তখন ওয়ারাকা বিন নাওফেল আর আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদি. এর মতো অল্প ক'জন আলেম ছাড়া পৃথিবীর সকল আলেম ধর্ম ব্যবসায় লিপ্ত। ধর্মকে পুঁজি করে, আল্লাহর কিতাবের অপব্যাখ্যা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত। আপনি কি চিন্তা করতে পারেন- একটা জাতির একশো জনের বলতে গেলে একশো জন আলেমই স্বার্থবাজ?? কিন্তু বাস্তবতা তাই বলে, যদিও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষদ্বাণী করে গেছেন, আমার উম্মত কদমে কদমে ইয়াহুদ নাসারার অনুসরণ করবে। তাহলে কি খুব আশ্চর্যের কথা যে, বুঝে না বুঝে, কিংবা স্বার্থের লোভে আলেমরাও হকের কথা গোপন করবেন, কিংবা হককে না-হক বলবেন? এক লাখের ফতোয়া, শুকরিয়া মাহফিল, বেফাক দুর্নীতি আর হাটহাজারির কাহিনির পর আশাকরি আর দলীল দিয়ে বুঝাতে হবে না।

তবে আল্লাহ তাআলা এ দ্বীনে হককে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখবেন। এজন্য সৃষ্টি করবেন তার কিছু মুখলিস বান্দা। যাদেরকে এ দ্বীনের গাছ হিসেবে লাগাবেন। যারা জান ও মাল দিয়ে, সাইফ ও কলম দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে এ দ্বীনের সহীহ রূপ উম্মতের সামনে তুলে ধরবেন। হত্যা, বন্দী, গুম নির্যাতন কিছুই তাদের রুখতে পারবে না। আল্লাহর কুরআন আর রাসূলের বাণী তাদের পাথেয়। শত বাধার মুখেও তারা চলবেন

হিদায়াতের পথে। দেখাবেন আলোর পথ।

এজন্য প্রিয় ভাই, আজ সময় এসেছে কুরআন সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার। অমুকের কথা আর অমুকের কাজ আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। দলীল বানাতে পারি না। জীবন পথের পাথেয় রূপে গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের রাহবার শুধু আল্লাহর কুরআন, রাসূলের হাদিস। সাহাবাদের সিরাত। খাইরুল কুরুনের সালাফে সালিহিন।

হে আল্লাহ! আমাদের হকের দিশা দাও। হকের পথে অবিচল থাকার তাওফিক দাও। আমীন। আমীন। আমীন।

৮৬.সরকার এখনও বুঝতে পারছে না কেন?

অনেক আগে থেকেই শুনে আসছি দাওয়াত একটি ফরিজা। দাওয়াত দিতে হবে। বুঝাতে হবে শাসকদের। বুঝিয়ে ভাল পথে আনতে হবে।

মুজাদ্দিদে আলফে সানির দৃষ্টান্তও এখানে টেনে আনা হয়।

জিহাদের কথা বলা হলেই এ প্রসঙ্গটা উঠিয়ে মুজাহিদদের সমালোচনা করা হয়। আমরা না'কি দাওয়াত না দিয়েই কাফের ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছি। দাওয়াত না দিয়েই না'কি আমরা মানুষ মেরে ফেলছি।

যাহোক, দাওয়াতের নববী তরিকা কোনটা সেটার কথা যদি বাদও দিই, তাহলেও এখন প্রশ্নটা সবার মনেই দেখা দিচ্ছে, সরকার এখন বুঝছে না কেন? সারা দেশের সকল আলেম এক হয়ে সর্বসম্মতভাবে ভাস্কর্য হারাম বলছেন। মিটিং করছেন। মিছিল করছেন। সংবাদ সম্মেলন করছেন। ঐক্যবদ্ধ ফতোয়াও জারি হয়েছে। আলোচনাও হয়েছে, হচ্ছে। সব ঘরানার আলেম একমত। কিন্তু সরকারকে তো আর বুঝানো যাচ্ছে না। সরকারপক্ষ তো বরাবর বলেই আসছে, ভাস্কর্য আর মূর্তি এক নয়। মূর্তি হারাম। ভাস্কর্য জায়েয। যারা এ দুটির পার্থক্য বুঝে না তারা...। তারা কি?

তারা মূর্খ। এরা আলেমই নয়। এরা কিসের লেখাপড়া করে?

এরা ধর্মের মুখোশধারী।

এরা ধর্ম ব্যবসায়ী।

এরা মৌলবাদি।

এরা পাকিস্তানি।

এরা তালেবানি মোল্লাতন্ত্র।

এরা স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী।

এরা দেশদ্রোহী।

এরা সাম্প্রদায়িক।

এরা দেশটা আফগানিস্তান বানিয়ে ফেলতে চাইছে।

এরা নষ্ট-ভ্রষ্ট।

এরা অপশক্তি।

এরা একাত্তরের পরাজিত শক্তি।

এরা উগ্রবাদি জঙ্গি ...।

এরা আরও অনেক কিছু, যেগুলো আপনারা পত্রিকার পাতা খোললেই দেখতে পাচ্ছেন।

সারা দেশের উলামা জনতা মিলেও সরকারকে বুঝাতে পারছেন না। উল্টো উলামা সমাজ বহু রকমের আলকাব আর বিশেষণে ভূষিত হচ্ছেন, যেগুলোর সবগুলো হয়তো এখন

পর্যন্ত জঙ্গিরাও পায়নি।

এখন প্রশ্ন, ব্যর্থতা কার? উলামাদের দাওয়াত হচ্ছে না? আর কি করার বাকি আছে যা করলে সরকার বুঝতে পারবে?

মুহতারাম উলামায়ে কেরাম! নববী তরিকায় ফিরে আসুন। বুঝতে বেশি দিন লাগবে না। কই, মক্কায় তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের বছর দাওয়াত দিলেন। নিজের ভাই, চাচা এদেরকেই তো বুঝালেন। কিন্তু বুঝতে তো পারলো না। অপরদিকে ফাতহে মক্কার দিন যখন তরবারি নিয়ে মক্কাবাসীর মাথার উপর সওয়ার হলেন, একদিনে সবাই বুঝে গেল। দু'দিনে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, দু'দিন পরেই তরবারি হাতে দ্বীনের নুসরতে হুনাইনে রওয়ানা হয়ে গেল। তরবারির ঝলমলানি এক নিমিষেই হক বুঝিয়ে দিল।

সিদ্দিকে আকবারের মতো হুংকার

দিন: আল্লাহর কসম, একটা রশি দিতে অস্বীকার করলেও আমি এদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব। আমার সাথে একজনও যদি না যায়, আমি একাই এদের বিরুদ্ধে লড়বো।

হুংকার দিন। এত দাওয়াত লাগবে না। দু’দিনেই সব বুঝে এসে যাবে। অন্যথায় বনী ইসরাইলের মতো দাওয়াতের তীহ ময়দানে শুধু উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরতেই থাকবেন আর নতুন নতুন বিশেষণ যোগ হতে থাকবে। বুঝে আর আসবে না।

***

৮৭.সরকারি আইন মানা কি জরুরী?

বিটকয়েন নিয়ে মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম সাহেবের **‘বিটকয়েন — পরিচিতি ও শরঈ পর্যালোচনা’** নামক একটি প্রবন্ধ সপ্তাহ খানেক হলো ফোরামে পোস্ট হয়েছে। প্রবন্ধটি তাহকিকি। আমি তাহকিক নিয়ে কোনো আপত্তি করছি না। তবে প্রবন্ধের শেষে তিনি যে কথাটি বলেছেন, সেটাতে একটু আপত্তি আছে। তিনি বলেন,

“আলোচিত বিটকয়েনে-অন্তত আমাদের দেশে-দ্বিতীয় গুণটি নেই। কারণ এটি ব্যাপকভাবে গৃহিত নয়। সরকারীভাবেও অনুমোদিত নয়। সুতরাং একে আমাদের দেশে শরঈ ও অর্থনীতি কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই কারেন্সি বা মুদ্রা বলা যায় না।

বিশেষত সরকারীভাবে এর লেনদেন আমাদের দেশে নিষিদ্ধ। শরীয়তের মাসয়ালা হল, বৈধ বিষয়ে রাষ্ট্রের আনুগত্য করা ওয়াজিব। এর জন্য রাষ্ট্র ইসলামী হওয়া জরুরী নয়। এছাড়া দেশের প্রতিটি নাগরিকই বক্তব্য বা কর্মে একথার স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, সে বৈধ বিষয়ে সরকারের আইন মানবে।

অতএব উপরোক্ত দুই কারণে, যতক্ষণ অবৈধ কাজে বাধ্য না করা হবে ততক্ষণ সরকারী আইন মানা জরুরী।”

আপত্তির বিষয় এ দু’টি কথা-

ক. শরীয়তের মাসয়ালা হল, বৈধ বিষয়ে রাষ্ট্রের আনুগত্য করা ওয়াজিব। এর জন্য রাষ্ট্র ইসলামী হওয়া জরুরী নয়।

খ. এছাড়া দেশের প্রতিটি নাগরিকই বক্তব্য বা কর্মে একথার

স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, সে বৈধ বিষয়ে সরকারের আইন মানবে।
এ দু'টি বিষয়ে কিছু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

ক- বৈধ বিষয়ে রাষ্ট্রের আনুগত্য

বর্তমান তাগুত শাসকদের ব্যাপারে মুফতি সাহেবের কি ধারণা আমার জানা নেই। স্বাভাবিক হয়তো এমনটাই হবে যে, কাফের মনে করেন না। এ হিসেবেই হয়তো আনুগত্যের কথা বলেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।
আর শরহুস সিয়ারের হাওয়ালা যেটা দিয়েছেন, সেটা মূলত মুসলিম বাহিনি জিহাদে বের হলে আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে। বর্তমান তাগুত শাসকদের ব্যাপারে না।

যাহোক, মুফতি সাহেবের বক্তব্যটা আম। মুমিন-কাফের সব ধরনের শাসক এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। দারুল ইসলাম-দারুল কুফর সব অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। মনে হচ্ছে, বিষয়টা বৈধ হলেই তাতে রাষ্ট্রের আনুগত্য ওয়াজিব। চাই তা দারুল

হরবই হোক না কেন। শাসক কাফের বা মুরতাদ যাই হোক না কেন।

এমনটা হলে অবশ্যই তা ভুল। আল্লাহ তাআলা কাফেরের জান মাল হালাল করেছেন। হত্যা করা বৈধ করেছেন। তার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয করেছেন। তার সাথে বন্ধুত্ব হারাম করেছেন। তার আনুগত্য নিষেধ করেছেন। মুসলিমদের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। সে মুসলিমদের উলুল আমর হতে পারে না। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের সামান্য কাতেবও হতে পারে না। এমনকি কাফের বাবা তার আপন মুসলিম সন্তানের অলি (অভিবাবক) পর্যন্ত হতে পারে না। তাহলে আনুগত্য বৈধ কিভাবে? এটি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার খেলাফ কথা।

বেশির চেয়ে বেশি এটা হতে পারে যে, যখন তারা মুসলিমদের উপর চেপে বসেছে, তখন মুসলিমরা নিজেদের জান মাল ও ইজ্জত আব্রু বাঁচানোর স্বার্থে তাকিয়া অবলম্বন করতে পারে, যেমনটা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন। অর্থাৎ একান্ত প্রয়োজন মুহূর্তে তাদের সাথে মৌখিক ও জাহিরি ভাল আচরণ করতে পারে। কিন্তু আনুগত্যের কথা কোথাও নেই। বরং আনুগত্য হারাম করা হয়েছে কুরআনের অসংখ্য আয়াতে। এটি

ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

খ- আনুগত্যের স্বীকারোক্তি

মুফতি সাহেব বলেছেন, ‘এছাড়া দেশের প্রতিটি নাগরিকই বক্তব্য বা কর্মে একথার স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, সে বৈধ বিষয়ে সরকারের আইন মানবে’।

প্রথমত: আনুগত্য সব সময় বৈধ বিষয়েই হয়ে থাকে। নাজায়েয বিষয়ে কখনও আনুগত্য হয় না। স্বয়ং ইমামুল মুসলিমিনের আনুগত্যের নির্দেশ যেখানে এসেছে, সেখানে বৈধ বিষয়ে আনুগত্যের কথাই এসেছে। নাজায়েয বিষয়ে আনুগত্য নিষেধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: আনুগত্যের স্বীকারোক্তির প্রয়োজন পড়লো কেন? স্বীকারোক্তি না দিলে কি আনুগত্য করতে হতো? না হতো না?

ইমামুল মুসলিমিনের আনুগত্য তো কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি জালেম হলেও জায়েয বিষয়ে তার আনুগত্য

জরুরী। জুলুমের কারণে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া যাবে না। এ আনুগত্য ব্যক্তির স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে না। এ আনুগত্য শরীয়ত নির্ধারিত। ব্যক্তি চাইলেও, না চাইলেও এ আনুগত্য করতে হবে। তাহলে এসব শাসকের আনুগত্যের জন্য স্বীকারোক্তির প্রয়োজন পড়লো কেন? তাহলে কি মুফতি সাহেব বলতে চাচ্ছেন, এরা আসলে শরয়ী শাসক নয়, তাই স্বীকারোক্তির প্রয়োজন পড়লো?

যদি মুফতি সাহেব মেনে নেন, এরা শরয়ী শাসক নয়, তাহলে তারা কি ধরনের শাসক? শরয়ী না হলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জরুরী। আনুগত্য কেন করতে হবে?

তৃতীয়ত: অনেকেই কথাটা বলে থাকেন যে, বর্তমান শাসকদের সাথে আমাদের চুক্তি হয়ে গেছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।

প্রশ্ন হলো, চুক্তি তো পরস্পর বিপরীত দুই পক্ষের মাঝে হয়। কাফের ও মুমিনদের মাঝে চুক্তি হয়। বাগি ও আহলে আদলের মাঝে চুক্তি হয়। এখন এ দেশের আলেম উলামা ও

জনগণ যদি চুক্তির এক পক্ষ হন, তাহলে অপর পক্ষ সরকার। এখন সরকারের অবস্থান কি?

- সরকার কি কাফের? আমাদের উপর চেপে বসেছে বলে আমরা তার সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছি- এমন?

- না'কি সরকারের সাথে আমাদের চুক্তিটা বাগি ও আহলে আদলের মাঝে যে চুক্তি হয় সেটা?
তাহলে প্রশ্ন- বাগি কারা আর আহলে আদল কারা?

এদেশের আলেম উলামা ও আম মুসলিম জনসাধারণ বাগি? না'কি সরকার বাগি?

যেটাই ধরবেন সমস্যা। কারণ, আহলে আদল বলা হয় ইমামুল মুসলিমিনের দলকে, যারা আগে থেকে ক্ষমতায় আছে, কিছু লোক তাদের বিরুদ্ধে বাগাওয়াত করেছে। ইমাম তাদের সাথে মাসলাহাতের বিবেচনায় সাময়িক চুক্তি করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এ অর্থে এদেশের আলেম উলামা ও মুসলিম জনসাধারণকে আহলে আদল ধরা যাচ্ছে না। কারণ, এটি ধরতে হলে প্রথমত সরকারকে বাগি ধরতে হবে। তারা কি স্বীকার করবেন যে, সরকার বাগি?

দ্বিতীয়ত তারা কোনো সময় ক্ষমতায় ছিলেন না। সরকার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ক্ষমতা দখল করেছে এমনও না। অধিকন্তু এখন তারা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিও নিচ্ছেন না। তাদের আলাদা কোনো ইমাম নেই।

যখন সরকারকে বাগি ধরছেন না, নিজেরা আহলে আদল হতে পারছেন না, তাহলে এর বিপরীতটাই রয়ে গেল। অর্থাৎ সরকার আহলে আদল আর আলেম উলামা ও দেশের জনগণ বাগি। তারা কি এটা স্বীকার করবেন?

যখন চুক্তিটা বাগি-আদলের মাঝে হচ্ছে না, তখন মুমিন-কাফেরই ধরতে হবে। এর অর্থ, সরকার কাফের, আম জনতা নিজেদের জান মালের নিরাপত্তার জন্য চুক্তি করেছে। বলি,

তারা কি এটা মানেন?

চতুর্থত: চুক্তি কে করলো? কখন করলো?

চুক্তির জন্য দু'টি পক্ষ লাগে। এক পক্ষ তো সরকার। অপর পক্ষ বলা হচ্ছে দেশের জনগণ। কিন্তু এ চুক্তি কখন হলো? জনগণের পক্ষ থেকে কারা কারা সই করেছে? চুক্তির দফাগুলো কি কি? করে থাকলে সে চুক্তি কি বহাল আছে না ভেঙে গেছে?

যখন কোনো কিছুরই হদিস নেই, তখন চুক্তি একটা ফাঁপা বেলুন ছাড়া কিছুই নয়।

অধিকন্তু চুক্তির কথাটা আসলে পক্ষ বিপক্ষের সেই প্রশ্নটা চলে আসবে, তাহলে কি সরকারপক্ষ কাফের, যার কারণে আমরা চুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছি? নইলে চুক্তির দরকার কি?

পঞ্চমত: একের চুক্তি অন্যের উপর বর্তাবে

কি?

মুসলিমরা যদি রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়, আর ইমামুল মুসলিমিন রাষ্ট্রীয়ভাবে চুক্তি করেন, তাহলে তার অধীনস্থ সকলকে সে চুক্তি মানতে হবে। অটোমেটিক মানার বিধান চলে আসবে। এ কথা বলা যাবে না যে, ইমাম চুক্তি করেছেন ইমাম মেনে চলুন, আমরা মানবো না। এ কথা বলার সুযোগ নেই। অধীনস্থ সকলকেই মানতে হবে।

এমনিভাবে এমন রাষ্ট্রের যেকোনো একজন মুসলিম কোনো কাফের রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে ফেললে ঐ মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিটি মুসলিমকে সে চুক্তি মেনে চলতে হবে। এ কথা বলা যাবে না যে, চুক্তি করেছে সে, আমরা কেনো মানবো? এ কথা বলার সুযোগ নেই। সকলকে মানতে হবে।

হ্যাঁ, চুক্তি যদি মাসলাহাতের খেলাফ হয়, তাহলে ইমামুল মুসলিমিন ঘোষণা দিয়ে তা ভেঙে দিতে পারেন এবং ঐ মুসলিমকে প্রয়োজনীয় শাস্তিও দিতে পারেন; কেন সে অনুমতি ছাড়া চুক্তি করলো? যতক্ষণ ইমাম ঘোষণা দিয়ে চুক্তি না ভাঙছেন, ততক্ষণ সকলকে তা মেনে চলতে হবে। কারও জন্য চুক্তির ব্যতিক্রম করা জায়েয হবে না।

এ বিধান হল যখন, চুক্তিকারী মুসলিম কাহের হয়। অর্থাৎ ইমামুল মুসলিমিনের অধীনে থেকে ভিন্ন কাফের রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে। পক্ষান্তরে মুসলিম যদি কাহের না হয়ে মাকহুর হয়, তাহলে তার চুক্তি শুধু তার নিজের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্যের উপর বর্তাবে না। যেমন,

ক. কোনো মুসলিম আমান নিয়ে ব্যবসায়ের জন্য দারুল হরবে গমন করেছে। এখন সে কাফেরদের অধীন। এখন যদি সে দারুল হরবের সাথে কোনো চুক্তি করে, তাহলে এ চুক্তি তার নিজের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্যের উপর বর্তাবে না। কারণ, সে এখন অন্যের অধীন। মুসলিমদের ক্ষমতায় শক্তিধর নয়। কাফেররা তাকে ভয় করে না। বরং সে নিজেই কাফেরদের ভয় করে। তার চুক্তি তখন শুধু তার নিজের জান মালের স্বার্থে হচ্ছে বলে বিবেচিত। এ চুক্তি অন্যের উপর বর্তাবে না। এজন্য এমন ব্যক্তি দারুল হরবে থাকাবস্থায়ও মুসলিমরা ইচ্ছে করলে দারুল হরবে আক্রমণ চালাতে পারে। পক্ষান্তরে ইমামুল মুসলিমিন যদি চুক্তি করতেন –নিজেই করুন বা কাউকে পাঠিয়েই করুন- তাহলে তার অধীনস্থ কোনো মুসলিমের জন্য দারুল হরবে আক্রমণ করা জায়েয হতো না।

খ. কোনো মুসলিম কাফেরদের হাতে বন্দী হলে তার চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সে কাহের নয়, মাকহুর। তার চুক্তি তার নিজের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্যের উপর বর্তাবে না। তার চুক্তি সত্ত্বেও মুসলিমরা দারুল হরবে আক্রমণ করতে পারবে। নইলে তো ভালই হতো! কাফেররা কোনো মুসলিমকে ধরে জোরপূর্বক তার সাথে চুক্তি করে নিতো আর অমনি সকল মুসলমানের জন্য ঐ দারুল হরবে আক্রমণ হারাম হয়ে যেতো। এমন বোকার সিদ্ধান্ত শরীয়ত দেয় না। হ্যাঁ, ঐ বন্দীর জন্য তখন ঐ দারুল হরবের কোনো কাফেরের উপর আক্রমণ করা জায়েয হবে না। এটা তার নিজের চুক্তির কারণে। অন্য সকল মুসলিমের জন্য জায়েয। তার চুক্তি অন্যদের উপর বর্তাবে না।

দেখলাম, মুসলিম যখন ইমামুল মুসলিমিনের অধীনে থাকে এবং কাহের অবস্থায় থাকে, যখন কাফেররা তাকে ভয় পায়, এ সময় চুক্তি করলে তার চুক্তি সকলে মানতে বাধ্য। পক্ষান্তরে সে যখন কাফেরের অধীনে, তখন তার চুক্তি কারও উপর বর্তাবে না, নিজ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এখন প্রশ্ন, এ দেশের জনগণ কি কাহের না মাকহুর? পরিষ্কার যে, মাকহুর। তারা সরকারের অধীনে। নিজেদের কোনো রাষ্ট্রক্ষমতা নেই যে, ঐ রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে চুক্তি করবে। যখন দশা এই, তখন যার যার চুক্তি তার নিজের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্যের উপর বর্তাবে না। অতএব, চুক্তি যদি কিছু মুসলিম করেও থাকে, তাহলে তা তাদের নিজেদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। অন্য সকল মুসলিমের জন্য সরকারের জান মাল হালাল।

অধিকন্তু আমরা দেখেছি, চুক্তি একটা ফাঁপা বেলুন মাত্র। আসলে কোনো চুক্তি কেউ কোনো সময় করেনি। করলে নথিপত্র হাজির করা হোক যে, অমুক তারিখে অমুক অমুকে এই এই শর্তে এত দিনের জন্য চুক্তি করেছে।

তাছাড়া চুক্তির কথা আসলেই সে প্রসঙ্গটা চলে আসবে, তাহলে কি সরকারপক্ষ কাফের? যদি মুমিন হয় তাহলে চুক্তি কেন হবে? চুক্তির দরকার কেন পড়বে? মুমিন হলে তো শরীয়তের

পক্ষ থেকেই আনুগত্য জরুরী হতো।

আসলে চুক্তির কথাটা সরকারের মাথায়ও কোনো দিন আসেনি। আমরাই ঘেঁটেঘুটে এই ঐ উজর বের করতে থাকি। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

যখন আনুগত্য নেই

যখন সরকারের আনুগত্যের কোনো মাসআলা নেই, প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে কি আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবো?

উত্তর: না। সরকারের আনুগত্য না থাকলেও আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য আছে। এখন আপনাকে দেখতে হবে আল্লাহ ও রাসূল কি বলেছেন। সেভাবে চলবেন। যেখানেই থাকুন শরীয়ত মতে চলতে হবে। মুসলিমের জান মাল শরীয়তে হারাম, যেখানেই থাকুক। অতএব, মুসলিমদের জান মালের কোনো ক্ষতি কোথাও করা যাবে না।

হাঁ, জিহাদি কাজের কারণে সরকার যদি কাউকে পেরেশান

করে, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। সেটা মুজাহিদরা নিজেরা করছে না। মুজাহিদরা তো মুসলিমদের জান মালের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিতে চেষ্টা করে। যেখানে সামর্থ্য নেই, সেখানে তারা অপারগ। সেখানে সরকার যা করছে সেটা তাদের উপর বর্তাবে না। এতটুকু ক্ষতি অবশ্যই বরদাশত করতে হবে। নইলে জিহাদ করা যাবে না। জিহাদ মানেই তো জীবন দেয়া নেয়া। আরামে আরামে তো আর জিহাদ হয় না। তাতাররুসের মাসআলা এর খায়রে দলীল। অবশ্য মুসলিমদের জান মালের সবচে’ কম ক্ষতি হয় এমন তরিকাই মুজাহিদদের অবলম্বন করা চাই। আলহামদুলিল্লাহ আলকায়েদা এ নীতি মেনেই কাজ করে। এজন্য তাদের কাজের গতি ধীর। তা দেখে অনেকে মনে করেন, তারা কোনো কাজই করছেন না। আসলে ভিতরে ভিতরে তারা যে কতটুকু এগিয়ে গেছেন সেটার খবর অনেকের নেই। ওয়াল্লাহু তাআলা আ’লাম।

৮৮.সাইফুদ্দিন কুতজ রহ. কি খলিফা ছিলেন?

উত্তর : না! তিনি সুলতান ছিলেন। খলিফা ছিলেন না। তিনি মূলত মিশরের সুলতান ইজ্জুদ্দীন আইবেকের গোলাম

এবং সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ গোলাম ছিলেন। ৬৫৫ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে ইজ্জুদ্দীন আইবেক তার বিবি ও খাদেমাদের হাতে নিহত হন। বদলাস্বরূপ কুতজ রহ. এর নেতৃত্বে আইবেকের অন্যান্য গোলামরা বিবিকে হত্যা করেন এবং আইবেকের অল্পবয়স্ক ছেলে নূরুদ্দীন আলীকে ক্ষমতায় বসান। অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে রাষ্ট্র চালানো সম্ভব ছিল না। তাই সকল বিষয় মূলত কুতজ রহ.-ই দেখাশুনা করতেন। তিনি আগে থেকেই এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং লোকজন তাকে মান্য করতো। এভাবে দুই বছর চলে।

৬৫৭ হিজরিতে তাতাররা শামে আগ্রাসন চালায় এবং মিশরে আগ্রাসন চালানোর পরিকল্পনা করে। পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী জিহাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখন কুতজ রহ. তার মুনীবের ছেলে নূরুদ্দীন আলীকে অপসারণ করে নিজে সুলতান পদে অধীষ্ঠিত হন। কারণ, অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে এ ধরণের ভয়াবহ পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব ছিল না। তখনকার উলামা, ফুকাহা ও উমারাগণও বিষয়টি মেনে নেন। বরং কুতজ রহ. এর ক্ষমতা গ্রহণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত ছিল। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে জিহাদে

রওয়ানা হন। আল্লাহ তাআলা তার হাতে তাতারদের নাস্তানুবাদ করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আরেকটু বিস্তারিত বললে- ৬৫৬ হিজরির সফর মাসে বাগদাদে আব্বাসী খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহ তাতারদের হাতে শহীদ হন। তাতাররা বাগদাদকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। বলা হয়, বাগদাদে তারা বিশ লাখ মানুষ হত্যা করে। তখন থেকে মুসলিম বিশ্ব খলিফা শূন্য হয়ে পড়ে। তিন বছর খলিফাশুন্য ছিল।

তাতাররা বাগদাদ ধ্বংসের পর শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। হালাব ও দামেশককেও বাগদাদের মতো মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। শামের আমীর-উমারা ও জনগণ মিশরের কাছে সাহায্য চান, যেন শাম ও মিশর মিলে তাতারদের প্রতিহত করা যায়। এ ঘটনা ৬৫৭ হিজরির। তখন মিশরের ক্ষমতায় অধীষ্ঠিত- ইজ্জুদ্দিন আইবেকের ছেলে নূরুদ্দীন আলী। তাতারদের ব্যাপারে আলোচনার জন্য মিশরে আমীর-উমারা ও উলামা-ফুকাহা মিলে এক মজলিস বসে। সময়ের

দাবি অনুযায়ী জিহাদের সিদ্ধান্ত হয়। তবে অল্প বয়স্ক বালকের পক্ষে এ ধরণের নাজুক পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব ছিল না। মূলত আগে থেকে কুতজ রহ.-ই রাষ্ট্রীয় বিষয়াশয় দেখাশুনা করতেন। লোকজনের মাঝে নূরুদ্দীন আলীকে বরখাস্ত করার আলোচনা উঠে। কুতজ রহ.-ই ছিলেন এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত লোক। তিনি নূরুদ্দীন আলীকে বরখাস্ত করে মিশরের সুলতান পদে অধীষ্ঠিত হন। ৬৫৭ হিজরির জিলকদ মাসে তার বাইয়াত হয়। উলামা-ফুকাহাগণও পরিস্থিতির বিবেচনায় এতে সমর্থন দেন। সুলতান পদে অধীষ্ঠিত হয়ে তিনি শাম ও মিশরবাসীকে নিয়ে জিহাদে রওয়ানা হন। আমীর রুকনুদ্দীন বাইবার্স রহ. শামের বাহিনিতে ছিলেন। তিনি কুতজের সাথে যোগ দেন। ৬৫৮ হিজরির রমযান মাসে আইনে জালূতে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে তাতাররা সূচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আল্লাহ তাআলা কুতজ রহ. এর হাতে তাতারদের নাস্তানুবাদ করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

শাম তাতারদের থেকে মুক্ত হওয়ার পর কুতজ রহ. মিশরে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কয়েকজন আমীরের ষড়যন্ত্রে তিনি

নিহত হন। এরপর সকলে মিলে ইসলামের সিংহ রুকনুদ্দীন বাইবার্স রহ.কে মিশর ও শামের সুলতান নির্ধারণ করে। তিনি সুলতান হওয়ার পর ৬৫৯ হিজরির রজব মাসে মুস্তানসির বিল্লাহ আব্বাসীকে খলিফা নিয়োগ দেন। এভাবে তিন বছর মুসলিম বিশ্ব খলিফাশুন্য থাকার পর ৬৫৯ হিজরিতে খলিফা নিয়োগ হয়। এ খলিফাবিহিন সময়েই ৬৫৮ হিজরির রমযান মাসে সুলতান কুতজ রহ. আইনে জালূতের জিহাদে তাতারদের পরাজিত করে ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

বিষয়টি ভালভাবে জানার জন্য কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি-

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.) বলেন,

ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس منها. اهـ

“৬৫৬ হিজরিতে তাতাররা বাগদাদ দখল করে নেয়। বাগদাদের অধিকাংশ অধিবাসীকে হত্যা করে দেয়, এমনকি

খলিফাকেও। সাথে সাথে বাগদাদ থেকে আব্বাসী শাসনেরও পতন হয়ে যায়।”- **আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১৩/২৩৩**

আরো বলেন,

قتلته التتار مظلوما مضطهدا في يوم الأربعاء رابع عشر صفر من هذه السنة، وله من العمر ستة وأربعون سنة وأربعة أشهر.وكانت مدة خلافته خمسة عشر سنة وثمانية أشهر وأياما (1) ، فرحمه الله وأكرم مثواه، وبل بالرأفة ثراه. وقد قتل بعده ولداه وأسر الثالث مع بنات ثلاث من صلبه، وشغر منصب الخلافة بعده، ولم يبق في بني العباس من سد مسده، فكان آخر الخلفاء من بني العباس. اهـ

“৬৫৬ হিজরির ১৪ই সফর নির্মমভাবে জুলুম করে তাতাররা খলিফাকে শহীদ করে। ... তার শহীদ হওয়ার পর খলিফার পদ শুন্য হয়ে পড়ে। শুন্যতা পূরণ করার মতো আব্বাসীদের কেউ বাকি থাকেনি। (কার্যত) তিনিই আব্বাসীদের শেষ খলিফা ছিলেন।”- **আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১৩/২৩৮**

অর্থাৎ পরে যদিও আব্বাসীদের থেকে খলিফা নিয়োগ দেয়া হয়েছে, কিন্তু খলিফার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। নামে মাত্র

ছিল। তাই বলতে গেলে শহীদ মুস্তাসিম বিল্লাহই আব্বাসীদের শেষ স্বাধীন খলিফা।

সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্স রহ. মিশর ও শামের সুলতান হওয়ার পর ৬৫৯ হিজরির রজব মাসে আব্বাসীদের থেকে মুস্তানসির বিল্লাহকে খলিফা পদে সমাসীন করেন- এ প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

بويع بالخلافة بمصر بايعه الملك الظاهر والقاضي والوزير والأمراء، وركب في دست الخلافة باديار مصر والأمراء بين يديه والناس حوله، وشق القاهرة في ثالث عشر رجب، وهذا الخليفة هو الثامن والثلاثون من خلفاء بني العباس بينه وبين العباس أربعة وعشرون أبا، وكان أول من بايعه القاضي تاج الدين لما ثبت نسبه، ثم السلطان ثم الشيخ عز الدين بن عبد السلام ثم الأمراء والدولة، وخطب له على المنابر وضرب اسمه على السكة وكان منصب الخلافة قد شغر منذ ثلاث سنين ونصفا، لأن المستعصم قتل في أول سنة ست وخمسين وستمائة، وبويع هذا في يوم الاثنين في ثالث عشر رجب من هذه السنة - أعني سنة تسع وخمسين وستمائة. اهـ

"মিশরে খলিফার বাইয়াত হয়। সুলতান জাহির (বাইবার্স), কাজি, উজির ও উমারাগণ বাইয়াত হন। ... মিম্বারে খলিফার নামে খুতবা দেয়া হয়। তার নামে মুদ্রাও চালু হয়। ইতিপূর্বে

তিন বছরেরও অধিক সময় ধরে খলিফার পদ শুন্য ছিল। কেননা, মুস্তাসিম বিল্লাহ শহীদ হন ৬৫৬ হিজরির শুরুতে আর বর্তমান খলিফার বাইয়াত হয়েছে চলতি ৬৫৯ হিজরির ১৩ই রজব।"- **আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১৩/২৬৮**

বাইবার্স রহ. এর জীবনীতে বলেন,

وهو الذي أنشأ الدولة العباسية بعد دثورها، وبقي الناس بلا خليفة نحوا من ثلاث سنين. اهـ

"পতন হয়ে যাওয়ার পর তিনিই আব্বাসী শাসনকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে তিন বছরের মতো কোন খলিফা ছিল না।"- **আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১৩/৩২৩**

ইবনু তাগরি রহ. (৮৭৪ হি.) বলেন,

وشغرت الخلافة بعده سنين، وبقيت الدّنيا بلا خليفة حتّى أقام الملك الظاهر بيبرس البندقدارىّ بعض بنى العبّاس فى الخلافة. اهـ

"খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহ শহীদ হওয়ার পর কয়েক বছর খলিফার পদ শুন্য পড়ে ছিল। দুনিয়ায় কোন খলিফা ছিল

না। অবশেষে সুলতান জাহির বাইবার্স আব্বাসীদের একজনকে খলিফা পদে সমাসীন করেন।”- **আননজুমুয যাহিরা ৭/৬৪**

***

সুলতান কুতজ এবং আইনে জালূত

ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

ثم دخلت سنة خمس وخمسين وستمائة فيها أصبح الملك المعظم صاحب مصر عز الدين أيبك بداره ميتا ... ولما قتل رحمه الله فاتهم مماليكه زوجته ولما سمعوا مماليكه أقبلوا بصحبة مملوكه الأكبر ... أم خليل شجرة الدر به وأقامت الأتراك بعد أستاذهم عز الدين أيبك ...سيف الدين قطز، فقتلوها التركماني، بإشارة أكبر مماليكه الأمير سيف الدين قطز، ولده نور الدين عليا (3) ولقبوه الملك المنصور، وخطب له على المنابر وضربت السكة باسمه. اهـ

“৬৫৫ হিজরিতে মিশরের সুলতান ইজ্জুদ্দীন আইবেক রহ.কে নিজ গৃহে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার মামলূকরা ধারণা করে যে, তার স্ত্রী শাজারাতুতদুর এ হত্যাকাণ্ডে

জড়িত। বড় মামলূক সাইফুদ্দীন কুতজের নেতৃত্বে মামলূকরা শাজারাতুতদুরকে হত্যা করে এবং তারই পরামর্শে আইবেকের স্থলে তার ছেলে নূরুদ্দীন আলীকে 'মানসূর' উপাধী দিয়ে ক্ষমতায় বসায়। তার নামে মিম্বারে খুতবা দেয়া হয় এবং মুদ্রাও চালু হয়।"- **আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১৩/২২৮**

সামনে বলেন,

لما قتل أستاذه المعز قام في تولية ولده نور الدين المنصور علي، فلما سمع بأمر التتار خاف أن تختلف الكلمة لصغر ابن أستاذه فعزله ودعا إلى نفسه، فبويع في ذي القعدة سنة سبع وخمسين وستمائة كما تقدم، ثم سار إلى التتار فجعل الله على يديه نصرة الإسلام كما ذكرنا، وقد كان شجاعا بطلا كثير الخير ناصحا للإسلام وأهله، وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيرا. اهـ

"মুনীব নিহত হওয়ার পর কুতজ রহ. মুনীবের ছেলে নূরুদ্দীন মানসূর আলীকে ক্ষমতায় বসান। পরে যখন তাতারদের আগ্রাসনের খবর পান, তার ভয় হয় যে, মুনীবের ছেলে (সুলতান মানসূর) অল্পবয়স্ক হওয়ায় (উমারাদের মাঝে) মতভেদ দেখা দিতে পারে (যা এ ধরণের পরিস্থিতিতে ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে)। তাই তিনি

তাকে বরখাস্ত করেন এবং সকলকে তার হাতে বাইয়াত হওয়ার আহ্বান জানান। ৬৫৭ হিজরির জিলকদ মাসে তার বাইয়াত হয়। বাইয়াতের পর তাতারদের মোকাবেলায় অগ্রসর হন। আল্লাহ তাআলা তার হাতে ইসলামের নুসরত করেন। তিনি অত্যন্ত বীর-বাহাদুর ছিলেন। অনেক ভাল লোক ছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণকামী ছিলেন। লোকজন তাকে মহব্বত করতো। তার জন্য অনেক দোয়া করতো।”- **আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১৩/২৬১**

আরো বলেন,

وبان عذره الذي اعتذر به إلى الفقهاء والقضاة وإلى ابن العديم، فإنه قال: لا بد للناس من سلطان قاهر يقاتل عن المسلمين عدوهم، وهذا صبي صغير لا يعرف تدبير المملكة. اهـ

“ফুকাহায়ে কেরাম, কাজিগণ এবং (শামের উজির) ইবনুল আদিম- সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুতজ রহ. পরিস্থিতির বিবেচনায়ই ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। ক্ষমতা নেয়ার যুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এমন একজন দাপটি সুলতান আবশ্যক যিনি দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে

মুসলমানদের সুরক্ষা দিতে পারেন। আর এ তো ছোট বালক। রাষ্ট্র চালানোর জ্ঞান-বুদ্ধি ও কলা-কৌশল তার জানা নেই।”- **আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১৩/২৫০**

সুলতান পদে অধীষ্ঠিত হওয়ার পর কুতজ রহ. তাতারদের মোকাবেলায় রওয়ানা হন। আইনে জালূতের ঐতিহাসিক যুদ্ধে তাতাররা সূচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাতাররা শাম থেকেও পলায়ন করে। শাম ও মিশর মুসলমানদের একচ্ছত্র অধীনে চলে আসে। আইনে জালূতের যুদ্ধ হয় ৬৫৮ হিজরির রমযান মাসে। এ সময় মুসলিম বিশ্ব খলিফাশুন্য ছিল। আইনে জালূতের পর মিশরে ফেরার পথে কুতজ রহ. কয়েকজন আমীরের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। সুলতান হওয়ার পর পূর্ণ এক বছরও তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। এরপর সকলে মিলে রুকনুদ্দীন জাহির বাইবার্স রহ.কে সুলতান নিয়োগ দেন। তিনি সুলতান হওয়ার পর ৬৫৯ হিজরির রজব মাসে মুস্তানসির বিল্লাহ আব্বাসীকে খলিফা নিয়োগ দেন। তিন বছর খলিফাবিহিন থাকার পর মুসলিম বিশ্বে আবার খলিফা নিয়োগ হয়।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে আশাকরি স্পষ্ট যে, সাইফুদ্দীন কুতজ রহ. খলিফা ছিলেন না, সুলতান ছিলেন। আইনে জালূতে তিনি যে জিহাদ করেছেন, তা খলিফা হিসেবে নয়, সুলতান হিসেবে। এ জিহাদকে উলামায়ে কেরাম আল্লাহর রহমত আখ্যা দিয়েছেন। বুঝা গেল, জিহাদ সহীহ বা জায়েয হওয়ার জন্য খলিফা থাকা শর্ত বা আবশ্যক নয়। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

৮৯.সাবিলুল্লাহ এবং জুমআর ফজিলত: একটি সংশয়

একটি সংশয়

==========================

এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. صحيح البخاري : 865

যার পদযুগল ফি সাবিলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। - সহীহ বুখারি: ৮৬৫

হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ. কিতাবুল জুমআতে এনে জুমআয় হেঁটে চলার ফজিলত বর্ণনা করেছেন, কিতাবুল জিহাদে এনে জিহাদের ময়দানে ধূলি ধূসরিত হওয়ার ফজিলত বর্ণনা করেছেন।

হাদিসটি ব্যাপক। সাহাবায়ে কেরাম হাদিসটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। সাহাবি আবু আবস রাদি. এ হাদিস দিয়ে জুমআয় হেঁটে চলার ফজিলত বর্ণনা করেছেন।

যেমন ইমাম বুখারি রহ. আবায়া বিন রিফায়া রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي
من اغبرت قدماه في سبيل الله) صلى الله عليه و سلم يقول
حرمه الله على النار) .صحيح البخاري : 865

আমি (পায়ে হেঁটে) জুমআয় যাচ্ছিলাম। তখন আবু আবস রাদি. এর সাথে সাক্ষাত হয়। (আমাকে হেঁটে চলতে দেখে) তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যার পদযুগল ফি সাবিলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। -সহীহ বুখারি: ৮৬৫

সাহাবি জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদি. এ হাদিস দিয়ে জিহাদের ময়দানে পায়ে হেঁটে চলার ফজিলত বর্ণনা করেছেন।

আবুল মুসাব্বিহ আলমাকরায়ি রহ. থেকে ইবনে হিব্বান রহ. (৩৫৪হি.) বর্ণনা করেন,

عن حصين بن حرملة المهري حدثنا أبو المصبح المقرائي،
قال: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن
عبد الله الخثعمي إذ مر مالك بجابر بن عبد الله وهو يمشي يقود
بغلا له فقال له مالك: أي أبا عبد الله اركب، فقد حملك الله،

فقال جابر: أصلح دابتي، وأستغني عن قومي، وسمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اغبرت قدماه في سبيل الله،
فأعجب مالكا قوله، فسار حتى إذا كان "حرمه الله على النار
حيث يسمعه الصوت ناداه بأعلى صوته يا أبا عبد الله اركب،
فقد حملك الله، فعرف جابر الذي أراد برفع صوته، وقال:
أصلح دابتي، وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله
من اغبرت قدماه في سبيل الله، حرمه الله " :عليه وسلم يقول
على النار" فوثب الناس عن دوابهم، فما رأينا يوما أكثر ماشيا
منه. -صحيح إبن حبان: 4604، قال الشيخ الأرنؤوط رحمه الله
تعالى: حديث صحيح. اهـ

আমরা একটি জিহাদি কাফেলা রোম ভূমিতে চলছিলাম। কাফেলার আমির ছিলেন মালেক বিন আব্দুল্লাহ আলখাসআমি রহ.। চলতে চলতে মালেক রহ. এক সময় সাহাবি জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদি.র পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। জাবের রাদি. তখন তাঁর একটি খচ্চর টেনে নিয়ে হেঁটে চলছিলেন। মালেক রহ. জাবের রাদি.কে বললেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি তো সওয়ার হতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তো আপনাকে সওয়ারি দান করেছেন'। তখন জাবের রাদি. উত্তর দেন, ... আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যার পদযুগল ফি সাবিলিল্লাহ

তথা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। ... এ কথা শুনতেই লোকজন লাফালাফি করে বাহন থেকে নামতে শুরু করে। আমরা সেদিনের চেয়ে অধিক লোককে কখনও পায়ে হেঁটে চলতে দেখিনি। -সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪৬০৪ (হাদিসটি সহীহ)।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. (৮৫২হি.) বলেন,

فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه؟. -فتح الباري لابن حجر (6/30)

(যুদ্ধের ময়দানে) কেবল পায়ে ধূলা বালি লাগলেই যদি তা জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়, তাহলে যে ব্যক্তি দৌড় ঝাঁপ করবে, নিজের সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দেবে তার ফজিলত কত হবে?! -ফাতহুল বারি: ৬/৩০

তাবলিগি ভাইদের বিভ্রান্তি

আমরা দেখলাম, হাদিসে ফি সাবিলিল্লাহ ধূলি ধূসরিত হওয়ার ফজিলতের কথা এসেছে আর সাহাবায়ে কেরাম কেউ একে জুমআয় ব্যবহার করেছেন কেউ জিহাদে ব্যবহার করেছেন। এ থেকে কেউ কেউ সংশয় সৃষ্টি করেছেন যে, বুঝা গেল

জিহাদের আয়াত-হাদিস প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলিগে ব্যবহার করা যাবে।

বরং আরো আগে বেড়ে গিয়ে প্রচলিত তাবলিগকে জিহাদে রূপান্তর করেছেন।

বরং আরো আগে বেড়ে জিহাদকে প্রচলিত তাবলিগের মধ্যেই সীমিত করে ফেলেছেন।

বরং আরো আগে বেড়ে তাবলিগ ফরয এবং জিহাদ হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

এখন তাদের আকিদা: জিহাদ হারাম, তাবলিগ ফরয। তাবলিগের কাজ করলে জিহাদের সকল ফজিলত বরং আরো বেশি পাওয়া যাবে। আর জিহাদ করলে সওয়াব তো হবেই না, উল্টো গোনাহ হবে।

অনেক তাবলিগি ভাইয়ের আকিদাই এমন। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক।

তিলকে তাল বানিয়ে এভাবে ফজিলত সাব্যস্ত করা জাহালত বৈ কিছু নয়। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

ফি সাবিলিল্লাহ

আসলে ফি সাবিলিল্লাহ একটি ব্যাপক শব্দ। সাধারণত ফি সাবিলিল্লাহ বলতে জিহাদ বুঝালেও এটি ব্যাপক অর্থেও ব্যবহার হয়।

'সাবিল' অর্থ পথ, রাস্তা। 'সাবিলুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর পথ, আল্লাহর রাস্তা। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার দ্বীন এবং দ্বীনের বিধানাবলী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেসকল আয়াতে বলা হয়েছে যে কাফেররা সাবিলুল্লাহ থেকে লোকজনকে ফিরায়

সেগুলোতে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

যেমন কয়েকটি আয়াত-

{ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99)} [آل عمران: 99]

{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167)} [النساء: 167]

{ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116)} [الأنعام: 116]

{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36)} [الأنفال: 36]

{ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47) } [الأنفال: 47، 48]

সাবিলুল্লাহর বিপরীতে আসে সাবিলুশ শাইতান/সাবিলুত তাগুত তথা শয়তানের রাস্তা, শয়তানের পথ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)} [النساء: 76]

যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। সুতরাং (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। (আর) শয়তানের চক্রান্ত তো নিতান্তই দুর্বল। - নিসা ৭৬

'ফি সাবিলিল্লাহ' অর্থ আল্লাহর রাস্তায়। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের জন্য বা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; গাইরুল্লাহর জন্য নয় বা লোক দেখানোর জন্য নয়।

যেমন হাদিসে এসেছে,

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে আরজ করলো- কেউ যুদ্ধ করে গনিমতের লোভে, কেউ যুদ্ধ করে প্রশংসা লাভের জন্য আর কেউ যুদ্ধ করে তার বাহাদুরী ও বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। এদের কার যুদ্ধ ফি সাবিলিল্লাহ তথা আল্লাহর রাস্তায় গণ্য হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, আল্লাহর কালিমা বুলন্দীর জন্য যে যুদ্ধ করে, তারটাই কেবল আল্লাহর রাস্তায় গণ্য হবে। -সহীহ বুখারী: ২৮১০, সহীহ মুসলিম: ৫০২৮

অতএব, লোক দেখানোর জন্য কোনো দ্বীনের কাজ করলে সেটা ফি সাবিলিল্লাহ হবে না তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে না, আল্লাহর দ্বীনের জন্য হবে না। এটাতে কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না। অতএব, লোক দেখানো দান, লোক দেখানো নামায, লোক দেখানো ওয়াজ, লোক দেখানো যুদ্ধ,

লোক দেখানো হিজরত কোনোটাই ফি সাবিলিল্লাহ নয়। এগুলো ফি সাবিলিল্লাহ তখনই হবে যখন সেগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আল্লাহর দ্বীনের উপকারের জন্য করা হবে। উপরোক্ত হাদিসে এ অর্থই উদ্দেশ্য। কুরআন ও সুন্নাহয় ফি সাবিলিল্লাহ বলতে অনেক ক্ষেত্রে এ অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ দ্বীনের কাজ দ্বীনের জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। যেমন কয়েকটি আয়াত লক্ষ করুন-

দান সংক্রান্ত

{ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } [البقرة: 261، 262]

যাকাত সংক্রান্ত

{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34)} [التوبة: 34]

হিজরত সংক্রান্ত

{وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100)} [النساء: 100]

{وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58)} [الحج: 58]

{وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22)} [النور: 22]

জিহাদে দান সংক্রান্ত

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195)} [البقرة: 195]

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)} [الأنفال: 60]

আর জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত অসংখ্য তাই উল্লেখ করা হলো না।

এ সকল আয়াতে দান সাদাকা, হিজরত ইত্যাদি ফি সাবিলিল্লাহ করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং দ্বীনের উপকারের জন্য করা। লোক দেখানোর জন্য না করা বা শরীয়ত বহির্ভুত শয়তানের পথে না করা।

ফি সাবিলিল্লাহ হওয়ার শর্ত

ফি সাবিলিল্লাহ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত:

এক. কাজটি দ্বীনের কাজ হতে হবে। শয়তানি তরিকার বা শরীয়ত বহির্ভুত হতে পারবে না। অতএব, কুফরি সংবিধান রক্ষার্থে জীবন দিলে সেটা ফি সাবিলিল্লাহ হবে না, ফি সাবিলিত তাগুত হবে। পতিতালয়ের জন্য অর্থ দান করলে তা ফি সাবিলিল্লাহ হবে না, ফি সাবিলিশ শাইতান হবে।

দুই. দ্বীনের উক্ত কাজটি ইখলাসের সাথে করতে হবে।

অতএব, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ, হিজরত যা কিছুই করি সব ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। লোক দেখানোর জন্য বা সুনাম কুড়ানোর জন্য হলে ফি সাবিলিল্লাহ হবে না।

ফি সাবিলিল্লাহ জিহাদের সাথে খাস নয়

বুঝতে পারলাম, সাবিলুল্লাহ অর্থ আল্লাহর পথ। অর্থাৎ যে পথ আল্লাহ তাআলা দেখিয়েছেন। যে পথে চললে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট। এ হিসেবে গোটা দ্বীন এবং দ্বীনের বিধি বিধান সবগুলোই সাবিলুল্লাহ। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, দান, সাদাকা, হিজরত, জিহাদ সব সাবিলুল্লাহ।

আর ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর পথে। তথা দ্বীনের পথে, দ্বীনের জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। দ্বীনের উপকারের জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করাকে ফি সাবিলিল্লাহ করা বলা হয়।

অতএব, যে কাজ শরীয়ত সমর্থিত নয়; কিংবা দ্বীনের যে কাজ দ্বীনের স্বার্থে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না তা ফি সাবিলিল্লাহ হবে না।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ফি সাবিলিল্লাহ জিহাদের সাথে খাস নয়। বরং ফি সাবিলিল্লাহর অংসখ্য কাজের মধ্যে জিহাদ একটা কাজ। অবশ্য ফি সাবিলিল্লাহ কথাটি বলা হলে দ্বীনের অসংখ্য কাজের মধ্য থেকে অনেক সময় শুধু জিহাদই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

অতএব, কোনো আয়াত বা হাদিসে ফি সাবিলিল্লাহ কথাটি আসলে আগে পরের আলোচনা দেখে বুঝতে হবে যে, এখানে শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে (যার মাঝে জিহাদও শামিল আছে), না'কি শুধু জিহাদ উদ্দেশ্য।

আলোচ্য হাদিসে ফি সাবিলিল্লাহ শব্দটি ব্যাপক

আমরা শুরুতে যে হাদিস নিয়ে কথা বলছিলাম, সে হাদিসটিতে ফি সাবিলিল্লাহ শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে জিহাদও আছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম এ ফজিলত জিহাদেও ব্যবহার করেছেন, জুমআতেও ব্যবহার করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. (৮৫২হি.) বলেন,

قال ابن بطال: ... والمراد في سبيل الله جميع طاعاته ا هـ. وهو كما قال، إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد، فضل المشي إلى الجمعة" استعمالا "وقد أورده المصنف في للفظ في عمومه. -فتح الباري لابن حجر (6 /29)

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, '(এ হাদিসে) ফি সাবিলিল্লাহ দ্বারা সকল নেক কাজ উদ্দেশ্য'। তিনি যেমন বলেছেন বিষয়টা এমনই। অবশ্য সাবিলুল্লাহ বলতে সাধারণত জিহাদই উদ্দেশ্য হয়। ইমাম বুখারি রহ. হেঁটে জুমআয় গমনের ফজিলত বুঝাতে হাদিসটি এনেছেন সাবিলুল্লাহ

শব্দটির ব্যাপক অর্থ হিসেবে। -ফাতহুল বারি: ৬/২৯

উপরোক্ত হাদিসে সাবিলুল্লাহ শব্দটি যেহেতু ব্যাপকার্থে এসেছে, সুনির্দিষ্টভাবে শুধু জিহাদের জন্য আসেনি, তাই এর ফজিলত যেমন জিহাদে ব্যবহার করা যাবে তেমনি জুমআ, হজ্ব, ইলমের জন্য সফর ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে। তবে যার আমলে যত বেশি কষ্ট তার উপর তত বেশি ফিট খাবে।

যেমনটা ইবনে হাজার রহ. বলেছেন,

فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه؟. -فتح الباري لابن حجر (6/30)

(যুদ্ধের ময়দানে) পায়ে কেবল ধূলা বালি লাগলেই যদি তা জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়, তাহলে যে ব্যক্তি দৌড় ঝাঁপ করবে, নিজের সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দেবে তার ফজিলত কত বেশি হবে?! -ফাতহুল বারি: ৬/৩০

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

فهذا في الغبار الذي يصيب الوجه والرجل فكيف بما هو أشق منه؛ كالثلج والبرد والوحل. -مجموع الفتاوى (28/ 419)

চেহারা ও কদমে লাগা ধূলা বালিরই যদি এ ফজিলত হয়, তাহলে বরফে চলা বা প্রচণ্ড শীত ও কাদা-কর্দমে চলার মতো কাজ, যেগুলো আরও অনেক গুণ কঠিন, সেগুলোর ফজিলত কত বেশি হবে?! -মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৪১৯

ঢালাওভাবে জিহাদের আয়াত-হাদিস অন্যত্র ব্যবহার করা যাবে না

উপরোক্ত হাদিসে যেহেতু সাবিলুল্লাহ শব্দটি আম তথা ব্যাপক ছিল তাই তা জিহাদসহ অন্য সকল আমলে ফিট করা যাবে। কিন্তু যে ফজিলত বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট কোনো আমলের ব্যাপারে এসেছে তা কি করে অন্য আমলের উপর ফিট করা হবে?? নামাযের ফজিলত কি রোযার উপর কিংবা হজ্বের উপর লাগনো যাবে? তদ্রূপ দান সাদাকার ফজিলত কি বিবাহ শাদির উপর লাগানো যাবে? সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ এ ধরনের কথা বলবে না।

তাবলিগি ভাইয়েরা দু’টি ভুল করেছেন

এক. জিহাদের ফজিলত ঢালাওভাবে প্রচলিত তাবলিগে ব্যবহার করেছেন।

দুই. এরপর প্রচলিত তাবলিগকে জিহাদ বানিয়ে ফেলেছেন।

এভাবে তারা শরীয়তের অকাট্য বিধান জিহাদের তাহরিফ করেছেন। বরং বলতে গেলে শরীয়ত থেকে জিহাদ নামক বিধানটি বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

আচ্ছা আপনিই বলুন, আমাদের আলোচ্য হাদিসটি তো দেখলাম যে, সাহাবায়ে কেরাম জুমআতেও ব্যবহার করেছেন জিহাদেও করেছেন। কিন্তু তাই বলে কি এ কথা বলা যাবে যে, একই ফজিলত যেহেতু দুই আমলে ব্যবহার করা যাচ্ছে কাজেই নামাযের অন্য সকল ফজিলতও জিহাদে ব্যবহার করা যাবে? যদি তা না করা যায় তাহলে কিভাবে জিহাদের সকল ফজিলত নামাযে ব্যবহার করা যাবে?!

কিংবা এ কথা কি বলা যাবে যে, জিহাদ করলে আর জুমআ পড়তে হবে না??!! এটা তো তাবলিগি ভাইয়েরাও স্বীকার করবেন না। তাহলে এ কথা কিভাবে বলা যাবে যে, জুমআ পড়লে জিহাদ আদায় হয়ে যাবে, জিহাদ করতে হবে না??

প্রচলিত তাবলিগ তো একটা নব আবিষ্কৃত পন্থা। সাহাবায়ে কেরামের যামানায় তা ছিল না। উপরোক্ত হাদিসের ফজিলত এ কাজে ব্যবহারের কথা সাহাবায়ে কেরাম থেকে নেই। তারপরও না হয় ধরে নিলাম হাদিসের ব্যাপকার্থের মাঝে তাবলিগও পড়ে। কিন্তু তাই বলে কি এ কথা বলা যাবে যে, জিহাদ আর তাবলিগ একই? তাবলিগই জিহাদ? তাবলিগ করলে আর জিহাদ করতে হবে না বা জিহাদ ফরয থাকবে না?

যদি তাবলিগওয়ালারা এটা বলতে চায় তাহলে এর আগে

বলতে হবে, নামায আর জিহাদ একই। জিহাদ করলে আর নামায লাগবে না।

৯০.সায়্যিদুল ইস্তিগফার (গোনাহ মাফের সর্বশ্রেষ্ট দোয়া) এর ফজিলত ও শর্ত।

বুখারী শরীফে এসেছে,

شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: سيد الاستغفار أن تقول

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شرما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء لك بذنبي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة

"হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে, রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত: সায়্যিদুল ইস্তিগফার হচ্ছে তুমি বলবে,

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি (খালেস নিয়্যতে, এর সওয়াব ও প্রতিদানের প্রতি) ইয়াকিন করত দিনের বেলায় তা বলবে, অত:পর সন্ধার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতবাসী। আর যে ব্যক্তি (খালেস নিয়্যতে, এর সওয়াব ও প্রতিদানের প্রতি) ইয়াকিন করত রাত্রির বেলায় তা বলবে, অত:পর সকাল হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতী’।”
[সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৫৯৪৭]

অর্থাৎ যখন কেউ গুনাহ থেকে তাওবা করতে চায়, তখন তার জন্য গোনাহ মাফের সর্বশ্রেষ্ট দোয়া হল- এই দোয়াটি।

তবে দোয়াটি শুধু মুখে মুখে পড়লেই হবে না, গুনাহ থেকে তাওবার নিয়্যতে, ইয়াকিন ও ইখলাসের সাথে পড়তে হবে। তবেই দোয়াটি সায়্যিদুল ইস্তিগফার হিসেবে গণ্য হবে এবং

তার ব্যাপারে বর্ণিত ফজিলত লাভ হবে, অন্যথায় নয়।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (মৃত্যু: ৮৫২হি.) হাফেয ইবনে আবি জামরাহ্ রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

"من شروط الاستغفار:

صحة النية،

والتوجه،

والأدب؛

فلو ان أحدا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ الوارد، واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد، لكن اخل بالشروط: هل يستويان؟

فالجواب: ان الذي يظهر ان اللفظ المذكور انما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة." اهـ

"ইস্তিগফারের শর্ত হচ্ছে,

(১). নিয়্যত সহীহ হওয়া।

(২). আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশের সহিত হওয়া।

(৩). আদবের সহিত হওয়া।

যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত শর্তসমূহ পালনপূর্বক হাদিসে বর্ণিত অন্য কোন দোয়া দিয়ে ইস্তিগফার করে তথা গোনাহ মাফ চায়, আর অন্য এক ব্যক্তি এসব শর্ত পালন ব্যতীত এই দোয়া দিয়ে

ইস্তিগফার করে- তাহলে উভয়ে কি বরাবর হবে?

উত্তর: স্পষ্ট এটাই, এ দোয়াটি সায়্যিদুল ইস্তিগফার হবে, যখন উল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া যাবে।” **[ফাতহুল বারী: ১১/৯৮]**

অতএব, যখন সহী নিয়্যতে, মনোনিবেশপূর্বক, আদবের সহিত এই দোয়া পড়ে আল্লাহর তাআলার কাছে গোনাহ মাফ চাইবে- তখনই এই দোয়ার ফজিলত পূর্ণ লাভ হবে। অন্যথায় শুধু মুখে পড়ার দ্বারা কিছু ফায়েদা তো হবে, কিন্তু হাদিসে বর্ণিত ফজিলত লাভ হবে না, সমস্ত গুনাহও মাফ হবে না।

বি.দ্র.

মুজাহিদ ভাইদেরকে কিছু আযকার পড়তে দেয়া হয়। তাতে এ দোয়াটিও আছে। কিন্তু অনেক সময়ই খালেস নিয়্যত এবং আদব-ইহতিরামের সাথে পড়া হয় না। তাওবা এবং গুনাহ মাফের নিয়্যতও থাকে না। শুধু প্রথা-মাফিক পড়ে যাওয়া হয়, যেন কোনমতে দায়িত্ব আদায় করা উদ্দেশ্য। এভাবে পড়ার দ্বারা ফায়েদা কিছু হলেও, কোন দোয়ারই পূর্ণ ফজিলত লাভ হবে না। তাই ভাইদের প্রতি আবেদন, আপনারা মনোযোগের

সহিত, বুঝে-শুনে, তাওবা ও গুনাহ মাফের নিয়্যতে আযকারগুলো পড়বেন।

পোস্টটা দেয়ার উদ্দেশ্য- যেন আল্লাহ তাআলা আপনাদের সাথে আমাকেও মনোযোগের সাথে, তাওবা ও গুনাহ মাফের নিয়্যতে পড়ার তাওফিক দান করেন। কেননা, অন্যকে স্বরণ করিয়ে দেয়ার বরকতে নিজের মধ্যেও আমলের জযবা পয়দা হয়।

৯১.হিদায়াতুস সারি: একটি সংশোধনী

গাযওয়া সাইটে শায়খ হুসাম আব্দুর রউফ (হাফিযাহুল্লাহ)র লেখা **((হিদায়াতুস সারি তাহযিবু মানারিল ক্বারী))** গ্রন্থের এড় দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এটি-

"বুখারি শরীফের একটি দুর্লভ শরাহ! এটি বুখারি এর বিখ্যাত শরাহ উমদাতুল কারী এর সংক্ষিপ্ত ব্যাক্ষাগ্রন্থ, লিখেছেন 'আদ দায়িরাতুল ই'লামিয়্যাহ লিকায়িদাতিল জিহাদ' এর প্রধান শাইখ হুসসাম আব্দুর রউফ হাফিজাহুল্লাহ!"

লিংক:

http://gazwah.net/2018/05/24/%e0%a6%...%81-%e0%a6%ae/

আমার মনে হচ্ছে এখানে দু'টো ভুল হয়েছে:

১. একে বুখারী শরীফের শরাহ বলা হয়েছে, অথচ এটি মূলত বুখারী শরীফের শরাহ নয়, শায়খ হামযা মুহাম্মাদ কাসিমের লেখা ((মুখতাসারু সহীহিল বুখারী))- এর শরাহ।

২. একে ((উমদাতুল ক্বারী))র সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলা হয়েছে। এটা একান্তই ভুল। বাস্তব হল, এ কিতাবের ফিকহি আলোচনা বহুলাংশে উমদাতুল ক্বারী থেকে নেয়া হয়েছে।

মূল ঘটনাটা হল-

শায়খ হামযা মুহাম্মাদ কাসিম দীর্ঘ দিন যাবৎ বুখারী শরীফের কোন খেদমত করতে তামান্না করে আসছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তার আশা পূরণ করেছেন। তিনি বুখারী শরীফকে মধ্যম ধরণের ইখতিসার করে একটি মতন

লিখেছেন ((মুখতাসারু সহীহিল বুখারী))। এরপর তিনি নিজেই পাঁচ খণ্ডে এর একটি বিস্তৃত শরাহ লিখেছেন, যার নাম দিয়েছেন, ((মানারুল কারী শরহু মুখতাসারি সহীহিল বুখারী))। এ শরাহতে তিনি যে ফিকহি আলোচনা করেছেন, তার বেশিরভাগের ক্ষেত্রে তিনি আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী রহ. (৮৫৫হি.) এর বুখারীর শরাহ ((উমদাতুল ক্বারী))- এর উপর নির্ভর করেছেন।

আলকায়েদার ((আদদায়িরাতুল ই'লামিয়্যা))- এর প্রধান শায়খ হুসাম আব্দুর রউফ (হাফিযাহুল্লাহ) উক্ত কিতাবের উপর জরুরী কিছু কাজ করেছেন। প্রয়োজনীয় ও জরুরী অনেক হাদিস, ফিকহি আলোচনা- ইত্যাদি সংযোজন করেছেন। কিছু বিয়োজন করেছেন। কিছু সংস্কার করেছেন। এতে কিতাবটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ একটি কিতাবে পরিণত হয়েছে। এর নাম, **((হিদায়াতুস সারি তাহযিবু মানারিল ক্বারী))।**

শায়খ হুসাম আব্দুর রউফ (হাফিযাহুল্লাহ)র কাছে কিতাবটি অত্যন্ত পছন্দনীয়। তিনি এর ব্যাপক প্রচার-প্রসারের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মুকাদ্দামায় (পৃ. ১৮-১৯) তিনি বলেন,

ولو كان الأمر بيدي والإمكانات متاحة لطبعت الآلاف من نُسَخِ هذا الكتاب - بعد تصحيحه وتهذيبه والإضافة إليه من قِبَلِ العلماء المتخصصين؛ وتوزيعها مجانًا على العلماء وطلبة العلم والمجاهدين والعاملين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك ترجَمته لجميع اللغات الحَيَّةِ المنطوقة بألسنة مئات الملايين.

واللهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أسألُ التَّوفيقَ وحُسْنِ الخاتمةِ لأصْحَابِ الدُّثورِ والأموال الذين يساهمون فِي طباعته على نفقاتهم الخاصة ويوزعونه مَجَّانًا؛ وكذلك شباب المسلمين الذين يتولون نشره عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت؛ أو ترجَمته إلى اللغات الحية المشهورة؛ ولهم ثواب "الدَّالّ على الخَيْرِ" إنْ شَاءَ اللهُ.

একজন মুজাহিদ শায়খের লেখা ও পছন্দনীয় কিতাবটি অবশ্যই বরকতময় হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিতাবটি থেকে যথার্থ ইস্তেফাদার তাওফিক দান করুন। তবে আমার মনে হচ্ছে এতে উপরোক্ত ভুল দু'টি হয়েছে। গাযওয়া সাইটের ভাইদেরকে বিষয়টি দেখার আবেদন জানাচ্ছি।

৯২.হিন্দুদের বাড়ি-ঘর মুসলমানদের চেয়ে উঁচু হতে পারবে না!!

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী হিন্দু ও অন্যান্য কাফেরদের বাড়ি-ঘর মুসলমানদের চেয়ে উঁচু হতে পারবে না। কেননা, কাফেরদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র বৈধ সূরত হচ্ছে জিযিয়া-কর দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনস্থ হয়ে নিম্ন শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে বসবাস করা। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না; যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।) (তাওবা ২৯)

আয়াতে শুধু আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করা হলেও আয়াতের হুকুম আহলে কিতাব সহ অন্যান্য কাফেরদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

অতএব, দারুল ইসলামে যিম্মিদেরকে নত হয়ে নিম্ন শ্রেণীর লোক হিসেবে থাকতে হবে। তাদের পোষাকাশাক, চাল-চলন, বাড়ি-ঘর সব কিছুর মাঝেই ফুটে উঠতে হবে যে, তারা নিম্ন শ্রেণীর। কোন দিক থেকেই তারা মুসলমানদের সমান হতে পারবে না কিংবা অগ্রে বেড়ে যেতে পারবে না। এই মূলনীতি অনুযায়ী তাদের বাড়ি-ঘর মুসলমানদের বাড়ি-ঘরের তুলনায় উঁচু হতে পারবে না। কারণ, তাদের বাড়ি উঁচু হওয়াটা তাদের সম্মান আর মুসলমানের অসম্মান বুঝায়। অথচ দারুল ইসলামে তাদেরকে থাকতে হলে মুসলমানদের সামনে সকল দিক থেকে নত হয়ে থাকতে হবে।

এমনকি পাশের মুসলমান যদি তাদেরকে উঁচু বাড়ি বানানোর অনুমতিও দেয় তবুও তাদের জন্য উঁচু বাড়ি বানানোর অনুমতি হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অপমানের রাখার আদেশ দিয়েছেন। কাজেই তাদের বাড়ি উঁচু হওয়া আল্লাহ

তাআলার পক্ষ থেকে নিষেধ। কোন মুসলমানের অধিকার নেই আল্লাহ তাআলা যা নিষেধ করেছেন তার বৈধতা দিয়ে দেবে।

নিষেধ করে দেয়ার পরও যদি কোন যিম্মি কাফের মুসলমানদের চেয়ে উঁচু বাড়ি বানায় তাহলে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। কারণ, তার বেঁচে থাকার অধিকার ততক্ষণ বহাল থাকবে যতক্ষণ সে মুসলমানদের সামনে নত হয়ে থাকে। কোন দিকে থেকে মুসলমানদের উপর বাড়াবাড়ি করলেই তার বেঁচে থাকার অধিকার শেষ। তাকে হত্যা করে দিতে হবে।

[বিস্তারিত দেখুন: ফাতাওয়া শামী; কিতাবুল জিহাদ; বাবুল উশরী ওয়াল খারাজী ওয়াল জিযইয়া।]